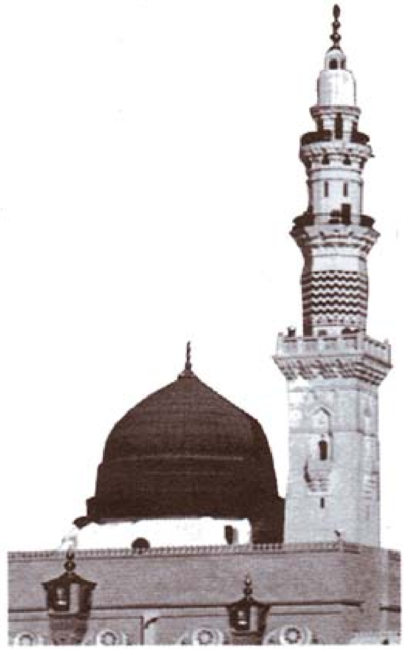
মাদারেজুন্ নবুওয়াত

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে
দেহলভী (রহঃ)



মাদারেজুন্ নবুওয়াত

৮ম খণ্ড

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (র)

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

মাদারেজুন্ নবুওয়াত
শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (র)
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুমিনুল হক
সম্পাদনা ঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

প্রথম প্রকাশ ঃ
মার্চ ২০০৮ ইং
রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিঃ
মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে
– সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

প্রচ্ছদ ঃ
আব্দুর রোউফ সরকার

মুদ্রণ ঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল,
ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময় ঃ
২৪০.০০ (দুইশত চল্লিশ টাকা)

MADAREZUN NABUWAT/ By Shaekh Abdul Haque Muhaddese Dehlabhi (Rh.) translated by Maolana Mominul Haque/ Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia. Exchange : Taka 240.00 US $ 20 only.

ISBN 984-70240-0020-0

نَحمَدُه ونُصَلّى علَى رَسُولِهِ الكريمْ

পৃথিবী তো এগিয়েই চলেছে। সময়ের শরীরে মুদ্রিত হয়ে চলেছে আমাদের শুভ-অশুভ কর্ম-অপকর্মের প্রতিচিত্র। এভাবে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে সকাল- দুপুর-সন্ধ্যা। আমরা তো ভেবেও দেখছি না, শেষ সময়টা হচ্ছে কেমন। বৃথা সময়যাপনের কলংক মুছবার মনোভাব আমাদের কোথায়? অনুতাপের অভিঘাতে না জ্বলে কী উপায় আছে আমাদের?

পথ তো প্রস্তুত। পান্থজনেরা কোথায়? মহাবিশ্বের মহামমতার মহাসিন্ধু যিনি, তিনি তো বলেই গিয়েছেন, পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণভিন্ন কোনো কল্যাণ নেই। সেই মহাকল্যাণের মহাসফলতার পথ তো প্রস্তুতই। পথিককুল! প্রস্তুত হও। যে মুহূর্তটি হারিয়ে যাচ্ছে, সেটিকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এসো। এই মুহূর্তে সমর্পিত হই সর্বশেষ পথপ্রদর্শকের পথে। অনুশোচনার অশ্রু চোখে নিয়ে তাকাই আপন, আপনতম নবীর নির্দেশ ও নিদর্শনাবলীর দিকে। তাঁকে তো জানতে হবে দু'ভাবে– জীবনযাপনে, কথায়, কাজে এবং হৃদয় দিয়ে, মগ্ন হয়ে, ভালবেসে।

সেই আয়োজনই চলেছে, চলে আসছে সহস্র শতাব্দী ধরে, শতাব্দী শতাব্দী ধরে। পৃথিবীর সকল ভাষায়, সকল সাহিত্যে তিনিই পেয়ে চলেছেন সর্বোচ্চ সম্মান। মহামানবতার সাফল্য, সম্মান ও সার্থকতা নিহিত রয়েছে কেবল তাঁরই অনুগমনপথে।

মন ও মনন, মেধা ও মনীষা শুদ্ধ ও পবিত্র হতে পারে কেবল তাঁর প্রেম-ভালবাসায়। জীবন ও জীবনসম্পৃক্ত সকলকিছুর চেয়ে তিনি হবেন অধিক প্রিয়। প্রিয়তম। বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা এটাই। আত্মউন্মোচন ও আত্মমুক্তির জন্যই আমাদেরকে নিমগ্ন থাকতে হবে তাঁর জীবনচরিতচর্চায়। সেই মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই আমরা প্রায় এক যুগ আগে শুরু করেছিলাম **'মাদারেজুন্ নবুওয়াত'** নামের কালজয়ী গ্রন্থটির অনুবাদকর্ম। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছি। হতে পেরেছি। এবার শেষখণ্ডটিও দিবস দর্শন করলো। সকল প্রশংসা-প্রশস্তি, স্তব-স্তুতি কেবল আল্লাহ্‌র। তাঁর আশ্রয়-প্রশ্রয় ও সমর্থন-সহায়তা ব্যতিরেকে কোনো কিছু হয় না । আলহামদু লিল্লাহি আলা যালিক।

সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহাসৃষ্টির মহামমতার মহাপারাবার নবীশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। সকল নবী-রসুল, নৈকট্যভাজন ফেরেশতাবৃন্দ, তাঁর সম্মানিত সহচরবৃন্দ, প্রিয়জনগণ, বংশধরগণ, আত্মীয়স্বজন, পরিবারবর্গ এবং তাঁর প্রেমিক-প্রেমাষ্পদগণের প্রতি। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

'মাদারেজুন্ নবুওয়াত' প্রায় চারশত বৎসর পূর্বে রচিত। এর সম্মানিত রচয়িতা ছিলেন প্রজ্ঞা ও প্রেমের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। বর্ণিত আছে, প্রতিদিন রসুলুল্লাহ্ স. এর সঙ্গে দীদার হতো তাঁর। তাই বুঝি তাঁর এই অমর গ্রন্থটির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও নুরানিয়াত এতো বেশী। অভিনিবেশী পাঠক পাঠিকাগণের নিকট বিষয়টি অবিদিত নয়।

আলোর অভিঘাতেই নিশিভোর হয়। প্রত্যুষপ্রার্থী যাঁরা, তাঁরা এই কালজয়ী গ্রন্থটিকে বক্ষে ধারণ করবেনই। পাঠ করবেন। কাঁদবেন। অন্যকেও কাঁদাবেন। পরিত্রাণ তো এইভাবেই। এই পথেই।

শেষ খণ্ডের শেষ মুখবন্ধখানি লিখতে গিয়ে এই নগণ্যাতিনগণ্য ফকির আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তে চান। তাঁর আর্তিতো কেবল পরিত্রাণাভিলাষ। কিন্তু তিনি তাঁর সুহৃদ-স্বজন ও হৃদয়বীর্যজাত সন্তান-সন্ততিদের জন্য চান পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সমূহ কল্যাণ, সর্বোৎকৃষ্ট সাফল্য। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রার্থনার হাতকে সদা সম্প্রসারিত রাখুন। আমিন।

পাঠক-পাঠিকাকুলের নিকটে উপরোধ, কোথাও কোনো অনবধানতা ও অসঙ্গতি চোখে পড়লে জানাবেন। আমরা সতর্ক ও শুদ্ধ হবার সুযোগ পাবো। আপনাদের জন্য প্রার্থনা করবো। প্রারম্ভে ও পরিসমাপ্তিতে সালাম।

ওয়াস্ সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

মনের আগুন নয় সময়ের মতোন শীতল
নেভাতে পারে না তাকে কোনোদিন দুচোখের জল
একা একা সারাবেলা একা একা রহস্যের খেলা
এই নিয়ে মানুষেরা সম্মিলিত শোকের কাফেলা
পৃথিবীর পরিধিতে পিপাসাই প্রকৃত জীবন
অন্য কিছু কিছু নয়, মূলধন চোখের প্লাবন
ধোয়ায় পাপের রাজ্য, অবুঝ হৃদয় য্যানো বলে
এই তো রোদন-সুখ, ডুবে যাই জীবনের জলে
মৃত্যুর শূন্যতা থেকে এভাবেই ত্রাণের জোয়ার
পাপিষ্ঠকে আশা দ্যায়, দ্যায় গন্ধ তোমার দয়ার
গোপন সৈকতে ভাঙে ক্ষমাকৃত বেদনা ভাবনা
যাবার সময় হলে প্রেমিকেরা বলে কি যাবো না?
অপেক্ষারা নীল হয় অনন্তের রঙের ছোঁয়ায়
যারা খোঁজে তারা পায়, যারা যায় তারা চলে যায়–

আমাদের অন্যান্য বই

- q তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
- q মাদারেজুন নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- q মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- q মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- q মাব্দা ওয়া মা'আদ
- q মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- q নূরে সেরহিন্দ
- q নক্শায়ে নক্শবন্দ
- q বায়ানুল বাকী
- q জীলান সূর্যের হাতছানি
- q চেরাগে চিশ্তি
- q কালিয়ারের কুতুব
- q প্রথম পরিবার
- q মহাপ্রেমিক মুসা
- q তুমিতো মোর্শেদ মহান
- q নবীনন্দিনী
- q পিতা ইব্রাহীম
- q আবার আসবেন তিনি
- q সুন্দর ইতিবৃত্ত
- q ফোরাতের তীর
- q মহাপ্লাবনের কাহিনী
- q দুজন বাদশাহ যাঁরা নবী ছিলেন
- q কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- q THE PATH
- q পথ পরিচিতি
- q নামাজের নিয়ম
- q রমজান মাস
- q BASICS IN ISLAM
- q ইসলামী বিশ্বাস
- q মালাবুদ্দা মিনহু
- q সোনার শিকল
- q বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- q সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- q তৃষিত তিথির অতিথি
- q ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- q নীড়ে তার নীল ঢেউ
- q ধীরে সুর বিলম্বিত ব্যথা

সূচীপত্র

গোসল, কাফন এবং জানাযা

রসুলেপাক স. অসুস্থাবস্থায় বলেছিলেন, আমার ওফাতের পর আমাকে গোসল দিবে আমার আহলে বাইতের পুরুষ ব্যক্তিগণ। হজরত আবু বকর সিদ্দীকও এমতো নির্দেশ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন। এ কথা জানিয়েও দিয়েছিলেন সবাইকে। সুতরাং এ কাজে নিয়োজিত হলেন আহলে বাইতের হজরত আলী মর্তুযা রা., হজরত আব্বাস রা. ও আরো কয়েকজন। হজরত আব্বাস বলেন, হুজরা মুবারকের দরজা আহলে বাইত ছাড়া অন্যদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হলো। বর্ণিত আছে, হজরত ইবনে আব্বাসকে একবার প্রশ্ন করা হলো, রসুলে আকরম স.কে গোসল দেয়া হয়েছিল কীভাবে? তিনি বললেন, হজরত আব্বাস কেল্লায় (গোসলের জায়গায়) ইয়ামনি চাদর টানিয়ে দিলেন। এভাবেই গোসলের জন্য কেল্লা বানানো আমাদের জন্য সুন্নত হয়েছে। চতুর্দিকে চাদর ঝুলিয়ে গোসল দেয়ার জন্য স্থান নির্ধারণ করাকে কেল্লা বলা হয়। তারপর হজরত আব্বাস কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করলেন। হজরত আলী ও তাঁর দুইপুত্র ফযল ও কছমকে ডাকলেন। এক বর্ণনায় কছম রা. স্থলে রয়েছে হজরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছের নাম। তাঁদের সাথে সাথে আশেকে রসুল হজরত উসামা বিন যায়েদ যিনি আহলে বাইতের লোক হিসাবে গণ্য হতেন, তিনিও এলেন। আরও এলেন রসুলেপাক স. এর গোলাম হজরত সালেহ্ হাবশী, যার উপাধি ছিলো শোকরান। তাঁরা সকলে একত্রিত হলেন এবং রসুলেপাক স.কে গোসল দেয়ার জন্য কেল্লার ভিতর নিয়ে এলেন।

সে সময় ঘরের ভিতর ও কেল্লার বাইরে যাঁরা ছিলেন সকলের উপর তন্দ্রা প্রভাব বিস্তার করলো। কে যেনো আওয়াজ করে বললো, গোসল দিয়ো না। কেননা আল্লাহ্র রসুল এ থেকে পবিত্র। তাঁকে গোসল দেয়ার প্রয়োজন নেই। সবদিকে ঘোষণাকারীকে তালাশ করা হলো। কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া গেলো না। সকলে চাচ্ছিলেনও তা-ই। তাঁকে যেনো গোসল না দেয়া হয়। কিন্তু হজরত আব্বাস বললেন, এমন একটি আওয়াজের ভিত্তিতে যার হাকীকত আমরা জানি না, একটি সুন্নতকে বাদ দেয়া যায় না। তারপর পুনরায় তাঁদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করা হলো এবং ঘোষণা দেয়া হলো, রসুলুল্লাহকে গোসল দাও। প্রথম ঘোষণাকারী ছিলো ইবলিস আর আমি হচ্ছি খিযির। কোনো কোনো কিতাব থেকে জানা যায়, গোসল না দেয়ার কথা বলা হয়েছিলো কেল্লা বাঁধার পূর্বে। গোসল দেয়ার বিষয়ে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, কেল্লা প্রস্তুত করা হলো তখনই।

রসুলে আকরম স.কে কেল্লার ভিতর নেয়া হলো। তখন সাহাবীগণের মধ্যে সৃষ্টি হলো আরেকটি মতভেদ। রসুল আকরম স.কে কি তাঁর পরিহিত পোশাক গায়ে রেখেই গোসল দেয়া হবে, নাকি গোসল দিতে হবে অন্যান্য মৃতের ন্যায় পরিধেয় বস্ত্র খুলে নেওয়ার পর। পুনরায় তাঁদের উপর প্রতিষ্ঠিত হলো তন্দ্রার প্রভাব। তাঁরা এমনভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন যে, তাঁদের চিবুকসমূহ বারবার তাঁদের বুকের উপর ঝুঁকে পড়তে লাগলো। হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে আওয়াজ উত্থিত হলো, রসুলুল্লাহ্‌কে বস্ত্রমুক্ত কোরো না। পরিচ্ছদাবৃত অবস্থাতেই গোসল দাও। এক বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আব্বাস যখন গোসল দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন রসুলেপাক স. এর পাশে চারজানু হয়ে বসলেন এবং হজরত আলীকে চারজানু হয়ে বসতে বললেন। তারপর তিনি রসুলেপাক স.কে কোলের উপর বসালেন। তখন আবার আওয়াজ শোনা গেলো– রসুলুল্লাহ্‌কে তাঁর কোমরের উপর বসাও এবং গোসল দাও। তারপর হজরত আব্বাস ও হজরত আলী রসুলেপাক স.কে এমনভাবে শায়িত করলেন যে, তাঁর পবিত্র মস্তক রইলো পূর্ব দিকে, আর পশ্চিম দিকে রইলো তাঁর পবিত্র চরণযুগল। হজরত আলী গোসল দেয়ার কাজ শুরু করলেন।

এক বর্ণনায় আছে, হজরত আব্বাস রসুলেপাক স.কে তাঁর বুকের উপর নিলেন এবং তাঁর দাস্তানা পরিহিত হাত প্রবেশ করালেন পবিত্র পিরহানের ভিতর। হজরত উসামা ও হজরত শোকরান জামার উপর পানি ঢেলে দিলেন। হজরত আলী রা. রসুলুল্লাহ্ স.কে এক পাশ থেকে অন্য পাশে ফেরালেন। এ কাজে সাহায্য করলেন হজরত আব্বাস এবং হজরত কছম। অদৃশ্য থেকে গোসলের কাজে সাহায্য করা হতে লাগলো। গোসলদানকারীরা অনুভব করলেন অন্য কোনো হাত তাঁদের হাতের সঙ্গে মিলিত হয়ে আছে। তাঁদের চোখে তখন পট্টি বাঁধা ছিলো। গায়েব থেকে এবং পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ হলো, আল্লাহ্‌র রসুলের প্রতি বিনম্র হও। নম্রতার সাথে কাজ করো। হজরত আলীকে রসুলেপাক স. বলেছিলেন, তুমি ছাড়া অন্য কেউ যেনো আমাকে গোসল না দেয়। গোসলের সময় ছতরের প্রতি যেনো দৃষ্টি না দেয়া হয়। কেউ এর অন্যথা করলে, সে হবে দৃষ্টিশক্তিহীন। গোসলের সময় রসুলেপাক স. এর দেহ থেকে কোনো কিছুই বের হয়নি, যেমন অন্যান্য লোকদের দেহ থেকে বের হয়ে থাকে। তা দেখে হজরত আলী রা. বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হোক। আপনি কতোইনা পরিচ্ছন্ন– কতোইনা সৌরভময়– যেমন জীবনে, তেমনি পরকালযাত্রাকালেও।

রসুলুল্লাহ্ স. এর পবিত্র শরীর বরই পাতা ও কর্পুর মিশিয়ে পাক সাফ পানি দিয়ে তিনবার ধৌত করা হলো। হজরত আলী থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছিলেন, গারস এর সাত মশক পানি দিয়ে আমাকে গোসল দিয়ো। গারস একটি কূপের নাম, যা মদীনা শরীফের উত্তর দিকে আধা মাইল দূরে

অবস্থিত। এটি একটি বৃহদাকারের কূপ– যা দৈর্ঘ্যে দশ হাত। প্রস্থে দশ হাত। এটি মদীনা শরীফের ওই সাতটি কূপের অন্যতম, যেগুলো রসুলেপাক স. এর যমানা থেকে আজ পর্যন্ত (মূল কিতাব রচনা কাল) বিদ্যমান আছে। কূপটির পানি গাঢ় সবুজ। কূপটিতে রয়েছে একটি সিঁড়ি। ওই সিঁড়ি বেয়ে কূপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। একথা সুপ্রমাণিত যে, রসুলেপাক স. ওই কূপের পানি পান করেছিলেন। ওই পানি দিয়ে ওজুও করেছিলেন। ওজুর বেঁচে যাওয়া পানি এ কূপের মধ্যে ঢেলেও দিয়েছিলেন। ইবনে হেব্বান নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস গারস কূপ থেকে পানি ওঠালেন। আমি দেখলাম রসুলপাক স. ওই পানি পান করলেন। ওজুও করলেন। ইবনে সীরীন বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, আজ রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি বেহেশতের একটি কূপের কাছে সকাল বেলায় উপস্থিত হয়েছি। একথা বলে তিনি স. সকাল বেলা গারস কূপে উপনীত হলেন এবং তার পানি দিয়ে ওজু করলেন। বেঁচে যাওয়া পানিতে মুখের পবিত্র লালা মিশিয়ে দিলেন। অকস্মাৎ কোথা থেকে যেনো হাদিয়া স্বরূপ মধু উপস্থিত করা হলো। ওই মধুও কূপের পানিতে ঢেলে দিলেন তিনি। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. হজরত আলীকে বললেন, আমি যখন এ জগত ছেড়ে চলে যাবো, তখন তোমরা আমাকে গারস কূপের পানি থেকে সাত মশক পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দিয়ো। সে মশকের মুখ খোলা রেখো। রসুলেপাক স. এর অন্তিম অসুস্থতার সময়ের বর্ণনায়ও এরকমই বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি সাত মশক পানি দিয়ে গোসল করে তাঁর প্রকোষ্ঠ থেকে মসজিদে এলেন। ওই পানিও ছিলো সম্ভবতঃ ওই কূপের। আল্লাহ্তায়ালা উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত। হাদিস ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, সাত মশক লওয়ার কথা এজন্য বলা হয়েছিলো যে, জাদু ক্রিয়া নষ্ট করার ক্ষেত্রে সাত সংখ্যার বিশেষ গুরুত্ব আছে। যেমন বিষ ও জাদুর চিকিৎসায় মদীনা তাইয়্যেবার সাতটি আজওয়া খেজুর খাওয়ার বর্ণনা আছে।

বর্ণিত আছে, গোসল করানোর পর রসুলে আকরম স. এর চোখের পাতার নিচে ও নাভীর পাশে কিছু পানি জমা হয়ে ছিলো। হজরত আলী ওই পানি তাঁর জিহ্বা দ্বারা চুষে নিলেন। এ কারণেই পরবর্তী সময়ে তিনি বলেছিলেন, আমার জ্ঞান, এলেম ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। গোসল সমাপ্ত হলো। শরীরের সেজদার জায়গা ও জোড়াসমূহে খোশবু মেখে দেয়া হলো। আগরের ধোঁয়া দেয়া হলো তিনবার। শেষে কেল্লা থেকে উঠিয়ে এনে রাখা হলো খাটে। বর্ণিত আছে, হজরত আলী কিছু মেশক ও সুঘ্রাণ আতর তাঁর সন্তানগণের কাছে দিয়ে এই মর্মে ওসিয়ত করেছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর আমার কাফনের কাপড়ে এই আতর মেখে দিও। এই আতর আমি বাঁচিয়ে রেখেছি রসুলুল্লাহ্র জন্য ব্যবহৃত আতর থেকে।

রসুলে আকরম স.কে তিনটি শাদা সহুলী (ধবধবে) কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হয়। 'সহুল' শব্দের অর্থ ধোপা। ধোলাই করার পর শাদা কাপড় যে ধবধবে হয়, সহুলী বলতে তাই বুঝানো হয়েছে। ইবনে সীরীন বলেছেন, সহুল ইয়ামনের একটি গ্রামের নাম। সেখানে তুলা দিয়ে কাপড় প্রস্তুত করা হতো। সুতরাং ইবনে সীরীনের মতে সহুলী মানে তুলার কাপড়। অন্য এক হাদিসে এসেছে, 'মিন কুরসুফ'। অর্থাৎ কুরসুফ দিয়ে কাফন পরানো হয়েছিলো। কুরসুফ অর্থ তুলা। আবার কুরসুফ একটি গ্রামের নামও। তখন অর্থ হবে, ওই এলাকার কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হয়েছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, দু'টি শাদা কাপড় ও একটি ইয়ামনী চাদর দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিলো। ইমাম তিরমিজী বলেছেন, রসুলে আকরম স. এর কাফনের বিষয়ে বিভিন্ন রকম বিবরণ পাওয়া যায়। ওগুলোর মধ্যে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর হাদিস সর্বাধিক বিশুদ্ধসূত্রসম্বলিত। অধিকাংশ আলেম সাহাবীগণ ওই হাদিসের উপর আমল করেছেন।

ইমাম বায়হাকী হাকেম সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, হজরত আলী মুর্তযা, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা, হজরত ইবনে ওমর, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহ সর্বজনবিদিত স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁরা বলেছেন, রসুলে আকরম স.কে তিন কাপড়ের কাফন দেয়া হয়েছিলো। তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিলো না। কামীস ও পাগড়ী সেই তিন কাপড়ের মধ্যে না থাকার বক্তব্য অনুধাবনের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ওই উক্তির বাহ্যিক অর্থ এই যে, রসুলে আকরম স. এর কাফনে কামীস ও পাগড়ী আসলে ছিলোই না। আর তার আরেকটি অর্থ এরকম হতে পারে যে, তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু কামীস ও পাগড়ী ছিলো ওই তিন কাপড়ের অতিরিক্ত– এরূপ অর্থ অবশ্য সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী। কেননা একথা সুসাব্যস্ত হয়নি যে, রসুলে আকরম স. এর কাফনে কামীস এবং পাগড়ী ছিলো। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কাফনে কামীস ও পাগড়ী থাকা মোস্তাহাব কি না– সে সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ বলেছেন, মোস্তাহাব হচ্ছে কাফনে তিন কাপড় হতে হবে। তার মধ্যে কামীস ও পাগড়ী গণ্য হবে না। তাঁরা তিন কাপড়ের অধিক কামীস ও পাগড়ীকে মাকরুহ্ বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এরকম জায়েয– তবে মোস্তাহাব নয়। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, কাফনের কাপড় হতে হবে তিনটি– ইযাব, কামীস ও লেফাফা। শেষ যুগের হানাফী আলেম ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেমগণ পাগড়ীকে জায়েয বলেছেন। আমাদের মাযহাব অনুযায়ী কাফনের কাপড় তিনটি। তবে দু'টিও হতে পারে। অক্ষম হলে যতোটুকু সম্ভব হয়। এক বর্ণনায় রসুলে আকরম স. এর কাফনের কাপড় সাতটির কথাও এসেছে। তবে ওই বর্ণনাটি দুর্বল এবং বলা হয়েছে, কোনো কোনো বর্ণনা থেকে

এরকম ধারণার উদ্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন। যা বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে জানা যায়, রসুলে আকরম স. এর পবিত্র শরীরে কামীস ছিলো। ওই কামীস সহকারেই তাঁকে গোসল দেয়া হয়েছে। তবে তা কাফনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। সুনানে আবু দাউদে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স.কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে দু'টি কাফনের কাপড় আর একটি ছিলো ওই কামীস, যা ওফাতের কালে রসুলে আকরম স. এর পবিত্র দেহে ছিলো। এই বর্ণনাসূত্রে দুর্বলতা আছে। তাই এটি সহীহ্ নয়। সহীহ্ তাই, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এই বর্ণনাসূত্রে রয়েছেন এযীদ নামক একজন বর্ণনাকারী, যিনি দুর্বল বর্ণনাকারী বলে খ্যাত। বিশেষ করে ওই সকল ক্ষেত্রে, যেখানে তাঁর বিপরীতে রয়েছেন সেকাহ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারীগণ। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতা আবু বকর সিদ্দীকের ওফাতের অসুস্থতার কালে তাঁর কাছে গেলাম। যে কাপড়টি পরিহিত অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন, সেটির দিকে তাকালাম। দেখলাম, তাতে জাফরানের রঙ লেগে আছে। তিনি বললেন, আমার এ পোশাকটি ধৌত করে আরও দু'টি কাপড় এর সঙ্গে বৃদ্ধি করে তিন কাপড়ে আমাকে কাফন দিয়ো। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমি বললাম, আপনার পরিধানকৃত বস্তুটি তো পুরাতন। তিনি বললেন, নতুন বস্ত্র মৃত ব্যক্তির চেয়ে জীবিত ব্যক্তির বেশী প্রয়োজন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারী।

নামাজে জানাযা

রসুলেপাক স. এর নামাজে জানাযা জামাতের সাথে আদায় করা হয়নি। বরং তা আদায় করা হয়েছিলো এভাবে– একটি দল তাঁর নিকটবর্তী হতো আর জামাত ছাড়া নামাজ পড়ে চলে যেতো। তারপর আর একদল আসতো এবং এভাবেই নামাজ আদায় করে চলে যেতো। তখন রসুলেপাক স. এর পবিত্র দেহ হুজরা শরীফেই ছিলো, যেখানে তাঁকে গোসল দেয়া হয়েছিলো। সকলের আগে পুরুষদের দল প্রবেশ করলো। তাঁরা পৃথক হয়ে গেলে এলো মেয়েদের দল। তাঁরা চলে গেলে এলো ছেলেরা। তাঁরা সকলে দাঁড়াতেন সারিবদ্ধভাবে, নামাজে কাতার করার নিয়মে। রসুলুল্লাহ্ স. এর নামাজে জানাযায় কেউ ইমামতী করেননি। আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী বলেছেন, রসুলুল্লাহ্র জানাযার নামাজে কেউ ইমামতী করেননি। কেননা তিনি হায়াতে ও ওফাতে উভয় অবস্থাতেই তোমাদের ইমাম। এটা রসুলেপাক স. এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম যে, তাঁর নামাজে জানাযা কয়েকবার হয়েছে এবং তা লোকেরা একা একা পড়েছে। এক বর্ণনায় রয়েছে, সর্বপ্রথম যাঁরা রসুলেপাক স. এর নামাজে জানাযা পড়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন আহলে বাইত। হজরত আলী, হজরত আব্বাস এবং বনী হাশেমের লোকগণ। তারপর নামাজ পড়েন মুহাজিরগণ। অতঃপর আনসারগণ। তারপর অন্যান্য লোক।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. অসুস্থ হওয়ার পূর্বে লোকদের কাছে তাঁর অন্তিমযাত্রার সংবাদ জানালেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে কে গোসল দিবেন? তিনি বললেন, আমার আহলে বাইতের মধ্য থেকে ওই ব্যক্তি, যে আমার অধিক নিকটবর্তী। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কোন্ কোন্ কাপড় দিয়ে আপনাকে কাফন দেয়া হবে? তিনি বললেন, ওই কাপড়সমূহ দ্বারা, যা থাকে আমার পরিধানে। অথবা মিসরী কাপড় দিয়ে অথবা ইয়ামনী চাদর বা যে কোনো শাদা কাপড় দিয়ে। তাঁর এ কথার অর্থ যে কোনো কাপড় দিয়েই আমার কাফন দিতে পারবে। অতঃপর লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনার জানাযার নামাজ পড়াবে কে? একথা বলে সকলেই ক্রন্দন করতে লাগলেন। এমন কি রসুলেপাক স.ও কান্নাবিজড়িত হয়ে গেলেন। বললেন, ধৈর্য ধারণ করো– উদ্বিগ্ন হয়ো না। আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের উপর রহম করবেন। তোমাদের গোনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করবেন। তিনি আরও বলেন, আমার গোসল এবং কাফন শেষ করার পর তোমরা আমাকে আমার কবরের পাশে এই হুজরাতেই রেখে দিয়ো এবং কিছু সময়ের জন্য বাইরে চলে যেয়ো । সর্বপ্রথম আমার নামাজে জানাযা পড়বেন আমার বন্ধু জিবরাইল। অতঃপর মিকাইল। তারপর ইসরাফীল। শেষে মালাকুল মওত। ফেরেশতাদের দলের সঙ্গে তাঁরা নামাজে জানাযা পড়বেন। এক বর্ণনায় আছে রসুলে আকরম স. বলেছেন, সর্বপ্রথম যিনি আমার জানাযার নামাজ পড়বেন, তিনি আমার রব। তারপর ওই ফেরেশতা চতুষ্টয়। তারপর ফেরেশতারা দলে দলে আসবে এবং নামাজ পড়বে। আমার জন্য বিলাপ কোরো না। মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার জানাযা পড়বে আমার আহলে বাইত। তারপর আহলে বাইতের মেয়েরা। তারপর সকল সাহাবী। লোকেরা প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! কবর শরীফে আপনাকে কে কে নামাবেন? তিনি বললেন, আমার আহলে বাইত। তাদের সঙ্গে থাকবে ফেরেশতাদের একটি জামাত। যারা তাদেরকে দেখবে কিন্তু তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে না।

আল্লামা ইবনে মাজেশুনকে লোকেরা একবার প্রশ্ন করলো, রসুলুল্লাহ্র জন্য কতোবার নামাজে জানাযা পড়া হয়েছিলো? তিনি বললেন, সত্তরবার। লোকেরা প্রশ্ন করলো, আপনি একথা কোত্থেকে জেনেছেন? তিনি বললেন ওই সিন্দুক থেকে যেখানে ইমাম মালেক তাঁর লেখা রেখেছেন (মুওয়াত্তা)। তিনি বর্ণনা করেছেন নাফে থেকে, আর তিনি ইবনে ওমর থেকে। সুতরাং বুঝা যায় যে, ফেরেশতা ছাড়াও সাহাবা কেরামের বিভিন্ন জামাত নামাজ পড়েছিলেন।

রসুলেপাক স. এর দাফন কাজ বিলম্বিত হয়েছিলো। তাঁর ওফাত হয়েছিলো সোমবার দিন। মঙ্গলবার দিন পুরো অতিবাহিত হয়েছিলো এমন অবস্থায় যে, ঘরের মধ্যে খাট রাখা হয়েছিলো এবং লোকেরা নামাজ পড়ে যাচ্ছিলো। তারপর বুধবার দিন তাঁকে দাফন করা হয়।

রসুলেপাক স. এর জানাযার দোয়া

আহলে বাইতের লোকজন জানাযার নামাজ পড়লেন। কিন্তু জনতা জানতে পারলো না, তাঁরা কী পড়েছেন এবং কী দোয়া করেছেন। তাঁরা হজরত ইবনে মাসউদকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, তোমরা আলীর কাছে জিজ্ঞেস করো। তাঁরা হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, পড়া হয়েছে এই দোয়া–

اِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتِه يُصَلُّوْنَ عَلَي النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَبَّيكَ وَسَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللهِ اَلْبَرُّ الرَّحِيْمُ وَالْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّنَ والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيئ يا رب العلمين علي محمد ابن عبد الله خاتم االنبين وسيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العلمين الشاهد البشير الداعي باذنك السراج المنير وعليه السلام -

এ দোয়াটি শায়েখ যায়নুদ্দীন মুরায়ী তাঁর কিতাব 'তাহ্কীকুন্নাদরা' তে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী রসুলেপাক স. এর জানাযার খাটের দিকে দাঁড়ালেন। বললেন, হে সম্মানিত নবী! আপনার উপর আল্লাহ্র রহমত ও বরকত নাযিল হোক। হে আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ওই সকল কিছুই আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যা তাঁর উপর নাযিল হয়েছিলো। তাঁর উম্মতের প্রতি নসীহতের যাবতীয় হক তিনি আদায় করেছেন। তিনি আল্লাহ্র পথে জেহাদ করেছেন– এমনকি আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দ্বীনকে গালেব করে দিয়েছেন। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে ওই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও, যারা তোমার নবীর উপর নাযিলকৃত সবকিছুর অনুসরণ করে। আমাদেরকে এবং রসুলে আকরম স.কে কিয়ামতের দিন একত্রিত করে দিও।

দাফন

এখন আলোচনায় আসা যাক রসুলে আকরম স. এর দাফন প্রসঙ্গে। এ বিষয়েও মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো যে, তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে? একদল বললেন, রসুলেপাক স. যে ঘরে ইনতেকাল করেছেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করতে হবে। আর একদল বললেন, মসজিদে নববীর মধ্যে। কেউ বললেন, জান্নাতুল বাকীর কবরস্থানে। আবার একদল বললেন, রসুলেপাক স.কে বাইতুল মাকদাসে দাফন করা হোক। কেননা সেখানে রয়েছে সকল নবীর কবর। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নবীকে দাফন করা হয় ওই স্থানে, যেখানে কবয করা হয় তাঁর রূহ। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই, যা

আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অধিকতর সম্মানিত ওই জায়গার চেয়ে, যেখানে নবী করীম স. এর রূহ কবয করা হয়েছে। হজরত আলীর এই কথা সকলে নতমস্তকে মেনে নিলেন। সেখান থেকে তাঁর পবিত্র শয্যা সরানো হলো এবং সেখানেই কবর খনন করা হবে সাব্যস্ত হলো।

মদীনা শরীফে কবর খননকারী ছিলেন দু'জন। একজন হচ্ছেন হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.। তিনি শিক কবর যাকে শামী কবর বলা হয়, ওই পদ্ধতিতে কবর খনন করতেন। অপর জন ছিলেন হজরত আবু তালহা আনসারী। যিনি লাহাদ পদ্ধতির কবর খনন করতেন। হজরত আব্বাস রা. বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি তোমার হাবীব স. এর জন্য ওই পদ্ধতিই নির্ধারণ করো, যা তোমার প্রিয় ও পছন্দনীয়। অতঃপর তিনি দু'ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিলেন হজরত আবু উবায়দা ও হজরত আবু তালহাকে ডাকার জন্য। তিনি আরও বলে দিলেন, যে ব্যক্তি আগে আসবে সেই তার তরীকা অনুযায়ী কবর খনন করার কাজ শুরু করে দিবে। হজরত আবু উবায়দাকে ডাকার জন্য যিনি গিয়েছিলেন তিনি তাঁকে পেলেন না। ইতোমধ্যে উপস্থিত হলেন হজরত আবু তালহা। তিনি খনন করেলন লাহাদ পদ্ধতির কবর।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. বলেছেন, আল্‌লাহদু লানা ওয়াস্‌সিককু লিগইরিনা। অর্থাৎ আমাদের জন্য লাহাদ কবর আর অন্যদের জন্য শিক কবর। 'লানা' দ্বারা রসুলেপাক স. মদীনাবাসীকে বুঝিয়েছেন। আর 'গইরিনা' দ্বারা মদীনা ছাড়া অন্য এলাকার লোক এবং মক্কার লোকদেরকে বুঝিয়েছেন। এর কারণ নিরূপণ করতে যেয়ে উলামা কেরাম বলেছেন, মদীনা তাইয়্যেবার মাটি শক্ত এবং তা লাহাদ কবরের উপযোগী। তাছাড়া নিজেদের পছন্দেরও ব্যাপার রয়েছে এতে। তাছাড়া এটি সুন্নতও বটে। তারপরেও বলতে হবে যে, রসুলেপাক স. এর জন্য যা যা করা হয়েছে তা সবই উত্তম– এতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যমীন যদি শক্ত হয়, তাহলে সেখানে লাহাদ কবর উত্তম। আর যমীন যদি নরম ও কমজোর হয় তা হলে সেখানে শিক কবর উত্তম। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, লানা দ্বারা মিল্লাতে ইসলামিয়াকে বুঝানো হয়েছে। আর লিগইরিনা দ্বারা আহলে কিতাবদেরকে বুঝানো হয়েছে। মাঝ থেকে নিচের দিকে সোজা খনন করাকে শিক কবর বলা হয়। আমাদের দেশে শিক কবরের মাঝামাঝি দেয়াল বানানো হয়। কিন্তু বিধান হচ্ছে, মধ্যখান থেকে খনন করে সোজা নিচের দিকে যাওয়া। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বুধবার মধ্য রাত্রিতে রসুলেপাক স.কে পায়ের দিক দিয়ে কবর শরীফে নামানো হয়েছিলো। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে রসুলেপাক স. এর কবর শরীফে নেমেছিলেন হজরত আলী, হজরত আব্বাস, হজরত ফযল ও হজরত কছম রাদ্বিয়াআল্লাহু আনহুম। হজরত কছম রসুলেপাক স. এর কবর শরীফ থেকে সর্বশেষে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি

বলেছেন, আমি সর্বশেষ ব্যক্তি যে রসুলেপাক স.কে তাঁর কবর শরীফে দেখেছিলো। তিনি বলেন, আমি কবরে তাঁকে দেখেছিলাম, তাঁর পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় নড়াচড়া করছে। আমি আমার কান তাঁর মুখের কাছে নিলাম। শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন, রব্বি উম্মাতী, উম্মাতী। কবর দেয়ার পর তাঁর উপর চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো। যে চাদরটি বিছানো হয়েছিলো তা ছিলো বাহরাইনের লাল মখমলের চাদর, যা পাওয়া গিয়েছিলো খয়বর যুদ্ধের দিন। শুকরান নামক সাহাবী সেই চাদর বিছিয়েছিলেন। তিনি চাদর বিছানোর পর এ কথাও বলেছিলেন, আমি পছন্দ করি না, রসুলেপাক স. এর পর অন্য কারও কবরের উপর চাদর বিছানো হোক। ইমাম নববী শাফেয়ী, অন্যান্য শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ এবং অন্যান্য আলেম সম্মানার্থে কবরে মাইয়্যেতের নিচে চাদর বিছানোকে মাকরুহ্ বলেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এতে কোনো দোষ নেই। কেননা এটি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, এরকম করা মাকরুহ এবং জমহুরের মাযহাবও তাই। কেননা ওই কাজটি ছিলো কেবল হজরত শুকরানের। তিনি একাই কাজটি করেছিলোন। অন্য কোনো সাহাবী তাঁর সঙ্গে এ কাজে যুক্ত ছিলেন না। আর তিনি এ বিষয়ে ভালো জানতেনও না। তিনি অন্য কারও কবরের উপর চাদর জড়ানোকে মাকরুহও বলেছেন। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, শেষে সেই চাদরখানা রওজা শরীফ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। এ বর্ণনাটি করেছেন ইবনে যিয়ানা। বিবরণটি ‘সীরাতে মুগলতায়ী’তে উল্লেখ করা হয়েছে। এরকম আমল যদি করা হয়েও থাকে, তবে তা করা হয়েছে রসুলেপাক স. এর জন্য বিশেষভাবে। অন্যদের জন্য এরূপ করা মাকরুহ।

রসুলেপাক স. এর কবর শরীফের উপর কাঁচা ইট বসানো হলো। তারপর নামানো হলো লাহাদ কবরে। হজরত বেলাল রা. কবর শরীফের উপর এক মশক পানি ছিটিয়ে দিলেন। পানি ছিটানো শুরু করলেন শিয়রের দিক থেকে। কবর শরীফ করা হলো এক বিঘত উঁচু। এক বর্ণনায় এসেছে, চার আঙ্গুল। ওই উঁচু মাটির উপর জমা করা হলো লাল ও শাদা পাথরের টুকরো।

দাফনের পর সাহাবা কেরাম সাইয়্যেদা ফাতেমা রা. এর কাছে এলেন। তিনি বললেন, তোমাদের অন্তরসমূহ কীভাবে মেনে নিলো যে, তোমরা রসুলুল্লাহ্‌র উপর মাটি রাখলে? সাহাবা কেরাম বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন হে রসুলতনয়া যাহরা! আমরাও এরকমই মনে করেছিলাম এবং এ চিন্তায় নিমগ্নও ছিলাম। কিন্তু কী করতে পারি আমরা? শরীয়তের হুকুম ছাড়া যে কোনো উপায় নেই। সাইয়্যেদা ফাতেমাতুয্ যাহরা তাঁর মহান পিতার কবর শরীফের শিয়রের কাছে দাঁড়ালেন। কবর শরীফ থেকে মাটি নিয়ে অশ্রুবর্ষণরত চোখে লাগালেন এবং বললেন–

ماذا علي من شم ترتبة احمد - ان لا يشم مدي الزمان غواليا
صبت علي مصائب لو انها - صبت علي الايام صرن لياليا

অর্থঃ আহমদের পবিত্র কবরের মাটির ঘ্রাণ যে নিয়েছে, যুগ যুগ ধরে কখনই আর তাকে অন্য কোনো সুঘ্রাণ নিতে হবে না। রসুলুল্লাহ্‌র মহাতিরোধানে আমার উপর যে বিপদ এসে পড়েছে, সে বিপদ যদি দিবসসমূহের উপর পতিত হতো তাহলে তারা পরিণত হয়ে যেতো রাত্রিতে।

রসুলেপাক স. এর পবিত্র কবর চূড়া সদৃশ উঁচু করা হয়েছিলো, না সমতল করা হয়েছিলো এ নিয়ে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। বোখারী শরীফে আবু বকর ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি কবর শরীফকে চূড়াবিশিষ্ট দেখেছেন। আবু নাঈম তাঁর 'মুস্তাখরাজ' গ্রন্থে যেটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে– হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুকের কবরদ্বয়ও চূড়াবিশিষ্ট করা হয়েছিলো। এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে, কবরকে চূড়াবিশিষ্ট করা মোস্তাহাব। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম মযনী এবং অনেক শাফেয়ী মতাবলম্বীর মত তাই। কাজী হুসাইন বলেছেন, এ বিষয়ে শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের ঐকমত্য রয়েছে। তবে পূর্ববর্তী জমানার শাফেয়ী মতাবলম্বীদের একটি জামাত দাবী করেছেন, কবরকে সমতল রাখা মোস্তাহাব। মাওয়ারদী ও অন্য একদলের মতও এরকম।

হাকেম হজরত কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এরকম– আমি হজরত আয়েশা সিদ্দীকা সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে সম্মানিতা মাতা! আমার জন্য রসুলুল্লাহ্‌র কবর শরীফ থেকে চাদর উঠিয়ে দিন। তিনি চাদর ওঠালেন। আমি দেখতে পেলাম, কবর শরীফ যমীন থেকে বেশী উঁচুও নয় আবার একদম সমতলও নয়। তাঁর ফরশের উপর পাথরের টুকরো জমা করা আছে। যা হোক কবরকে চূড়াবিশিষ্ট করা এবং সমতল বানানো উভয়ই জায়েয। মতভেদ হলো এই যে, এর মধ্যে কোন্‌টি উত্তম। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথমে রসুলে আকরম স. এর কবর শরীফ সমতল ছিলো। পরে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতকালে কবরকে চূড়াবিশিষ্ট করা হয়। সুফিয়ান আনসার থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে– আমি রসুলেপাক স. এর কবর শরীফ চূড়াবিশিষ্ট অবস্থায় দেখেছি। তাতে উপরোক্ত বিবরণটিই রয়েছে। আমাদের দেশে যে তরীকা প্রচলিত আছে, পুরোপুরি সমতলও নয় আবার পুরোপুরি চূড়াবিশিষ্টও নয়। বরং উভয় পদ্ধতিরই প্রচলন আছে। এমতো প্রচলন কোত্থেকে চালু হয়েছে, তা জানা যায় না। আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, হুজরা শরীফের মধ্যে অর্থাৎ বর্তমানে যেখানে রওজা শরীফ অবস্থিত, সেখানে হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত ওমর ফরুককে দাফন করার পর একটি কবরের জায়গা বাকী আছে। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, এখানে হজরত ঈসা ইবনে মরিয়মকে দাফন করা হবে। ইমাম হাসান যখন শহীদ হলেন, তখন উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকার কাছে

আবেদন করা হলো, হুজরা শরীফ আপনার। আপনি অনুমতি দিলে ইমাম হাসানকে তাঁর নানাজানের পাশে দাফন করা যায়। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা তাঁদের আবেদন কবুল করলেন। বললেন, মারহাবা! এতো খুবই ভালো কথা। কিন্তু ওই সময় হজরত আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে মদীনার শাসক ছিলো মারওয়ান। সে হজরত ইমাম হাসানকে ওই স্থানে দাফন করার অনুমতি দিলো না। পরবর্তীতে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফকেও ওই স্থানে দাফন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বেলায়ও তা সম্ভব হয়নি।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. বলেছেন, ঈসা ইবনে মরিয়ম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিবাহ করবেন। তাঁর সন্তান-সন্ততিও হবে। তিনি এ পৃথিবীতে অবস্থান করবেন পঁয়তাল্লিশ বছর। তারপর তাঁর ইনতেকাল হবে এবং তাঁকে আমার কবরের পাশে দাফন করা হবে। কিয়ামতের দিন আমি এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম এক কবর থেকে উঠবো আর আবু বকর ও ওমর এক কবর থেকে উঠবে। এখানে কবর বলতে কবরস্থানকে বুঝানো হয়েছে।

রসুলেপাক স.কে দাফন করার পর সাহাবা কেরাম দিশেহারা হয়ে গেলেন। রসুলবিচ্ছেদের আগুনে তাঁরা জ্বলে পুড়ে ছারখার হতে লাগলেন। চতুর্দিকে শুধু কান্না আর কান্না। সবচেয়ে বেশী শোকাভিভূতা হলেন সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরা। রসুলের প্রিয় দৌহিত্রদ্বয় হাসান-হুসাইনের দিকে তাকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়তে লাগলেন বার বার। এদিকে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা ওই হুজরা শরীফের অদূরে বসে কাঁদতে লাগলেন বিরামহীনভাবে। হুজরা শরীফ হলো চিরবিচ্ছেদ ও অনন্ত শোকের গৃহ। সেখান থেকে রাত-দিন আসতে লাগলো শুধু কান্না ও আহাজারীর আওয়াজ।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, যেদিন রসুলুল্লাহ্ স. এই নশ্বর ধরাধাম থেকে অবিনশ্বর আলয়ের দিকে স্থানান্তরিত হলেন, সেদিন দিনের আলো নিভে গেলো। দিবসে নেমে এলো রাতের আঁধার। হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, মদীনায় ওই দিনের চেয়ে উত্তম ও নুরানী আর কোনো দিন ছিলো না, যে দিন সাইয়্যেদে আলম এখানে শুভাগমন করেছিলেন। আর ওই দিনের চেয়ে মন্দ ও তমসাচ্ছন্নও ছিলো না কোনো দিন, যেদিন ঘটেছিলো তাঁর মহাপ্রস্থান। এই মাত্র আমরা রসুলুল্লাহ্কে দাফন করে এলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরসমূহ পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমাদের উপর পর্দা পড়ে গেলো। যেনো আমাদের অন্তরসমূহ চলে গেলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আহলে বাইত এবং প্রধান প্রধান সাহাবীগণ প্রত্যেকেই রসুলে আকরম স. এর মহাতিরোধানে ব্যথিত হৃদয় নিয়ে চোখের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার নিয়ে কবিতা পড়তে লাগলেন। দাফনের পর সর্বপ্রথম হজরত ফাতেমা যাহরা জিয়ারতে গেলেন পবিত্র সমাধির। কবরের মাটি নিয়ে অশ্রুসিক্ত চোখের উপর স্থাপন করে পাঠ করলেন এই কবিতাখানি–

কেউ কেউ বলেছেন, কবিতাটি রচনা করেছিলেন হজরত আলী। পরে তিনি এ কবিতাংশটিও পাঠ করলেন–

اذا اشتد شوقي زرت قبرك باكيا - وذكرك واشكو ما اراك مجاديا
يا ساكن الغيراء علمني البكاء - وذكرك انساني جميع المصائبا
فان كنت عن عيني في التراب فعيبا - فما كنت علي قلبي الخرين بغائبا -

অর্থঃ হে আমার পিতা! আমার অভিলাষ যখন উদগ্র হয় তখন কাঁদতে কাঁদতে আপনার সমাধি দর্শন করি। আপনাকে স্মরণ করি। তবে আমার অনুযোগ– ক্রন্দনরত সেই আপনাকে দেখি না কেনো? হে বিপদগ্রস্ত গৃহের অধিবাসীরা! আমাকে ক্রন্দন শিখিয়ে দাও। হে পিতা ! আপনার স্মরণ আমাকে ভুলিয়ে দেয় সকল মুসিবতকে। আপনি যতোই আমার চোখের সামনে থেকে মাটিতে আড়াল হয়ে থাকুন না কেনো, আমার ব্যথিত হৃদয় থেকে অদৃশ্য হওয়ার উপায় আপনার নেই। হজরত ফাতেমা যাহরা মনের আবেগে এই দু'টি পঙক্তিও আবৃত্তি করলেন–

نفسي علي زخرتها محبوسة - يا ليتها خرجت مع الزفرات -
لا خبر بعدك في الحياة و انها - ابكي مخافته ان تطول حياتي -

অর্থঃ আমার আত্মাখানি বন্দী হয়ে আছে দীর্ঘ আশার উপর। হায় আক্ষেপ! আমার আত্মা যদি দীর্ঘশ্বাসের মাধ্যমে বেরিয়ে যেতো। হে পিতা! আপনার চলে যাওয়ার পর আমার এ জীবনে আর কোনো কল্যাণ নেই। আমি ক্রন্দন করি এই আশংকায় যে, না জানি আমার জীবন দীর্ঘ হয়ে যায়।

বর্ণিত আছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ আনসারী একজন মুস্তাজাবুদ্-দাওয়াত সাহাবী ছিলেন। তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার পৃথিবীদর্শনের চোখ দু'টি তুমি নিয়ে নাও। আমার হাবীবের রূপ-সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে চাই না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। একদল সাহাবীর অবস্থা তো এমন হলো যে, রসুলেপাক স. এর দীদারবিহীন জীবন তাঁরা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁরা মদীনা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হজরত বেলাল। তিনি চলে গেলেন শাম দেশে। পূর্ণ ছ'মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো। এক রাত্রে স্বপ্নে রসুলেপাক স. এর দীদার লাভে ধন্য হলেন তিনি। রসুলেপাক স. বললেন, হে বেলাল! আমার উপর জুলুম করছো কেনো? আমার জিয়ারতে আসছো না যে? ঘুম থেকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে হজরত বেলাল রওয়ানা দিলেন মদীনার দিকে। মদীনায় পৌঁছে শুনতে পেলেন সাইয়্যেদা ফাতেমা ইনতেকাল করেছেন। তিনি হাসান-হুসাইনকে হজরত ফাতেমার সংবাদাদী জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন 'আজারাকাল্লাহু ফী ফাতেমাতা' অর্থাৎ ফাতেমার ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে

গিয়েছেন। একথা শুনে হজরত বেলাল দীর্ঘক্ষণ ক্রন্দন করলেন। বললেন, হে রসুলে মকবুলের কলিজার টুকরা! আল্লাহ্র শপথ! কতো তাড়াতাড়ি আপনি আপনার মহাসম্মানিত পিতার সঙ্গে মিলিত হতে পারলেন।

বিচ্ছেদের চিন্তা ও যন্ত্রণা

রসুলেপাক স. এর ওফাতের পর তাঁর বিচ্ছেদ যন্ত্রণার যে সকল ঘটনা ঘটেছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে গাধার ঘটনা। যে গাধাটির উপর রসুলেপাক স. অধিকাংশ সময় আরোহণ করতেন, সেই গাধাটি রসুলেপাক স. এর বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একদিন কূপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করলো। রসুলেপাক স. এর উষ্ট্রীটিও বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পানাহার ছেড়ে দিলো। এভাবে সেও বিসর্জন দিলো তার জীবন। এ জাতীয় ঘটনা যে ঘটবে, সে কথা রসুলেপাক স. পৃথিবীতে থাকতেই বলেছিলেন। এরকম ঘটনা রয়েছে অনেক।

মুসলিম শরীফে হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা কোনো উম্মতের জন্য কল্যাণ কামনা করলে তাদের নবীর রূহ কবয করে তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়ে যান। উম্মতেরা তাঁর বিয়োগব্যথায় ব্যথিত হয়। আর আল্লাহ্তায়ালা কোনো উম্মতকে শাস্তি দিতে চাইলে তাদের নবীকে তাদের মধ্যে জীবিত রাখেন। তাঁর চোখের সামনেই ওই উম্মতকে ধ্বংস করে দেন তিনি, যারা তাদের নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। এভাবে আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীর চোখকে শীতল করে দেন।

রওজা শরীফ ও মসজিদে নববী জিয়ারত

রসুলেপাক স. এর রওজা শরীফ ও মসজিদে নববী জিয়ারত করা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। কারও কারও মাযহাব হচ্ছে– প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর রসুলেপাক স. এর রওজা শরীফ ও মসজিদ জিয়ারত করা ওয়াজিব। যেমন ইমাম আবদুল হক যিনি শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেছগণের অন্যতম, তিনি এরকম মত প্রকাশ করেছেন। উলামা কেরাম বলেন, ওয়াজিব এর অর্থ হবে এখানে সুন্নতে মুয়াক্কাদা যা ওয়াজিবেরই পর্যায়ে পড়ে। যা সাব্যস্তের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। রসুলে আকরম স. বলেছেন– **من زار قبري وجبت له شفاعتي** (যে আমার কবর জিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব)। তিনি আরও বলেছেন– **من وجد ساعة ولم يعد الي فقد جفاني** (যে ব্যক্তি ক্ষমতা লাভ করলো, অথচ আমার দিকে এলো না সে নিশ্চয়ই আমার উপর জুলুম করলো)। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা বলেছেন, এই হাদিস প্রমাণ করে যে, জিয়ারত না করা হারাম।) কেননা জিয়ারত

তরক করা দ্বারা রসুলেপাক স.কে কষ্ট দেয়া হয়। তাঁর উপর জুলুম করা হয়। তাঁকে কষ্ট দেয়া ও জুলুম করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। জুলুম দূর করা ওয়াজিব। তাই রসুলেপাক স. এর রওজা শরীফ জিয়ারত করা ওয়াজিব। রসুলেপাক স. বলেছেন, **من زار بعد موتي فكانما زارني في حياتي** (আমার ওফাতের পর যে আমার জিয়ারত করলো সে যেনো আমার হায়াতেই আমাকে জিয়ারত করলো)। এ সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। রওজা শরীফ ও মসজিদে নববী জিয়ারত করার ফজিলত, আদব ও আহকাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব' গ্রন্থে।

নবী করীম স. এর বৈশিষ্ট্য ও মীরাছ বণ্টন না করা

রসুলেপাক স. এর ওফাতকালীন বিশেষত্ব হলো– তাঁর জানাযার নামাজ অনেকবার হয়েছিলো এবং তা জমাতবদ্ধভাবে হয়নি। তাঁকে তাঁর ঘরের মধ্যেই দাফন করা হয়েছিলো। তাছাড়া তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে ওয়ারিশির বণ্টন হয়নি। এ সম্পর্কে তিনি স. নিজেই বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কারও মীরাছ গ্রহণ করি না এবং আমাদের মীরাছও কেউ গ্রহণ করতে পারে না। আমাদের রেখে যাওয়া সম্পদ হচ্ছে সদকা। রসুলেপাক স. রেখে গিয়েছিলেন একটি গাধা, কিছু অস্ত্রপাতি, কামীস, চাদর এবং এ জাতীয় আরও কিছু পোশাক, বনী নযীরের, খয়বরের ও ফদকের ভূমি। তিনি স. ওই ভূমিসমূহের উৎপন্ন শস্য দ্বারা তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণের ভরণ পোষণ করতেন, মেহমানদারী করতেন এবং ফকীর মিসকীনদের অভাব পূরণ করতেন। যখন তিনি স. দুনিয়া থেকে চলে গেলেন এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীক খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন হজরত ফাতেমা হজরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকটে উপস্থিত হয়ে মীরাছের দাবী করলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে মীরাছ দিলেন না। সাইয়্যেদা ফাতেমা বললেন, আপনার যখন ইনতেকাল হবে তখন আপনার ওয়ারিশ কে হবে? তিনি বললেন, আমার পরিবার ও সন্তানেরা। হজরত ফাতেমা যাহরা বললেন, তাহলে এ কেমন কথা যে, আমি আমার পিতার ওয়ারিশ হতে পারবো না? হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, 'আমাদের কোনো মীরাছ হয় না' আমি রসুলুল্লাহ্কে এরকম বলতে শুনেছি। তবে আমি রসুলুল্লাহ্র খলীফা। তিনি স. যাদেরকে প্রতিপালন করেছেন, আমিও তাঁদের প্রতিপালন করে যাবো। রসুলুল্লাহ্ যে মাল রেখে গিয়েছেন, সে মাল তিনি যে সকল জায়গায় খরচ করতেন এবং যেভাবে মুসলমানদের অভাব পূরণ করতেন, আমিও সে রকম করে যাবো। তাছাড়া রসুলেপাক স. থেকে আমি আরো শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা যখন তাঁর কোনো নবীকে দান করেন, তখন সে দানের প্রাপ্যাধিকারী তিনিই হন এবং তাঁর পর হন তিনি, যিনি নবীর কার্যাবলী সম্পাদন করেন।

এমন অনেক লোক ছিলেন, যাদেরকে রসুলেপাক স. কিছু দান করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। তাঁরা হজরত আবু বকর সিদ্দীকের কাছে এলেন। তিনি তাঁদেরকে কৃত ওয়াদা মোতাবেক দান করলেন। এমন কি এ হুকুম হজরত ফাতেমা যাহরার উপরও বর্তেছিলো।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, আমিও রসুলুল্লাহ্‌র ওফাতের পর তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তি খয়বর, ফদক এবং মদীনার বনু নযীর গোত্রের ভূমি ইত্যাদির ওয়ারিশির দাবী করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা থেকে আমাকে কিছুই দান করেননি। তিনি আমাকে ওই কথাই বলেছিলেন, যা বলেছিলেন ফাতেমা যাহরাকে। রসুলেপাক স. এর সকল সহধর্মিণীগণের একই রকম অবস্থা ছিলো। এমন নয় যে, এই বর্ণনাটি কেবল হজরত আবু বকর সিদ্দীকই করেছেন। বরং সকল সাহাবীই এর উপর সাক্ষী দিয়েছেন এবং সহমত পোষণ করেছেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছিলেন, রসুলুল্লাহ্‌র বংশধরগণ এ মাল থেকে সেভাবেই অংশ লাভ করবেন, যেমন তাঁর জীবদ্দশায় পেতেন। রসুল স. এর আমল আমি পরিবর্তন করবো না। আল্লাহ্‌র শপথ! রসুলুল্লাহ্‌র নিকটজন আমার কাছে আমার নিকটজনদের চেয়ে অধিক প্রিয়। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের কথায় সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরা অতুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর ইনতেকাল পর্যন্ত হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে তিনি সম্পর্কচ্যুত ছিলেন। বিষয়টি বিস্ময়কর! তাঁর এরূপ বিচ্ছিন্ন থাকা এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি রাগ করার ভিত্তি কী ছিলো? যদি একথা ধরে নেয়া যায় যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক কর্তৃক বর্ণিত হাদিস হজরত ফাতেমার কাছে পৌঁছেনি। কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, হাদিসটি তাঁর কাছে গ্রহণীয় হলো না কেনো? ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, হজরত ফাতেমার মনোকষ্টটি ছিলো স্বভাবজাত। কিন্তু তাঁর উপর স্থির থাকা অবশ্য বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। তবে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সঙ্গে হজরত ফাতেমার অমিল স্থায়ী থাকেনি। পরবর্তীতে অবশ্য তাঁর মনোকষ্ট দূর হয়ে গিয়েছিলো। হজরত ফাতেমা তাঁর মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় হজরত আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি তুষ্ট হয়েছিলেন। ইমাম বায়হাকী শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক হজরত ফাতেমার অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন। হজরত আলী মুর্তযা বললেন, আবু বকর সিদ্দীক এসেছেন। তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। হজরত ফাতেমা রা. হজরত আলী রা.কে বললেন, আপনি কী বলেন। অনুমতি দিবো? তিনি বললেন, হাঁ। হজরত ফাতেমা অনুমতি দিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক ভিতরে প্রবেশ করলেন। তারপর এমন কথা বললেন, যাতে তিনি খুশী হয়ে গেলেন। 'কিতাবুল ওয়াফা'তে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। 'রিয়াদুন নাদরা' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক হজরত ফাতেমার নিকটে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছে কৈফিয়ত পেশ করলেন। তাঁর কথা

শুনে হজরত ফাতেমা সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। ইমাম আওযায়ী বলেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে হজরত ফাতেমার দরজায় এসে বললেন, আমি এখান থেকে যাবো না, যতোক্ষণ না রসুলুল্লাহ্র কন্যা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। হজরত আলী তাঁর কাছে এলেন এবং হজরত ফাতেমাকে রাজী করাবেন বলে শপথ করলেন। পরে হজরত ফাতেমা তাঁর প্রতি পরিতুষ্ট হলেন। হাদিসটি শায়খাইন বর্ণনা করেছেন 'কিতাবুল মুওয়াফিকা'তে।

প্রচলিত কথা এই যে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক হজরত ফাতেমার জানাযায় উপস্থিত ছিলেন না। তার কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, হজরত ফাতেমার জানাযা হয়েছিলো রাতের বেলা। হজরত আবু বকর সিদ্দীক হজরত আলীর সংবাদের অপেক্ষায় বসেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, হজরত আবু বকর সিদ্দীক হজরত ফাতেমার জানাযায় হাজির ছিলেন। জানাযার নামাজও পড়েছিলেন। 'আওলাদে রসুল' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও বর্ণনা আসবে ইনশাআল্লাহ্। 'ফসলুল খেতাব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার কাছে এলেন। তখন হজরত ফাতেমা খুব অসুস্থ ছিলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হজরত আলী মুর্তযা বললেন, আবু বকর এসেছেন এবং তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তোমার ইচ্ছে হলে তাঁকে গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারো। সাইয়্যেদা ফাতেমা হজরত আলীকে বললেন, আপনার কাছে তাঁর ভিতরে প্রবেশ না করার চেয়ে প্রবেশ করা কি বেশী পছন্দনীয়? তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর হজরত আবু বকর সিদ্দীক ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর কাছে ওজর খাহী পেশ করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার জানাযার নামাজ পড়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মাগরিব ও এশার নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে পরলোকগমন করেন। সে সময় সেখানে উপস্থিত হন হজরত আবু বকর সিদ্দীক, হজরত ওসমান, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং হজরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম। নামাজ পড়ার জন্য যখন জানাযা রাখা হলো, তখন হজরত আলী বললেন, হে আবু বকর! আপনি সামনে যান। তিনি বললেন, আপনি উপস্থিত থাকা অবস্থায় আমি সামনে যাবো? হজরত আলী বললেন, হাঁ আমি উপস্থিত আছি। কিন্তু আপনি ছাড়া জানাযার নামাজ কেউ পড়াবে না। অতঃপর হজরত আবু বকর সিদ্দীক সামনে অগ্রসর হন এবং হজরত ফাতেমার নামাজে জানাযা পড়ান। উক্ত নামাজে জানাযায় তিনি চার তকবীর উচ্চারণ করেন। তারপর রাতের আঁধারে তাঁকে দাফন করা হয়। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হজরত আবু বকর সিদ্দীকের ওফাতের পর খলীফা হন হজরত ওমর ফারুক। তিনিও উপরোক্ত মালসমূহ ওই পদ্ধতিতেই বণ্টন করেছিলেন, যে পদ্ধতিতে বণ্টন করেছিলেন রসুলেপাক স. এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীক। দু'বছর পর্যন্ত তিনি

এভাবে আমল করেছিলেন। তারপর তিনি ওই সম্পদ হজরত আব্বাস ও হজরত আলীর নিকট সোপর্দ করেন। তাঁদেরকে দায়িত্বে দেন, তাঁরা যেনো একই নিয়ম অনুসরণ করে চলেন। কিছুদিন পর তাঁদের দু'জনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে তাঁরা হজরত ওমর ফারুকের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, এই সম্পত্তি আমাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোক। আর আমরা চাই, আমাদের মধ্যে আর কোনো অংশীদার যেনো না থাকে। হজরত ওমর ফারুক সাহাবা কেরামের বৈঠক ডাকলেন। বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালার শপথ দিয়ে বলছি, যার নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে আকাশ এবং পৃথিবী। নবীয়ে করীম স. বলেছেন, নিশ্চয়ই আমরা নবী সম্প্রদায়। আমরা কোনো মীরাছ রেখে যাই না এবং আমরা কোনো মীরাছ পাইও না। আমরা যা রেখে যাই তা হচ্ছে সদকা। একথা শুনে সকল সাহাবীই বললেন, হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি এরকম বলেছেন। হজরত ওমর ফারুক বললেন, রসুলুল্লাহ্‌ এই মাল বণ্টন করতেন এবং সারা বৎসরব্যাপী আয্‌ওয়াজে মুতাহ্‌হারাতের জন্য খরচ করতেন। তারপর যা অবশিষ্ট থাকতো, তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জমা করে দিতেন। অথবা অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করতেন। কিংবা মুসলমানদের অভাব পূরণের জন্য খরচ করতেন। তাঁর মহাতিরোধানের পর খলীফা হলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক। তখন তিনি ওই সম্পদ হস্তগত করলেন এবং রসুলুল্লাহ্‌ যেভাবে ব্যয় করতেন, তিনিও সেভাবে ব্যয় করতে লাগলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা জানেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক এ ব্যাপারে রসুলুল্লাহ্‌র যথাযথ অনুসরণকারী ছিলেন। তারপর হজরত আবু বকর সিদ্দীকের মহাপ্রস্থান ঘটলো। আমি নিযুক্ত হলাম রসুলুল্লাহ্‌ এবং আবু বকরের খলীফা। আমিও দুই বৎসর পর্যন্ত ওই রকমই করলাম। এরপর দায়িত্ব দিলাম আপনাদের দু'জনকে। এতোদিন আপনারা উভয়েই একমতে ছিলেন। আমি আপনাদের কাছ থেকে এইমর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, আপনারাও ওই রকমই করবেন যে রকম করেছিলেন আল্লাহ্‌র রসুল। আপনারাও আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলেন যে, আপনারা ওই রকমই আমল করবেন। এখন আবার আপনারা ভিন্ন কথা বলছেন কেনো? আপনাদের দু'জনের মধ্যে সব সম্পদ ভাগ করে দিতে বলছেন কেনো? এখন আপনারা যদি সন্তুষ্ট না হোন, অথবা ওইরকম আমল করতে না পারেন, তাহলে ওই সম্পত্তি আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। আমি ওই রকম আমলই করবো, যেরকম করেছেন রসুলুল্লাহ্‌ এবং তাঁর খলীফা হজরত আবু বকর।

উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত পরবর্তী ইতিহাস ছিলো এরকম— অতঃপর ওই সম্পত্তি হজরত আব্বাস এবং হজরত আলীর অধিকারভূত হয়। পরে হজরত আলী হজরত আব্বাসের উপর প্রবল হন এবং তিনি তা হস্তগত করেন। হজরত আলীর পর হজরত ইমাম হাসান ইবনে আলীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ওই সম্পত্তির অধিকারী হন হুসাইন ইবনে আলী। তারপর হজরত আলী ইবনে হুসাইন। তারপর হাসান ইবনে

হুসাইন। তারপর ইমাম হুসাইন ইবনে আলীর ভাই যায়েদ ইবনে হাসান ইবনে আলী। শেষে ওই সম্পত্তি অধিকার করে নেয় মদীনার শাসক মারওয়ান। পরবর্তীতে মারওয়ানী শাসকদের কাছ থেকে ওই সম্পত্তি চলে আসে হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের কর্তৃত্বে। তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ। তিনি বললেন, রসুলুল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর কন্যা সাইয়্যেদা ফাতেমাকে যে বিষয়ে বিরত রেখেছিলেন, তার মধ্যে আমি আমার হাতই স্পর্শ করবো না। এর মধ্যে আমার কোনো অধিকার নেই। একথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরা রসুলুল্লাহ্‌র পৃথিবী বাসকালেই তাঁর কাছে উক্ত মালের দাবী করেছিলেন। কিন্তু তিনি স. তাঁকে তা দেননি। সহীহ্ বোখারী শরীফে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

কোনো কোনো আলেম বলেন, আম্বিয়া কেরামের রেখে যাওয়া সম্পত্তির উপর মীরাছের হুকুম জারী না হওয়ার কারণ হচ্ছে, তাঁদের হায়াত। বিশেষ করে সাইয়্যেদুল মুরসালীন স. এর পবিত্র হায়াত হচ্ছে চিরস্থায়ী। মীরাছের হুকুম জারী হয় মৃতদের উপর, জীবিতদের উপর নয়। আলোচনার ধারা যেহেতু চলেছে রসুলেপাক স. এর পবিত্র হায়াতের দিকে। কাজেই এ প্রসঙ্গটি নিয়ে এই গ্রন্থখানি সুবিন্যস্ত করতে চাই। কেননা রসুলেপাক স. এর মহাতিরোধান তো সংঘটিত হয়েছে। আর তিরোধানের অন্যান্য আহকাম– গোসল, কাফন-দাফন ইত্যাদির আলোচনাও করা হয়েছে। যদিও এ সকল সম্পর্ক সাইয়্যেদে আলম স. এর পবিত্র সত্তার প্রতি করা হয়েছে, কিন্তু বাতেনী হাকীকতে তিনি সকলের হায়াতের উৎস ও মূল। সকল আদম সন্তান বরং সমগ্র আলমের সকল অংশের স্থায়িত্বের মূল হচ্ছেন তিনি। কিন্তু কী আর করা যাবে? সময়ের প্রয়োজনে তাঁর শানে উক্ত শব্দাবলী ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য। মাকসুদ ও মাকহুমের ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় উপরোক্ত বিবরণাবলী ব্যবহার না করে যে আমাদের কোনো উপায় নেই। হাঁ, ঘটনা হচ্ছে এরকম, যে রকম আল্লাহ্‌তাআলা এরশাদ করেছেন –**كل نفس ذائقة الموت** (জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে)(২১ঃ৩৫)। আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানানুসারে রসুলেপাক স.কেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে– একথা আমরা বলতে পারি। কিন্তু মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার পর এবং দাসত্বের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করার পর তাঁর জন্য রয়েছে হায়াত আর হায়াত। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। ওই রকম অবস্থার আলোচনা ছাড়া বিভিন্ন পুস্তকে সাধারণভাবে যা দেখা যায় এবং যেভাবে 'মওত' শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহার রসুলেপাক স. এর প্রতি সম্বন্ধিত করা হয়, তা খুবই অসঙ্গত। মৃত্যু নামক অবস্থাটাকে উক্তরূপ ব্যাখ্যা না করে যদি অন্য কোনোরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে তা-ই হবে উত্তম। আল্লাহ্‌তায়ালা ইমাম মালেকের প্রতি রহম করুন, যিনি ছিলেন রসুল স. এর দরবারের বিশিষ্ট প্রতিবেশী। তিনি মাকরুহ মনে করতেন এরকম উক্তিকে, যেখানে বলা হতো 'আমি নবী করীম স. এর কবর শরীফ জিয়ারত করেছি।' তিনি মনে করতেন, বলা উচিত এরকম– আমি রসুলুল্লাহ্‌র জিয়ারত করেছি।

হায়াতে আম্বিয়া

প্রকাশ থাকে যে, আম্বিয়া কেরামের হায়াত বা জীবনকাল সম্পর্কে উলামায়ে মিল্লাতের ঐকমত্য রয়েছে। এ বিষয়ে মতভেদ মাত্রই নেই। আম্বিয়া কেরামের হায়াতের অস্তিত্ব শহীদগণের হায়াতের চেয়ে উন্নততর ও অধিক পরিপূর্ণ। কেননা শহীদগণের হায়াতের অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র নিকট অর্থগত এবং আখেরাত সম্পর্কিত। আর আম্বিয়া কেরামের পবিত্র হায়াত অনুভূতিগত এবং জাগতিক। এ সম্পর্কে বহুসংখ্যক হাদিস ও আছার বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস ও আছারের আলোকে আম্বিয়া কেরামের হায়াত

আবু ইয়ালী অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের সঙ্গে হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম স. বলেছেন, اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِي قبورهم 'আল আম্বিয়াউ আহ্‌ইয়াউ ফী কুবূরিহিম' (অর্থঃ আম্বিয়া কেরাম তাঁদের আপন আপন কবরে জীবিত)। এ সম্পর্কে আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদিসখানি যথাসূত্রসম্বলিত নয়। হাদিসখানি এরকম–

....ما من مسلم يسلم علي الا راد الله علي روحي حتي ا رد عليه السلام

(কোনো মুসলমান আমাকে সালাম দিলে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন। আমি তার সালামের জবাব দেই)। উলামা কেরাম বলেছেন, হাদিসখানি রসুল স. এর হায়াত সম্পর্কিত নয়। বরং এর দ্বারা ওই ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদাকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি সাইয়্যেদে আলম স. এর উপর সালাত ও সালাম পেশ করে, চাই সে ব্যক্তি রওজা শরীফে হাজির হয়ে জিয়ারত করুক, অথবা অন্য যে কোনো স্থান থেকে সালাম পেশ করুক। নাসায়ী বিশুদ্ধসূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এমন একদল ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকে। আমার উম্মতের মধ্য থেকে কেউ আমার উপর সালাত ও সালাম পেশ করলে তারা তা আমার কাছে পৌঁছে দেয়। এ বিধানটি যারা দূর থেকে সালাম পাঠায় তাদের জন্য। কিন্তু যারা রওজা শরীফে উপস্থিত হয়, তাদের ব্যাপারে এই হাদিস তো এরকমই প্রমাণ করে যে, রসুলেপাক স. স্বয়ং জিয়ারতকারীর সালাত ও সালাম শ্রবণ করেন এবং তার জবাব দেন। শুধু তাই নয়, বরং এর চেয়েও অধিক। অনেক সময় তিনি সালাম প্রদানে অগ্রগামী হয়ে যান, যেমন জাহেরী হায়াতে তাঁর পবিত্র স্বভাব ছিলো। তিনিই আগে সালাম প্রদান করতেন। এরকম আর একটি হাদিস রয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এমতাবস্থায়ও সেখানে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে, যে রসুলেপাক স. এর দরবারে সালাম পেশ করে থাকে। যেমন রাজা-বাদশাহদের দরবারে গোমস্তা

হাজির থাকে। ইমাম আবদুল হক, যিনি হাদিসবেত্তাগণের ইমাম ছিলেন, তিনি তাঁর রচিত 'আহকামে সুগরা' নামক গ্রন্থে যথাসূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকরম স. বলেছেন, কেউ যদি তার মুসলমান ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে যায়, আর সে যদি তাকে সালাম দেয়, তাহলে সেই কবরবাসী তার মুসলমান ভাইকে চিনতে পারে এবং তার সালামের প্রত্যুত্তর দেয়। এ সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। এ বিষয়টি যখন সাধারণ সকল মুমিন মুসলমানের ব্যাপারে সাব্যস্ত, তখন সাইয়্যেদুল মুরসালীন স. এর ক্ষেত্রে তা কী রকম হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বিষয়টি কেবল সালাম পৌঁছানোর উপরেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং উম্মতের সকল আমলসমূহও তাঁর দরবারে পৌঁছে দেয়া হয়। বায্যার বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার কিছু ফেরেশতা পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকে এবং তারা তোমাদের আমলসমূহ আমার কাছে উপস্থিত করে। সে সমস্ত আমলের যা নেক আমল, তা দেখে আমি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করি। আর যা মন্দ আমল, তার জন্য আল্লাহ্তায়ালার কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করি।

বায়হাকী হজরত আনাস থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাকে শুদ্ধসূত্রসম্পর্কিত বলে আখ্যায়িতও করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আম্বিয়া কেরাম চল্লিশদিন তাঁদের কবরের মধ্যে আপন অবস্থায় থাকেন না। বরং তখন তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার দরবারে নামাজ পড়তে থাকেন। এমনি অবস্থায় একদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, আম্বিয়া কেরাম তাঁদের বরযখী জীবনে জীবিত। এ সম্পর্কে বহু হাদিস রয়েছে। তারপর তিনি ওই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, রসুলেপাক স. হজরত মুসার কবর শরীফ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। দেখতে পেলেন হজরত মুসা তাঁর কবরের মধ্যে নামাজ পড়ছেন। তারপর তিনি ওই সকল হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে, রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মোলাকাত করার জন্য আম্বিয়া কেরামের আগমন ঘটেছিলো। এ সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী আরও বলেছেন, উল্লিখিত হাদিসসমূহের তাৎপর্যের ভিত্তি হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালা আম্বিয়া কেরামের মহাপ্রস্থানের পর তাঁদের পবিত্র আত্মাসমূহ তাঁদের দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেন। আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন– **فصعق من في السموات ومن في الارض** (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হইয়া পড়িবে)(৩৯:৬৮)। এই বেহুঁশী তাঁদের উপরও কার্যকর হবে। কিন্তু এ কথার দ্বারা এ রকম বলা যায় না যে, তাঁদের বেলায় বেহুঁশী অর্থ হবে মত্ততা। বরং বেশী থেকে বেশী এর অর্থ হতে পারে যে, তাদের অনুভূতি লোপ পেয়ে যাবে। আবার কথাটির ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ্তায়ালা উক্ত আয়াতের পর বলেছেন **الا ما شاء الله** (যাহাদিগকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতীত)(৩৯:৬৮)। সুতরাং আম্বিয়া কেরাম উক্ত বেহুঁশী থেকে স্বতন্ত্র।

হাদীস শরীফে আরো বর্ণনা এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, তোমরা জুমার দিন আমার উপর বেশী বেশী সালাত ও সালাম পেশ কোরো। কেননা তোমাদের সালাত ও সালাম আমার কাছে পেশ করা হয়। তখন সাহাবা কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যখন আমাদের চোখের আড়াল হয়ে যাবেন তখন আমাদের সালাত ও সালাম আপনার কাছে কীভাবে পেশ করা হবে। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আম্বিয়া কেরামের পবিত্র দেহসমূহ ভক্ষণ করাকে মৃত্তিকার জন্য হারাম করে দিয়েছেন। এ সকল বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আম্বিয়া কেরামের পবিত্র হায়াত অনুভূতিগত ও জাগতিক। শুধুমাত্র রূহ অবশিষ্ট থাকা নয়। যেমন শহীদগণের আত্মাকে সবুজ রঙের পাখির দেহের ভিতরে রেখে দেয়া হবে– এমন নয়।

'তালখীস' প্রণেতা শাফেয়ী বলেছেন, যে সম্পত্তি রসুলেপাক স. এর মালিকানায় ছিলো এখন পর্যন্ত তা তাঁর মালিকানায়-ই রয়েছে– যেমন ছিলো তাঁর জহেরী হায়াতে। তা ওয়ারিশগণের হাতে হস্তান্তরিত হয়নি, যেমন উম্মতের বেলায় হয়ে থাকে। ইমাম হারামাইন এ কথা সমর্থন করে বলেন, একথা হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পবিত্র জীবনের অনুকূল, রসুল স. এর মালিকানার বিষয়ে তিনি যা আমল করেছেন। 'তালখীস' প্রণেতা আরও বলেছেন, ইমামুল হারামাইনের বক্তব্য বিস্ময়কর। কেননা তিনি বলেছেন– রসুলুল্লাহ্ স. এতো জন স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি স্ত্রীগণের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এ কথার দ্বারা তিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর প্রতি মৃত্যুর সম্পর্ক করেছেন। আবার হায়াতুন নবীও প্রমাণ করেছেন। এক ব্যক্তি পরস্পরবিরোধী কথা বলতে পারেন কী করে? তার জবাব অবশ্য তিনি দিয়েছেন এভাবে– এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা তিনি ওফাতবরণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে হায়াত দান করেছেন।

আল্লামা সুবকী তার 'শেফাউল আসক্বাম' গ্রন্থে লিখেছেন, দেহের মধ্যে আত্মা ফিরিয়ে দেয়া, যেমন কবরে হয়ে থাকে– তা তো সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু কথা তো হচ্ছে মানবদেহের মধ্যে আত্মার সার্বক্ষণিক অবস্থান সম্পর্কে। শরীরের সঙ্গে আত্মা সম্মিলিত হয়ে জীবিত অবস্থা ধারণ করা, যেমন দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় হয়ে থাকে– এ প্রশ্নের জবাবে ওই সকল হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলোতে রয়েছে হায়াতুল আম্বিয়ার প্রমাণ। সকল হাদিস দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, আম্বিয়া কেরাম আপন আপন কবরের মধ্যে শারীরিকভাবেই জীবিত আছেন। যেমন দুনিয়াতে মানুষ জীবিত থাকে। কিন্তু দুনিয়ার জীবনে খাদ্য ও আলো বাতাস যা জীবিত জনের জন্য অপরিহার্য, তা থেকে তাঁরা মুক্ত। এ সকল মৌলিক উপাদান ছাড়াই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদেরকে জীবিত রাখতে সক্ষম। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদের পবিত্র দেহে এমন অবস্থা ও অনুসঙ্গ সৃষ্টি করে দেন, যার ফলে তাঁদের এ সবের প্রয়োজনই হয় না। এমন কি তাঁরা এ সবের প্রতি

ভ্রূক্ষেপও করেন না। যেমন কোনো কোনো সময় অত্যন্ত আনন্দ বা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ পানাহার করে না অথবা করতে পারে না। প্রয়োজনও পড়ে না। স্মরণও থাকে না।

শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. বলেছেন, সওমে বেসাল সম্পর্কিত হাদিস **عند ربي يطعمني و يسقيني** (আমি আমার রবের কাছে থাকি। তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান) হায়াতুন্ নবী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে যথেষ্ট। এই হাদিসে প্রকৃত খানাপিনার কথাই বুঝানো হয়েছে, যেমন বেহেশত থেকে রসুলেপাক স. এর জন্য খানা এনে দেয়া হয়েছে। অথবা এর দ্বারা যওক বা প্রেমের আস্বাদন ও উপস্থিতি বুঝানো হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, হায়াতে আম্বিয়া এবং তাঁদের এ সকল গুণাবলী প্রমাণার্থে যে সকল আহকাম ও আছার রয়েছে, সে সব বিষয়ে কোনো আলেমেরই মতানৈক্য নেই। তবে একটি বিষয়ে আছে, আর তা হচ্ছে আম্বিয়া কেরামের অবস্থান কি তাঁদের কবরের পবিত্র ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে, নাকি অন্য কোনো স্থানে। বিষয়টি নিয়ে উলামা কেরাম বিভিন্ন কথা বলেছেন। আলাউদ্দীন কুনুভী, যিনি শাফেয়ী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট আলেম এবং তাসাউফপন্থী ব্যক্তি, তিনি বলেছেন, আমাদের বিশ্বাস এই যে, আম্বিয়া কেরাম আল্লাহ্তায়ালার কাছে জীবিত অবস্থায় আছেন। আর তাঁদের এ জীবন দুনিয়ার বাহ্যিক ও প্রচলিত হায়াতের চেয়ে অধিক পূর্ণ এবং মর্যাদাসম্পন্ন। আর আমরা এ বিশ্বাসও পোষণ করি যে, রসুলে আকরম স. তাঁর রফীকে আ'লার সঙ্গে সর্বোচ্চ আসমানে সিদ্রাতুল মুন্তাহার কাছে জান্নাতুল মা'ওয়ায় অবস্থান করছেন। এ অবস্থানটি তাঁর কবর শরীফে অবস্থান করার চেয়ে উত্তম ও অধিকতর পরিপূর্ণ। অবশ্য হাদিস শরীফের বর্ণনার আলোকে সাধারণভাবে সকল মুমিন ব্যক্তির কবর দৃষ্টিসীমানা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে থাকে। তাহলে সরওয়ারে কায়েনাত সাইয়্যেদে আহলে সুফ্ফা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর কবর শরীফের প্রশস্ততার বিষয়ে কী আর অনুমান করা যায়? রসুলে আকরম স. এর অবস্থান জান্নাতে আ'লার মধ্যে হওয়া অধিকতর পূর্ণ, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান সমতুল্য। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, আম্বিয়া কেরামকে চল্লিশ দিন পর কবরের মধ্যে আর রাখা হয় না। অন্য এক হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার নিকট আমি এই অবস্থা থেকে উন্নততর অবস্থানে আছি যে, আল্লাহ্তায়ালা তিন দিন পর আমাকে কবরের মধ্যে রাখবেন। এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আম্বিয়া কেরাম উক্ত সময়সীমার পর তাঁদের কবরের মধ্যে অবস্থান করবেন– বিষয়টি অকাট্য নয়। এসব হচ্ছে শায়েখ আলাউদ্দীন কুনুভী শাফেয়ীর ভাষ্য। তাঁর এহেন ভাষ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আম্বিয়া কেরামের হায়াত জারী থাকা এবং কবরের মধ্যে অবস্থান করা– এ দু'টি বিষয়ে তাঁর দোদুল্যমানতা আছে। তবে তাঁদের হায়াত যে হাকীকী হবে, এ বিষয়টি তাঁর

কাছে স্বীকৃত। কুনুভী র. নিজেই তাঁর দোদুল্যমান বক্তব্যের পর বলেছেন, আমার এ বক্তব্যের পর কেউ যেনো এরকম মনে না করে যে, আম্বিয়া কেরাম তাঁদের কবর থেকে দৃষ্টিপাত করার বিষয়টি বন্ধ করে দিয়েছেন। বরং তাঁদের অবস্থানস্থল ও কবরের মধ্যে বিশেষ যোগসূত্র বিদ্যমান। ফলে তাঁদেরকে তাঁদের কবরের পবিত্র জায়গাটির প্রতিই সম্বন্ধ করা হয়। নতুন কোনো স্থানের প্রতি নয়।

এ অবস্থা সকল মুসলমানের। তাদের কবর ও আত্মার মধ্যে এক ধরনের বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান, যার ফলে তারা জিয়ারতকারীদেরকে চিনতে পারে। এর প্রমাণ হচ্ছে ওই নির্দেশনা, যেখানে বলা হয়েছে, সব সময়ই জিয়ারত করা মোস্তাহাব। ইমাম বায়হাকী অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এ সকল হাদিস প্রমাণ করে যে, কবরবাসীর অনুভব ও শ্রবণশক্তি বিদ্যমান। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শ্রবণশক্তি একটি আনুষঙ্গিক বিষয়, যা হায়াতের সঙ্গে শর্তযুক্ত। সুতরাং সকল মুসলমানই কবরে জীবিত থাকে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের হায়াত শহীদগণের হায়াতের তুলনায় স্বল্পতর। আর আম্বিয়া কেরামের পবিত্র হায়াত শহীদগণের হায়াতের তুলনায় পূর্ণতর।

রসুলেপাক স. এর জাগতিক হাকীকী হায়াত সাব্যস্ত করার পর যদি কেউ বলে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব স. এর শরীরে এমন অবস্থা ও শক্তি দান করেছেন, যার বদৌলতে তিনি স্বয়ং কোথাও তশরীফ নিয়ে যান, অথবা মিছালী সুরতে কোথাও যান– তা আসমানে হোক অথবা যমীনে, কবর শরীফে থাকুন অথবা অন্য কোনো স্থানে– তাহলে এর একটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু তার পরও তিনি সর্বাবস্থায় তাঁর বিশেষ স্থান রওজা শরীফে অবস্থান করছেন– বিভিন্ন হাদিসের বর্ণনা দ্বারা একথাই প্রমাণিত। যেমন হজরত ওসমানকে যখন বিদ্রোহীরা ঘিরে ফেললো, তখন কোনো কোনো সাহাবী তাঁকে পরামর্শ দিলেন, শামবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যান। সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করুন। তখন তিনি বললেন, দারুল হিজরত মদীনা পরিত্যাগ করবো এবং রসুলুল্লাহ্র প্রতিবেশী হওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবো এরকম হতে পারে না। কৃষ্ণকালে (এজীদী শাসনামলে) হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেবের বর্ণিত ঘটনাটি সুবিদিত। তখন সকল মানুষ মসজিদে নববী ছেড়ে পলায়ন করেছিলো। তিন দিন পর্যন্ত হুজরা শরীফের ভিতর থেকে আজানের আওয়াজ শোনা গিয়েছিলো। এ সকল ঘটনা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, রসুলে আকরম স. রওজা শরীফেই অবস্থান করছেন। সুলতান সাঈদ নূরুদ্দীন শহীদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো ৫৫৭ হিজরীতে। রসুলে আকরম স. রাত্রে তিনবার তাঁকে স্বপ্নে দেখালেন যে, দু'জন নাসারা তাঁর পবিত্র দেহ চুরি করে নেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। রসুলেপাক স. তাঁকে সেই লোক দু'টির চেহারাও দেখিয়েছিলেন। তারপর সুলতান এক হাজার লোক নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন। দুষ্কৃতকারীদেরকে পাকড়াও করলেন। তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করলেন। তার

পর পরই সুলতান হুজরা শরীফের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে সীসা দিয়ে ঢালাই করে দিলেন। মদীনা শরীফের সকল ইতিহাসবিদগণ যেমন হেজালউদ্দিন মাতরী, মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী এবং অনেক আলেম এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

এখন কথা হলো, শায়েখ আলাউদ্দীন কুনুভী রসুলেপাক স. এর কবর শরীফে অবস্থান করার চেয়ে বেহেশতের মধ্যে অবস্থান করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন কেনো? জবাবে উলামা কেরাম বলেন, প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির কবরই বেহেশতের বাগিচাসমূহের অন্যতম। আর রসুলেপাক স. এর কবর শরীফ তো বেহেশতের বাগিচাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। হতে পারে যে, রসুলেপাক স. তাঁর কবর শরীফে থাকা অবস্থাতেই এমন ক্রিয়াশীল ও ক্ষমতাবান হতে পারেন যে, তাঁর সামনে আসমান, যমীন ও বেহেশত সকল জায়গার পর্দা রহিত হয়ে যায় এবং তিনি স্থানান্তরিত না হয়েই ক্রিয়াশীল হয়ে যান। সে কারণে মানুষ আখেরাতের কার্যাবলী এবং বরযখের বিভিন্ন অবস্থার সাথে দুনিয়ার অবস্থাকে তুলনা করতে পারে না, যা সীমা ও দিকের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ। প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্পাকই অধিক পরিজ্ঞাত।

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী বলেছেন, বেহেশতের কোন্ অংশ এমন আছে, যা রসুলেপাক স. এর কবর শরীফের চেয়ে উত্তম? কবর শরীফই সকল পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদাশীল স্থানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ– তা বেহেশতই হোক, বা অন্য কোনো স্থানই হোক। অতঃপর তিনি আরও বলেছেন, রসুলেপাক স. এর কবর শরীফকে যদি আরশে আজীমের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়, তবে আমি জানি না যে, কোনো সত্যবাদী মুমিন সে বিষয়ে দ্বিধা করবে কি না। কেননা ওই সব কিছুকেই রসুলেপাক স. এর তোফায়েলে সৃষ্টি করা হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

শেষ অধ্যায়

এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে হজরত রসুলেপাক স. এর আওলাদে কেরাম, আযওয়াজে মুতাহ্হারাত, তাঁর গোলাম যাঁরা ছিলেন, তাঁর চাচা-চাচীগণ, দাদী-নানীগণ, খাদেম, আযাদকৃত গোলাম, তাঁর দরবারের আমীর, লেখক, কর্মচারী, কবি, খতীব, মুওয়ায্যিন, যুদ্ধাস্ত্র,পশু ও অন্যান্য আসবাবপত্র সম্পর্কে।

আওলাদে কেরাম

রসুলেপাক স. এর সন্তান-সন্তুতি ছিলেন ছয় জন। দু'জন ছেলে– হজরত কাশেম এবং হজরত ইব্রাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। চারজন ছিলেন কন্যা– সাইয়্যেদা যয়নব, সাইয়্যেদা রুকিয়্যা, সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুম এবং সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরা রাদ্বিয়াআল্লাহু আনহুমা। কোনো কোনো আলেম পুত্র সন্তানদের মধ্যে হজরত তাইয়্যেব ও হজরত তাহেরকেও গণ্য করেন। এই হিসাব অনুযায়ী রসুলেপাক স. এর সন্তানগণের সংখ্যা আট। চারজন পুত্র এবং চারজন কন্যা। কেউ কেউ বলেছেন, ইব্রাহীম ও কাসেম ছাড়াও রসুলেপাক স. এর আরেকজন পুত্র সন্তান ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো আবদুল্লাহ। মক্কায় বসবাসের সময় শিশুকালেই তাঁর ইনতেকাল হয়। তাহের ও তাইয়্যেব তাঁর উপাধি ছিলো। বংশপ্রবাহ বর্ণনাকারী অধিকাংশ আলেমের মত এরকম। ইমাম দারা কুতনী বলেছেন, এই মতটি সুসাব্যস্ত। সুতরাং রসুলেপাক স. এর সন্তান-সন্তুতি ছিলেন মোট সাত জন– তিন পুত্র ও চার কন্যা।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে দারা কুতনী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তাহের ও তাইয়্যেব ছিলেন আবদুল্লাহ ছাড়াই। সে হিসেব অনুসারে পুত্রসন্তানের সংখ্যা হয় পাঁচ। আর সন্তান-সন্তুতির সংখ্যা হয় সর্বমোট নয়। কেউ কেউ বলেছেন, তাইয়্যেব ও মুতাইয়্যেব ছিলেন এক গর্ভজাত সন্তান। আর মুতাহ্হের ও তাহের ছিলেন অপর গর্ভজাত সন্তান। 'সফওয়া' গ্রন্থকার একথা বলেছেন। এই হিসেব অনুসারে সন্তানের সংখ্যা দাঁড়ায় এগারো। কারও কারও কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে তাঁর এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিলো আবদে মানাফ। এ হিসেব অনুসারে রসুলেপাক স. এর সন্তানের সংখ্যা দাঁড়ায় বারো। আবদে মানাফ ছাড়া বাদবাকী সকলেরই জন্ম হয়েছিলো ইসলামের যুগে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, হজরত ইব্রাহীম ছাড়া অন্য সকল সন্তানের জন্ম হয়েছিলো ইসলামের যুগে এবং সকলেরই ইনতেকাল হয় দুধপান করার বয়সে। অপর এক ব্যক্তির বর্ণনায় পাওয়া যায়, হজরত আবদুল্লাহ নবুওয়াতপ্রাপ্তির

পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে কারণেই তার নাম ছিলো তাহের ও তাইয়্যেব। এ সকল বর্ণনার ভিত্তিতে রসুলেপাক স. এর সন্তানের সংখ্যা দাঁড়ায় বারো। তাঁদের মধ্যে হজরত কাসেম ও হজরত ইব্রাহীমের বিষয়ে ঐকমত্য আছে। ছয় জনের বিষয়ে রয়েছে মতভেদ। তাঁরা হলেন ১. আবদে মানাফ ২. আবদুল্লাহ ৩. তাইয়্যেব ৪. মুতাইয়্যেব ৫. তাহের ও ৬. মাতাহ্হের। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, তিন ছেলে– কাশেম, ইব্রাহীম এবং আবদুল্লাহ আর চার কন্যা। হজরত ইব্রাহীম ছাড়া তাঁরা সকলেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত খাদীজাতুল কুবরা রা. এর গর্ভ থেকে। এ সব কথা 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

রসুলেপাক স. এর বড় সন্তান এবং সন্তানগণের জন্মতারিখের ক্রমধারার বিষয়ে উলামা কেরাম মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, রসুলেপাক স. এর বড় সন্তান ছিলেন হজরত কাসেম রা., তাঁর পর হজরত যয়নব রা. অতঃপর রুকিয়্যা রা., অতঃপর ইব্রাহীম রা.। ইবনে আবদুল্লাহর মতে এটাই বিশুদ্ধ।

হজরত কাসেম ইবনে রসুল

রসুলেপাক স. এর প্রথম সন্তান ছিলেন হজরত কাসেম। যিনি নবুওয়াত জাহের হওয়ার পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে কারণেই রসুলেপাক স. এর কুনিয়াত ছিলো আবুল কাসেম। তিনি হাঁটতে শিখেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, ছওয়ারীতে আরোহণ করতে পারেন এমন বয়স পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, দু'বছর হায়াত পেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিনি সতেরো মাস পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, শেষোক্ত কথাটিই সঠিক। তাঁর ইনতেকালও হয়েছিলো নবুওয়াত জাহের হওয়ার পূর্বে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থকার বলেছেন, 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, হজরত কাসেমের জন্ম হয়েছিলো ইসলামের যুগে। তিনি ছিলেন রসুলেপাক স. এর প্রথম সন্তান।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রসুল

রসুলেপাক স. এর পুত্র হজরত আবদুল্লাহ তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শিশুকালেই তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো। হজরত আমর ইবনুল আসের পিতা আস ইবনে ওয়ায়েল যখন সংবাদ পেলো, রসুলেপাক স. এর পুত্র হজরত আবদুল্লাহর ইনতেকাল হয়েছে, ইতোপূর্বে ইনতেকাল করেছিলেন অপর সন্তান হজরত কাসেম, তখন সে বলতে লাগলো, মোহাম্মদের সন্তান মারা গিয়েছে। সে আবতার (নির্বংশ)। আবতার শব্দের অর্থ লেজকাটা, নির্বংশ, বিস্মৃত হওয়া। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো–**اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ** (নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ)(১০৮:৩)। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে

তার নাম নেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। আর যদি কেউ তার নাম নেয়ও, তবে তার উপর লানত করবে। আর আপনাকে তো কেউ আবতার বলতেই পারে না। কেননা দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার এতোই কল্যাণ লাভ হয়েছে যে, তা বর্ণনাবহির্ভূত। সারা জাহান আপনার আওলাদ ফরযন্দে ভরপুর হয়ে যাবে। পূর্ব-পশ্চিম সকল প্রান্তেই তারা ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি কিয়ামতের দিন হাজার হাজার মুসলমান আপনার আত্মিক সন্তানদের পিছে পিছে থাকবে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব স.কে সংবাদ দিয়েছেন إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكَ ٱلْكَوْثَرَ (আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি (১০৮ঃ১) কাওছার– ফাওআল শব্দের ওজনে এসে মুবালাগা (আধিক্য) এর অর্থ প্রদান করেছে। এর অর্থের মধ্যে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ, যার সূক্ষ্মতা পর্যন্ত মাখলুকের এলেম পৌঁছতে পারে না। এ বিষয়ে যাই বর্ণনা করা হোক না কেনো, তা হবে সিন্ধুর সামনে বিন্দু তুল্য। 'কাউছার' শব্দের অর্থ করতে গিয়ে উলামা কেরাম বিভিন্ন উক্তি ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যিনি বাতেনের নূরের হিস্‌সা যে পরিমাণ পেয়েছেন, তিনি সে মোতাবেক বর্ণনা দিয়েছেন। নবুওয়াত, মোজেযাসমূহ, শাফাআত, রসুলেপাক স. এর বরকতময় সত্তার যাবতীয় বরকত ও পূর্ণতাসমূহ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় কারামাতসমূহ 'কাওছার' শব্দের ভিতর শামিল আছে। আরও রয়েছে হাউযে কাওছার, যা পরকালে রসুলেপাক স.কে দান করা হবে। কাওছারের পানি পান করলে কেউ কখনো পিপাসার্ত হবে না। সেই হাউযে কাওছারও উক্ত কল্যাণের একটি অংশ।

হজরত ইব্রাহীম ইবনে রসুল

হজরত ইব্রাহীম ছিলেন রাসুলেপাক স. এর সর্বশেষ সন্তান। অষ্টম হিজরীর যিলহজ্ব মাসে মদীনা শরীফে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন সাইয়্যেদা মারিয়া কিবতিয়া রা. যাঁকে ইসকান্দারিয়ার বাদশাহ মাকুকাস অন্যান্য হাদিয়ার সঙ্গে হাদিয়া স্বরূপ রসুলেপাক স. এর দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম হজরত আবু রাফের স্ত্রী হজরত সালমা হজরত ইব্রাহীমের ধাত্রীমাতা ছিলেন। হজরত সালমা তাঁর স্বামী হজরত আবু রাফেকে খবর দিলেন, সাইয়্যেদা মারিয়া কিবতিয়া সন্তান প্রসব করেছেন। হজরত আবু রাফে রসুলেপাক স.কে সংবাদটি পৌঁছে দিলেন। তিনি স. খুশী হয়ে হজরত আবু রাফেকে মুক্ত করে দিলেন। তারপর হজরত জিবরাইল এসে রসুলে আকরম স.কে আবু ইব্রাহীম বলে সম্বোধন করলেন। তিনি খুব আনন্দিত হলেন এবং দু'টি দুম্বা আকীকা দিলেন। মতান্তরে একটি বকরী আকীকা করলেন। সন্তানের মাথা মুণ্ডন করে তাঁর নাম রাখলেন। একটি উক্তি এরকমও আছে যে, প্রথম দিনই তাঁর নাম রাখা হয়েছিলো। সহীহ্ বোখারীতে হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে,

রসুলেপাক স. বললেন, আজ রাতে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তার সম্মানিত দাদার নামানুসারে আমি তার নাম রেখেছি ইব্রাহীম। মাথার চুল কামিয়ে সে চুলের ওজন পরিমাণে মিসকীনদের মধ্যে রৌপ্য সদ্‌কা করে দিলেন। কামানো চুল মাটিতে দাফন করে দিলেন। তারপর হজরত ইব্রাহীমকে দুধ পান করানোর জন্য উম্মে সাইফ নাম্নী জনৈক কর্মকারের স্ত্রীর কাছে সমর্পণ করলেন। ওই কর্মকারের নাম ছিলো আবু সাইফ। রসুলেপাক স. তাঁর পুত্র হজরত ইব্রাহীমকে দেখার জন্য হজরত আবু সাইফের গৃহে তশরীফ নিয়ে যেতেন।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, আমি রসুল স. এর চেয়ে স্বীয় পরিজনের প্রতি অধিক দয়ার্দ্র আর কাউকে দেখিনি। হজরত ইব্রাহীম মদীনার আওয়ালী এলাকায় দুধ পান করতেন। রসুলে আকরম স. যখন সেখানে তশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে থাকতাম। তিনি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতেন এবং তাঁর শিশুপুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতেন। হজরত আবু সাইফ হাঁপরের উনুনে আগুন জ্বালাতেন এবং তাঁর ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত হয়ে যেতো। কখনও কখনও এমন হতো যে, রসুলেপাক স. যখন হজরত ইব্রাহীমকে দেখতে যেতেন, তখন আমি তাঁকে খবর জানিয়ে দিতাম। তাঁর কাজ বন্ধ রাখতে বলতাম। আওয়ালীয়ে মদীনায় হজরত মারিয়া কিবতিয়ার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিলো। এখন সে জায়গাকে মাশরাবায়ে উম্মে ইব্রাহীম বলা হয়। লোকেরা বরকত লাভের জন্য সেখানে জিয়ারত করতে যায়।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. জানতে পারলেন, হজরত ইব্রাহীমের জাকান্দানী শুরু হয়ে গিয়েছে। তখন হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁর কাছে ছিলেন। তিনি স. হজরত আবদুর রহমানের হাত ধরে রওয়ানা দিলেন। হজরত ইব্রাহীমের শিয়রের কাছে উপস্থিত হলেন। দেখতে পেলেন, তিনি জাকান্দানী অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। রসুলেপাক স. তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। বললেন, হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকার্ত। আমার চোখ ক্রন্দন করছে। অন্তর দগ্ধ হচ্ছে। আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ভয়ে এর বেশী তিনি আর কোনো কথা বললেন না। আবু দাউদের বর্ণনানুসারে তাঁর বয়স হয়েছিলো দুইমাস দশ দিন। এক বর্ণনায় এসেছে, ষোল মাস আট দিন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এক বৎসর দু'মাস ছয়দিন। কেউ কেউ বলেছেন, প্রায় দেড় বৎসর। রসুলেপাক স.কে ক্রন্দনরত দেখে হজরত আবদুর রহমান বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনিও ক্রন্দন করছেন? আপনি তো মৃতের উপর ক্রন্দন করতে নিষেধ করে থাকেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে আউফের সন্তান! যে অবস্থা তুমি অবলোকন করেছো, তা রহমত ও স্নেহশীলতা। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বাভাবিকভাবে। আমি নিষেধ করেছিলাম ওই দু'প্রকারের আওয়াজকে– এক. যা গান গাওয়া ও খেলতামাশার সময় শয়তানী

সুর থেকে হয়। আর অপরটি ওই আওয়াজ, যা মুসিবতের কালে হয়ে থাকে। তাছাড়া আমি সুর করে ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করতে, চেহারার উপর আঘাত করতে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলতে মানা করেছিলাম। তবে চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া দয়া ও স্নেহশীলতার কারণে হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল না হয়, তার প্রতিও কোনোরূপ দয়া করা হয় না। হজরত আবদুর রহমান ইবনে হেববান তাঁর মাতা সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি ছিলেন হজরত মারিয়া কিবতিয়ার বোন, তিনি বলেছেন, আমি ইব্রাহীমের শিয়রে বসে ছিলাম। আমি এবং আমার বোন মারিয়া বিলাপ করতে লাগলাম। রসুলুল্লাহ্ আমাদেরকে বিলাপ করতে নিষেধ করলেন। তারপর তাঁর রূহ যখন কবয হয়ে গেলো, তখনও তিনি আমাদেরকে বিলাপ করতে নিষেধ করলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. এর চোখ থেকে যখন অশ্রু প্রবাহিত হলো, তখন হজরত উসামা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে নিষেধ করলেন। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনাকেও তো ক্রন্দনরত দেখছি। তিনি স. বললেন, ক্রন্দন হচ্ছে রহমত আর চিৎকার করে কাঁদা শয়তানী কাজ।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, হজরত ইব্রাহীমকে তাঁর ধাত্রী মাতা গোসল দিয়েছিলেন। অপর এক বর্ণনা মতে হজরত ফযল ইবনে আব্বাস তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। আর হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ পানি ঢেলে দিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারপর তাকে ছোটো একটি তক্তার উপর রাখা হলো। বিশুদ্ধমত হচ্ছে, রসুলে আকরম স. নিজেই তাঁর জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বর্ণনা করেছেন, তাঁর জানাযার নামাজ পড়া হয়নি। এ বিষয়ে উলামা কেরাম এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হতে পারে রসুলেপাক স. নিজে তাঁর নামাজে জানাযা না পড়িয়ে অন্য কোনো সাহাবীকে নামাজ পড়ানোর জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। অথবা তার অর্থ এমন হতে পারে যে, জামাতের সাথে তাঁর জানাযার নামাজ পড়া হয়নি।

হজরত ইব্রাহীমকে জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে দাফন করা হয়। রসুলেপাক স. বলেছেন, আমি তাকে ওসমান ইবনে মাযউনের পাশে দাফন করেছি। তারপর তাঁর কবরের উপর পানি ছিটানো হয়েছিলো। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এই কবরই সর্বপ্রথম কবর, যার উপর পানি ছিটানো হয়েছিলো। তাঁর কবরের উপর চিহ্ন করা হয়েছিলো, যেমন হজরত ওসমান ইবনে মাযউনের কবরের উপর চিহ্ন করা হয়েছিলো। এ জন্য রসুলেপাক স. স্বয়ং পাথর এনে তাঁর কবরের উপর রেখেছিলেন।

হযরত ইব্রাহীমের ওফাতের দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো। তাঁর ওফাত হয়েছিলো দশই মহররম বা দশই রবিউল আউয়াল তারিখে। লোকেরা বলতে লাগলো, এ গ্রহণ হয়েছে রসুলুল্লাহ্র পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুর কারণে। তখনকার লোকেরা বিশ্বাস

করতো, মহান ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে গ্রহণ সংঘটিত হয়। রসুলে আকরম স. তাদের কথা শুনে বললেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ লাগে না। এক বর্ণনায় আছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, এমন দু'টি নিদর্শন আছে, যা দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বান্দাদিগকে হুঁশিয়ার করেন, তারা যেনো এ দ্বারা নসিহত গ্রহণ করে, দান-সদকা করে, গোলাম আযাদ করে এবং আল্লাহ্র দরবারে তওবা এস্তেগফার করে।

সাধারণতঃ গ্রহণ সংঘটিত হয় চন্দ্র মাসের আটাশ বা ঊনত্রিশ তারিখে। কিন্তু ওই সময় গ্রহণ লেগেছিলো দশ তারিখে। উপর্যুক্ত বর্ণনা দ্বারা জ্যোতির্বিদদের কথা বাতিল বলে প্রমাণিত হয়। তাদের মত অনুসারে সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রমাসের আটাশ বা ঊনত্রিশ তারিখ ব্যতীত সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. হজরত ইব্রাহীমের ওফাতের দিন বলেছিলেন, সে যদি বেঁচে থাকতো, তাহলে আমি তার মায়ের সকল নিকটাত্মীয়দেরকে আযাদ করে দিতাম এবং সকল কিবতীদের জিযিয়া মওকুফ করে দিতাম। সহীহ্ কিতাবসমূহে এই হাদিসসমূহ সাব্যস্ততার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমার পুত্র ইব্রাহীমের ওফাত হয়েছে দুধপানের সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার আগেই। এক বর্ণনায় আছে, তার জন্য একজন দুগ্ধদায়িনী নির্বাচন করা হয়েছে, বেহেশতে তাকে দুধ পান করানোর সময়সীমা পূর্ণ করানোর জন্য। এমন হতে পারে যে, বেহেশত বলতে আলমে বরযখকেই বুঝানো হয়েছে। অথবা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুগ্ধপ্রদানকারিণী সৃষ্টি করা এবং দুধপানের সময়সীমা পূর্ণ করার মধ্যে যে হেকমত আছে, তা এলমে রেসালতেই সীমাবদ্ধ। কোনো কোনো মাশায়েখ এর তাৎপর্য এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, মৃত্যুর পরও তাঁর তরক্কী হয়েছে। এ বান্দা (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দিছে দেহলভী)ও এ কথার প্রবক্তা। তিনি উপরোক্ত হাদিস থেকে তার দলিল গ্রহণ করেছেন।

অপর এক হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি কোরআনে কারীম হেফ্য করার জন্য চেষ্টা করে, পূর্ণতা লাভ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন, যে তাকে হেফ্য করায় পূর্ণতা এনে দেয়। এই হাদিস পূর্বোল্লিখিত হাদিসের চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট। এ থেকে বুঝা উচিত যে, মৃত্যুর পর কী পরিমাণ পর্দা উন্মোচিত হয়ে যায় এবং কী পরিমাণ নেয়ামত প্রস্ফুটিত হয়। এর চেয়ে অধিক আর উন্নতি কী হতে পারে? সালেকের কাছে যদি আলমে গায়েবের কোনো কিছু উন্মোচিত হয়ে যায়, তবে তা কী পরিমাণ খুশি ও আনন্দের বিষয় হতে পারে? তখন তো সমস্ত নূর ও রহস্য প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হয়ে যায়। তখন সে আনন্দের কী হাল হতে পারে? কেউ যদি বলে, এখানে উন্নতি বলতে সুলুক পরিপূর্ণ করাকে বুঝানো হয়েছে– যা তমসা দূরীকরণ এবং মানবীয়

গুণাবলীর ফানা দ্বারা হাসিল হয়ে থাকে। আর তাতো দুনিয়াতে হাসিল হয়নি এবং ফানা সাব্যস্ত হয়নি। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, আলমে গায়েবের নূরসমূহ ও রহস্য উদ্ভাসিত হওয়ার পরও যদি কারও তমসা ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যের পতন না হয় এবং তা থেকে যদি পবিত্র না হয়– তাহলে সেক্ষেত্রে কী করণীয়? কেউ যদি এরকম বলে যে, সুলুক তো দুনিয়াতেই পূর্ণ করা উচিত। দুনিয়া থেকে যদি কেউ সুলুক পূর্ণ না করে, তবে কবরের সুলুকে আর কী-ই বা উপকারে আসবে। এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যদিও সঙ্গত, তবে মনে রাখতে হবে বিষয়টি আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত। আর আলমে বরযখের হুকুম তো ভিন্ন প্রকৃতির। শায়েখ ইবনুল আরাবী তাঁর কোনো কোনো পুস্তিকাতে উক্ত বিষয়ের সমর্থনে বলেছেন, হজরত সুহায়ল তশতরীকে আমি পেয়েছি, যিনি কোনো একটি মাসআলার বিষয়ে আমার বিপরীত মত পোষণ করতেন। তারপর আমি তাঁর ওফাতের পর তাঁকে (আত্মিকভাবে) এ বিষয়ে তালীম ও তালকীন দেই। পরবর্তীতে হজরত সুহায়ল তশতরীর এলেমের উন্নতি হয়। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

হজরত আনাসের হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, لَوْ عَاشَ اِبْرَاهِيْم كَانَ نَبِيَا (ইব্রাহীম বেঁচে থাকলে নবী হতো)। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, রসুলনন্দন হজরত ইব্রাহীম শিশুকালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি যদি জীবিত থাকতেন, তবে নবী হতেন– একথাটি বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি এবং এর কোনো গুরুত্ব নেই। কেননা এরূপ কথা মূলতঃ এলমে গায়েবের বিষয়ে ধৃষ্টতা প্রদর্শন মাত্র। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, আমি জানি না এ কথার তাৎপর্য কী। হজরত নূহ এর কয়েকজন পুত্রসন্তান ছিলো। কিন্তু কেউ তো নবী হয়নি। প্রকাশ্য কথা এই যে, এ কথাটি কোনো কোনো সলফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে সম্পৃক্ত (মারফু) হয়নি। এর সনদ যখন রসুলেপাক স. পর্যন্ত মারফু হয়েছে বলে বিশুদ্ধতা পায়নি, তখন এ কথার গুরুত্ব তো হ্রাস পাবেই। এটা স্পষ্টতঃ এলমে গায়বের বিষয়ে অতিরঞ্জন। অতঃপর ইবনে আবদুল বার এরূপ বর্ণনাকে অসম্ভব বলে আখ্যা দিয়েছেন।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, রসুলুল্লাহ্র পুত্র ইব্রাহীম যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে অবশ্যই নবী হতেন। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখেননি। কারণ তোমাদের নবী সর্বশেষ নবী। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থকার তাবারী থেকে বর্ণনা করেছেন, এই হাদিস হজরত আনাস নিজে থেকে বলেননি। রসুলেপাক স. থেকে শুনেই বলেছেন, যা ছিলো কেবল হজরত ইব্রাহীম সম্পর্কিত। নতুবা এমনটি হওয়া আবশ্যিক নয় যে, নবীর ছেলে নবীই হবেন। তাঁর দলিল হচ্ছে হজরত নূহ এর পুত্র নবী ছিলেন না। ইমাম নববী থেকে বর্ণিত হয়েছে হাদিসটি কোনো কোনো মুতাকাদ্দেমীন থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনাটি পরিত্যাজ্য। এর দ্বারা গায়েবের বিষয়ে কথা

বলার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়েছে। শায়েখ সাখাভী ও তাঁর 'মাকাসেদে হাসানা' গ্রন্থে ইবনে আবদুল বারের মতো বক্তব্য দিয়েছেন। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী ইমাম নববীর কথার পর বলেছেন, এরকম কথা বিস্ময়কর। কেননা হাদিসটি তিনটি সূত্রপরম্পরায় বিবৃত হয়েছে। তিনি এ সম্পর্কে আরও বলেছেন, সম্ভবতঃ ইমাম নববী'র নিকট হাদিসটির মর্মার্থ প্রকাশ পায়নি। তাই হয়তো তিনি অস্বীকারের দিকে মোড় নিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, শায়েখ সাখাভী উক্ত তিনটি সূত্রপরম্পরা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে– ইবনে মাজা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। হজরত ইব্রাহীম ইবনে রসুলুল্লাহ্‌র যখন ওফাত হলো, রসুলে আকরম স. তাঁর জানাযার নামাজ পড়লেন এবং বললেন, তার জন্য বেহেশতের মধ্যে দুগ্ধদায়িনী নিযুক্ত করা হয়েছে। সে যদি বেঁচে থাকতো তাহলে নবী হতো। এই হাদিসের সূত্রশৃঙ্খলে আবু শায়বা ইব্রাহীম ইবনে ওছমান ওয়াসেতী নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। তিনি বর্ণনাকারী হিসাবে দুর্বল। এই সনদের মাধ্যমে ইবনে মিন্দাহ 'আল মারেফাত' গ্রন্থে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, এটি গরীব (দুর্লভ)। দ্বিতীয় সূত্রপরম্পরায় ইব্রাহীম শাদভী হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকরম স. বলেছেন, ইব্রাহীম (আমার) কোলের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। সে যদি জীবিত থাকতো, তাহলে নবী হতো। তৃতীয় সনদ যা ইমাম বোখারী পর্যন্ত পৌঁছেছে। মোহাম্মদ ইবনে বিসর ইসমাইল ইবনে খালেদকে বললেন, আমি একবার আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে বললাম, তুমি কি নবী করীম স. এর পুত্র ইব্রাহীমকে দেখেছো? তিনি বললেন, তিনি তো শিশুকালে পরলোকগমন করেছেন। একথা যদি নির্ধারিত থাকতো যে, রসুলেপাক স. এর পর তিনি নবী হবেন, তবে রসুলেপাক স. এর সন্তান মৃত্যুবরণ করতেন না। সুতরাং বুঝা গেলো, হাদিসটির সনদ রয়েছে কয়েকটি। যদিও সেগুলো দুর্বল (জয়ীফ) ও দুর্লভ। তাই বলে এরূপ কথা বলা যাবে না যে, কথাগুলো সলফে সালেহীন থেকে এসেছে। অথবা কোনো কোনো মুতাকাদ্দেমীন এরকম বলেছেন। অথবা একথা এলমে গায়েবের বিষয়ে ধৃষ্টতা প্রদর্শন। অবশ্য এই হাদিসের জটিলতা আছে দু'দিক দিয়ে। একটি হচ্ছে, রসুলে পাক স. এর পর নবুওয়াতের ধারা অবশিষ্ট নেই। সুতরাং একথার তাৎপর্য কী যে, ইব্রাহীম জীবিত থাকলে নবী হতেন? জবাবে বলা যায়– 'কাযিয়ায়ে শর্তিয়া' (শর্তযুক্ত বাক্য) দু'তরফের বাস্তবায়নকে অবশ্যম্ভাবী করে না। যেমন কেউ যদি বলে, আনকা যদি বিদ্যমান থাকতো, তাহলে এমন এমন হতো। অথবা যায়েদ যদি গাধা হতো, তাহলে না হক হতো। ঠিক তদ্রূপ বাক্য। যদি সে জীবিত থাকতো তাহলে নবী হতো। কিন্তু তিনি জীবিত থাকেননি, সুতরাং নবীও হননি। অপরটি হচ্ছে– মোলাযেমাত অর্থাৎ বাক্য থেকে যা লাযেম হয়, অর্থাৎ হজরত ইব্রাহীমের নবী হওয়া। এর উত্তর হচ্ছে– এর দ্বারা হজরত ইব্রাহীম যে নবীই হবেন, তা বুঝানো

হয়নি। বরং এর দ্বারা তাঁর শানের প্রশংসা, মহত্ব ও পরিপূর্ণ যোগ্যতার প্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ তিনি যদি জীবিত থাকতেন এবং নবুওয়াতের দরজা বন্ধ না হতো, তাহলে তাঁর মধ্যে যে শান ও যোগ্যতা ছিলো যার ফলে তিনি নবী হতে পারতেন, যে যোগ্যতা রসুলেপাক স. এর অন্য কোনো সন্তানের মধ্যে ছিলো না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সাইয়্যেদে আলম স. এর কন্যাগণ

সাইয়্যেদা যয়নব রা.

রসুলেপাক স. এর কন্যাসন্তানগণের মধ্যে অধিকাংশ আলেমের মতে সর্বজ্যেষ্ঠা ছিলেন হজরত যয়নব রা., আর একথাই বিশুদ্ধ। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থকার বলেছেন, ইমাম কাসায়ীর মতে কথাটি বিশুদ্ধ নয়। আর তিনি বলেছেন, মতভেদ হচ্ছে এ বিষয় নিয়ে যে, হজরত যয়নব এবং হজরত কাসেমের মধ্যে কে প্রথমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে ইসহাকের মতে রসুলেপাক স. এর কন্যা হজরত যয়নবের জন্ম হয়েছিলো আসহাবে ফীলের ঘটনার ত্রিশতম বৎসরে। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং মদীনায় হিজরতও করেছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিলো তাঁর খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে, যার নাম ছিলো আবুল আস ইবনুর রবী ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে আবদুশ্ শামস ইবনে আবদে মানাফ। আবুল আসের মাতা ছিলেন হিন্দা বিনেত খোওয়ায়লেদ সায়্যেদা খাদীজা বিনতে খোওয়ায়লেদের সহোদর বোন। আবুল আস তাঁর কুনিয়াতী নামে মশহুর ছিলেন। তাঁর নাম নিয়ে মতভেদ আছে। লফীয, মুকসিম, কাসেম বা ইয়াসির– এ সব নাম সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, প্রথম অর্থাৎ লফীয নামটি বেশী বিশুদ্ধ। আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেই সাইয়্যেদা যয়নব হিজরত করেছিলেন। তখন আবুল আস শিরিকের মধ্যে ছিলেন। তিনি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রসুলে আকরম স. আবুল আসের প্রথম বিয়েতেই হজরত যয়নবকে সমর্পণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, নতুন বিয়ের মাধ্যমে তাঁকে সোপর্দ করেছিলেন। আবুল আসের ঘটনা এরকম– তিনি বদরযুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। মক্কাবাসীরা যখন আপন আপন বন্দীদেরকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ পাঠিয়েছিলো, তখন রসুলতনয়া হজরত যয়নব তাঁর স্বামী আবুল আসকে মুক্ত করার জন্য তাঁর গলার ওই হারটি পাঠিয়ে দিলেন, যা তাঁর আম্মাজান হজরত খাদীজা কন্যার বিয়ের আকদের সময় জাহিয (উপহার) হিসেবে দান করেছিলেন। রসুলে আকরম স. যখন ওই হারটি দেখলেন, তখন তাঁর প্রিয়তম সহধর্মিণী হজরত খাদীজার কথা মনে পড়ে গেলো। মনে মনে খুবই দুঃখ পেলেন। সাহাবা কেরামকে বললেন, দেখো, তোমরা যদি কোনো উপায় করতে

পারো, তবে যয়নবের কায়েদীকে ছেড়ে দাও এবং ফিদ্‌ইয়ার মাল ফিরিয়ে দাও। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার যা মর্জি আমরা তাই করবো। তারপর রসুলে আকরম স. আবুল আস থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, তিনি যেনো তাঁর কন্যা যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আস অঙ্গীকার করলেন। তারপর রসুলেপাক স. হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা ও অন্য একজন আনসারী সাহাবীকে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন সাইয়্যেদা যয়নবকে নিয়ে আসার জন্য। বললেন, তোমরা মক্কার অভ্যন্তরে পৌঁছবে না। বরং নাজেদ নামক উপত্যকায় অবস্থান করবে। এটি মক্কার বাইরের একটি জায়গার নাম। আয়েশা মসজিদের সামনে যেখান থেকে মক্কাবাসীরা ওমরার এহ্‌রাম বাঁধে। তিনি তাঁদেরকে আরও বললেন, তারা যখন যয়নবকে তোমাদের হাওলা করে দিবে, তখন তোমরা তাকে নিয়ে মদীনায় চলে এসো। এ ঘটনার আড়াই বছর পর আবুল আস ব্যবসার উদ্দেশ্যে মক্কার বাইরে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো মক্কার লোকদের ব্যবসার মালপত্র। সেই তেজারতী কাফেলা মক্কায় প্রত্যাবর্তনকালে রসুল স. এর সাহাবীগণ তাদের অন্বেষণে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা যখন কাফেলাকে কবজা করে ফেললেন, তখন তাঁরা আবুল আসের মালপত্র দখল করে তাকে কতল করে ফেলতে চাইলেন। এ সংবাদ যখন সাইয়্যেদা যয়নবের কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি রসুলেপাক স.কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল ! কোনো মুসলমানের কি কাউকে নিরাপত্তা প্রদানের অধিকার নেই? তিনি স. বললেন, আছে। সাইয়্যেদা যয়নব বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আবুল আসকে আমান দিলাম। সাহাবা কেরাম যখন এ কথা জানতে পারলেন, তখন তাঁরা আবুল আস ও তাঁর মাল থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন। তাঁকে বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। তাহলে এ সকল মাল তোমার জন্য গনিমত হয়ে যাবে। আবুল আস বললেন, আমার লজ্জা করছে। এ মাল দ্বারা আমি আমার দ্বীন-ধর্ম কলুষিত করবো? তারপর তিনি মক্কায় চলে গেলেন এবং মালসমূহ মালিকদের কাছে সমর্পণ করে বললেন, হে মক্কাবাসীরা! আমি কি তোমাদের কাছে তোমাদের মালসমূহ পৌঁছে দিয়ে দায়মুক্ত হয়েছি? তারা বললো, হাঁ। আবুল আস বললেন, তোমরা সাক্ষী থেকো আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। তারপর তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে এলেন। রসুলেপাক স. পূর্বের নিকাহ ঠিক রেখে অথবা নতুন নিকাহ এর মাধ্যমে হজরত যয়নব রা.কে তাঁর কাছে প্রত্যর্পণ করলেন।

এ বিষয়টি নিয়ে উলামা কেরামের মতভেদ আছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করলে দু'জনের মধ্যে বিয়ে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় কিনা? উপরোক্ত ঘটনাই এ মতভেদের মূল কারণ।

রসুলেপাক স. আবুল আসকে খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর প্রতি তিনি ছিলেন খুবই স্নেহশীল। আবু জাহেলের কন্যা খুবই রূপসী ছিলো। হজরত আলী চাইলেন তাকে বিয়ে করতে। এ সংবাদ যখন রসুলেপাক স. এর কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি বিষয়টি অপছন্দ করলেন। তারপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং ভাষণ দিলেন। আবুল আসের প্রশংসা করলেন। তারপর হজরত আলী প্রসঙ্গে বললেন, আলী মুর্তযা যদি আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে সে যেনো ফাতেমা যাহরাকে তালাক দিয়ে দেয়। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীবের কন্যা এবং তাঁর দুশমনের কন্যাকে একত্র করতে চান না। হজরত আলী মুর্তযা একথা শুনে রসুলেপাক স. এর কাছে এসে ওযরখাহী পেশ করে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তা চাইনি এবং এ বিষয়ে কোনো কিছু বলিওনি। অন্য লোকেরা এ রকম চাচ্ছে। রসুলেপাক স. বললেন, হে আলী! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। আমার আশংকা হচ্ছে, তোমার সাথে আমার ভালোবাসার মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি হতে পারে।

সাইয়্যেদা যয়নবের গর্ভে হজরত আবুল আস থেকে এক পুত্র সন্তান আর এক কন্যা সন্তান হয়েছিলো। পুত্রের নাম ছিলো আলী আর কন্যার নাম ছিলো উমামা। কিন্তু পুত্র আলী ইবনে আবুল আস বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছিলেন। রসুলে আকরম স. মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ছওয়ারীর পিঠের পিছনে তাঁকে বসিয়েছিলেন। উমামাকেও তিনি খুব মহব্বত করতেন। একবার রসুলেপাক স. নামাজ পড়ছিলেন। উমামা বসে ছিলেন তাঁর কাঁধের উপর। রুকুতে যাওয়ার সময় তাঁকে মাটিতে নামিয়ে দিতেন। আবার যখন সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কিয়ামের দিকে যেতেন তখন তাঁকে কাঁধের উপর উঠিয়ে নিতেন। এ ঘটনা সম্বন্ধে হাদিস ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। কাঁধের উপর উঠানো আবার কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে দেয়া— এ সব তো আমলে কাছীর, যাতে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। রসুলেপাক স. তা বৈধ করলেন কেমন করে? একথার উত্তর এই যে, হজরত উমামা নিজেই এসে কাঁধের উপর বসতেন আবার নিজেই কাঁধ থেকে নেমে যেতেন। রসুলেপাক স. নিজে থেকে তাঁকে ওঠা-নামা করাতেন না। সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার ওফাতের পর তাঁর ওসিয়ত মোতাবেক হজরত আলী হজরত উমামাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরই গর্ভ থেকে হজরত আলীর সন্তান মোহাম্মদ আওসাত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মোহাম্মদ আকবর এবং মোহাম্মদ আসগরও হজরত আলীর সন্তান। মোহাম্মদ আকবর হচ্ছেন, মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া। আর মোহাম্মদ আসগরের মা হচ্ছেন হজরত আলীর উম্মে ওয়ালাদ (বাঁদী)। তিনি কারবালার প্রান্তরে হজরত ইমাম হুসাইনের সঙ্গে শাহাদতবরণ করেছিলেন।

সাইয়্যেদা যয়নবের ওফাত হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর জীবদ্দশায় অষ্টম হিজরীতে। হজরত সাওদা বিনতে যামআ, উম্মে সালামা, উম্মে আয়মান এবং উম্মে আতিয়া রা. প্রমুখ আনসারী রমণী তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। হজরত উম্মে

আতিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. আমাদের কাছে এমন সময় এলেন, যখন আমরা তাঁর সাহেবজাদীকে গোসল দিচ্ছিলাম। মোহাদ্দেছীনে কেরাম বলেছেন, এখানে সাহেবজাদী বলতে হজরত আবুল আসের স্ত্রী হজরত যয়নব রা.কে বুঝানো হয়েছে। যেমন মুসলিম শরীফে হজরত উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, যখন রসুলুল্লাহ্‌র কন্যা সাইয়্যেদা যয়নব দুনিয়া থেকে বিদায় হলেন, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, তাকে গোসল দাও (আল-হাদীস)। অথবা সাহেবজাদী বলে হজরত উম্মে কুলছুমকে বুঝানো হয়ে থাকবে, যিনি ছিলেন হজরত ওছমান যুন্নুরাইনের স্ত্রী, যেমন ইবনে মাজাতে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই অধিক অবগত।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে এসেছে, হজরত উম্মে আতিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ আমাদের কাছে তশরীফ নিয়ে এলেন, সে সময় আমরা তাঁর সাহেবজাদীকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তাকে তিনবার গোসল দাও অথবা এর চেয়ে বেশী। এক বর্ণনায় আছে, সাতবার। এর উদ্দেশ্য এখতিয়ার দেয়া নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনবারে যদি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়, তবে তাই হবে শরীয়তসম্মত। আর যদি এর অধিক প্রয়োজন হয়, তাহলে পবিত্রতা অর্জিত হওয়া পর্যন্ত (সাত বার পর্যন্ত) ধৌত করা যাবে। তবে একবার ধৌত করা ওয়াজিব। রসুলেপাক স. আরও বললেন, বিশুদ্ধ পানি এবং বরই পাতা মিশানো পানি দ্বারা গোসল দাও। শেষে কর্পুর মালিশ করে দাও। এক বর্ণনায় এসেছে, মেশক মালিশ করে দাও। রসুলেপাক স. বললেন, হে নারীগণ! গোসল দেওয়া শেষ করে আমাকে সংবাদ দিয়ো। তারপর তিনি স. তাঁর লুঙ্গি (সেলাইবিহীন) পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, এর দ্বারা এমনভাবে কাফন পরিধান করাও যেনো তা শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে। এই হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, পুণ্যবানগণের বরকতের জিনিস দ্বারা তাবাররুক গ্রহণ করা মোস্তাহাব।

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বললেন, তাকে তিনবার ধৌত করো অথবা পাঁচবার, অথবা সাতবার। ডান দিক থেকে ওজুর জায়গাসমূহ থেকে গোসল দেয়া শুরু করো। হজরত উম্মে আতিয়া বলেছেন, আমরা তাঁর চুলকে তিনটি বেনী করে দিয়েছিলাম এবং সেগুলো পিছনের দিকে রেখে দিয়েছিলাম। কাফন পরানোর পর জানাযার নামাজ হলো। তারপর তাঁকে দাফন করা হলো। রসুলেপাক স. নিজেই তাঁকে কবরে নামালেন।

সাইয়্যেদা রুকিয়া রা.

রসুলেপাক স. এর দ্বিতীয় কন্যা ছিলেন হজরত রুকিয়া রা.। তাঁর জন্ম হয়েছিলো আসহাবে ফীলের ঘটনার তেত্রিশতম বছরে। সাইয়্যেদা যয়নবের জন্মের তিন বছর পর তাঁর জন্ম হয়েছিলো। যুবায়র ইবনে বুসা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ

বলেছেন, সাইয়্যেদা রুকিয়া রসুলেপাক স. এর সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। জুরজানী ও নাসাবা সম্প্রদায়ের এক জামাত এ কথার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তবে বিশুদ্ধ কথা তাই, যা অধিকাংশ নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন। আর তা হচ্ছে– হজরত যয়নব ছিলেন রসুলেপাক স. এর সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে সাইয়্যেদা রুকিয়ার বিয়ে হয়েছিলো আবু লাহাবের পুত্র উতবার সঙ্গে। তাঁর বোন সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুমের বিয়ে হয়েছিলো উতবার ভাই উতায়বার সঙ্গে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া', 'জামেউল উসুল' ও অন্যান্য গ্রন্থে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। তবে 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বিপরীত বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ হজরত রুকিয়ার বিয়ে হয়েছিলো উতায়বার সঙ্গে, আর হজরত উম্মে কুলছুমের বিয়ে হয়েছিলো উতবার সঙ্গে। উতায়বার ইসলাম গ্রহণ ও সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য হওয়ার বিষয়টি সুপ্রমাণিত। আর রসুলেপাক স. যার সম্বন্ধে বদদোয়া করেছিলেন এবং যাকে বাঘে ছিঁড়ে ফেড়ে খেয়েছিলো, সে ছিলো তাঁর ভাই উতবা।

যখন 'সুরা লাহাব' অবতীর্ণ হলো, তখন আবু লাহাব তার পুত্র উতবাকে বললো, হে উতবা! আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবো– যদি তুমি মোহাম্মদের কন্যাকে তোমার থেকে পৃথক করে না দাও। তখন উতবা তার স্ত্রী সাইয়্যেদা রুকিয়া থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলো।

বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, কুরাইশরা হজরত আবুল আসকেও উত্তেজিত করেছিলো। নবীনন্দিনী সাইয়্যেদা যয়নবকে ছেড়ে দিতে বলেছিলো। আবুল আস বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি রসুলুল্লাহ্‌র কন্যাকে কখনও পৃথক করে দিতে পারবো না। আর তার স্থলে কুরাইশদের অন্য কোনো মেয়েকে আমি গ্রহণ করতেও পারবো না।

তারপর রসুলেপাক স. মক্কাতেই সাইয়্যেদা রুকিয়ার বিয়ে দিলেন হজরত ওছমান যুন্নুরাইনের সঙ্গে। হজরত ওছমান তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দু'টি হিজরত করেছিলেন। প্রথমে হাবশায়। তারপর হাবশা থেকে মদীনায়। রসুলেপাক স. তাঁর প্রশংসায় বলেছেন, নবী লুতের পর এই হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র দিকে হিজরত করেছে। হজরত ওছমান যুন্নুরাইন ছিলেন সুদর্শন এবং সুপুরুষ। দুলাবী বলেছেন, সাইয়্যেদা রুকিয়ার সঙ্গে হজরত ওছমানের বিয়ে হয়েছিলো জাহেলী যমানায়। অন্যান্য নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ইসলামী যুগে তাঁদের বিয়ে হয়েছিলো।

বর্ণিত আছে, সাইয়্যেদা রুকিয়ার যখন ইনতেকাল হলো, তখন রমণীগণ ক্রন্দন করেছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁদেরকে এরকম করতে নিষেধ করেননি। সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরা, সায়্যেদা রুকিয়ার কবরের শিয়রে রসুলেপাক স. এর পাশে বসে কাঁদছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র চাদরের কিনারা দিয়ে তাঁর অশ্রু মুছে দিচ্ছিলেন। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। হজরত রুকিয়ার জন্য যখন শোক প্রকাশ করা হচ্ছিলো, তখন রসুলেপাক স. বলেছিলেন–

ওই আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমার কন্যাকে দাফন করে দিয়েছেন, যা কষ্টকর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা দয়াদ্রচিত্ততা ও কোমলতার কারণে হয়ে থাকে। মৃতের বিদায় হয়ে যাওয়ার কারণে নয়। কেননা তা তো তকদীরে এলাহী অনুসারে হয়ে থাকে। এ সকল বর্ণনা তখনই গ্রহণযোগ্য বলে ধরা হবে, যখন সাইয়্যেদা রুকিয়ার ওফাতকালে, রসুলেপাক স. সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই ছিলো যে, সাইয়্যেদা রুকিয়ার ওফাতকালে তিনি স. ছিলেন বদর যুদ্ধের ময়দানে। সুবিদিত বর্ণনা এরকমই। সুতরাং এ ধারণাটিই প্রবল হয় যে, এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিলো সাইয়্যেদা যয়নব অথবা সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুমের বেলায়। বর্ণনাকারী ধারণাবশতঃ সাইয়্যেদা রুকিয়ার নামে এরকম বলে ফেলেছেন। তাছাড়া উক্ত ঘটনা যদি বাস্তবিকই সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, সাইয়্যেদা রুকিয়ার বেলায়ই এরকম ঘটেছিলো, তাহলে বিষয়টি এমন হতে পারে যে, বদরযুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি স. যখন সাইয়্যেদা রুকিয়ার কবরের পাশে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখনই ওরকম ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো। অবশ্য একটি বর্ণনায় এমনও পাওয়া যায় যে, রসুলেপাক স. সাইয়্যেদা রুকিয়ার ওফাতকালীন সময়ের নিকটবর্তী কোনো এক সময়ে সেখানে তশরীফ নিয়ে এসেছিলেন।

সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুম রা.

সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুম ছিলেন রসুলেপাক স. এর তৃতীয় কন্যা। উতবা বা মতান্তরে উতায়বার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, আসলে তাঁর নাম কী ছিলো, তা জানা যায় না (উম্মে কুলছুম তাঁর কুনিয়াতী নাম বা উপনাম)। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো আমেনা। বর্ণিত আছে, উতবা যখন সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো তখন সে রসুলেপাক স. এর দরবারে এসে বললো, আমি আপনার কন্যাকে অস্বীকার করি। আপনার ধর্ম আমার কাছে পছন্দনীয় নয়। আর আপনিও আমার কাছে প্রিয় ব্যক্তি নন। ওই হতভাগাটি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মন্দ আচরণ করেছিলো। সে রসুলুল্লাহ্‌র পবিত্র কামীস ছিঁড়ে ফেলেছিলো। এক বর্ণনায় এসেছে, সে তখন বলেছিলো, আমি কুফুরী করছি ওই সত্তার সঙ্গে যে নিকটবর্তী হয়েছে, অতঃপর আরও নিকটবর্তী হয়েছে। অতঃপর ধনুকের দু'মাথা পরিমাণ কাছে এসেছে অথবা তারও বেশী নিকটবর্তী হয়েছে। কোরআনে করীমের আয়াতের সঙ্গে কুফুরীর শব্দ মিলিয়ে সে উপহাস করেছিলো (বাংলা অনুবাদক)। বাহ্যতঃ দেখা যায় উতবা উক্ত বাক্য সুরা 'ওয়ান্নাজম' থেকে গ্রহণ করেছিলো। কেননা এই সুরা মক্কা শরীফেই নাযিল হয়েছিলো। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, উক্ত মালউন এতোই গোস্তাখী করেছিলো যে, সে তার নাপাক মুখের থুথু রসুলেপাক স. এর দিকে নিক্ষেপ

করেছিলো। তারপর বলেছিলো আমি রুকিয়াকে তালাক দিয়ে দিলাম। রসুলেপাক স. বললেন, হে আল্লাহ! তুমি এর উপর তোমার কুকুরসমূহ থেকে একটি কুকুর লাগিয়ে দাও। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, আবু তালেব সে সময় মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি জানি না কোন জিনিস তোমাকে মোহাম্মদের বদদোয়ার তীর থেকে রক্ষা করতে পারবে।

একবার ওই অভিশপ্ত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শাম দেশের দিকে যাত্রা করলো। পথিমধ্যে এমন এক জায়গায় সে তাঁবু ফেললো, যেখানে ছিলো হিংস্র প্রাণীর আনাগোনা। আবু লাহাব কাফেলার অন্যান্য লোকদেরকে বললো, আজকের রাতে তোমরা আমাকে সাহায্য করো। কেননা আমি আশংকা করছি মোহাম্মদের বদ দোয়া আমার ছেলের উপর আজ রাতেই হয়তো কার্যকর হবে। তখন কাফেলার সকলেই আপন আপন মালপত্র একত্রিত করলো। একের পর এক মাল স্তুপ করে তার উপর উতবার জন্য শোবার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। তার চর্তুদিকে ঘেরাও করে কাফেলার লোকেরা বসে পড়লো। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। ইতোমধ্যে একটি বাঘ এসে এক এক করে সকলের মুখের ঘ্রাণ নিলো, কিন্তু কাউকে আক্রমণ করলো না। তারপর বাঘটি এক লাফে উতবার উপর উঠে তার থাবা বসিয়ে দিলো। ফেঁড়ে ফেললো তার বুক। এক বর্ণনায় আছে, বাঘটি উতবার ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছিলো।

রসুলে আকরম স. সাইয়্যেদা রুকিয়ার ওফাতের পর সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুমকে হিজরতের তৃতীয় বৎসরে হজরত ওছমানের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জিবরাইল আমাকে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্তায়ালা উম্মে কুলছুমকে ওসমানের সাথে বিবাহ দিতে আদেশ করেছেন।

সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুম হিজরতের নবম বৎসরে ইনতেকাল করেন। রসুলেপাক স. তাঁর নামাজে জানাযা পড়েন। তিনি তাঁর কবরের পাশে বসলেন এবং তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হলো। বললেন, আজ রাতে যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়নি, এমন কেউ কি এখানে আছে? হজরত আবু তালহা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আছি। তিনি স. বললেন, তুমি তাকে কবরে নামাও। কোনো কোনো হাদিস ব্যাখ্যাকার বলেছেন, রসুলেপাক স. এর এরূপ নির্দেশের মধ্যে হজরত ওছমানের প্রতি কোনো বিষয়ে ইঙ্গিত হয়তো ছিলো। কেননা তিনি সেই রাত্রে তাঁর বাঁদীর সাথে সহবাস করেছিলেন। সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুমের দীর্ঘ দিন অসুস্থতার কারণে তিনি অসহ্য হয়ে পড়েছিলেন হয়তোবা।

রসুলেপাক স. সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুমের ইনতেকালের পর হজরত ওছমানকে বলেছিলেন, আমার যদি তৃতীয় আরেকটি কন্যা থাকতো, তাহলে আমি তাকেও তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম। এক বর্ণনায় এসেছে, যদি দশটি কন্যা থাকতো, তাহলে আমি তাদেরকে একের পর এক তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুম বেশ কিছুকাল হজরত ওছমান যুন্নুরাইনের দাম্পত্য জীবনে ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোনো সন্তান হয়নি। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, দু'টি সন্তান প্রসব করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁরা জীবিত থাকেননি। সাইয়্যেদা রুকিয়ার গর্ভ থেকেও কোনো সন্তান হয়নি। হাবশায় প্রথম হিজরতের সময় তাঁর গর্ভ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তারপর তাঁর আর একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো। তাঁর বয়স যখন দু'বছর, তখন একটি মোরগ তার চোখের ভিতর ঠোকর মারে। ওই আঘাতেই তিনি ইনতেকাল করেন। সুতরাং রসুলেপাক স. এর সাহেবজাদীগণ থেকে হজরত ওছমানের কোনো সন্তান ছিলো না। তবে তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণ সন্তান লাভ করেছিলেন। তাঁরা জীবিতও ছিলেন। আল্লাহ্ই উত্তমরূপে জ্ঞাত।

সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহ্‌রা রা.

রসুলেপাক স. এর চতুর্থ ও কনিষ্ঠ সাহেবজাদী ছিলেন সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহ্‌রা। তাঁর জন্ম হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর জন্মের একচল্লিশতম বৎসরে। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এরকম বলেছেন আবু বকর রাযী। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এর নবুওয়াত জাহির হওয়ার পূর্বেই তাঁর সকল আওলাদের জন্ম হয়েছিলো। ব্যতিক্রম ছিলেন হজরত ইব্রাহীম। আবু বকর রাযীর বর্ণনানুসারে সাইয়্যেদা ফাতেমার জন্ম হয়েছিলো নবুওয়াত প্রাপ্তির এক বছর পর। ইবনে জওযী বলেছেন, সাইয়্যেদা ফাতেমার জন্ম হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর নবুওয়াত জাহির হওয়ার পাঁচ বছর পূর্বে। এটাই বিখ্যাত বিবরণ। এক বর্ণনা মতে হজরত ফাতেমা রসুলেপাক স. এর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা। এক বর্ণনানুসারে সাইয়্যেদা রুকিয়া ছিলেন সর্বকনিষ্ঠা। আবার আরেক বর্ণনা মতে সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুম ছিলেন রসুলেপাক স. এর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা।

সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহ্‌রা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের নারীদের নেত্রী। বেহেশতী রমণীদেরও তিনি নেত্রী। তাঁর সাইয়্যেদা উপাধি হওয়ার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাঁকে এবং তাঁকে যারা মহব্বত করবে, তাদের জন্য দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। তাঁর আরেক নাম ছিলো বতুল। বতুল নামকরণের কারণ হচ্ছে, তিনি তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য রমণীদের থেকে অধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত। দ্বীনদারী ও রূপ-সৌন্দর্যে অনন্যা এবং গায়রুল্লাহ্ থেকে অমুখাপেক্ষী। তাঁর আর এক নাম ছিলো যাহ্‌রা। এ নামকরণের কারণ হচ্ছে, তিনি রূপ-সৌন্দর্যে ও কমনীয়তায় পরিপূর্ণ। যাকিয়া ও রাযিয়া তাঁর উপাধি ছিলো। সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহ্‌রার চাল-চলন, সুরত-সীরাত ও কথা-বার্তা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলো। রসুলেপাক স. এর মহিমান্বিত স্বভাব ছিলো– হজরত ফাতেমা

যাহ্রা যখন আগমন করতেন, তখন তিনি তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরতেন। কপালে চুম্বন করতেন এবং নিজের জায়গায় নিয়ে বসাতেন। এমনিভাবে রসুলেপাক স.ও যখন তাঁর কাছে তশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন তিনিও রসুলেপাক স. এর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন, এগিয়ে গিয়ে তাঁর পবিত্র হাত ধরতেন এবং নিজের জায়গায় বসিয়ে দিতেন।

রসুলেপাক স. তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন হজরত আলী মুর্তযার সঙ্গে দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মাসে বদরযুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর। কেউ কেউ বলেছেন, উহুদযুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। তাঁদের বাসর হয়েছিলো জিলহজ্ব মাসে। এক বর্ণনা মতে রজব মাসে। আবার আরেক বর্ণনানুসারে সফর মাসে। বিয়ে সংঘটিত হয়েছিলো আল্লাহ্র হুকুমে ওহীর নির্দেশ অনুসারে। তখন সাইয়্যেদা ফাতেমার বয়স হয়েছিলো পনেরো বছর সাড়ে পাঁচ মাস। আর হজরত আলীর বয়স হয়েছিলো একুশ বছর পাঁচ মাস। সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহ্রার পবিত্র গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, মুহসিন, যয়নব, উম্মে কুলছুম ও রুকিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুম। মুহসিন ও রুকিয়া বাল্যকালেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যয়নবের বিয়ে হয়েছিলো আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের সঙ্গে। আর উম্মে কুলছুমের বিয়ে হয়েছিলো হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের সঙ্গে। সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুমের গর্ভ থেকে হজরত ওমর ফারুকের এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো। তাঁর নাম ছিলো যায়েদ। সহীহ্ হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, ফাতেমা বেহেশতী নারীদের নেত্রী। আর হাসান-হুসাইন বেহেশতী যুবকদের নেতা। হাদিসটি বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। রসুলেপাক স. বলেছেন, ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। যে তাকে কষ্ট দিবে, সে আমাকেই কষ্ট দিবে। আর যে তার প্রতি হিংসা করবে, সে আমার প্রতি হিংসা করবে। রসুলেপাক স. আরও বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা ফাতেমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট হন, আর তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, একবার রসুলুল্লাহ্ স. হজরত আলী ও হজরত ফাতেমাকে আনন্দিতচিত্তে এক বিছানায় বসিয়ে দিলেন। হজরত আলী নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার কাছে কে বেশী প্রিয়, ও না আমি? রসুলেপাক স. বললেন, ও আমার কাছে তোমার চেয়ে বেশী প্রিয়। আবার তুমিও আমার কাছে তার চেয়ে বেশী প্রিয়।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে, যেখানে তিনি বলেছেন, একবার রসুলেপাক স. তাঁর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিলো রেশমী চাদর। একটু পরে সেখানে এলেন হজরত হাসান ইবনে আলী। তিনি তাঁকে তাঁর চাদরের ভিতর নিয়ে নিলেন। এরপর এলেন হজরত হুসাইন ইবনে আলী। তিনি স. তাঁকেও চাদরের ভিতর নিয়ে

নিলেন। তারপর এলেন সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরা এবং হজরত আলী মুর্তযা। রসুলেপাক স. তাঁদেরকেও তাঁর চাদরের ভিতর নিয়ে নিলেন। তখন আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرَ

(হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে)(৩৩ঃ৩৩)। রসুলেপাক স. এই চারজন সম্বন্ধে বলেছেন, যারা এদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। যারা এদের সঙ্গে সন্ধি করবে, আমি তাদের সঙ্গে সন্ধি করবো।

একদিন রাসুলেপাক স. সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার ঘরে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, তিনি উটের পশমের দ্বারা তৈরী মোটা পোশাক পরিধান করে আছেন। রসুলেপাক স. এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। বললেন, ফাতেমা! তুমি দুনিয়ার দারিদ্র ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করো। কিয়ামতের দিন তুমি বেহেশতের নেয়ামত ভোগ করতে পারবে। বর্ণিত আছে, একদিন রসুলেপাক স. সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার পবিত্র বক্ষের উপর হাত রেখে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষুধার কষ্ট থেকে মুক্তি দাও। সাইয়্যেদা ফাতেমা বলেন, তারপর থেকে আমি আর কোনো দিন ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করিনি। হাদিস শরীফে এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

রসুলে পাক স. এর আযাদকৃত গোলাম হজরত ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. যখন সফরে বের হতেন তখন সর্বশেষে বিদায় গ্রহণ করতেন হজরত ফাতেমার কাছ থেকে। আর যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গের মধ্যে সকলের আগে সাক্ষাৎ করতেন তাঁরই সঙ্গে। তারপর মিলিত হতেন তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণের সঙ্গে। হাদিসবেত্তাগণ সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণনা করেছেন, লোকেরা তাঁর কাছে একবার প্রশ্ন করলো, রসুলে আকরম স. এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, সাইয়্যেদা ফাতেমা। লোকেরা আবার প্রশ্ন করলো, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন, তাঁর স্বামী। এই বর্ণনাটিতে প্রকাশিত হয়েছে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতা। আর আহলে বাইতের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততার পরিচয়। অপর এক হাদিসে এসেছে, লোকেরা হজরত ফাতেমা যাহরার কাছে জিজ্ঞেস করলো, রসুলেপাক স. এর নিকট কোন ব্যক্তি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, আয়েশা সিদ্দীকা। লোকেরা প্রশ্ন করলো পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন, তাঁর পিতা। দু'টি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সকলেই প্রিয় ছিলেন। তবে প্রেক্ষিত ছিলো ভিন্ন ভিন্ন।

ইমাম হাসান বর্ণনা করেছেন, আমি আমার সম্মানিত আম্মাজান সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরাকে দেখেছি, তিনি গৃহাভ্যন্তরে নির্মিত নামাজের জায়গায় রাতভর

নামাজ পড়তেন। এমনকি সোবেহ্ সাদেক হয়ে যেতো। তার আগ পর্যন্ত তিনি নামাজে মশগুল থাকতেন। আর আমি তাঁকে মুসলমানদের এবং মুসলমান নারীদের ব্যাপারে অনেক বেশী দোয়া করতে শুনেছি। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের জন্য কোনো দোয়া করতেন না। আমি তখন বলতাম, হে দয়াময়ী আম্মাজান ! আপনি আপনার নিজের জন্য কোনো দোয়া করেন না, কারণ কী? তিনি বলতেন, হে আমার পুত্র! প্রথমে প্রতিবেশী তারপর স্বগৃহ।

হজরত ওমর ফারুক বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন সাইয়্যেদা ফাতেমার ঘরে পৌঁছে তাঁকে বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! হে ফাতেমা! আমি রসুলুল্লাহ্‌র নিকট আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কাউকে দেখিনি। আল্লাহ্‌র শপথ করে আরও বলছি, আপনার মহান পিতার পর আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিকতর প্রিয় আর কেউ নন।

আহলে বাইতে আতহারের (পবিত্র পরিবারবর্গের) মর্যাদা অগণিত। কিছুতো সামগ্রিকভাবে আহলে বাইতের জন্য। আর কিছু হচ্ছে খাস করে হজরত ইমাম হাসান-হুসাইন-আলী-ফাতেমার জন্য। এখানে যেহেতু হজরত ফাতেমার বিষয়ে আলোচনাই উদ্দেশ্য, তাই তাঁর আলোচনার উপরই বর্ণনা সংক্ষেপ করা হলো। আহলে বাইতের মর্যাদা অনুধাবনের জন্য এই আয়াতে কারীমা ও তার ব্যাখ্যাই যথেষ্ট। যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেছেন– 'ইন্নামা ইউরীদুল্লহু লিইউয্‌হিবা আনকুমুর রিজ্‌সা' (আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে)(৩৩ঃ৩৩)।

সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার তিরোধান

সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার তিরোধান ঘটেছিলো এগারো হিজরীর রমজান মাসের তিন তারিখ মঙ্গলবার রাতে। রসুলুল্লাহ্ স. এর মহাতিরোধানের ছয়মাস পর। এই মতটিই বিশুদ্ধ। এ ছাড়া আরও কয়েকটি মত আছে– সেগুলো বিশুদ্ধতার স্তর থেকে দূরে। জান্নাতুল বাকীতে রাতের বেলায় তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো। এক বর্ণনা অনুসারে তাঁর জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন হজরত আলী রা.। আরেক বর্ণনা মতে হজরত আব্বাস রা.। পরের দিন হজরত আবু বকর সিদ্দীক, হজরত ওমর ফারুক ও অন্যান্য সাহাবী এসে হজরত আলীর কাছে অনুযোগ করলেন, আমাদেরকে কেনো খবর দেয়া হলো না? আমরাও তাঁর জানাযায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতাম। হজরত আলী বললেন, আমি ফামেতার ওসিয়ত পালনার্থে এরকম করেছি। ফাতেমা বলেছিলো, আমি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব, তখন রাতের বেলায় আমাকে দাফন করবেন, যাতে গায়ের মুহার্‌রমদের দৃষ্টি আমার জানাযার প্রতি না পড়ে। বিখ্যাত বর্ণনা এরকমই। তবে 'রওজাতুল আহবাব' ইত্যাদি গ্রন্থের বিবরণসমূহ থেকে জানা যায়, হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. তাঁর জানাযায় এসেছিলেন এবং তিনি জানাযার

নামাজ পড়িয়েছিলেন। তাছাড়া হজরত ওছমান ইবনে আফফান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং যুবায়ের ইবনে আওয়ামও জানাযায় শরীক হয়েছিলেন।

সাইয়্যেদা ফাতেমা রা.কে কোথায় দাফন করা হয়েছিলো, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, তাঁর চিরনিদ্রাস্থল হচ্ছে বাকীর গোরস্থানে হজরত আব্বাসের কোব্বায়, যেখানে আহলে বাইতগণ শায়িত আছেন (এখন সে কুব্বা আর নেই। জান্নাতুল বাকী'র সমস্ত মাজার ও কুব্বাসমূহের চিহ্ন বে-আদব নজদী ওহাবীরা তাদের ক্ষমতার দাপটে ১৩৪৩ হিজরীতে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে (অনুবাদক)। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তাঁকে তাঁর গৃহেই দাফন করা হয়েছিলো, যা এখন মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জানাযা ঘরের বাইরে বের করা হয়নি। এখনও সে স্থানেই তাঁকে জিয়ারত করার বিষয়টি সুবিদিত। আরেকটি মত রয়েছে– তাঁর মাজার শরীফ রয়েছে জান্নাতুল বাকীর মসজিদে, যাকে বলা হয় কুব্বায়ে আব্বাসী। আর তা হচ্ছে পূর্ব দিকে। ইমাম গাযযালী জান্নাতুল বাকী জিয়ারতের ক্ষেত্রে মসজিদটির নাম উল্লেখ করেছেন এবং সেই মসজিদে নামাজ পড়ার ওসিয়ত করেছেন (অবশ্য সে মসজিদ বর্তমানে নেই (অনুবাদক)। তিনি বলেছেন, ওই স্থানটিকে 'বাইতুল হুযন' বলা হয়। কেননা সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরা রা. রসুল পাক স. এর বিচ্ছেদবেদনার সময় মানুষের সাহচর্য বর্জন করে নির্জনে অবস্থান করতেন। আরও বলা হয়ে থাকে, হজরত আলী জান্নাতুল বাকীতে হজরত ফাতেমার জন্য একখানা ঘরও তৈয়ার করেছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম। তবে প্রথমোক্ত মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ– খবর ও আছারের অনুকূল।

মাসউদী 'মুরাযুয্ যাহাব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইমাম হাসান, ইমাম যয়নুল আবেদীন, ইমাম মোহাম্মদ বাকের এবং ইমাম জাফর সাদেকের কবর স্থানে একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছিলো। তাতে লেখা ছিলো–

هٰذَا قَبْرِفَاطِمَةُ بِنْتِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ وَ سَيِّدُ نِسَاءِ الْعَلَمِيْنَ وَقَبْرِ الْحَسَنَ بْنِ عَلِيْ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيْ وَ جَعْفَرُ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمْ وَاَلتَّحِيَّتُه وَالسَّلَامَ -

(হাযা ক্ববরি ফাতিমাতু বিনতি রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সায়্যিদু নিসাইল আলামীন ওয়া ক্ববরি হাসান ইবনিল আলী ইবনি হুসাইন ইবনি আলী ওয়া জাফর ইবনি মুহাম্মদ আলাইহিম ওয়াত্তাহিয়্যাতাহু ওয়াস্ সালাম)। এই শিলালিপিটি আবিস্কৃত হয়েছিলো ৩৩০ হিজরীতে। ইমামুল মুসলেমীন সাইয়্যেদুল হাসান ইবনে আলীর দাফন সংক্রান্ত বিষয়ে বর্ণিত আছে, তিনি ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন, মানুষ যদি ভীড় সৃষ্টি না করে, তবে আমাকে যেনো রসুলেপাক স. এর পাশে দাফন করা হয়। অন্যথায় জান্নাতুল বাকীতে আমার মাতা সাইয়্যেদা ফাতেমার পাশে যেনো দাফন করা হয়। তাঁর কবর শরীফের জন্য এ দু'টি

জায়গাই তাঁর কাছে পছন্দনীয় ছিলো। মুহিববে তাবারী 'যাখায়েরুল উকবা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, একজন পুণ্যবান ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছেন, তিনি আমাকে জানিয়েছেন, শায়েখ আবুল আস মুরসী, যিনি শায়েখ আবুল হাসান শাযলীর শাগরিদ ছিলেন, তিনি একবার বাকীর গোরস্থান জিয়ারত করেছিলেন। তিনি হজরত আব্বাসের কুব্বার সামনে অগ্রসর হয়ে সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার উপর সালাম পড়েছিলেন। বলেছিলেন, সেখানেই সাইয়্যেদা ফাতেমার কবর তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছে। আর এ কাশফটি শায়েখ শাযলীর একটি বড় কারামত ছিলো। শায়েখ আবুল আস মুরসী বলেছেন, শায়েখ শাযলীর প্রতি দীর্ঘদিন ধরে আমার যে আকীদা ছিলো, আমি তার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। পরবর্তীতে ইমাম হাসানের ওফাত সম্পর্কে ইবনে আবদুল বার যে বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনাটির উপর যখন শায়েখ শাযলীর কাশফের খবর পেলাম, তখন তাঁর প্রতি আমার এতেক্বাদ আরও বেড়ে গেলো। শায়েখ আবুল আস বলেছেন, আমার নিকট ওই হাদিসের বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত হলো, শায়েখ শাযলীর কাশফের সত্যতাও সাব্যস্ত হলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. এর পুত পবিত্রা স্ত্রীগণ

প্রকাশ থাকে যে, রসুলেপাক স. এর নিকট পার্থিব উপকরণসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিলো তাঁর পুত পবিত্রা স্ত্রীগণ। তিনি তাঁদেরকে খুবই ভালবাসতেন।

জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, রসুলে আকরম স.কে ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন পুরুষের সমান শক্তি দান করা হয়েছিলো। তাই তাঁর জন্য বৈধ ছিলো তিনি যতো জন স্ত্রী চাইবেন, ততোজনকে গ্রহণ করতে পারবেন। এখানে আরেকটি বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বিয়ের মধ্যে বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। যেমন বংশ রক্ষা, মানব জাতিকে রক্ষা করা, দৈহিক ও মানসিক আস্বাদ উপভোগ করা, আল্লাহ্‌র দেওয়া নেয়ামত থেকে উপকৃত হওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি। বীর্যকে অবরুদ্ধ রাখা অনেক সময় কঠিন রোগের কারণ হয়ে থাকে। এতে দৈহিক দুর্বলতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শৈথিল্য সৃষ্টি হয়। যৌনশক্তির উজ্জীবন ও বীরত্ব প্রকাশ করে এবং তা প্রশংসনীয়ও। কিন্তু তার নিষিদ্ধ পদ্ধতি প্রকাশ করে খর্বতা, তাচ্ছিল্য ও পাপ। এ ধরনের দুর্বলতা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত। স্ত্রীগণের প্রতি ভালোবাসা এবং একাধিক স্ত্রী গ্রহণ মানব জাতির ব্যক্তি বিশেষের পূর্ণতর অবস্থার পরিচায়ক। হজরত ঈসা ও হজরত ইয়াহইয়া ব্যতীত সকল নবী একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। অনেক সন্তানের অধিকারীও ছিলেন তাঁরা। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহীম খলীল দৈনিক তাঁর বোরাকে আরোহণ করে স্ত্রীমিলনের অধীর আগ্রহ নিয়ে শাম দেশ থেকে মক্কা মুকাররমায় বিবি হাজেরার কাছে যেতেন। স্ত্রীর প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা থাকার কারণে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে তিনি থাকতে

পারতেন না। হজরত দাউদের নিরানব্বই জন স্ত্রী ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি আরেকজনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। স্ত্রীর সংখ্যা একশ পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। হজরত সুলায়মানের ছিলো তিনশত জন স্ত্রী এবং একহাজার ক্রীতদাসী। তিনি এক রাত্রে একশ জনের কাছে যেতেন।

বোখারী শরীফে হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. এক রাতে তাঁর সকল বিবিগণের কাছে যেতেন। তখন তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা ছিলো এগারো। এক বর্ণনায় আছে নয়জন। আল্লাহ্পাকের দেয়া নেয়ামত প্রকাশার্থে তিনি বলেছিলেন, তাঁকে তিরিশ জন পুরুষের সমান শক্তি দেয়া হয়েছে। তাউস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁকে চল্লিশজন পুরুষের সমান শক্তি দেয়া হয়েছিলো। মুজাহিদ থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, দেয়া হয়েছিলো চল্লিশজন বেহেশতী যুবকের শক্তি। যথাসূত্রসম্বলিত বিবরণে এসেছে, প্রত্যেক বেহেশতী যুবক পানাহার ও যৌনশক্তিতে পৃথিবীর একশত পুরুষের সমান শক্তিশালী। সুতরাং রসুলেপাক স. এর জন্য বৈধ ছিলো, তিনি যতোজনকে চাইবেন, ততোজনকেই বিবাহ করতে পারবেন। এদ্বারা তাঁর মর্যাদার পূর্ণতা এবং অন্য সকল পুরুষ থেকে তাঁর বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

রসুলেপাক স. এর অধিক স্ত্রী গ্রহণের হেকমত এই ছিলো যে, তিনি মহিলাদের অভ্যন্তরীণ ও গোপনীয় বিধানসমূহ উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে বিবিগণকে ব্যবহার করতেন। তাঁরা সে বিষয়গুলো উম্মতের কাছে মহিলা অঙ্গণে বর্ণনা করতেন। অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করা, ভালো ব্যবহার করা ও বিবিগণকে সঙ্গতা প্রদান করতে যেয়ে সহিষ্ণুতা রক্ষা করা– আর এসকল কিছুর মধ্যেই রয়েছে নবুওয়াতী জীবনের স্বার্থকতা।

নবী সুলায়মানের ফযিলত সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, তাতে রসুলেপাক স. এর উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। কেননা রসুলে আকরম স. এর কামালত ও ফযিলত এতো অধিক যে, সকল নবীর ফাযায়েলকে একত্র করলেও তাঁর ফযিলতই সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। প্রকৃত অবস্থা ছিলো এরকম– হজরত সুলায়মান আল্লাহ্তায়ালার কাছে এমন বাদশাহী চেয়েছিলেন, যা অন্য কারো পক্ষে লাভ করা সম্ভব না হয়। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাঁকে এমন কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন, যা অন্য কাউকে দেননি– যেমন বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দেয়া এবং জ্বীন জাতিকে তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য করে দেয়া ইত্যাদি। হজরত সুলায়মান একজন নবী ছিলেন। তিনি বাদশাহও ছিলেন। আর এ সব ছিলো তাঁর মোজেযার অন্তর্ভুক্ত।

হাদিস শরীফে এসেছে, আমাদের নবীকে বলা হয়েছিলো আপনি নবী-বাদশাহ হতে চান কিনা? না, হতে চান নবী-বান্দা। রসুলেপাক স. তখন বন্দেগীকেই গ্রহণ করেছিলেন। বাদশাহ হওয়াকে তিনি পছন্দ করেননি। তার মানে এই যে, বন্দেগী

বাদশাহীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা রসুলে আকরম স.কে মানবতার সীমায়, দারিদ্র ও বন্দেগীর উপর কায়েম রেখেছিলেন। আর হজরত সুলায়মানকে সুলতানাত, বাদশাহী, অধিক সংখ্যক স্ত্রী, হাওয়ার উপর ভর করে সিংহাসন উড়ে যাওয়া ও জ্বিন জাতিকে বশ করা ইত্যাদি মোজেযা সহকারে নবুওয়াত দান করেছেন। আর এ সব কিছুই ছিলো বাহ্যিক শক্তি। কিন্তু আমাদের নবীর শক্তি, সৃষ্টির প্রতি প্রভাব, আল্লাহ্তায়ালার দরবারে সম্মান ও নৈকট্য ছিলো তাঁর তুলনায় অনেক বেশী। রসুলেপাক স. এর শক্তি-ক্ষমতা ও নেয়ামতের শুকরিয়া ছিলো সুলাইমান আ. এর তুলনায় অধিক পরিপূর্ণ। বিষয়টি অনুধাবন করতে গেলে একটি হাদিসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় যেখানে বলা হয়েছে– একবার এক দুষ্ট জ্বিন রসুলে আকরম স. এর কাছে এলো। উদ্দেশ্য সে তাঁর নামাজের মধ্যে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করবে। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে চাইলাম। ভাবলাম, তাহলে মদীনার কিশোরেরা তাকে নিয়ে খেলা করতে পারবে। কিন্তু আমার ভাই সুলায়মানের একটি দোয়ার কথা আমার মনে পড়ে গেলো। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। এ কথার অর্থ জ্বিন জাতির উপর আমার শক্তি ও ক্ষমতা আছে ঠিকই, কিন্তু এ ক্ষমতা যেহেতু নবী সুলায়মানের একটি বিশেষত্ব, তাই আমি একাজ থেকে নিবৃত্ত হলাম।

রসুলেপাক স. রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে বিবিগণকে সমতা প্রদান করতেন। পালাক্রমে রাত্রিযাপন, খাদ্য ও বাসস্থানের হক আদায় করা, অন্যান্য অধিকার প্রদান ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সমতা প্রদান করতেন– যতোটুকু তাঁর ক্ষমতার মধ্যে থাকতো। কিন্তু মহব্বতের বেলায় বলতেন, হে আল্লাহ! এই যে বণ্টন ব্যবস্থা ও ইনসাফ করা তা ওই সকল বিষয়ে, যা আমার শক্তি ও এখতিয়ারভূত। আর যে বিষয়ে আপনি আমাকে মালিক বানাননি, সে ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করবেন না। মহব্বত ও সহবাস বিষয়ে আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের (রসুলেপাক স. এর পবিত্র স্ত্রীগণের) মধ্যে সমতা বিধান করা এবং তার প্রতি লক্ষ্য রাখা রসুলেপাক স. এর উপর ওয়াজিব ছিলো কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। সমতা বিধান করা তাঁর উপর ওয়াজিব ছিলো, নাকি তা তাঁর নিছক ফযল, অনুগ্রহ ও ব্যক্তিত্ববোধ বা তাঁদেরকে খুশি করার জন্যই করতেন? ইমাম আবু হানীফা দ্বিতীয় মতটি পোষণ করেছেন। তৎসত্ত্বেও তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. তাঁর বিবিগণের হকের প্রতি এতোবেশী লক্ষ্য রাখতেন যে, মনে হতো তা তাঁর উপর ওয়াজিব। কিন্তু মূলতঃ ওয়াজিব ছিলো না। নিছক দয়া, ভালোবাসা ও অনুগ্রহের কারণেই তিনি এরূপ করতেন। আল্লাহ্পাকই প্রকৃত তত্ত্বের পরিজ্ঞাতা।

আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের সঙ্গে রসুলে আকরম স. এর আচার ব্যবহার খুবই উত্তম ছিলো। তিনি এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই উত্তম, যে তার স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনের সঙ্গে আচার ব্যবহারে উত্তম। তিনি যখন সফরে যাওয়ার

সিদ্ধান্ত নিতেন, তখন বিবিগণের মধ্যে লটারী দিতেন। লটারীতে যাঁর নাম উঠতো তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়েই সফরে যেতেন। রসুলে আকরম স. এর স্ত্রীগণকে আল্লাহ্তায়ালা মুমিনদের জননী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ঘোষণা তাঁদেরকে বিয়ে করা হারাম এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁদেরকে দেখা এবং নির্জন অবস্থান প্রসঙ্গে নয়। তৎসত্ত্বেও তাঁর কন্যাগণ মুসলমানদের ভগ্নিতুল্য হবেন না। তাঁর মাতা ও পিতা মুসলমানদের দাদী ও দাদা হওয়ার হুকুম রাখেন না। তাছাড়া তার বোন ও ভাইগণ মুসলমানদের খালা ও মামা হিসেবে গণ্য হবেন না। রসুলেপাক স. কোনো পুরুষ বা নারীর জন্য পিতার হুকুমেও নন। আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের মর্যাদা উম্মতের সকল রমণীর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের পুরস্কার ও তিরস্কারও উম্মতের তুলনায় দ্বিগুণ। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন সাইয়্যেদা খাদীজাতুল কুবরা এবং সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা। এই দু'জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, সে নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। এ সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা করা হবে যথাস্থানে, ইনশাআল্লাহ্।

রসুলেপাক স. এর স্ত্রীগণের সংখ্যা ও তাঁদের ক্রমধারা নিয়ে উলামা কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। যাঁরা রসুলেপাক স. এর পূর্বে ইনতেকাল করেছিলেন, যাঁরা রসুলেপাক স. এর পর ইনতেকাল করেছিলেন, যাঁদের সঙ্গে দুখুল (বাসর) হয়েছিলো, যাঁদের সঙ্গে দুখুল হয়নি, যাঁদেরকে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিলেন, কিন্তু বিয়ে হয়নি, যাঁরা রসুলেপাক স. এর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছিলেন– তাঁদের সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের মধ্য হতে যাঁদের বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে তাঁদের সংখ্যা এগারো। তন্মধ্যে ছয়জন ছিলেন কুরাইশ বংশের। তাঁরা হচ্ছেন ১. সাইয়্যেদা খাদীজাতুল কুবরা ২. সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক ৩. সাইয়্যেদা হাফসা বিনতে ওমর ফারুক ৪. সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান, ৫. সাইয়্যেদা উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া ৬. সাইয়্যেদা সাওদা বিনতে যামআ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা। চারজন ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত, তবে কুরাইশ বংশীয়া নন। তাঁরা হচ্ছেন ১. সাইয়্যেদা যয়নব বিনতে জাহাশ, ২. সাইয়্যেদা মায়মুনা ৩. সাইয়্যেদা যয়নব বিনতে খুযায়মা ৪. সাইয়্যেদা জুওয়ায়রিয়া বিনতে হারেছ রদ্বিয়াআল্লাহু আনহুমা। আর একজন ছিলেন অনারব। তিনি ছিলেন বনী ইসরাইল বংশের। তাঁর নাম সাফিয়া বিনতে হুয়াই। তিনি ছিলেন বনী নাযীর গোত্রের। রসুলেপাক স. এর সামনেই যাঁরা দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন দু'জন। হজরত খাদীজাতুল কুবরা রা. এবং হজরত যয়নব বিনতে খুযায়মা রা.। রসুলেপাক স. এর মহাপ্রস্থানের কালে তাঁর নয়জন স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেন। এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই।

মুমিন জননী খাদীজাতুল কুবরা রা.

রসুলেপাক স. সর্বাগ্রে বিয়ে করেছিলেন সাইয়্যেদা খাদীজাতুল কুবরাকে। যতোদিন পর্যন্ত তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, ততোদিন পর্যন্ত তিনি স. অন্য কাউকে বিয়ে করেননি। উম্মুল মুমিনীন হজরত খাদীজাতুল কুবরার নসবনামা এরকম– খাদীজা খোয়ায়লেদের কন্যা, তিনি আসের পুত্র, তিনি আবদুল উয্যার পুত্র, তিনি কুসাইয়ের পুত্র, তিনি কেলাবের পুত্র, তিনি মুররার পুত্র, তিনি কাআবের পুত্র, আর তিনি লুওয়াইয়ের পুত্র। সাইয়্যেদা খাদীজাতুল কুবরার নসব রসুলেপাক স. এর নসব শরীফে মিলিত হয়েছে কুসাই এর সঙ্গে। রসুলেপাক স. কুসাইয়ের আওলাদ থেকে হজরত খাদীজা এবং হজরত উম্মে হাবীবা ছাড়া আর কাউকেই কামনা করেননি। তাঁর উপনাম ছিলো উম্মে হিন্দা। তাঁর মাতা ছিলেন ফাতেমা বিনতে যাহেদাহ ইবনে আসাম। বনী আমের লুওয়াই গোত্রের লোক ছিলেন। প্রথমে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো আবু হালা ইবনে নিয়াস ইবনে যুরারাহ নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে। তার ঔরসে দু'টি সন্তান হয়েছিলো তাঁর। একজনের নাম হিন্দা। অপরজনের নাম হালা। তারপর তাঁর বিয়ে হয়েছিলো আতীফ ইবনে আয়েব মাখযুমীর সঙ্গে। তাঁর ঘর থেকে তাঁর এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো। তাঁর নাম ছিলো হিন্দা। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এক ছেলে ও এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলো। তার পরে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আর তাঁর কন্যা হিন্দা রসুলেপাক স. এর রবীবা ছিলেন। বিয়ের সময় হজরত খাদীজাতুল কুবরার বয়স ছিলো চল্লিশ বছর। আর রসুলেপাক স. এর বয়স হয়েছিলো পঁচিশ বছর। অপর এক বর্ণনামতে একুশ বছর। তবে প্রথম মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। কেউ কেউ তেইশ বছরও বলেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম (আল্লাহ্পাকই ভালো জানেন)।

সাইয়্যেদা খাদীজা ছিলেন বুদ্ধিমতী, মহীয়সী। জাহেলী যুগে লোকেরা তাঁকে তাহেরা বলে ডাকতো। তিনি ছিলেন উচ্চ বংশীয়া এবং বিত্তবতী। আবু হালা আতীকের পর কুরাইশ বংশের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর পানিপ্রার্থী হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেননি। তিনি নিজেই রসুলেপাক স. এর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. এ বিষয়ে তাঁর চাচাগণের সঙ্গে আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর চাচা হজরত হামযাকে সঙ্গে নিয়ে খোওয়ায়লেদ ইবনে আসাদের কাছে গেলেন এবং বিবাহের পয়গাম দিলেন। রসুলেপাক স. এর সঙ্গে তাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো। সাইয়্যেদা খাদীজাকে মহরস্বরূপ দেয়া হয়েছিলো ঊনত্রিশটি জওয়ান উট। এক বর্ণনায় আছে, বারো আওকিয়া স্বর্ণ।

নবীজীবনীরচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, সাইয়্যেদা খাদীজাতুল কুবরা স্বপ্নে দেখেছিলেন, আসমানের সূর্য তাঁর ঘরে নেমে এসেছে এবং তার আলো ঘর থেকে

বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে। এমন কী মক্কা মুকাররমার এমন কোনো ঘর অবশিষ্ট রইলো না, যেখানো আলো উদ্ভাসিত হলো না। ঘুম ভাঙলে তিনি আপন চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গিয়ে স্বপ্নের কথা বললেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন, আখেরী জমানার নবীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

সাইয়্যেদা খাদীজাই প্রথম রমণী, যাঁর কাছে সর্বপ্রথম ইসলামের হাকীকত উদ্ভাসিত হয়েছিলো এবং তিনিই সর্বপ্রথম রসুলেপাক স. এর উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি রসুলেপাক স. এর সন্তুষ্টিতে ব্যয় করেছিলেন। হজরত ইব্রাহীম ছাড়া রসুলেপাক স. এর সকল পুত্র ও কন্যা হজরত খাদীজাতুল কুবরার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে চব্বিশ বা পঁচিশ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। হিজরতের পাঁচ বৎসর বা তিন বৎসর পূর্বে তিনি পরলোকগমন করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো পঁয়ষট্টি বৎসর। রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির দশম বছরে রমজান মাসে তাঁর ওফাত হয়েছিলো। জুহুন নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। রসুলেপাক স. নিজেই তাঁর কবরে প্রবেশ করেছিলেন এবং দোয়া খায়ের করেছিলেন। তখনও জানাযার নামাজ পড়ার শরীয়তসম্মত রীতি চালু হয়নি। রসুলেপাক স. হজরত খাদীজার মৃত্যুতে খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁর তিরোধানের বছরকে 'আমুল হুযন' বা দুশ্চিন্তার বছর নামে আখ্যায়িত করা হয়। হজরত খাদীজার অনেক ফযিলত ও মর্যাদা রয়েছে। তবে তাঁর মর্যাদায় এতোটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার মতো মহীয়সী রমণী তাঁর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। নবীজীবনীপ্রণেতাগণ বর্ণনা করেছেন, কুরাইশ বংশের কাফেরদের মিথ্যা অপবাদের জ্বালায় রসুলেপাক স. যখন চিন্তিত ও অস্থির হয়ে মনে মনে কষ্ট পেতেন, তখন সাইয়্যেদা খাদীজাকে দেখা মাত্রই তাঁর মনের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যেতো। তিনি তখন আনন্দিত হয়ে যেতেন। রসুলেপাক স. যখন সাইয়্যেদা খাদীজাতুল কুবরার কাছে তশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন তিনি তাঁর মানোরঞ্জনে সচেষ্ট হতেন। তাতে সমস্ত মুশকিল তাঁর কাছে আসান হয়ে যেতো।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুলে করীম স. এর কাছে এসে হজরত জিব্রাইল নিবেদন করলেন, হে মোহাম্মদ! আপনার কাছে হজরত খাদীজা দস্তরখান নিয়ে আসছেন, যার মধ্যে পানাহারের আয়োজন আছে। তিনি এলে আপনি তাঁকে রবের সালাম বলবেন। আর আমার পক্ষ থেকে তাঁকে এই সুসংবাদ দিবেন যে, বেহেশতের মধ্যে তাঁর জন্য মোতির একটি ঘর আছে। সেখানে কোনো শোর-গোল থাকবে না এবং থাকবে না কোনো দুঃখ-কষ্ট। আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আদম বলেছেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আমি মানব জাতির সরদার হবো। তবে নবীগণের মধ্যে আমার বংশ থেকে একজন হবেন, যার পবিত্র নাম

হবে আহমদ। তিনি দু'বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী মর্যাদাবান হবেন। তন্মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে, তাঁর স্ত্রী হবেন তাঁর সৎকর্মের সহযোগিনী। আর আমার স্ত্রী আমাকে ভুল পথে প্ররোচনা দিয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়েছিলো। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর হামযাদ শয়তানের উপর তাঁকে সাহায্য করেছেন এবং সে মুসলমান হয়ে গিয়েছে। আর আমার হামযাদ শয়তান কাফেরই রয়ে গেছে। মসনদে ইমাম আহমদ কিতাবে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, বেহেশতী রমণীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাইয়্যেদা খাদীজা বিনতে খোয়ায়লেদ, সাইয়্যেদা ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ স., হজরত মরিয়ম বিনতে ইমরান এবং ফেরাউনের স্ত্রী হজরত আসিয়া। ওলিউদ্দীন ইবনুল ইরাকী বলেছেন, বিশুদ্ধ মতানুসারে সাইয়্যেদা খাদীজাতুল কুবরা মুমিন জননীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ বলেছেন, সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা শ্রেষ্ঠ। শায়েখুল ইসলাম জাকারিয়া আনসারী তাঁর 'লাহজা' পুস্তকে বলেছেন, আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন সাইয়্যেদা খাদীজা এবং সাইয়্যেদা আয়েশা। তবে তাঁদের দু'জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইবনে এমাদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সাইয়্যেদা খাদীজাই শ্রেষ্ঠ। কেননা এ বিষয়টি সুসাব্যস্ত যে, রসুলেপাক স.কে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সাইয়্যেদা খাদীজার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন। একথা দ্বারা তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছিলেন এবং নিজেকে সাইয়্যেদা খাদীজার উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। উত্তরে রসুলেপাক স. বলেছিলেন, না। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে খাদীজার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেননি। কেননা সাইয়্যেদা খাদীজা আমার উপর ইমান এনেছিলো ওই সময়, যখন মানুষ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। সে তার সহায় সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করেছিলো এমন সময়, যখন লোকেরা আমাকে বঞ্চিত করতো। ইবনে দাউদকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, তাঁদের দু'জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, সাইয়্যেদা খাদীজা রা.। হজরত আয়েশা তার সালাম রসুলের মাধ্যমে জিবরাইলের নিকট পাঠিয়েছেন। আর হজরত খাদীজা রা.কে আল্লাহ্‌তায়ালা জিবরাইলের মাধ্যমে রসুলেপাক স. এর জবানীতে সালাম পাঠিয়েছিলেন। এ হিসেবে সাইয়্যেদা খাদীজা রা. অধিকতর উত্তম। তারপর ইবনে দাউদকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা এবং হজরত ফাতেমা যাহরা– এ দু'জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ইবনে দাউদ বলেছিলেন, নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেউই রসুলেপাক স. এর কলিজার টুকরার সমতুল্য হতে পারে না। আমার এ কথার সাক্ষী রসুলেপাক স. এর এই বাণী– তিনি হজরত ফাতেমাকে বলেছিলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি মরিয়ম ব্যতীত বেহেশতের সকল রমণীদের নেত্রী! যাঁরা হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.কে প্রাধান্য

দিয়ে থাকেন, তাঁরা এই প্রমাণটিই দিয়ে থাকেন যে, সাইয়্যেদা আয়েশা আখেরাতে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে থাকবেন। আর সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরা থাকবেন হজরত আলী মুর্তযার সঙ্গে। শায়েখ তাজউদ্দীন সুবকীকে এই মাসআলার বিষয়ে একবার প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, যে বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং যে সিদ্ধান্ত আল্লাহ্পাকের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি, তা হচ্ছে সাইয়্যেদা ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ শ্রেষ্ঠ। তারপর শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন তাঁর মাতা সাইয়্যেদা খাদীজাতুল কুবরা রা.। তারপর হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.। তিনিও উল্লিখিত হাদিস থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। তবে তিবরানীতে এমন একটি হাদিস রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, বিশ্বের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মরিয়ম বিনতে ইমরান। অতঃপর সাইয়্যেদা খাদীজা বিনতে খোয়ায়লেদ। অতঃপর ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ স.। অতঃপর ফেরাউনের স্ত্রী হজরত আসিয়া। ইবনে এমাদ এর উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, হজরত খাদীজা রা.কে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তা মা হওয়ার দিক দিয়ে। নেতৃত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। শায়েখ সুবকী এই মতটি গ্রহণ করেছেন যে, বিবি মরিয়ম শ্রেষ্ঠ। উপর্যুক্ত হাদিসের ভিত্তিতে আবু উমামা ইবনে নাক্কাশ বলেছেন, সাইয়্যেদা খাদীজার প্রাধান্য ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে। আল্লাহর ধর্ম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা, শক্তি যোগানো ও সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে কেউ তাঁর অংশীদার ছিলো না। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বা মুমিন জননীগণের মধ্যে অন্য কেউই তখন ছিলেন না। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো ইসলামের শেষ অবস্থায়, তাঁর সৎ তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে। উম্মতের সঙ্গে দ্বীনের গুরুদায়িত্ব বহন করা, ইসলাম প্রচার, তার শিক্ষাদান, উম্মতকে ইসলামের আহকাম ও মাসায়েল শিক্ষাদান– এ সব এমনই সৌন্দর্যের বিষয়, যার মধ্যে তাঁর সঙ্গে অন্য কেউই শরীক হতে পারেননি। সাইয়্যেদা খাদীজাও নন, অন্য কোনো মুমিন জননীও নন। এ সব কিছুই 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' থেকে বর্ণিত। মোট কথা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে উভয়ই শ্রেষ্ঠ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সাইয়্যেদা সাওদা বিনতে যামআ রা.

উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা সাওদা রা. ছিলেন যামআর কন্যা। আর তিনি কায়েসের পুত্র, তিনি আবদে শামসের পুত্র, তিনি আবদে উদের পুত্র। কুরাইশ বংশের বনী আমের গোত্রের ছিলেন তিনি। তাঁর নসবনামা রসুলেপাক স. এর নসব শরীফে মিলিত হয়েছে লুওয়াইয়ের সঙ্গে। তাঁর কুনিয়াতী নাম ছিলো উম্মুল আসওয়াদ। তাঁর মাতার নাম ছিলো কামুস বিনতে কায়েস। রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির প্রথম দিকেই তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো তাঁর আপন চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে। তার নাম ছিলো সুকরান

ইবনে আমর ইবনে আবদে শামস। আর তিনি ছিলেন সুহাইল ইবনে আমরের ভাই। তাঁর স্বামীও তাঁর সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুত্রসন্তান ছিলো। তাঁর নাম আবদুর রহমান। সাইয়্যেদা সাওদা সুকরানের সঙ্গে হাবশার দিকে দ্বিতীয় হিজরত করেছিলেন। হাবশা থেকে মক্কা মুকাররমায় পৌঁছার পর তাঁর স্বামীর ইনতেকাল হয়। এক বর্ণনা অনুসারে হাবশাতেই তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো। হজরত খাদীজার পরে রসুলেপাক স. তাঁকে বিয়ে করেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে বিয়ে করেন তার পর। এ মত হচ্ছে কাতাদা ও আবু উবায়দার। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত সাওদার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পূর্বেই হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে বিবাহ করেছিলেন তিনি স.। এই দুই মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় এভাবে– সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিলো সাইয়্যেদা সাওদার সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পূর্বেই। কিন্তু প্রথম বাসর হয়েছিলো সাইয়্যেদা সাওদার সঙ্গে।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, সাইয়্যেদা সাওদা হাবশা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর স্বপ্নে দেখলেন, রসুলেপাক স. তাঁর নিকটে এলেন। তারপর তাঁর পবিত্র চরনযুগল রাখলেন হজরত সাওদার স্কন্ধদেশে। তিনি এ স্বপ্নের কথা তাঁর স্বামী সুকরানের কাছে বললেন। স্বপ্নের বর্ণনা শোনার পর তিনি বললেন, তুমি যদি সত্যিই এরকম দেখে থাকো, তবে শুনে রাখো, আমি অতি শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবো এবং রসুলেপাক স. তোমাকে চাইবেন। পরে তিনি আবার স্বপ্নে দেখলেন, তিনি কোনো কিছুর উপর হেলান দিয়ে আছেন। আর আকাশ থেকে চাঁদের আলো তাঁর উপরে এসে পড়ছে। এ স্বপ্নের কথাও তিনি তাঁর স্বামীর কাছে বললেন। তাঁর স্বামী বললেন, এর মানে হচ্ছে অচিরেই আমি মৃত্যুবরণ করবো এবং রসুলেপাক স. তোমাকে কামনা করবেন। সে দিন থেকেই সুকরান অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইনতেকাল করলেন। হজরত সাওদা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। নবুওয়াতের দশম বৎসরে সাইয়্যেদা খাদীজার ইনতেকালের পর রসুলেপাক স. তাঁকে বিবাহ করলেন। বিবাহের মোহর নির্ধারিত হলো চারশত দিরহাম। পরবর্তীতে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন তখন হিজরতের অষ্টম বৎসরে রসুলেপাক স. তাঁকে তালাক দিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, রসুলেপাক স. তাঁকে তালাক দেননি। কিন্তু তালাক দিতে চেয়েছিলেন। এক রাতে তিনি রসুলেপাক স. এর চলাচলের পথে এসে বসে পড়লেন। সে সময় তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ঘরে অবস্থান করছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আপনার কাছে কোনো কিছুরই আকাঙ্খা করি না। এখন আমার কোনো যৌনচাহিদাও নেই। তবে আমি চাই এবং এটিই আমার একমাত্র বাসনা, কাল কিয়ামতের দিন যেনো আমি আপনার স্ত্রীগণের মধ্যে শামিল থাকতে পারি। আর আমি আমার পালার দিনটি আয়েশার

জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। তারপর রসুলেপাক স. তাঁকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। মতান্তরে যদি তালাক দিয়েও থাকেন, পরে তাঁকে রুজআত করলেন।

হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বিদায় হজ্বের দিন তাঁর স্ত্রীগণকে বললেন, এই হজ্ব ইসলামের হজ্ব, যা এতোদিন আমাদের স্কন্ধের উপর ছিলো। এই মুহূর্তে আমাদের কাঁধ থেকে তা অপসারিত হলো। এরপর থেকে নিজেদের ঘরের বিছানাকে গনিমত মনে করবে এবং পারতপক্ষে ঘর থেকে বের হবে না। এরপর রসুলেপাক স. এর সকল স্ত্রীগণ হজ্বে গিয়েছিলেন। কিন্তু হজরত সাওদা এবং হজরত যয়নব বিনতে জাহাশ হজ্ব করতে যাননি। বলেছিলেন, রসুলেপাক স. এর পর আমি আর কখনও ছওয়ারীতে আরোহণ করবো না। কেননা তিনি আমাদেরকে এরকমই ওসিয়ত করে গিয়েছেন।

বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে হজরত সাওদা থেকে পাঁচটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদিস বোখারীতে এবং বাকী চারটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে সুনানে আরবাআ বা তিরমিযি, নাসায়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা সুনান চতুষ্টয়ে। তাঁর ওফাত হয়েছিলো ৫৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে। হজরত মুয়াবিয়ার শাসনামলে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরূপ বলা হয়েছে। অপর এক বর্ণনানুসারে হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতের শেষের দিকে তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো। জীবনীরচয়িতাগণ বলেছেন, সাইয়্যেদা সাওদা রা. দীর্ঘ ও স্থূল দেহের অধিকারিণী ছিলেন। তাই হজরত ওমর বলেছিলেন, তাঁর জানাযা (খাটিয়া) রাতে ওঠাবে। হজরত আসমা বিনতে উমায়েস বলেছেন, আমি হাবশায় দেখেছি মহিলাদের জন্য পর্দাবিশিষ্ট খাটিয়া তৈয়ার করা হয়। সাহাবীগণ হজরত সাওদার জন্য ওই রকম খাটিয়া নির্মাণ করেছিলেন। হজরত ওমর ফারুক রা. যখন তা দেখলেন, তখন হজরত আসমা বিনতে উমায়েসের জন্য দোয়া করলেন। বললেন– সাতারতাহা সাতারাকিল্লাহ (তুমি তাকে আচ্ছাদিত করেছো, আল্লাহ্তায়ালাও তোমাকে আচ্ছাদিত করুন)। কেউ কেউ বলেছেন, পর্দাবিশিষ্ট খাটিয়া নির্মাণ করা হয়েছিলো সাইয়্যেদা যয়নব বিনতে জাহাশের জন্য। 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সুসাব্যস্ত কথা এই যে, হজরত আসমা বিনতে উমায়েস পর্দাবিশিষ্ট খাটিয়া বানিয়েছিলেন সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার জন্য। সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার ওফাতই আগে হয়েছিলো। সুতরাং তিনিই প্রথম রমণী, যার জন্য পর্দাবিশিষ্ট খাটিয়া তৈয়ার করা হয়েছিলো।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা রা.

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা রা. হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সাহেবজাদী ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিলো উম্মে আবদুল্লাহ। তাঁরই বোনের ছেলে আবদুল্লাহর

নামে ছিলো তাঁর এই উপনাম। আবদুল্লাহ ছিলেন হজরত যুবায়ের ও হজরত আসমার পুত্র। সাইয়্যেদা আয়েশা রা. রসুলেপাক স. এর নিকট আবেদন করেছিলেন, আমার জন্য একটি উপনাম ঠিক করে দিন। তখন রসুলেপাক স. বলেছিলেন, তোমার বোনের ছেলে অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নামে তোমার নাম রাখো। এক বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন রসুলেপাক স. তাঁর তাহনিক করেছিলেন (পবিত্র মুখের লালা তাঁর মুখে দিয়েছিলেন) এবং সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকাকে বলেছিলেন, এ হচ্ছে আবদুল্লাহ আর তুমি হচ্ছো উম্মে আবদুল্লাহ (আবদুল্লাহর মা)। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার মাতা ছিলেন রুমান বিনতে আমের। আমেরের পিতার নাম ছিলো ওয়ায়মের। তিনি ছিলেন বনী কেনানা গোত্রের। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা প্রথমে জুবায়ের ইবনে মুতয়েমের বাগদত্তা ছিলেন। পরবর্তীতে রসুলেপাক স. তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন ছয় বছর বয়সে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মদীনায় আসার আঠারো মাসের শেষের দিকে দ্বিতীয় হিজরীতে নয় বছর বয়সে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে তাঁর বাসর হয়।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা রা. শাওয়াল মাসে বিয়ে হওয়া পছন্দ করতেন। অবশ্য মুর্খতার যুগে এ মাসে বিয়ে হওয়াকে তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন, আমার বিয়ে এবং বাসর শাওয়াল মাসেই হয়েছে। এমন কোনো নারী কি আছে যে, রসুলেপাক স. এর কাছে আমার চেয়ে অধিক প্রিয়। বিভিন্ন সফরে রসুলেপাক স. তাঁকে স্মরণ করতেন এবং বলতেন, 'ওয়া আরুসাহ' (হায় আমার নব পরিণীতা)। এরকম বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. রসুলেপাক স. এর দাম্পত্য জীবনে নয় বছর ছিলেন। রসুলেপাক স. এর মহাপ্রস্থানকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো আঠারো বছর। তাঁর ওফাত হয়েছিলো ৫৭ হিজরীতে। ওয়াকেদী বলেছেন, ৫৮ হিজরীর ১৭ই রমজান মঙ্গলবার দিন তাঁর ওফাত হয়েছিলো। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৬ বছর। তিনি ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন, তাঁকে যেনো রাতের বেলায় জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। হজরত আবু হোরায়রা তাঁর জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন। সে সময় আমীর মুয়াবিয়া কর্তৃক নিযুক্ত মদীনার শাসক ছিলেন মারওয়ান। আর মদীনার মুতাওয়াল্লী ছিলেন কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার ওফাত হয়েছিলো স্বাভাবিকভাবে। বলা হয়ে থাকে, হজরত আমীর মুয়াবিয়া রা. কূপ খনন করে উপর থেকে তার মুখ বন্ধ করে হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে দাওয়াত করেছিলেন। তিনি কূপে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এটি রাফেযী সম্প্রদায়ের বানানো কল্পকাহিনী ও মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

রসুলেপাক স. সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা ছাড়া অন্য কোনো কুমারীকে বিয়ে করেননি। তাঁর গর্ভ থেকে কোনো সন্তানও জন্মগ্রহণ করেনি। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর একটি সন্তান নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, যে কারণে তাঁর কুনিয়াত হয়েছিলো উম্মে আবদুল্লাহ। কথাটি সুসাব্যস্ত নয়। বরং বিশুদ্ধ কথা এই যে, তাঁকে উম্মে আবদুল্লাহ ডাকা হতো আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নামানুসারে।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার ফযিলত ও মর্যাদা সীমাহীন ও অগণিত। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা ফকীহ্‌, আলেম, ফাসাহাতবিদ, বালাগাতবিদ এবং আকাবের সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। কোনো কোনো সলফে সালেহীন বলেছেন, সে সময় আহকামে শরীয়ার সমাধানের জন্য তাঁর দিকে ধাবিত হতে হতো। হাদিস শরীফে এসেছে,

خُذُوْا ثُلُثَيْ دِيْنَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْحُمَيْرَاءِ

(তোমরা তোমাদের দ্বীনের দুই তৃতীয়াংশ এই হুমায়রার (আয়েশা সিদ্দীকার) কাছ থেকে অর্জন কোরো)। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, কোরআনের অর্থ, হালাল-হারামের বিধান, আরবের কবিতাসমূহ এবং নসব (বংশ) সংক্রান্ত এলেমে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার চেয়ে অধিক আলেম আমি আর কাউকে দেখিনি। রসুলেপাক স. এর প্রশংসায় হজরত আয়েশা সিদ্দীকার দু'টি পঙক্তি এরকম–

لو سمعوا في مصرا وصاف حده + لما بذلوا في سوم يوسف من نقد
لو امي زلَيَحَا لو داين حبيبه + لا ثرن بالقطع القلوب علي الا يَدي

অর্থঃ মিশরের লোকেরা যদি তাঁর (রসুল স. এর) গণ্ডদেশের গুণাবলীর কথা শুনতে পেতো, তাহলে তারা অবশ্যই ইউসুফের দানদস্তরে অর্থ ব্যয় করতো না। যুলায়খার তিরস্কারকারীরা যদি আল্লাহ্‌র হাবীবের পরিচয় পেতো, তাহলে তারা তাদের হাতের উপর তাদের অন্তরসমূহ রেখে কেটে টুকরা টুকরা করে দিতো।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকার সবচেয়ে বড় ফযিলত ও মর্যাদা হচ্ছে, রসুলেপাক স. তাঁকে খুব বেশী মহব্বত করতেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইসলামে সর্বপ্রথম যে মহব্বত জন্ম নিয়েছিলো, তা হচ্ছে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি রসুলেপাক স. এর মহব্বত। সাহাবা কেরাম রসুলেপাক স.কে জিজ্ঞেস করতেন, আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি জবাব দিতেন, আয়েশা। আবার জিজ্ঞেস করতেন পুরুষদের মধ্যে– তিনি বলতেন, তার পিতা। হ'ত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত আছে, একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, রসুলুল্লাহ্‌র কাছে সব চাইতে প্রিয়জন কে? তিনি জবাব দিলেন, ফাতেমা যাহরা। লোকেরা আবার প্রশ্ন করলো, পুরুষদের মধ্যে কে? জবাব দিলেন, তাঁর স্বামী। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌তায়ালাই

ভালো জানেন। এদু'টি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে, স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা রা.। আর আওলাদগণের মধ্যে ছিলেন সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরা রা.। আহলে বাইতের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন হজরত আলী মুর্তযা রা.। আর সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা.। তবে মহব্বতের আধিক্যের প্রেক্ষিত ও দিক ছিলো ভিন্ন ভিন্ন।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদিন রসুলুল্লাহ্ তাঁর পবিত্র পাদুকা সেলাই করছিলেন। আমি চরখায় সুতা কাটছিলাম। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে তাকাতেই দেখলাম, তাঁর পবিত্র ললাট থেকে ঘাম প্রবাহিত হচ্ছে। আর সে ঘাম থেকে বিকিরিত হচ্ছে তাঁর সৌন্দর্যের রূপচ্ছটা। আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। রসুলেপাক স. আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, কী ব্যাপার, কথা বলছো না কেনো? সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার জ্যোতির্ময় অবয়ব এবং ললাটদেশের স্বেদবিন্দু দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। রসুলুল্লাহ্ দাঁড়ালেন। আমার কাছে এলেন। আমার দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে চুম্বন করলেন। বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তুমি আমাকে দেখে এতো আনন্দিত হওনি, আমি তোমাকে দেখে যতো আনন্দিত হয়েছি। আর রসুলেপাক স. সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার দু'চোখের মধ্যবর্তীস্থানে চুম্বন করেছিলেন– তাঁর নিজের ইনসাফ ও গুণগ্রহিতার কারণে। যে দু'চোখ ভরে মহব্বত ও মারেফতের নজরে তিনি রসুলেপাক স. এর অপরূপ রূপ অবলোকন করছিলেন সে চক্ষুদ্বয় তো মহব্বত পাওয়ারই যোগ্য।

মাসরুক ছিলেন নেতৃস্থানীয় তাবেয়ী। তিনি যখন সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন সিদ্দীকের কন্যা সিদ্দীকা রসুলুল্লাহ্ স. এর মাহবুবা। অথবা কখনও এভাবে হাদিস বর্ণনা করতেন, আল্লাহ্র হাবীবের মাহবুবা আসমানী নারী, সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা আপন ফযিলত ও অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের চাইতে তাঁর প্রতি রসুলেপাক স. এর অধিক ভালোবাসার বিষয়ে অনেক সময় গৌরববোধ করতেন। আল্লাহ্তায়ালার দেয়া এহেন নেয়ামতকে তিনি এভাবেই প্রকাশ করতেন। বলতেন, রসুলুল্লাহ্ আমাকে ছাড়া অন্য কোনো বাকেরা (কুমারী)কে বিয়ে করেননি। নারীদের জন্য এই মর্যাদাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ বাকেরা (কুমারী) নারীই তার স্বামীর কাছে অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলতেন, ইতোপূর্বে রসুলেপাক স. আমাকে বিয়ে করার জন্য পয়গাম পাঠিয়েছেন। জিবরাইল রেশমী কাপড় পরিধান করিয়ে আমার চেহারা-সুরত রসুলেপাক স.কে দেখিয়েছেন এবং তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছেন,

আপনার পবিত্রা স্ত্রী। অপর এক বর্ণনায় আছে, এই হলো আপনার স্ত্রী– দুনিয়া ও আখেরাতে। একথার অর্থ এই যে, যে অংকিত চিত্র আপনাকে দেখানো হলো, তা আপনার পবিত্র স্ত্রীর। তখন পর্যন্ত ছবি হারাম ছিলো না। দ্বিতীয়তঃ এই বর্ণনাটি ছিলো স্বপ্নসংক্রান্ত। আল্লাহ্তায়ালা আলমে মিছালের দৃশ্য রসুলেপাক স.কে দেখিয়েছিলেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে তিন রাত স্বপ্নে দেখেছি। ফেরেশতারা রেশমী কাপড়ের টুকরায় তোমাকে অংকিত করেছিলো। এই হাদিসে সাধারণভাবে রেশমী কাপড়ের টুকরা বলা হয়েছে। অপর এক হাদিসে এসেছে, জিবরাইল সবুজ রেশমী কাপড়ের টুকরায় করে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ছবি নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, এটি আপনার পবিত্র স্ত্রী বা তার প্রতিচ্ছবি। তারপর আমি কাপড়ের টুকরাটি আমার সামনে থেকে সরিয়ে দিলাম। তখন ওই চেহারা বেরিয়ে এলো এখন যেভাবে আছো। স্বপ্নেই আমি বললাম, এটা যদি আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তা পূর্ণ হবে। অর্থাৎ এমন স্ত্রী আমার লাভ হবে। এ বর্ণনার মধ্যে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার মর্যাদা রয়েছে। তিনি আগমন করার পূর্বেই তাঁর সৌন্দর্যের আসক্ত বানিয়ে দেয়া হয়েছিলো রসুলেপাক স.কে।

যুলায়খা একবার স্বপ্নে হজরত ইউসুফকে দেখেছিলেন এবং তিনি হজরত ইউসুফের প্রেমে আসক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আর এখানে রসুলেপাক স.কে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ছবি তিনবার স্বপ্নে দেখানো হলো। এটা নিঃসন্দেহে অধিক ভালোবাসাপ্রকাশক। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি রসুলেপাক স. এর ভালোবাসার ধরন প্রকাশ করতে যেয়ে তিনি বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ নামাজ পড়তেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর সামনে সোজা শুয়ে থাকতাম। এ ধরনের করতাম কেবল আমিই। রসুলেপাক স. যখন রাতের নামাজে দণ্ডায়মান হতেন তখন আয়েশা সিদ্দীকা স্বস্থানেই শুয়ে থাকতেন। সেজদা করার সময় রসুলেপাক স. এর পা মোবারক হজরত আয়েশা সিদ্দীকার গায়ে লেগে যেতো। একথা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে সামনে নিয়ে লাগালাগি অবস্থায় নামাজ পড়তেন। বরং আয়েশা সিদ্দীকা রসুলেপাক স. এর পায়ের দিকে ডান পাশে ঘুমিয়ে থাকতেন, যদিও হাদিসের বিবরণদৃষ্টে এরকমই অনুমিত হয়। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.বলেছেন, আমি তখন জানাযায় খাটিয়ার ন্যায় রসুলুল্লাহ্র সামনে শুয়ে থাকতাম। যদি প্রকৃত মর্ম এরকমই হয়, তাহলে বুঝতে হবে, এটি তাঁর জন্য স্বতন্ত্র একটি ফযিলত। আর যদি প্রকৃতপক্ষে এমনটি না হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে, এর দ্বারা হজরত আয়েশা সিদ্দীকার একটি খাস অবস্থা বুঝানো হয়েছে, যা তাঁর ফযিলতই বহন করে। এটি তাঁর জন্য একটি খাস অবস্থা যদি বুঝায়, তবে তার তাৎপর্য হবে এরকম– বিষয়টি ছিলো আকস্মিক, যা হজরত

আয়েশা সিদ্দীকার পালার দিন তাঁর ঘরে সংঘটিত হয়েছিলো। এর অর্থ এরকম কখনও মনে করা যাবে না যে, এরকম করা তাঁর জন্য জায়েয ছিলো। অথবা তাঁর স্থলে অন্য কোনো স্ত্রী হলে তাঁর জন্যও জায়েয ছিলো। হাদিসের শেষাংশে এরকম বর্ণনা এসেছে। রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা আমার পায়ে ধাক্কা দিতেন। আর অমনি আমি আমার পা সরিয়ে নিতাম। মনে হতো যেনো সেজদার জায়গা আমার পায়ের কাছাকাছিতেই রয়েছে। রসুলেপাক স. যখন সেজদা করে নিতেন, তখন সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা আবার পা লম্বা করে নিতেন। এরকম হতো নিদ্রার প্রাবল্যের কারণে। অথবা অন্য কোনো কারণে। এখানে একটি কারণ এ-ও ছিলো যে, সে রাতে ঘরের মধ্যে কোনো প্রদীপ ছিলো না। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এ থেকে দলিল দিয়ে থাকেন যে, স্ত্রীকে (কামভাবের সাথে) স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার আরেকটি ফযিলত ছিলো এরকম– তিনি বলতেন, আমি এবং রসুলুল্লাহ্ এক পাত্রের পানি নিয়ে এক সাথে গোসল করতাম। তিনি অন্য কোনো স্ত্রীর সঙ্গে এরকম করতেন না। মেশকাত শরীফে মুআযায়ে আদবিয়া থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন, সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, আমি এবং রসুলুল্লাহ্ একই বরতন থেকে গোসল করতাম, যা আমার এবং তাঁর মাঝখানে থাকতো। তিনি তাড়াহুড়া ও জলদি করতেন। এমনকি আমি তখন বলতে বাধ্য হতাম, আমার জন্যও পানি রেখে দিন, আমিও যাতে পানি নিতে পারি। আমি এবং রসুলুল্লাহ্ উভয়ই জুনুবী অবস্থায় (গোসল ফরজ এমন অবস্থায়) এরকম করতাম। এই হাদিস তাঁদের দু'জনের মধ্যে পরিপূর্ণ একাত্মতা ও গভীর ভালোবাসাকে প্রমাণ করে।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার আরেকটি ফযিলত এই যে, তিনি বলেছেন, আমার রাত যাপনের পোশাক ছাড়া অন্য কারও পোশাক পরিহিত অবস্থায় রসুলেপাক স. এর উপর ওহি নাযিল হয়নি। এতে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার শান ও মর্যাদা যে স্বতন্ত্র ধরনের ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কথার কোনো ব্যাখ্যা প্রদানেরও প্রয়োজন নেই। সহীহ্ হাদিসে এসেছে, সাইয়্যেদা উম্মে সালামা সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার ব্যাপারে রসুলেপাক স. এর নিকট কিছু বলেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়ো না। নিশ্চয়ই আয়েশা ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীর রাত্রি যাপনের পোশাক পরিহিত অবস্থায় আমার উপর কখনও ওহী নাযিল হয়নি। তখন উম্মে সালামা বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনাকে কষ্ট দেয়া থেকে আমি আল্লাহ্র কাছে তওবা করছি।

রসুলেপাক স. একদিন সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরাকে বললেন, হে ফাতেমা! আমি যাকে মহব্বত করি, তুমিও কি তাকে মহব্বত করবে? সাইয়্যেদা ফাতেমা বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তাকে অবশ্যই মহব্বত করবো।

রসুলেপাক স. বললেন, তুমি আয়েশাকে মহব্বত কোরো। এ সম্বন্ধে অগণিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বলতেন, রসুলুল্লাহ্ চাইতেন না যে, অন্য কোনো স্ত্রীর পিতা-মাতা আল্লাহ্র পথে হিজরত করুক। তাছাড়া সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার পরিবারে অর্থাৎ তাঁর পিতার পরিবারের চার জন রসুল স. এর সাহাবী ছিলেন। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, আমার পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার ঘোষণা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি এ কথার দ্বারা ইফকের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। মুনাফিকেরা যখন তাঁর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলো, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা সম্পর্কে এবং মুনাফিকদের নিন্দায় সতেরো, আঠারোটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ আমার ঘরেই তাঁর শেষযাত্রার সময় কাটিয়েছেন এবং আমার পালার সময়েই তিনি লোকান্তরিত হন। তখন তাঁর পবিত্র মস্তক আমার গলা ও বুকের মধ্যবর্তীতে ছিলো। আমার হুজরাতেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একবার এক লোককে হজরত আয়েশা সিদ্দীকা সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতে শুনলেন। তখন হজরত আম্মার রা. তাকে বললেন, হে অপদস্থ-লাঞ্ছিত ব্যক্তি! চুপ করো, রসুলুল্লাহ্র প্রিয়তমাকে তুমি খারাপ বলছো। একবার সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বালিকাদের সাথে খেলা করছিলেন। রসুলেপাক স. যখন তাদের কাছে এলেন, তখন তারা সকলেই লজ্জার কারণে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো। রসুলেপাক স. মেয়েদের পিছনে পিছনে গেলেন এবং তাদেরকে ডেকে এনে হজরত আয়েশা সিদ্দীকার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, তারা যেনো তাঁর সঙ্গে খেলা করে।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেছেন, একদিন রসুলেপাক স. আমার কাছে তশরীফ নিয়ে এলেন। আমি আমার ঘরের কন্যা পুতুলগুলো জানালায় রেখে তা একটি পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখলাম। রসুলুল্লাহ্র সঙ্গে যায়েদও ছিলেন। তিনি জানালার পর্দা সরিয়ে পুতুলগুলো রসুলুল্লাহ্কে দেখালেন। তিনি বললেন, এ সব কী? আমি বললাম, এগুলো আমার মেয়ে অর্থাৎ কন্যাপুতুল। কন্যাপুতুলগুলোর সঙ্গে একটি ঘোড়াপুতুলও ছিলো। তার ছিলো দু'টি ডানা। রসুলুল্লাহ্ বললেন, ঘোড়ার কি ডানা থাকে? আমি বললাম, সম্ভবতঃ হে আল্লাহ্র রসুল আপনি একথা শুনেননি যে, নবী সুলায়মানের ঘোড়া ছিলো এবং সেগুলোর ডানাও ছিলো। একথা শুনে তিনি এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর পবিত্র দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে পড়লো। রসুলেপাক স. এর সঙ্গে এভাবে বিতর্ক করার মতো সাহস সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার ছিলো। আর তা ছিলো তাঁর এলেম, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার কারণেই। তাছাড়া রসুলেপাক স. এবং তাঁর মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি, নৈকট্যের বাঁধন ছিলো, সেটিও ছিলো একটি কারণ। যেমন রসুলেপাক স. একদিন বললেন, যার হিসাব

নেওয়া হবে, সে আযাব ভোগ করবে। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল। আল্লাহ্পাক তো বলেছেন– অর্থাৎ অচীরেই তাদের হিসাব নেয়া হবে, আসান হিসাব। হিসাব যখন আসান হবে, তখন তাতে আযাব কেমন করে হবে? রসুলেপাক স. বললেন, তা হচ্ছে হিসাব প্রদান করা। হিসাব গ্রহণ করা নয়। হিসাব গ্রহণ করা মানে প্রশ্নোত্তর করা।

একবার রসুলেপাক স. বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে মিলন হওয়াকে পছন্দ করে, আল্লাহ্তায়ালাও তার মিলনকে পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহ্র সাথে মিলনকে অপছন্দ করে, আল্লাহ্তায়ালাও তার মিলনকে অপছন্দ করেন। এখানে মিলন অর্থ মৃত্যু। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বললেন, আমরা তো অপছন্দ করি। অর্থাৎ নফস ও স্বভাব অনুসারে প্রত্যেকেই মৃত্যুকে অপছন্দ করে। রসুলেপাক স. বললেন, বিষয়টি এরকম নয়, যেমন তুমি মনে করেছো। বরং আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান, তার মধ্যে মৃত্যুর মহব্বত পয়দা করে দেন, যখন তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়।

আরেকদিনের ঘটনা। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালার রহমত ও অনুগ্রহ ছাড়া কেউই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। একথা শুনে সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনিও কি আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন না? তিনি বললেন, না, আমিও প্রবেশ করতে পারবো না। তবে আল্লাহ্র রহমত আমাকে আচ্ছাদিত করে আছে। আরেকদিন রসুলেপাক স. হজরত আয়েশা সিদ্দীকাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমার হামযাদ শয়তান তোমাকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা নিবেদন করলেন, মানুষের সঙ্গে শয়তানও কি থাকে? রসুলেপাক স. বললেন, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই তার হামযাদ শয়তান থাকে। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার সাথেও কি আছে? তিনি বললেন, হাঁ আমার সাথেও আছে। কিন্তু আমার শয়তানটি মুসলমান হয়ে গিয়েছে, সে আমার অনুগত হয়ে গিয়েছে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার সঙ্গে রসুলেপাক স. এর সম্পর্ক ছিলো এমন, যেমন হয়ে থাকে প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে। প্রেমিকা প্রেমিকের কাছে যাই কামনা করে, নির্দ্বিধায় তা ব্যক্ত করে ফেলে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুলুল্লাহ্ বললেন, হে আয়েশা! আমি জানি, তুমি কখনও আমার প্রতি খুশি থাকো, আবার কখনও নাখোশ হও। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তা কেমন করে জানেন? তিনি বললেন, তুমি যখন খুশি থাকো, তখন তুমি বলো 'লা ওয়া রব্বা মুহাম্মদ' না মোহাম্মদের রবের শপথ! আর যখন তুমি বেজার থাকো, তখন বলো, 'লা ওয়া রব্বা ইবরাহীম' না ইব্রাহীমের রবের শপথ। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে আমি তো আপনার

নামটি ছাড়া আর কিছুই বর্জন করি না। অর্থাৎ নাখোশ অবস্থায় আপনার নাম নেই না বটে, কিন্তু আপনার সত্তা ও আপনার স্মরণ তো সর্বদাই আমার অন্তরে জাগরুক থাকে। আমার জীবন তো আপনার ভালোবাসায় নিমজ্জিত। সে ভালোবাসায় কোনোরূপ পরিবর্তন আসে না। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা থেকে আরও বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ আমাকে একবার বললেন, হে আয়েশা ! তুমি যদি জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকতে চাও তাহলে দুনিয়াতে এমনভাবে থাকবে, ফকির মুসাফির যেমন থাকে। মুসাফিরেরা কোনো কাপড়কে পুরাতন মনে করে না, যতক্ষণ তা সেলাইযোগ্য থাকে। এক বর্ণনায় এসেছে, সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্তায়ালা যেনো আমাকে জান্নাতে আপনার স্ত্রীগণের মধ্যে রাখেন। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি যদি এই মর্যাদা লাভ করতে চাও, তবে কালকের জন্য খানা অবশিষ্ট রেখো না। আর কোনো কাপড় যতোক্ষণ সেলাইযোগ্য থাকে ততোক্ষণ তা ফেলে দিয়ো না। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা রসুলেপাক স. এর এই ওসিয়ত ও নসিহত যা ফকিরীকে ধনাঢ্যের উপর প্রাধান্য দেয়ার বিষয়ে করে গিয়েছেন, তা তিনি আজীবন বাস্তবায়ন করে গিয়েছেন। হজরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকাকে সত্তর হাজার দেরহাম আল্লাহ্র রাস্তায় দান করতে দেখেছি, অথচ তখন তাঁর পবিত্র বস্ত্র ছিলো সেলাই করা। একবার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাঁর জন্য এক লাখ দেরহাম প্রেরণ করলেন। তিনি তা ওই দিনের মধ্যেই নিকটাত্মীয় ও গরীব লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। সেদিন তিনি রোজা রেখেছিলেন। সন্ধ্যায় তাঁর ঘরে খাওয়ার মতো কোনো কিছুই ছিলো না। বাঁদী নিবেদন করলো, রুটি ক্রয় করার জন্য যদি এক দেরহাম রেখে দেয়া হতো, তাহলে ভালো হতো। তিনি বললেন, মনে ছিলো না, যদি মনে থাকতো তাহলে রেখে দিতাম।

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থে জননী আয়েশা সিদ্দীকা থেকে দু'হাজার দু'শ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে একশ' চুয়াত্তরটি, বোখারীতে চুয়ান্নটি এবং মুসলিমে সাতষট্টিটি। অবশিষ্ট হাদিস বর্ণিত হয়েছে অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্য থেকে অনেক সংখ্যক বর্ণনাকারী তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা তাঁর ওফাতের সময় বলতেন, আমি যদি গাছ হতাম, আমাকে কেটে ফেলা হতো। আমি যদি মাটির ঢেলা হতাম। আমি যদি এমন হতাম যে আমাকে কেউ স্মরণই করে না। আমার যদি জন্মই না হতো। সুবহানাল্লাহ্! দুনিয়ার প্রতি তাঁর কী রকম অনীহাই না ছিলো। ছিলো কী রকম বিনয় ও অক্ষমতার মনোভাব। তাঁর সম্মানিত পিতা যিনি উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিও এরকমই বলতেন। সত্যিই তিনি ছিলেন তাঁর পিতার উপযুক্ত পুত্রী। উলামা

কেরাম বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে যাঁরা নৈকট্যপ্রাপ্ত, তাঁরা সুসংবাদপ্রাপ্ত হলেও আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে ঔদ্ধত্য প্রকাশের ভয়ে থাকতেন সদা শংকিত।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার ইনতেকাল যখন হলো, তখন তাঁর ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শোনা গেলো। সাইয়্যেদা উম্মে সালামা রা. তাঁর ক্রীতদাসীকে খবর নিতে পাঠালেন। ক্রীতদাসী এসে তাঁর ওফাতের সংবাদ জানালো। শোকসংবাদ শুনে সাইয়্যেদা উম্মে সালামাও কাঁদতে লাগলেন। বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। তিনি রসুলেপাক স. এর কাছে তাঁর পিতার পরে ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, একবার কোনো এক ব্যক্তি সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কীভাবে জানবো যে, আমি পুণ্যবান? তিনি বললেন, যখন তুমি তোমার পাপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, আমি কীভাবে জানবো যে, আমি মন্দ? তিনি বললেন, যখন তুমি জানবে যে, তোমার কাজটি পুণ্যকর্ম। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা সব সময় বলতেন, তোমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খোলা থাকবে। প্রশ্ন করা হলো, কীভাবে এবং কী আমলের দ্বারা? তিনি বললেন, ক্ষুধা এবং পিপাসার দ্বারা। একবার তিনি কোরআন পাঠকালে এই আয়াতে এসে পৌঁছলেন– **وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَاتَعْقِلُوْنَ** (আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব যাহাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?)(২১:১০) তারপর থেকে তিনি কোরআন পাঠ করতেন, আর প্রতিটি আয়াতের অর্থ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতেন। বলতেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আমার অবস্থার কথাই কোরআনে পাকের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন **وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ-** (এবং অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধী স্বীকার করিয়াছে, উহারা এক সৎকর্মের সহিত অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করিয়াছে আল্লাহ্ হয়ত উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন)(৯:১০২)। আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আয়েশা সিদ্দীকার বিনয়, ন্যায়নিষ্ঠা ও তাঁর মারেফত বা আত্মপরিচয়ের উপর অনুকম্পা অবতীর্ণ করুন। আমিন।

সাইয়্যেদা হাফসা রা.

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের কন্যা সাইয়্যেদা হাফসা ছিলেন কুরাইশ বংশীয়া ও আদী গোত্রের। তাঁর মাতা ছিলেন যয়নব বিনতে মাযউন– ওছমান ইবনে মাযউনের বোন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করেছিলেন। রসুলেপাক স. এর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পূর্বে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো খুনায়স ইবনে হুযাফার সঙ্গে। হজরত খুনায়স একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। সাইয়্যেদা হাফসা তাঁর সঙ্গেই

হিজরত করেছিলেন। হজরত খুনায়স বদর যুদ্ধের পর ইনতেকাল করেন। আবার এক বর্ণনা অনুসারে উহুদ যুদ্ধের পর তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো। হজরত হাফসা যখন বিধবা হলেন, তখন হজরত ওমর হজরত ওছমানকে তাঁর মেয়ের বিয়ের পয়গাম দিলেন। কিন্তু তিনি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। তখন হজরত ওছমানের স্ত্রী রসুলেপাক স. এর কন্যা হজরত রুকিয়া সদ্য পরলোকগমন করেছেন। কন্যার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণে হজরত ওমর রা. রসুলেপাক স. এর কাছে হজরত ওছমান সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে বললেন, আমি হাফসাকে তার সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। ওছমান আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালা ওছমানের জন্য তোমার কন্যার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করবেন আর তোমার কন্যার জন্যও দান করবেন ওছমানের চেয়ে উত্তম স্বামী। তাই হলো। রসুলেপাক স. হজরত হাফসা রা.কে গ্রহণ করলেন। আর তাঁর কন্যা সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুমকে বিবাহ দিলেন হজরত ওছমানের সঙ্গে। ইতোপূর্বে হজরত ওমর তাঁর কন্যা হাফসাকে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সাথেও বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো উত্তরই করেননি। ফলে হজরত ওমর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তারপর তিনি প্রস্তাব পাঠান রসুলেপাক স. এর কাছে। রসুলেপাক স. হজরত হাফসাকে হিজরতের তৃতীয় বৎসরে বিবাহ করেন। অপর এক বর্ণনামতে এই বিবাহ হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরে সংঘটিত হয়। সহীহ্ বোখারীতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমরের কন্যা হাফসা তাঁর স্বামী খুনায়স ইবনে হুযাফা সাহমীকে হারিয়ে বিধবা হন। হজরত খুনায়স ছিলেন রসুল স. এর সাহাবী। তিনি মদীনা শরীফে ইনতেকাল করেন। হজরত ওমর ফারুক হজরত ওছমান ইবনে আফ্ফানের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে চাইলেন। হজরত ওছমান বললেন, আমাকে একটু চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ দিন। সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় তিনি কয়েকদিন কাটালেন। তারপর বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছু দিন বিয়ে করবো না। এরপর হজরত ওমর হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আপনার যদি ইচ্ছে হয় তাহলে হাফসাকে বিয়ে করতে পারেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক নিশ্চুপ রইলেন। হজরত ওমর বললেন, তিনি আমার এ কথার কোনো জবাবই দিলেন না। আমি তাঁর প্রতি রাগান্বিত হলাম। ওছমানের চেয়ে তাঁর প্রতিই আমার রাগ হলো বেশী। এর কয়েকদিন পর রসুলেপাক স. প্রস্তাব দিলেন। আমি হাফসাকে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম। হজরত ওমর বলেন, পরে হজরত আবু বকর সিদ্দীক আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, সম্ভবতঃ তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলে। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আমি জানতাম, রসুলেপাক স. হাফসাকে স্মরণ করেছেন। আমি আল্লাহ্র রসুলের গোপন বিষয়টি প্রকাশ করতে চাইনি। রসুলেপাক স. তাঁকে গ্রহণ না করলে আমি এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারতাম।

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. সাইয়্যেদা হাফসাকে একদিন কোনো এক কারণে এক-তালাক রেজয়ী দিলেন। হজরত ওমর একথা জেনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তারপর জিবরাইল এই মর্মে ওহী নিয়ে এলেন যে, আল্লাহ্তায়ালা হাফসাকে ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। আরো বলেছেন, সে খুব রোজা রাখে এবং রাত্রি জাগরণ করে। সে জান্নাতে আপনার স্ত্রী হয়ে থাকবে।

সাইয়্যেদা হাফসার জন্ম হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পাঁচবছর পূর্বে। আর তার ওফাত হয়েছিল হজরত আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে ৪১ বা ৪৫ অথবা মতান্তরে ৪৭ হিজরীতে। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ওছমানের খেলাফতের সময়। তবে প্রথম মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ষাট বৎসর। বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ষাট। তন্মধ্যে চারটি হাদিস মুত্তাফাক আলাইহি। অর্থাৎ বোখারী মুসলিমে বর্ণিত। আর শুধু মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে দু'টি হাদিস। বাকী পঞ্চাশটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে।

সাইয়্যেদা যয়নব বিনতে খোযায়মা রা.

উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা যয়নব ছিলেন খোযায়মা ইবনে হারেছের কন্যা। হেলাল ও আমের গোত্রের লোক। জাহেলী যুগে তাঁকে উম্মুল মাসাকীন বলা হতো। কেননা তিনি মিসকীনদেরকে আহার করাতেন এবং তাদেরকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের স্ত্রী ছিলেন। তিনি উহুদযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি রসুলুল্লাহ্র চাচাতো ভাই উবায়দা ইবনে হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী ছিলেন। আর তিনি বদরযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি প্রথমে তুফায়ের ইবনে হারেছের স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন। তারপর উবায়দা ইবনে হারেছ তাঁকে বিয়ে করেন। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আসাদী তাঁকে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিলেন। কোনো কোনো নবীজীবনীবিশেষজ্ঞ এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে, 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে বলা হয়েছে, প্রথম বর্ণনাটি বিশুদ্ধতর। যাহোক, হিজরতের তৃতীয় বৎসরে রসুলুল্লাহ্ স. তাঁকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেন। তারপর রসুলেপাক স. এর খেদমতে তিনি খুব কম হায়াতই পেয়েছিলেন। রসুলেপাক স. এর পৃথিবীবাসের সময়ে তিনি ইনতেকাল করেন। রসুলেপাক স. এর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তিনি দু'মাস, মতান্তরে ছয়মাস বা আট মাস হায়াত পেয়েছিলেন। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থকার 'ফাযায়েল' অনুচ্ছেদে তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন। সাইয়্যেদা যয়নব চতুর্থ হিজরীর রবিউস্সানী মাসে ইনতেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। বাকীতে কুব্বায়ে আযওয়াজুন্নবী নামক একটি খিলান ছিলো। দুরাচার ইবনে সউদ নজদী জান্নাতুল বাকীর সকল কবরের সঙ্গে তাঁর কবরটিও ধ্বংস করে।

সাইয়্যেদা উম্মে সালামা রা.

রসুলেপাক স. এর স্ত্রীগণের মধ্যে সাইয়্যেদা উম্মে সালামা ছিলেন অন্যতম। তাঁর নাম ছিলো হিন্দা বিনতে আবু উমাইয়া মাখযুমী। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো রামলা। তবে প্রথমোক্তটি অধিকতর বিশুদ্ধ এবং বিখ্যাত। তাঁর পিতা আবু উমাইয়ার নাম ছিলো সাহল ইবনে মুইযযাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর মাখযুম। তাঁর মাতার নাম ছিলো আতেকা বিনতে আমের ইবনে রবীআ। এরকম বিবরণ রয়েছে 'জামে' গ্রন্থে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থেও বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি আতেকা বিনতে মুত্তালিব নন। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তাঁর মাতার নাম আতেকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব। সুতরাং বিষয়টি লক্ষণীয়। সাইয়্যেদা উম্মে সালামা প্রথমে আবু সালামা আবদ ইবনুল আসাদের স্ত্রী ছিলেন। আর তিনি ছিলেন রসুলেপাক স. এর ফুফু বাররা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। সাইয়্যেদা উম্মে সালামা ও তাঁর স্বামী প্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে ছিলেন, যাঁরা হিজরত করেছিলেন আবিসিনিয়ার দিকে। এই স্বামীর ঔরস থেকে তাঁর চার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো। যয়নব, সালামা, আমর এবং দুররা। এই চারজনের মধ্যে যয়নব এবং আমর রসুলেপাক স. এর রবীব ছিলেন (সন্তানসহ কাউকে বিয়ে করলে তার ওই সন্তানকে বলা হয় রবীব বা রবীবা)। তিনি দু'বার আবিসিনিয়া বা হাবশার দিকে হিজরত করেছিলেন। অতঃপর হাবশা থেকে ফিরে আসেন মদীনায়। কেউ কেউ বলেছেন, সাইয়্যেদা উম্মে সালামাই প্রথম মহিলা, যিনি হাওদায় আরোহণ করে মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন। আবু সালামা উহুদযুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। তারপর তাঁকে একটি বাহিনীর সাথে মদীনায় পাঠানো হয়। তাঁর জখম প্রকট আকার ধারণ করে। শেষে চতুর্থ হিজরীতে তিনি ইনতেকাল করেন। অপর এক বর্ণনামতে পরলোকগমন করেন তৃতীয় হিজরীতে। সাইয়্যেদা উম্মে সালামা রসুলেপাক স. থেকে শুনেছিলেন, কোনো মুসলমান মুসিবতে পড়লে সে যেনো এই দোয়া পড়ে— আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখ্‌লুফ লী খাইরম মিনহা। (হে আল্লাহ! বিপদে তুমি আমাকে আশ্রয় দাও। আর এর চেয়ে উত্তম অবস্থায় স্থলাভিষিক্ত করে দাও)। হজরত আবু সালামার মৃত্যুর পর সাইয়্যেদা উম্মে সালামা এ দোয়াটিকে ওযিফা বানিয়ে নিলেন। তিনি বলেন, আমি এই দোয়াটি আমার স্বামীর বিয়োগবেদনার সময় পাঠ করতাম। বলতাম, এর চেয়ে উত্তম অবস্থায় স্থলাভিষিক্ত করে দাও। মনে মনে ভাবতাম, আবু সালামার চেয়ে উত্তম হতে পারে কে? রসুলেপাক স. এর কাছ থেকে আমি এ কথাও শুনেছিলাম যে, যে মৃত ব্যক্তির শিয়রে বসে থাকে, সে যেনো উত্তম দোয়া করে। কেননা সে সময় যে দোয়াই করা হয় ফেরেশতারা তার সঙ্গে 'আমিন' বলে। সাইয়্যেদা উম্মে সালামা বলেন, আবু সালামার যখন ইনতেকাল হলো, তখন আমি রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার স্বামী

আবু সালামা পরলোকগমন করেছেন। এখন আমি কী পাঠ করবো? রসুলেপাক স. বললেন, পড়তে থাকো ‘আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ালাহূ ওয়া আ’কিবাতী আ’কিবাতা জান্নাতান’ (হে আল্লাহ্! আমাকে এবং তাকে মাফ করে দাও। আর অবশেষে আমাকে জান্নাত দাও)। তারপর থেকে আমি এ দোয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলাম এবং আল্লাহ্তায়ালা আমাকে আবু সালামার চেয়ে উত্তম স্বামী দান করলেন। আর তিনি হলেন আখেরী নবী মোহাম্মদ মোস্তফা। আবু সালামা যখন ইনতেকাল করলেন রসুলেপাক স. উম্মে সালামার গৃহে উপস্থিত হলেন। শোক প্রকাশ করলেন। তারপর হজরত উম্মে সালামার জন্য দোয়া করলেন– হে আল্লাহ্! তার দুশ্চিন্তায় তুমি শান্তি দান করো। তার মুসিবতকে তুমি উত্তম বানিয়ে দাও এবং তাকে উত্তম বিনিময় দান করো। রসুলেপাক স. যে রকম দোয়া করেছিলেন, সে রকমই হয়েছিলো। সাইয়্যেদা উম্মে সালামা বলেন, অতঃপর রসুলেপাক স. হাতেব ইবনে আবু বুলতাআকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আমার কাছে পয়গাম পেশ করলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর উভয়েই তাঁর কাছে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সাইয়্যেদা উম্মে সালামা তাঁদের কারও পয়গামই মঞ্জুর করেননি। যখন রসুলেপাক স. এর পয়গাম এলো তখন তিনি বলে উঠলেন, ‘মারহাবাম বিরসুলিল্লাহ্’ কিন্তু আমি একজন বেশী বয়সের নারী। আমার সাথে কয়েকটি এতীম সন্তান রয়েছে এবং আমি দুর্দশাগ্রস্ত। রসুলেপাক স. বললেন, আমার বয়স তোমার বয়সের চেয়ে বেশী। তোমার এতীম সন্তানদের প্রতিপালনের যিম্মাদারী আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেন, তোমার সন্তান-সন্ততি আমারই সন্তান-সন্ততি। আমি দোয়া করি আল্লাহ্তায়ালা তোমার দুর্দশা দূর করে দিন। রসুলেপাক স. এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে সম্পাদিত হয় চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে। দশ দেরহাম মূল্যের জিনিসপত্র তাঁর জন্য মহর নির্ধারণ করা হয়েছিলো। মুমিন জননীগণের মধ্যে সর্বশেষে ৫৯ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়েছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, ৬২ হিজরীতে এযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার শাসনামলে হজরত ইমাম হুসাইনের শাহাদতের পর। প্রথম বর্ণনাটি অধিকতর বিশুদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় মতের সপক্ষে তিরমিযী শরীফে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন একজন আনসারীর স্ত্রী থেকে। তাঁর নাম ছিলো সালমা। তিনি বলেন, আমি একবার সাইয়্যেদা উম্মে সালমা এর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি ক্রন্দন করছেন। বললাম, কাঁদছেন কী কারণে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রসুলকে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর মাথা ও চেহারায় মাটি লেগে আছে এবং তিনি কাঁদছেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি ক্রন্দন করছেন কেনো? তিনি বললেন, যেখানে হুসাইনকে শহীদ করা হয়েছে, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হাদিসের বাহ্যিক বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ইমাম হুসাইনের

শাহাদতের সময় সাইয়্যেদা উম্মে সালামা জীবিত ছিলেন। তাছাড়া নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, হজরত ইমাম হুসাইনের শাহাদতের সংবাদ যখন সাইয়্যেদা উম্মে সালামার কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি হন্তারক ইরাকীদেরকে অভিশাপ দিলেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

সাইয়্যেদা উম্মে সালামাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়েছিলো। তাঁর জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন হজরত আবু হুরায়রা। কেউ কেউ বলেছেন, সাঈদ ইবনে যায়েদ। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৪ বৎসর। আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের মধ্যে দু'টি ভাগ ছিলো। এক ভাগে ছিলেন সাইয়্যেদা আয়েশা, হাফসা, সাওদা এবং সাফিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা। আরেক ভাগে ছিলেন সাইয়্যেদা উম্মে সালামা এবং অন্যান্যগণ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা। এই ভাগের নেত্রী ছিলেন সাইয়্যেদা উম্মে সালামা।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, সাইয়্যেদা উম্মে সালামাকে যখন রসুলেপাক স. বিবাহ করলেন, তখন সাইয়্যেদা যয়নব বিনতে খুযায়মার ঘরে তুললেন। ইতোমধ্যে যয়নব বিনতে খুযায়মার ওফাত হয়েছিলো। সাইয়্যেদা উম্মে সালামা ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন ঘরে রয়েছে একটি ছোটো মাটির কলসী। তাতে রয়েছে সামান্য পরিমাণ যব। আরেকটি পাথরের পাতিল এবং চাক্কি। তিনি ঘরে প্রবেশ করে সামান্য কিছু যব চাক্কিতে পিষে ময়দা তৈরী করলেন। রসুলেপাক স. যখন ঘরে এলেন, তখন ওলিমার খানা ছিলো সাইয়্যেদা উম্মে সালামার তৈরী রুটি।

বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে সাইয়্যেদা উম্মে সালামা থেকে ৩৭৮টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুত্তাফাক আলাইহে অর্থাৎ বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিস রয়েছে ১৩টি। শুধু বোখারী শরীফে ৩টি আর মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে ১০টি। অবশিষ্ট হাদিস রয়েছে অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে।

সাইয়্যেদা যয়নব বিনতে জাহাশ রা.

আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা যয়নব বিনতে জাহাশ। পূর্বে তাঁর নাম ছিলো বাররা। বাররা শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই রসুলেপাক স. এ নামটি অপছন্দ করেন। যেমন লোকে বলতে পারে 'আমি বাররার কাছ থেকে এসেছি'। অথবা বলতে পারে, এ ঘরে বাররা নেই। কেননা 'বাররা' শব্দের অর্থ কল্যাণ, নেকী ও এহসান। সুতরাং রসুলেপাক স. তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন যয়নব। তাঁর উপনাম ছিলো উম্মুল হাকাম। তাঁর মাতা ছিলেন রসুলেপাক স. এর ফুফু উমায়মা বিনতে আবদুল মুত্তালিব। প্রথমে তিনি যায়েদ ইবনে হারেছার স্ত্রী ছিলেন। যায়েদ তাঁকে তালাক দেন এবং রসুলেপাক স. তাঁকে বিবাহ করেন।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. হজরত যায়েদ ইবনে হারেছার জন্য তাঁর কাছে বিবাহের পয়গাম পাঠান। কিন্তু হজরত যয়নব বিনতে জাহাশ প্রস্তাব কবুল করতে অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করেন এবং মুখ ফিরিয়ে নেন। তার কারণ, তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন এবং ছিলেন রসুলুল্লাহ্‌র ফুফুর কন্যা। তাছাড়া তাঁর স্বভাবে ছিলো আত্মমর্যাদাবোধের প্রচণ্ড তীক্ষ্নতা ও তীব্রতা। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি যায়েদকে পছন্দ করি না। কেননা তিনি আযাদকৃত গোলাম। যয়নবের ভাই হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশও এ ব্যাপারে বোনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করলেন। রসুলেপাক স. তাঁর নবুওয়াত জাহির হওয়ার পূর্বেই হজরত যায়েদকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন তিনি স.। তাই বললেন, প্রস্তাব কবুল না করার কোনো সুযোগই নেই। মেনে নেওয়াই উচিত। তখন হজরত যয়নব নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে একটু চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দিন। এমনি কথাবার্তা চলছিলো। এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হলো – 'ওয়ামা কানা লামু'মিনিঁও ওয়ালা মু'মিনাতিন ইজা কাদাল্লাহু ওয়া রসূলুহু আমরান আইঁ ইয়াকূনা লাহুমুল খিয়ারাতু মিন আমরিহিম ওয়ামাইঁ ইয়া'সিল্লাহা ওয়া রসূলাহূ ফাকাদ দ্বাল্লা দ্বালালাম মুবীনা' (আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হইবে)(৩৩ঃ৩৬)। এই আয়াত শুনে সাইয়্যেদা যয়নব ও তাঁর ভাই উভয়েই বললেন, আমরা রাজী। আমাদের কী অধিকার আছে যে, আমরা আমাদের ইচ্ছাকে প্রতিবন্ধক বানাবো। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অবাধ্যতা করবো? তারপর তাঁর পরিবারবর্গ তাঁকে হজরত যায়েদের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিলেন। এক বছর বা তারও কিছু বেশী সময় তিনি যায়েদের সংসারে ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা রসুলেপাক স.কে জানিয়ে দিলেন, আমার চিরন্তন জ্ঞান এরকম যে, যয়নব আপনার স্ত্রী হবে। এর পর থেকে হজরত যায়েদ এবং সাইয়্যেদা যয়নবের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিলো। হজরত যয়নবের পক্ষ থেকে হজরত যায়েদের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ প্রকাশ পেতে লাগলো এবং তা সীমা ছাড়িয়ে গেলো। নিরুপায় হয়ে হজরত যায়েদ রসুলেপাক স.কে সব কথা জানালেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি মনস্থ করেছি, যয়নবকে তালাক দিয়ে দিবো। সে আমার সঙ্গে খুবই রূঢ় আচরণ করে এবং কটু কথা বলে। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি এ কাজ থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। কিন্তু রসুলেপাক স. যেহেতু আল্লাহ্‌পাকের তরফ থেকে জেনে গিয়েছিলেন যে, যয়নব তাঁর জীবনসঙ্গিনী হবেন, তাই তাঁর বক্তব্যে দৃঢ়তাও প্রকাশ পেলো না। তিনি লজ্জাবোধ করলেন। জনঅপবাদের আশংকাও ছিলো তাঁর মনে। পালিতপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করলে অপযশ তো ছড়াবেই। কেননা জাহেলী

যুগের লোকেরা ওই পুত্রবধুকে হারাম মনে করতো, যাকে তারা মুখে মুখে পুত্র বলতো। তারা পাতানো পুত্রকে ঔরসজাত পুত্রের মতোই মনে করতো। রসুলেপাক স. আশংকা করছিলেন দুর্বলচিত্ত ও কপট বিশ্বাসীদের জন্য। উলামা কেরাম বলেন, রসুলেপাক স. হজরত যায়েদকে তালাক দিতে নিষেধ করেছিলেন একারণে যে, বিষয়টি শরীয়তসম্মতভাবে সম্পূর্ণতই হজরত জায়েদের অভিপ্রায়নির্ভর। তাছাড়া তাকে পরীক্ষা করাও হয়তো ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য।

হজরত যয়নবের প্রতি হজরত যায়েদের সর্বশেষ আকর্ষণ অন্তর্হিত হয়েছে কি না– এ বিষয়েও হয়তো নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন তিনি স.। হজরত যায়েদ পুনরায় রসুলুল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! যয়নবকে আমি তালাক দিয়ে দিয়েছি। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত– 'ওয়া ইজ তাকূলু লিল্লাজী আনআমাল্লাহু আলাইহি ওয়া আনআমতা আলাইহি আমসিক আলাইকা জাওযাকা ওয়াত্তাকিল্লাহা ওয়া তুখফী ফী নাফসিকা মাল্লাহু মুবদীহি ওয়া তাখশান নাসা ওয়াল্লাহু আহাক্কু আন তাখশাহু' (স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমিও যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তুমি তাহাকে বলিতেছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যাহা গোপন করিতেছ আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন; তুমি লোক ভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত)(৩৩ঃ৩৭)। বর্ণিত আছে, হজরত যয়নবের ইদ্দত যখন পুরো হলো, তখন রসুলেপাক স. তাঁকে বিয়ের পয়গাম পাঠালেন হজরত যায়েদের মাধ্যমে। এরকম করার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এটাই ছিলো যে, লোকেরা যেনো জেনে যায় যে, হজরত যায়েদও এমতো সিদ্ধান্তের প্রতি তুষ্টচিত্ত।

তাছাড়া হজরত যায়েদকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের হুকুমের আনুগত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা এবং আল্লাহ্র হুকুমের উপর যয়নবকে সম্মত রাখাও ছিলো এমতো সিদ্ধান্তের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। কেননা বিষয়টি ছিলো প্রকৃতই একটি স্পর্শকাতর বিষয়।

রসুলেপাক স. এর নির্দেশ মতো হজরত যায়েদ বিশুদ্ধ সংকল্পের সাথে রওয়ানা দিলেন। হজরত যায়েদ বর্ণনা করেন, আমি যয়নবের ঘরে পৌঁছলাম, তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব আমাকে অভিভূত করলো। আমি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারলাম না। পিঠ ঘুরিয়ে উল্টো হয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, তুমি একথা জেনে খুশি হবে যে, রসুলুল্লাহ্ স্বয়ং আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি তোমাকে বিবাহ করবেন বলে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। হজরত যয়নব বললেন, আমি এ বিষয়ে এখন কোনো উত্তর দিতে পারবো না। আগে আমি আমার রবের কাছে পরামর্শ করে নেই। তারপর তিনি উঠলেন এবং জায়নামাজে গিয়ে সেজদায় মাথা রাখলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, দু'রাকাত নামাজ পড়ার পর সেজদায়

গেলেন এবং মোনাজাত করলেন– হে আল্লাহ্! তোমার নবী আমার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। আমি যদি তাঁর স্ত্রী হওয়ার যোগ্য হই, তাহলে আমাকে তাঁর সাথে মিলিয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দোয়া কবুল হলো। এতে করে এ কথাই বুঝা যায় যে, সাইয়্যেদা যয়নব ছিলেন আল্লাহ্পাকের প্রিয় ও নৈকট্যভাজন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো– 'ফালাম্মা কাদা যাইদুম মিনহা ওয়াতারান যাও ওয়াজ্নাকাহা লিকাই লা ইয়াকূনা আলাল মু'মিনীনা হারাজুন ফী আয্ওয়াজী আদ্ইয়াইহিম ইযা কাদাও মিনহুন্না ওয়াতারান ওয়া কানা আমরুল্লাহি মাফঊলা'। (অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলাম। যাহাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্র ছিন্ন করিলে সেইসব রমণীকে বিবাহ করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে)(৩৩ঃ৩৭)। রসুলেপাক স. মৃদু হেসে বললেন, কে যয়নবের কাছে যাবে এবং তাকে এই সুসংবাদ দিবে যে, আল্লাহ্তায়ালা তাকে আমার স্ত্রী করে দিয়েছেন। একথা বলে তিনি স. অবতীর্ণ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। রসুলেপাক স. এর খাদেমা সালমা দৌড়ে গিয়ে হজরত যয়নবকে সুসংবাদ দিলেন। সুসংবাদ শুনে হজরত যয়নব আনন্দিত হলেন। তাঁর পরিহিত অলংকারসমূহ গা থেকে খুলে সালমাকে দান করলেন এবং সেজদায়ে শুকুর (কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক সেজদা) আদায় করলেন। দু'মাস রোজা রাখার মান্নতও করলেন।

বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ্ স. সাইয়্যেদা যয়নবের ঘরে তশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি তখন ছিলেন মস্তক অনাবৃত অবস্থায়। রসুলেপাক স.কে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! রসুলেপাক স. খোতবা প্রদান ও সাক্ষী নিযুক্ত ছাড়াই হজরত যয়নবকে বিয়ে করলেন। বললেন- 'আল্লাহু মুযাওবিযু ওয়া জিবরীলু শাহিদুন' (আল্লাহ্তায়ালা বিয়ে করিয়ে দিয়েছেন আর জিবরাইল হয়েছেন সাক্ষী)। তারপর ওলিমার খানা প্রস্তুত করা হলো। লোকদেরকে পরিতৃপ্তির সাথে রুটি ও গোশত খাওয়ানো হলো। হজরত যয়নবের বিয়েতে যে রকম ওলিমা তৈরী করা হয়েছিলো, রসুলেপাক স. এর অন্য কোনো স্ত্রীর বিয়েতে সেরকম ওলিমা তৈরী করা হয়নি। তাঁর বিয়েতে জাহেলী যুগের সকল রীতি-নীতি বর্জন করে খাস শরীয়তের পদ্ধতি চালু করা হয়েছিলো। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'মুসলমানদের মনে তাদের পালকপুত্রদের স্ত্রীদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে যেনো কোনোরূপ সংকীর্ণতা না থাকে'। এ বিয়ের ঘটনার মাধ্যমে ইসলামের পর্দাপ্রথা চালু হয়েছিলো।

কোনো কোনো নবীজীবনীবিশেষজ্ঞ, তফসীরকার এবং ইতিহাসবেত্তা উক্ত ঘটনাটি এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যা বাস্তবতাবর্জিত এবং রসুলেপাক স. এর মহামর্যাদার অনুপযুক্ত। মুহাক্কিকগণ (সত্যবাদীগণ) এ ধরনের বর্ণনাকে বর্জন করাকেই সমীচীন মনে করেন। হজরত যয়নবের সঙ্গে রসুলেপাক স. এর বিয়ের

ঘটনা, হজরত ইউসুফের সঙ্গে যুলায়খার নির্জন অবস্থানের ঘটনা, হজরত দাউদের ঘটনা, হজরত সুলায়মানের আংটি হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঐতিহাসিকগণ যেভাবে বিবৃত করেছেন, মুহাক্কিকগণ তা বর্জন করেছেন এবং আদবের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সাইয়্যেদা যয়নবের ফযিলত অনেক। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, একদিন হজরত যয়নব হজরত ওমরকে কিছু রূঢ় কথা বললেন। তার কারণ হজরত ওমর রসুলেপাক স. এর সঙ্গে কোনো বিষয়ে শক্ত কথা বলেছিলেন। তখন হজরত যয়নব হজরত ওমরকে বললেন, আল্লাহ্‌র রসুলের সঙ্গে কীভাবে কথা বলছেন আপনি? রসুলেপাক স. হজরত ওমরকে নিবৃত্ত করলেন। বললেন, ওমর! তুমি তাকে কিছু বলো না। কেননা সে হচ্ছে, আওওয়াহা অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে ভীত রমণী। সেখানে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলো। সে জিজ্ঞেস করলো 'আওওয়াহা' মানে কী? রসুলেপাক স. বললেন, দোয়াতে বিনম্র হওয়া এবং আল্লাহ্‌র নিকটে কাকুতি মিনতি করা। এরপর তিনি স. এই আয়াত পাঠ করলেন– 'ইন্না ইবরাহীমা লাআও্ওয়াহুন হালীম' (নিশ্চয়ই ইব্রাহীম দোয়াতে বিনম্র ও কাকুতি মিনতিকারী এবং সহিষ্ণু)। বলাবাহুল্য, রসুলেপাক স. একথা বলে হজরত যয়নবকে উক্ত গুণের দিক দিয়ে হজরত ইব্রাহীম খলীলের মর্যাদা দান করতে চেয়েছেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, অত্যধিক পুণ্যকর্ম, সদকা খয়রাত, দরিদ্রদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন, স্বজনদের সঙ্গে সুন্দর সহাবস্থান এবং সব ধরনের ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখার দিক দিয়ে যয়নবের চেয়ে অগ্রগামী আমি আর কোনো রমণীকে দেখিনি। সাইয়্যেদা যয়নব বলেছেন, রসুলেপাক স. আমার ব্যাপারে বলতেন, আমার মধ্যে এমন কিছু ফযিলত রয়েছে, যা তাঁর অন্য স্ত্রীর মধ্যে নেই। তিনি স. বলতেন যে, ১.তোমার দাদা আর আমার দাদা এক ২. আমার বিয়ে তোমার সঙ্গে সংঘটিত হয়েছে আসমানে ৩. এতে দূত ও সাক্ষী ছিলেন জিবরাইল। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে, একদিন রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীগণকে সম্বোধন করে বললেন,'আতওয়ালাকুন্না ইয়াদান আসরু'কুন্না' (তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা, সে আমার সাথে অধিক দ্রুত গতিতে মিলিত হবে)। এ কথার তাৎপর্য এই যে, এ দুনিয়া থেকে আমার চলে যাওয়ার পর সর্বপ্রথম তাঁর ওফাত হবে। রসুলেপাক স. এর একথা বলার পর তাঁর সকল স্ত্রী বাঁশের টুকরো নিয়ে আপন আপন হাত মেপে ছিলেন তাঁদের মধ্যে কার হাত সবচেয়ে লম্বা তা জানার জন্য। তাঁরা অবশ্য আগে থেকেই জানতেন যে, সাইয়্যেদা সাওদা বিনতে যামআর হাত সবচেয়ে বেশী লম্বা ছিলো। রসুলেপাক স. এর ওফাতের পর সর্বপ্রথম যখন সাইয়্যেদা যয়নবের ইনতেকাল হলো, তখন তাঁরা রসুলেপাক স. এর কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা তখন জানতে পেরেছিলেন, সাইয়্যেদা যয়নবের হাত লম্বা ছিলো দান খয়রাত ও সৎকর্ম সম্পাদনের দিক দিয়ে।

বর্ণিত হয়েছে, সাইয়্যেদা যয়নবের ইনতেকালের সংবাদ যখন হজরত আয়েশা সিদ্দীকার কাছে পৌঁছলো, তিনি মন্তব্য করলেন, নন্দিত স্বভাবের অধিকারিণী, পরোপকারকারিণী, এতীম ও বিধবাদের খোঁজ খবরকারিণী দুনিয়া থেকে চলে গেলো। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান এবং তিনি ঘোষণা করে দেন যেনো মদীনাবাসীরা তাদের মায়ের জানাযায় হাজির হয়। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়েছিলো। সুবিদিত বর্ণনা মতে তাঁর ওফাত হয়েছিলো হিজরতের বিশতম বৎসরে। কেউ কেউ বলেছেন, একুশতম বৎসরে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৫৩ বৎসর। তাঁর কাছ থেকে এগারোটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুত্তাফাক আলাইহি হাদিস দু'টি। বাদবাকী নয়টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে।

সাইয়্যেদা জোয়ায়রিয়া বিনতে হারেছ রা.

রসুলেপাক স. এর স্ত্রীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাইয়্যেদা জোয়ায়রিয়া বিনতে হারেছ ইবনে আবু যারার। তাঁর আসল নাম ছিলো াররা। রসুলেপাক স. তাঁর এই নাম পরিবর্তন করে নাম রেখেছিলেন জোয়ায়রিয়া। সাইয়্যেদা জোয়ায়রিয়া রা. খুবই ইবাদতগোজার এবং জিকিরকারী ছিলেন। নবীজীবনী-বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুলেপাক স. ফজরের নামাজের পর সাইয়্যেদা জোয়ায়রিয়ার কাছ থেকে বাইরে কোথাও তশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি তখন তাঁর জায়নামাযে বসে ইবাদতের মধ্যে মশগুল ছিলেন। রসুলেপাক স. চাশতের সময় তাঁর কাছে ফিরে এলেন। দেখলেন, তখনও তিনি জায়নামাজেই বসে আছেন। তিনি স. বললেন, তখন থেকে কি তুমি এভাবেই আছো? সাইয়্যেদা জোয়ায়রিয়া বললেন, হাঁ। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে পৃথক হবার পর চারটি কলেমা পাঠ করেছি। তুমি যে আমল করেছো, সেই আমলকে যদি ওই চার কলেমার বিপরীতে ওজন করা হয়, তবে অবশ্য ওই কলেমার ওজনই বেশী হবে। সেই চার কলেমা হচ্ছে– 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী আদাদা খালকিহী ওয়া নাফসিহী ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী'। সম্ভবতঃ রসুলেপাক স. এই কলেমাসমূহের ফযিলত বুঝাতেই এরকম বলেছেন, যাতে তিনি তাঁর ওযিফার মধ্যে তা শামিল করে নেন অথবা আসলেই এই কলেমাসমূহের সওয়াবের পরিমাণ সাইয়্যেদা জোয়ায়রিয়ার কৃত আমলের চেয়ে বেশী। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পরিশ্রমের পরিমাণ অনুসারে আমলের সওয়াবের তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন কেউ বললো– আল্লাহুম্মা সল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আলফা মার্‌রাতিন (হে আল্লাহ! মোহাম্মদের উপর এক হাজার বার দরুদ প্রেরণ করো)। আবার অন্য একজন এই দরুদটি এক হাজার বার পাঠ করলো। তবে শেষোক্ত ব্যক্তির সওয়াব অবশ্যই প্রথমোক্ত ব্যক্তির চেয়ে

বেশী হবে। তবে হাঁ, কোনো বিশেষ পরিপূর্ণ অবস্থা যদি হয়, আর অবস্থাটি যদি চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রাবল্যের উপর শামিল হয়, আমলকারীর উপর যদি তার হাকীকত (প্রকৃত তত্ত্ব) প্রকাশিত হয় এবং সেই হাকীকতের আলোকে যদি কেউ ওরকম বলে থাকে, যেমন রসুলেপাক স. বলেছেন, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে– 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি বাইনাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ' (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসা আসমান যমীন ভরে)। কেউ যদি এই কলেমা পাঠ করে তাহলে তার ওই পরিমাণ সওয়াবই হতে পারে। কেননা রসুলেপাক স. এর নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসার হাকীকত উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে যে, এই কলেমা দ্বারা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসায় সত্যিই আসমান-যমীন ভরপুর হয়ে যায়। এটি শুধু মৌখিক প্রকাশ মাত্র নয়। আল্লাহ্‌তায়ালার ফযল তো প্রশস্ত। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে এই শব্দসমূহের মধ্যেই উক্ত বরকত দান করতে পূর্ণরূপে সক্ষম। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. শুক্রবার দিন সাইয়্যেদা জোয়ায়রিয়ার সঙ্গে বাসর যাপন করেছিলেন। তখন তিনি রোজাদার ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে বললেন, তুমি রোজা ভেঙেই ফেলো। এ থেকে বুঝা যায়, শুধু শুক্রবার দিন রোজা রাখা মাকরুহ। উলামা কেরামের মাযহাব তাই। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তোমাদের কেউ যেনো শুধু জুমার দিন রোজা না রাখে। তার পূর্বে অথবা পরে একটি করে রোজা মিলিয়ে নেয়। কোনো কোনো আলেম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এদ্বারা মূলতঃ রোজা রাখা থেকে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে শরীর দুর্বল না হয় এবং জুমার দিনের অন্যান্য আমল আদায় করতে পারে। যেমন দুর্বল লোকদের জন্য আরাফার দিনে রোজা না রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। উলামা কেরাম বলেছেন, এধরনের ব্যাখ্যা খুবই দুর্বল। জুমার দিনের পূর্বে এবং পরে যে রোজা রাখার কথা বলা হয়েছে, তার সাথে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। কেননা লাগাতার দু'দিন বা তার চেয়ে বেশী দিন রোজা রাখলে তো শরীর আরও বেশী দুর্বল হতে পারে। উলামা কেরাম আরও বলেছেন, জুমার দিন রোজা রাখার যে বিধান আছে, তা জুমার দিনের কোনো আমলে যদি ক্রটি সৃষ্টি হয়, তার ক্ষতিপূরণ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, জুমার দিনের অনেক ফযিলত রয়েছে। তৎসত্ত্বেও আমলের ক্ষেত্রে শরীয়ত যতোটুকু অনুমোদন দিয়েছে, তাতে অতিরঞ্জিত অনভিপ্রেত। এরকম করলে এই দিনের সামগ্রিক ফযিলত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ইহুদী ও নাসারাদের সঙ্গে সাদৃশ্যও ফুটে ওঠে। কেননা তারা নির্দিষ্ট দিবসের সম্মান করে। যেমন শনিবারকে ইহুদীরা এবং রবিবারকে নাসারারা। তাছাড়া শুক্রবার হচ্ছে ঈদের দিন। হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। সুতরাং এদিন রোজা রাখা সমীচীন নয়। আর সুনির্ধারিত করা তো সঙ্গতই নয়।

শায়েখ মোহাক্কেক আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী বলেন, এই নিষিদ্ধতা দ্বারা এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বান্দাকে মাওলার ইবাদতে সর্বদাই মশগুল থাকতে হবে। জুমার রাতকে কিয়ামের জন্য খাস করে নেওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। ইমাম মালেক বলেছেন, আমি এমন কোনো আলেমকে পাইনি যিনি বলেছেন, শুধুমাত্র জুমার দিন রোজা রাখা মাকরুহ। ইমাম নববী বলেছেন, এ বিষয়ে সহীহ্ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তা যদি কারও কাছে পৌঁছে না থাকে, তাহলে আমরা কী করবো? এ নিষিদ্ধতা সম্পর্কে সহীহ্ হাদিস পাওয়ার পরও তারা এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয় না। উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা জোয়ায়রিয়ার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনাটি দীর্ঘায়িত হয়ে গেলো। এখন আমরা মূল আলোচনার দিকে অগ্রসর হতে পারি।

প্রকাশ থাকে যে, রসুলেপাক স. উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা জোয়ায়রিয়াকে আশা করেছিলেন মুরাইসির যুদ্ধের সময়, যা ৫ম হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। এই যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসুলেপাক স. তাঁকে কামনা করেছিলেন। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, জোয়ায়রিয়া বিনতে হারেছ ছিলেন মিষ্টিভাষিণী ও লাবণ্যময়ী। কেউ তাঁকে দেখলে অভিভূত হয়ে যেতো। যুদ্ধশেষে গনিমতের মাল বণ্টন সমাপ্ত হলো। রসুলেপাক স. একটি কূপের পাশে দাঁড়ালেন। এমন সময় হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন জোয়ায়রিয়া। আমার মধ্যে জ্বলে উঠলো মর্যাদাবোধের আগুন। ভাবলাম, রসুলুল্লাহ্ তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিদান করবেন না তো। বিবাহ করতে চাইবেন না তো। জোয়ায়রিয়া বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি মুসলমান হয়েছি। তিনি উচ্চারণ করলেন 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া ইন্নাকা রসুলিহি'। আমি হারেছ ইবনে আবু যারারের কন্যা। তিনি এই জনপদের নেতা। এখন তিনি ইসলামী সৈন্যদের হাতে বন্দী এবং তিনি পড়েছেন ছাবেত ইবনে কায়েসের ভাগে। আর ছাবেত ইবনে কায়েস আমাকেও মুকাতাব বাঁদী বানিয়েছেন। তিনি আমার ভাগে এতো বেশী পরিমাণে মাল ধার্য করে দিয়েছেন যে, তা পরিশোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনুগ্রহপূর্বক আমার মুক্তির বিষয়ে সাহায্য করুন। রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ। আমিই পরিশোধ করবো। এর চেয়েও ভালো আচরণ করবো। সাইয়্যেদা জোয়ায়রিয়া বললেন, এর চেয়েও ভালো– একথার অর্থ কী? রসুলেপাক স. বললেন, তোমাকে মুক্ত করতে যতো অর্থের প্রয়োজন, ততো অর্থই আমি দেবো এবং আমি তোমাকে গ্রহণ করবো। দেবো স্ত্রীর মর্যাদা। রসুলেপাক স. কোনো একজনকে হজরত ছাবেত ইবনে কায়েসের কাছে পাঠালেন। তাঁর মাধ্যমে মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করলেন। আর তাঁকে বিবাহের জন্য মহর নির্ধারণ করলেন চারশত দেরহাম। এক বর্ণনায় এসেছে, বনী মুস্তালিকের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়াই ছিলো হজরত জোয়ায়রিয়ার বিবাহের মহর। সে সময় তাঁর বয়স

হয়েছিলো বিশ বছর। প্রধান সাহাবীগণ যখন বিষয়টি জানলেন, তাঁরা বলতে লাগলেন, সাইয়্যেদে আলম হেরেমের বংশধর। তাঁর শশুরকুলের কেউ আমাদের কাছে বন্দী অথবা ক্রীতদাস হয়ে থাকবেন কেমন করে? তারপর তাঁরা এক এক করে সকলকেই মুক্ত করে দিলেন। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, বনী মুস্তালিকের বন্দীর সংখ্যা ছিলো মোট একশ'র অধিক। তারা সকলেই এভাবে মুক্তি পেয়েছিলো। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্‌র স্ত্রীগণের মধ্যে আমি জানি না জোয়ায়রিয়ার চেয়ে অধিক খায়ের বরকতময় আর কেউ আছে কিনা।

সাইয়্যেদা জোয়ায়রিয়া বলেছেন, রসুলুল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হওয়ার পূর্বে আমি আমার জনপদে থাকা অবস্থায় একদিন স্বপ্নে দেখলাম, ইয়াসরিবের দিক থেকে একটি চাঁদ আমার কোলে নেমে এলো। আমি আমার এই স্বপ্নের কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি। যখন জানলাম, তখন নিজে নিজেই এর অর্থ করলাম এবং আলহামদুলিল্লাহ্! আমি যা বুঝেছিলাম, শেষে তাই হলো।

সাইয়্যেদা জোয়ায়রিয়ার ওফাত হয়েছিলো মদীনায় ৫০ অথবা মতান্তরে ৫৬ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৫ বৎসর। তাঁর নামাজে জানাযা পড়িয়েছিলেন আমীর মুয়াবিয়া কর্তৃক নির্বাচিত মদীনার প্রশাসক মারওয়ান। গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে তাঁর কাছ থেকে ৭টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে বোখারীতে দু'টি এবং মুসলিম শরীফে দু'টি। আর বাকীগুলো বর্ণিত হয়েছে অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে।

সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা রা.

আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাতের অন্যতম ছিলেন হজরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান। আবু সুফিয়ান হচ্ছেন হারবের পুত্র। তিনি উমাইয়ার পুত্র। তিনি আবদে শামসের পুত্র। তিনি আবদে মানাফের পুত্র। তাঁর নাম ছিলো রামলা। এক বর্ণনা মতে তাঁর নাম ছিলো হিন্দা। তাঁর মাতার নাম সফিয়া বিনতে আবুল আস। তিনি উমাইয়ার পুত্র, তিনি আবদে শামসের পুত্র। তিনি ছিলেন হজরত ওছমান ইবনে আফ্‌ফান ইবনে আসের ফুফু।

সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা প্রথমে উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশের স্ত্রী ছিলেন। প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমান হয়েছিলেন এবং হাবশার দিকে দ্বিতীয় হিজরত করেছিলেন। উবায়দুল্লাহ থেকে এক কন্যা সন্তান হয়েছিলো তাঁর। তার নাম ছিলো হাবীবা। তাই তাঁর উপনাম হয়েছিলো উম্মে হাবীবা। পরে উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। মদ্যপানে লিপ্ত হয় এবং মাতাল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা বলেন, আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম, কে যেনো আমাকে 'হে উম্মুল মুমিনীন' বলে ডাকছে। আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করলাম– রসুলুল্লাহ্ আমাকে বিবাহ করবেন। তারপর রসুলেপাক স. আমর ইবনে উমাইয়্যা

যামরীকে নাজ্জাশীর কাছে পাঠিয়ে উম্মে হাবীবার বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আসকে ওকীল বানালেন। হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব এবং হাবশায় হিজরতকারী তাঁর সঙ্গি-সাথীগণ সকলেই বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন। নাজ্জাশী বিয়ের খোতবা পাঠ করলেন– আল হামদু লিল্লাহিল মালিকিল কুদ্দূসুস্ সালামুল্ মু'মিনুল মুহায়মিনুল আজীজুল জাব্বারু- আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রসূলুহূ আরসালাহূ বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইউজহিরাহূ আলাদ্ দ্বীনি কুল্লিহি ওয়ালাও কারিহাল মুশরিকূন– আম্মা বা'দ ফাকাদ আজিবতা ইলা মা দা'আ ইলাইহি রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া কাদ আস্দাক্তাহা আরবা'আ মিআতা দীনারান যাহাবান। খোতবা পাঠের পর নাজ্জাশী মহরস্বরূপ আনীত চারশ দীনার উপস্থিত সকলের সামনে ঢেলে দিলেন। তারপর সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ওকীল হজরত খালেদ ইবনে সাঈদ বললেন– আল হামদু লিল্লাহি আহমাদুহু ওয়া আস্তাইনুহূ ওয়াস্ তাগফিরুল্লাহা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রসূলুহূ আর সালাহূ বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইউয্হিরাহূ আলাদ্ দ্বীনি কুল্লিহী ওয়ালাও কারিহাল মুশরিকূন আম্মাবা'দ ফাক্বাদ উজিবতা ইলা মা দাআ রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাওজাতাহ উম্মি হাবীবা বিনতি আবী সুফিয়ান ফাতাবারাকাল্লাহূ লিরসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। খোতবা পাঠ শেষ হলো। নাজ্জাশী দীনারগুলো খালিদ ইবনে সাঈদের কাছে হস্তান্তর করলেন। দীনারসমূহ নিয়ে তিনি চলে যাবার উপক্রম করতেই নাজ্জাশী বললেন, বসুন! আম্বিয়া কেরামের সুন্নত হচ্ছে বিবাহের মজলিশে পানাহারের ব্যবস্থা করা। নাজ্জাশী পানাহারের ব্যবস্থা করলেন। পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহার সম্পন্ন করে সকলেই বিবাহের অনুষ্ঠান থেকে বিদায় হলেন। 'মাওয়াহেবে' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে।

সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবার পিতা আবু সুফিয়ান তখন আল্লাহর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী। সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের সঙ্গে যে আচরণ করেছিলেন, সে ঘটনা সর্বজনবিদিত। হুদায়বিয়ার সন্ধি নবায়নের উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান মদীনায় এলো। কন্যা সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলো তাঁর প্রকোষ্ঠে। বসতে চাইলো রসুলেপাক স. এর বিছানায়। কিন্তু সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা তাকে সেখানে বসতে দিলেন না। পিতাকে সরাসরি বললেন, আপনি মুশরিক, অপবিত্র। এই পবিত্র শয্যা আল্লাহ্র রসুলের। এর উপরে উপবেশন করতে আপনি পারেন না।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, অন্তিমযাত্রাকালে সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা সাইয়্যেদা আয়েশা ও সাইয়্যেদা উম্মে সালামাকে বললেন, তোমরা আমাকে ওই সকল বিষয়ে ক্ষমা করে দাও, যা এক স্বামীর বিভিন্ন স্ত্রীগণের মধ্যে সংঘটিত হয়ে

থাকে। ওই ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, যা আমার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে, তা মাফ করে দাও। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমার এই অপরাধবোধের বোঝা লাঘব করে দিন। তোমাকে ক্ষমা করে দিন। আমরাও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে খুশি করুন, যেহেতু তোমরা আমাকে খুশি করে দিলে।

উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবা ছিলেন পবিত্র স্বভাব ও প্রশংসিত চরিত্রের অধিকারিণী, দানশীল এবং উঁচু হিম্মতের গুণে গুণান্বিতা। তাঁর পরলোকগমন হয়েছিলো ৪০ অথবা ৪৪ হিজরীতে মদীনায়। এটাই বিশুদ্ধ মত। অন্য এক মতানুসারে তাঁর তিরোভাব ঘটেছিলো শামদেশে। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে ৬৫টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাক আলাইহি হাদিস দু'টি। এককভাবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে একটি। আর বাদবাকী হাদিস বর্ণিত হয়েছে অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে।

সাইয়্যেদা সাফিয়া বিনতে হুয়াই

আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের অন্যতমা সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব ছিলেন বনী ইসরাইলের বনু নযীর গোত্রের। প্রথমে তিনি সালাম ইবনে মুসলিমের স্ত্রী ছিলেন। তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর কেনানা ইবনে রবী ইবনে আবুল হাকীকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কেনানাকে খয়বরযুদ্ধে হত্যা করা হয়। খয়বর বিজয়ের পর হজরত সাফিয়া যুদ্ধবন্দীদের সাথে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। রসুলেপাক স. তখন তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করেন।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত সাফিয়াকে রসুলেপাক স. এর দরবারে আনা হলো। তিনি স. বললেন, তাকে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে যাও। তারপর রসুলেপাক স. তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করলেন। হজরত সাফিয়া রসুলেপাক স.কে দেখে দাঁড়ালেন। রসুলেপাক স. এর জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলেন। নিজে বসলেন মাটিতে। রসুলেপাক স. বললেন, হে সাফিয়া! তোমার পিতা সব সময়ই আমার সঙ্গে দুশমনী পোষণ করে আসছিলো। শেষে আল্লাহ্তায়ালাই চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিলেন। হজরত সাফিয়া বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কোনো বান্দার গোনাহ্র জন্য অন্য বান্দাকে পাকড়াও করেন না। সাইয়্যেদে আলম স. তখন তাঁকে এই স্বাধীনতা দিলেন যে, ইচ্ছা করলে তিনি মুক্ত হয়ে আপন কওমের কাছে চলে যেতে পারেন, অথবা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করতে পারেন এবং রসুলেপাক স. এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন। হজরত সাফিয়া ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী এবং ধীরস্থির স্বভাবের। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা রাখি। আর আপনার আহ্বানের পূর্বেই আমি আপনাকে বিশ্বাস

করেছি। এখন রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। কুফর ও ইসলামের মধ্যে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার এখতিয়ারও আমাকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুল আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। হজরত সাফিয়াকে এমতো স্বাধীনতা দানের উদ্দেশ্য হয়তো ছিলো তাঁকে পরীক্ষা করা এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা যাচাই করা। প্রকৃতপক্ষে কুফর ও ইসলামের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া নয়। তারপর রসুলেপাক স. তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাঁকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে নিলেন।

তাঁর জন্য মহর ধার্য করা হলো তাঁর মুক্তিকে। রসুলেপাক স. খয়বর থেকে প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তাঁর জন্য ছওয়ারী আনা হলো। তিনি তাঁর পবিত্র পদযুগল ছওয়ারীর উপর রাখলেন, যাতে হজরত সফিয়া তাঁর পা দু'খানা রসুলেপাক স. এর পায়ের উপর রাখতে পারেন। কিন্তু হজরত সাফিয়া আদব-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখলেন এবং তাঁর জানুকে রসুলেপাক স. এর রানের উপর রেখে ছওয়ার হলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে ছওয়ারীর উপর নিজের পিছনে বসিয়ে নিলেন এবং হাওদার মধ্যে পর্দা টানিয়ে দিলেন। পথ চলতে চলতে একবার রসুলেপাক স. এর উটটি মাটিতে হোঁচট খেলো। তাঁরা দু'জনেই মাটিতে পড়ে গেলেন। কিন্তু কারও দৃষ্টিই রসুলেপাক স. এবং হজরত সাফিয়ার প্রতি পড়লো না। রসুলেপাক স. উঠে হজরত সফিয়াকে পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত করে নিলেন।

পথিমধ্যে এক স্থানে রসুলেপাক স. সাইয়্যেদা সাফিয়ার সঙ্গে বাসর যাপন করলেন। সাহাবীগণকে বললেন, তোমাদের কাছে যে সকল খাদ্য আছে সেগুলোকে একত্রিত করো। সকলে নির্দেশ পালন করলেন। তা দিয়ে হায়স (খিচুড়ি) রান্না করা হলো। রসুলেপাক স. এর বরকতে এবং তাঁর মোজেযায় সকলে পেট ভরে আহার করলেন। হজরত সাফিয়ার ওলীমা রসুলেপাক স. এর নিকট ছিলো সম্মান ও জৌলুশপূর্ণ। রসুলেপাক স. তাঁর প্রতি খুবই অনুগ্রহ করতেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা তাঁর প্রতি সপত্নীসুলভ হিংসা পোষণ করতেন। বর্ণিত আছে, একদিন সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা রসুলেপাক স. এর কাছে সাইয়্যেদা সাফিয়া সম্পর্কে যে কোনো বিষয়ে অনুযোগ উত্থাপন করলেন। বললেন, সাফিয়াইতো আপনার জন্য যথেষ্ট। সে তো এরকম ওরকম। এভাবে ইঙ্গিত করলেন যে, সাফিয়া তো এরকম খর্ব দেহের অধিকারিণী। রসুলেপাক স. বললেন, হে আয়েশা! তোমার কথা যদি সাগরে নিক্ষেপ করা হয়, তবে সাগরের পানি বিবর্ণ হয়ে যাবে। বর্ণিত আছে, একবার সাইয়্যেদা সাফিয়ার পালার দিন রসুলেপাক স. তাঁর কাছে এলেন। দেখলেন সাইয়্যেদা সাফিয়া ক্রন্দন করছেন। রসুলেপাক স. তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি নিবেদন করলেন, আয়েশা এবং হাফসা আমাকে কষ্ট দেয়। বলে, তাঁরা নাকি আমার চেয়ে উত্তম। কারণ তাঁরা আপনার বংশের। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি বললে না কেনো যে,

তোমরা আমার চেয়ে উত্তম কীভাবে হলে? আমার আদী পিতা তো নবী হারুন। আর রসুল মুসা আমার পিতৃব্য।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এর সঙ্গে এক সফরে ছিলেন সাফিয়া। পথ চলতে চলতে এক সময় উটটি থেমে গেলো। যয়নবের সঙ্গে ছিলো একটি অতিরিক্ত উট। রসুলুল্লাহ্ যয়নবকে বললেন, সাফিয়ার উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তোমার উটটি তাকে দিয়ে দাও, সে যেনো গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যয়নব বললেন, আমি এই ইহুদী মহিলাকে কোনো কিছুই দিবো না। রসুলেপাক স. রোষান্বিত হলেন। দুই বা তিন মাস তাঁর সাথে যোগাযোগ বন্ধ রাখলেন। এর মধ্যে তাঁর কাছেও গেলেন না। উম্মুল মুমিনীনগণের সঙ্গে রসুলেপাক স. এর আদব ও শাসন এমন ছিলো যে, তাঁরা একে অপরকে বেশী মহব্বত করলেও আপন আপন অধিকারের ব্যাপারে কেউ কাউকে ছাড় দিতেন না।

বর্ণিত আছে, হজরত সাফিয়া যখন মদীনায় পৌঁছলেন, তখন আনসারী মহিলাগণ তাঁকে দেখার জন্য ভীড় জমালেন। তাঁরা তাঁর রূপ-সৌন্দর্যের কথা আগে থেকেই জানতেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা হাজির হলেন নেকাবে মুখ ঢেকে চাদর পরিধান করে। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ স. তাঁকে দেখে চিনে ফেললেন। ফেরার সময় তিনি তাঁর পিছনে পিছনে এসে চাদর সরিয়ে বললেন, হে হুমায়রা! সাফিয়াকে কেমন দেখলে? তিনি বললেন, ইহুদী রমণীদের মধ্যে একটি ইহুদিনী বসে আছে। রসুলেপাক স. বললেন, হে আয়েশা! তুমি এরকম কথা বলছো কেনো? সে তো এখন মুসলমান। তার ইসলাম গ্রহণ সুন্দর ও গ্রহণীয়।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. এর অন্তিম অসুস্থতার কালে উম্মুল মুমিনীনগণ সকলেই একত্রিত হলেন। হজরত সাফিয়া নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্র শপথ! আপনার রোগটি যেনো আমার হয়ে যায়। একথা শুনে আযওয়াজে মুতাহ্হারাত সকলেই একে অপরের ব্যাপারে পরোক্ষে সমালোচনায় লিপ্ত হলেন। রসুলেপাক স. একথা জানতে পেরে মনোক্ষুণ্ন হলেন। বললেন, আল্লাহর শপথ! সাফিয়া তার দাবীতে সত্যবাদিনী।

উম্মুল মুমিনীন হজরত সাফিয়ার ওফাত হয়েছিলো ৩৬ হিজরীতে। এক বর্ণনামতে ৫২ হিজরীতে। আবার আরেক বর্ণনামতে ৫৫ হিজরীতে। এরকমও একটি বর্ণনা আছে যে, হজরত ওমরের খেলাফতকালে তাঁর ইনতেকাল হয় এবং হজরত ওমর ফারুক তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান। তাঁর নিকট থেকে দশটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদিস মুত্তাফাক আলাইহি। বাদবাকীগুলো অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে রয়েছে।

সাইয়্যেদা মায়মুনা রা.

রসুলেপাক স. এর পুত পবিত্রা স্ত্রীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা বিনতে হারেছ। আমের ও হেলাল গোত্রভূতা ছিলেন তিনি। তাঁর মাতার

নাম ছিলো হিন্দা বিনতে আউফ। তিনি ছিলেন হিময়ার গোত্রের। এক বর্ণনামতে ছিলেন কেনানা গোত্রের। তাঁর নামও ছিলো বাররাহ। রসুলেপাক স. তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন মায়মুনা। এটি 'ইউমনু' শব্দ থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ বরকত। হজরত মায়মুনার মাতা হিন্দা এমন জামাতা পেয়েছিলেন, যা অন্য কেউই পাননি। কেননা তাঁর এক জামাতা ছিলেন সাইয়্যেদে আলম রসুলেপাক স.। আর দ্বিতীয় জামাতা ছিলেন হজরত আব্বাস। হজরত মায়মুনার বোন যার নাম ছিলো উম্মুল ফযল, তাঁকে হজরত আব্বাস বিয়ে করেছিলেন। হজরত মায়মুনার পিতা হারেছের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পূর্বে হিন্দার আর এক জনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো। তাঁর নাম উমায়স খাসআনী। তাঁর ঔরস থেকে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলো। তাঁদের একজনের নাম আসমা বিনতে উমায়স। তিনি ছিলেন রূপসী। প্রথমে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের সঙ্গে। হজরত জাফরের শাহাদতের পর হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের ইনতেকালের পর হজরত আলী রা. তাঁকে বিয়ে করেন। হজরত আসমার সকল স্বামী পক্ষেরই সন্তান ছিলো। হজরত জাফর থেকে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর এবং হজরত আলী থেকে আউন ইবনে আলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হজরত আসমার আরেক বোন ছিলেন হজরত যয়নব বিনতে উমায়স। তাঁকে বিয়ে করেছিলেন হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তাঁর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আম্মারা বিনতে হামযা। তাঁকে লালন পালন করেছিলেন হজরত জাফর। কেননা তাঁর খালা আসমা বিনতে উমায়েস হজরত জাফরের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর আরেকটি বোন ছিলো। তাঁর নাম সালমা বিনতে উমায়েস, যিনি ছিলেন শাদ্দাদ ইবনে ইলহাদের স্ত্রী। তাঁরা ছিলেন চার বোন। আর জামাতা ছিলেন ছয়জন। হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের পিতা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাও ছিলো তাঁর জামাতা। তাকে অবশ্য জামাতাদের দলে গণ্য করা হয় না। কারণ সে মুশরিক ছিলো। হজরত খালেদের মাতার নাম ছিলো লুবাবা বিনতে হারেছ। তিনি ছিলেন হজরত মায়মুনার বোন। আর হজরত মায়মুনা হচ্ছেন রসুলেপাক স. এর স্ত্রী। এই লুবাবাকে লুবাবা সুগরা বলা হয়। আবার হজরত উম্মুল ফযলের কন্যার নামও ছিলো লুবাবা। তাঁকে বলা হতো লুবাবা কুবরা।

হজরত মায়মুনা জাহেলিয়াতের যুগে মাসউদ ইবনে ওমর ছাকাফীর স্ত্রী ছিলেন। পারস্পরিক বনী বনা না হওয়ার কারণে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। তারপর আবু রুহম বা অন্য কোনো একজনের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। তারপর রসুলেপাক স. তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। তখন ছিলো ৭ম হিজরীর যিলক্বদ মাস। ওমরাতুল কাযার সময়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, হজরত মায়মুনার বিবাহ বাসর ও ওফাত একই স্থানে হয়েছিলো। জায়গাটির নাম সারেফ। স্থানটি মক্কা থেকে দুই

মাইল দূরে অবস্থিত। এখন পর্যন্ত (চারশ বছর পূর্বে এ কিতাব রচনাকালে) এখানে হজরত ময়মুনার মাজার রয়েছে। নজদীরা তাঁর মাজার শরীফকে ধ্বংস করে দিয়েছে নাকি দেয়নি তা নিশ্চিত জানা যায় না। ওয়াল্লহু আ'লাম। রসুলেপাক স. কখন তাঁকে বিয়ে করেন তা নিয়ে দু'রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। হজরত মায়মুনাকে বিয়ে করার সময় রসুলেপাক স. এহরাম অবস্থায় ছিলেন অথবা ছিলেন এহরামমুক্ত। দু'রকম বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে উলামা কেরামের মধ্য এহরামকারী বিবাহ করতে পারেন কি না সে সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের অভিমত এই যে, এহরাম অবস্থায় বিয়ের আকদ হওয়া জায়েয। দু'টি বর্ণনার মধ্যে যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেয়া এবং এ বিষয়ে সত্যাসত্য নিরূপণ করার বিষয়টি উসুলে ফেকাহ্র মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ অভিমতানুসারে সাইয়্যেদা মায়মুনার ওফাত হয়েছিলো ৫১ হিজরীতে। তাছাড়া বিভিন্ন মতানুসারে ৬১, ৬৩ এবং ৬৬ হিজরীতে। সর্বশেষ বর্ণনা অনুসারে সাইয়্যেদা মায়মুনাই ছিলেন রসুলেপাক স. এর সর্বশেষ সহধর্মিণী, যিনি এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন সকলের শেষে। কিন্তু বিখ্যাত বর্ণনা এরকম যে, সাইয়্যেদা উম্মে সালামা পরলোকগমন করেন সকলের শেষে। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত মায়মুনার পরকাল যাত্রা ঘটেছিলো ৩৭ হিজরীতে আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদেনা আলী মুর্তযার খেলাফতকালে। হজরত মায়মুনার পরে রসুলেপাক স. আর কাউকে বিবাহ করেননি। তাঁর নামাজে জানাযা পড়েছিলেন তাঁরই বোনের ছেলে হজরত ইবনে আব্বাস। তিনি এবং তাঁর সাথে অন্যান্য বোনের ছেলেগণ তাঁকে কবরে নামিয়েছিলেন। সাইয়্যেদা মায়মুনা বলেছেন, আমার পালার এক রাত্রে রসুলুল্লাহ্ আমার কাছ থেকে বাইরে কোথাও গেলেন। আমি উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ফিরে এলেন এবং দরজায় করাঘাত করলেন। আমি দরজা খুললাম না। রসুলেপাক স. আমাকে কসম দিয়ে আমাকে খুশি করে বললেন, দরজা খোলো। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পালার রাত্রে আপনি অন্য স্ত্রীর কাছে চলে যান কেনো? তিনি স. বললেন, এমন ঘটনাতো ঘটেনি। আমি বাইরে গিয়েছিলাম প্রাকৃতিক প্রয়োজনে। বাহ্যিকভাবে এই হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কসম করা এবং তার প্রতি গুরুত্ব দেয়া রসুলেপাক স. এর উপর ওয়াজিব ছিলো। কেননা হজরত মায়মুনা ব্যথিত হয়েছিলেন। রসুলেপাক স. তাই কৈফিয়ত দিয়েছিলেন। এটি হচ্ছে শাফেয়ী মাযহাবের মত। এ বিষয়ে হানাফী অভিমত হচ্ছে, কসমের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি ছিলো রসুলুল্লাহ্ স. এর নিছক অনুগ্রহ। আর তিনি তার প্রতি এতোবেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে, তাতে মনে হয়েছে কসম তাঁর উপর ওয়াজিব ছিলো।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, হজরত মায়মুনা রসুলেপাক স. এর এমন স্ত্রী ছিলেন, যিনি তাঁর নিজেকে সম্প্রদান করে দিয়েছিলেন রসুলেপাক স. এর জন্য,

যখন তাঁর কাছে রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে পয়গাম পৌঁছেছিলো। বর্ণিত আছে, তখন তিনি উটের উপর আরোহণ করা অবস্থায় ছিলেন। পয়গাম পেয়ে তিনি বলেছিলেন, উট এবং উটের উপর যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের। তাঁর এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়– 'ওয়াম্‌রাআতাম মু'মিনাতান ইওঁ ওয়াহাবাত নাফসাহা লিন্ নাবিয়্যি ইন আরাদান নাবিয়্যু আইঁ ইয়াস্‌তান্‌কিহাহা' (এবং কোন মু'মিন নারী নবীর নিকটে নিজেকে নিবেদন করিলে এবং নবী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে সেও বৈধ) (৩৩ঃ৫০)। এটি ছিলো রসুলেপাক স. এর জন্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'খলিসাতাল লাকা মিন দূনিল মু'মিনীন' (ইহা বিশেষ করিয়া তোমারই জন্য অন্য মু'মিনের জন্য নহে) (৩৩ঃ৫০)। এক বর্ণনায় রয়েছে, রসুলেপাক স. এর যে স্ত্রী তাঁর জন্য নিজকে হেবা করে দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন যয়নব বিনতে জাহাশ। তাঁর বিয়ে সংঘটিত হয়েছিলো আসমানে। কেউ কেউ বলেছেন, রসুলেপাক স. এর জন্য যে রমণী নিজকে হেবা করে দিয়েছিলো তিনি ছিলেন বনী আমের গোত্রের অপর এক রমণী। নাম ছিলো উম্মে শুরায়ক। আসল নাম ছিলো উয়াই বিনতে জাবের ইবনে আউফ ইবনে আমের ইবনে লুয়াই। কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ছিলো বিনতে দাউদ ইবনে আউফ। বলা হয়ে থাকে, উপরোল্লিখিত কয়েকজন নারী ছাড়া আরও কয়েকজন এমন ছিলেন যাঁরা নিজেদেরকে রসুলেপাক স. এর কাছে আত্মসম্প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে কবুল করেননি।

হজরত মায়মুনা থেকে ৭৬টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি হাদিস মুত্তাফাক আলাইহি। একটি বোখারী ও একটি মুসলিম শরীফে। অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে বাকী হাদিসগুলো।

তালাক প্রাপ্তাগণ

উম্মুল মুমিনীন এগারোজন ছিলেন– যাঁদেরকে রসুলেপাক স. বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের সাথে বাসরও হয়েছিলো তাঁর। আর তাঁদের মধ্যে কারও কারও গর্ভ থেকে সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে সাইয়্যেদা খাদিজাতুল কুবরা এবং সাইয়্যেদা যয়নব বিনতে খোযায়মা রসুলেপাক স. এর পৃথিবীবাসের সময়েই ইনতেকাল করেছিলেন। বাকী নয়জন রসুলেপাক স. এর পরে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাছাড়া মেয়েদের আরেকটি দল আছে যাদের সংখ্যা বিশ বা তার চেয়ে বেশী। তন্মধ্যে কাউকে তিনি স. বিয়ে করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তাঁর বাসর হয়নি। আবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছেন, যাঁদের সঙ্গে বাসর হয়েছিলো বটে, কিন্তু তাঁদেরকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিলো। আর তখন এই আয়াত নাযিল হয়েছিলো 'ইয়া

আইয়্যুহান নাবীয়্যু কুল লিআযওয়াজিকা ইন কুনতুন্না তুরিদনাল হায়াতাদ্ দুন্ইয়া ওয়া যীনাতাহা ফাতাআলাইনা উমাত্তি'কুন্না ওয়া উসার্‌রিহ্‌কুন্ন সারাহান জামীলা' (হে নবী ! তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও উহার ভূষণ কামনা কর তবে আইস, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রির ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং সৌজন্যের সহিত তোমাদিগকে বিদায় দেই) (৩৩ঃ২৮)। এই আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিলো। তখন তারা বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ তাঁদেরকে আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাতের মধ্যে শামিল করেননি। আমরা এখানে তাদের কারও কারও বিষয়ে এমন কোনো কোনো ঘটনার আলোকপাত করবো, যার মধ্যে বিস্ময়কর সূক্ষ্মতা এবং উপকারিতা আছে।

তাদের মধ্যে এক মহিলা ছিলো বনু কেলাব গোত্রের, যে দুনিয়াকে গ্রহণ করেছিলো। শেষে তার অবস্থা এমন হয়েছিলো যে, রাস্তায় রাস্তায় সে খেজুরের আঁটি কুড়াতো। এক বর্ণনায় আছে, রাস্তায় রাস্তায় জানোয়ারের বিষ্ঠা কুড়াতো। এক ব্যক্তি তাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলো, তুমি কে? তখন সে মাথা তুলে জবাব দিয়েছিলো, আমি ওই হতভাগা রমণী, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ছেড়ে দুনিয়াকে গ্রহণ করেছিলো।

দ্বিতীয় মহিলার নাম ছিলো আসমা কিন্দিয়া। 'জামেউল উসুল' পুস্তকে তার নাম এসেছে জোয়ায়বা। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া ' গ্রন্থে এসেছে, তার নাম আসমা বিনতে নোমান ইবনে আবুল জুন কিন্দিয়া। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, রসুলেপাক স. তাকে বিয়ে করেছিলেন। তবে তাকে তালাক দেয়া হয়েছিলো কিনা, সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কাতাদা এবং আবু উবায়দা বলেছেন, রসুলেপাক স. তাকে যখন আপন সান্নিধ্যে আনতে চাইলেন, বললেন, নিকটে এসো। সে রসুলুল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিলো না এবং অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো। কেউ কেউ বলেছেন, সে তখন বলেছিলো, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাই। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি পানাহ্ তালাশ করছো এবং খুব সাংঘাতিক পানাহ্ চাচ্ছো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে পানাহ্ দিয়ে দিয়েছেন। তুমি তোমার পরিবারে চলে যাও। এই বাক্যটি এমন বাক্য যা তালাকের নিয়তে বলা হয়। 'জামেউল উসুল' পুস্তকে বিনতুল জুনের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা থেকে। তিনি বলেছেন, জুনের কন্যা রসুলুল্লাহ্‌র কাছে এসে বললো, 'আউযুবিল্লাহি মিনকা' (আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার থেকে পানাহ্ চাই)। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি খুব সাংঘাতিক পানাহ্ চেয়েছো। যাও, তোমার পরিবারে যেয়ে মিলিত হও। বর্ণনা করেছেন বোখারী। নাসায়ী শরীফেও এরকম বর্ণিত হয়েছে। আবু উসায়দ থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, আমরা রসুলুল্লাহ্ স. এর সঙ্গে কোনো

এক ঘেরাও করা বাগিচার ভিতর গেলাম। রসুলেপাক স. সেই বাগানে থামলেন। তারপর তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা এখানেই বসো। তারপর জুনিয়াকে ডাকা হলো। বলা হলো, তাকে খেজুর বাগানে নিয়ে যাও। জুনিয়া সেখানে উপস্থিত ছিলো। তার সঙ্গে একটি পশুও ছিলো। ওই পশুর উপর ছওয়ার হয়ে সে এসেছিলো। রসুলেপাক স. তার কাছে পৌঁছলেন। বললেন, তুমি আমার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। সে বললো, একজন রাজরাণী কি তার চেয়ে নিম্নস্তরের লোকের কাছে নিজকে সমর্পণ করে? রসুলেপাক স. তাকে চুপ করানোর জন্য তার পবিত্র হাত সম্প্রসারিত করলেন। সে বললো 'আউযুমিনকা' (আমি আপনার থেকে পানা চাই)। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি বড় আশ্রয় স্থলের কাছেই আশ্রয় চেয়েছো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসুলেপাক স. বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, হে উসায়দ! তাকে দু'টি জামা পরিয়ে দিয়ে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দাও। মহিলাটি অহংকার করেছিলো এবং নিজকে রাজরাণী বলে আখ্যায়িত করেছিলো এ জন্য যে, তার পিতা নোমান ইবনে আবুল জুন কিন্দাবাসীদের সরদার ছিলো। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. এর স্ত্রীগণ ওই মহিলাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি যখন তোমাকে কাছে ডাকবেন এবং পবিত্র হাত তোমার দিকে সম্প্রসারিত করবেন, তখন তুমি 'আউযুবিল্লাহি মিনকা' বোলো। কেননা রসুলেপাক স. এ বাক্যটি খুবই পছন্দ করেন। মহিলাটি ছিলো খুবই রূপসী। তাঁরা আশংকা করছিলেন, না জানি সে আবার তাঁদের উপর বিজয়ী হয়ে যায়। রসুলেপাক স. যখন এ কথা শুনলেন, তখন তাঁর কাছে তা খারাপ মনে হলো। তিনি তাকে তালাক দিয়ে তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মহিলাটি পরবর্তী জীবনে নিজেকে বদবখ্ত বা হতভাগ্য বলে আখ্যায়িত করতো। কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ছিলো উসায়মা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ছিলো উমামা। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. আবু উসায়দ সঈদীকে পাঠিয়েছিলেন আসমাকে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য। কেননা তার রূপলাবণ্যের কথা মদীনায় প্রচার হয়ে গিয়েছিলো। মেয়েরা তাকে দেখার জন্য ভিড় জমাতো। তাই কেউ একজন তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো যে, তুমি হলে রাজকন্যা। তুমি যদি চাও, তোমার স্বামী তোমাকে খুব বেশী ভালোবাসুক, তবে যখন তুমি নিরিবিলিতে যাবে তখন বলবে 'আউযু বিল্লাহি মিনকা' তাহলে দেখবে যে, তোমার স্বামী তোমাকে খুব ভালোবাসবে। এক বর্ণনায় এসেছে, যখন তাকে রসুলেপাক স. এর দরবারে আনা হলো, তখন সকল মেয়ে তাকে দেখে হিংসা করতে শুরু করলো এবং বাহ্যিকভাবে তার সাথে সমবেদনামূলক কথাবার্তা বলতে লাগলো। হজরত আয়েশা হজরত হাফসাকে বললেন, তুমি তাকে মেহেদী লাগিয়ে দাও। আর আমি তার চুল ঠিক করে দিচ্ছি। সে সময় তাঁরা দু'জনে তাকে বললেন, রসুলেপাক স. এর সঙ্গে যখন তুমি নিরিবিলিতে যাবে, তখন তুমি বলবে 'আউযুবিল্লাহি মিনকা'।

রসুলেপাক স. ঘরে প্রবেশ করলেন। তাকে সান্নিধ্যে আনতে চাইলেন। তখন সে বললো 'আউযুবিল্লাহি মিনকা'। রসুলেপাক স. একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। তাকে বললেন, তুমি বড় আশ্রয়স্থলের কাছে আশ্রয় চেয়েছো। ওঠো এবং তোমার আপনজনদের সঙ্গে মিলিত হও। তারপর তিনি স. আবু উসায়দকে বললেন, তাকে তার কবীলার কাছে পৌঁছে দাও। পরবর্তীতে রসুলেপাক স. যখন জানতে পারলেন যে, মেয়েরা তাঁর সঙ্গে এরকম আচরণ করেছেন তখন তিনি স. বললেন, নিশ্চয়ই ওই মহিলারা নবী ইউসুফের ভাইদের মতো এবং নিশ্চয়ই তাদের ষড়যন্ত্র ভয়ানক।

এখন কথা হলো, এরকম ষড়যন্ত্র কতোটুকু যুক্তিযুক্ত? এ কথার উত্তরে উলামা কেরাম বলেন, এটি মানবীয় স্বভাব এবং মহব্বতের প্রভাব থেকে সৃষ্ট আত্মমর্যাদামূলক কাজ। রসুলেপাক স. এর প্রতি তাঁদের সীমাহীন ভালোবাসার প্রমাণ। তাঁরা চাননি যে, অন্য কেউ তাঁদের প্রিয়তমের মধ্যে ভাগ বসাক। তাঁদের মাহবুব তাঁদের থেকে পৃথক হোক, অন্য কারো কারণে এটি তাঁরা কামনা করেননি। তা তাঁরা সহ্যও করতে পারেননি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কারও কোনো মাল আছে অথবা কোনো বিশেষ অবস্থা আছে এমতাবস্থায় সে চাইবে না যে, সেই মালের মধ্যে অন্য কেউ অংশীদার হয়ে যাক। অথবা সে মালটি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাক। এমনি অবস্থা এখানেও। তাছাড়া এক্ষেত্রে তাদের তেমন কোনো অন্যায়ও হয়নি। কারণ তাঁরা তো শুধু মুখের কথাটুকুই বলেছিলেন। বল প্রয়োগ তো করেননি। কিন্তু ওই মহিলা এরকম কথা বললো কেনো? তাছাড়া এমনও বলা যেতে পারে যে, স্বামীর ভালোবাসার প্রত্যাশায় স্ত্রীগণের জন্য এতোটুকু বৈধ। আর সে কারণেই হয়তো রসুলেপাক স. তাঁদেরকে কোনো কটু কথা বলেননি অথবা তাঁদের জন্য কোনো শাস্তির বিধান করেননি। শুধু এতোটুকু কথাই বলেছেন, মেয়েদের মধ্যে প্রতারণার মনোভাব থাকে, আর তাদের প্ররোচনা বড় ভয়ানক। যেমন কোরআনে করীমে হজরত ইউসুফের উক্তি হিসাবে এসেছে– 'ইন্না কাইদা কুন্না আযীম' (নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ)(১২ঃ২৮)।

আরেকজন মহিলাও এরকম ছিলো। তার নাম ছিলো মালেকা বিনতে কাআব। সে ছিলো লাইছ কবীলার। তার সঙ্গে বাসর বা নিশিযাপনের পূর্বেই রসুলেপাক স. এর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, মহিলাটিই রসুলেপাক স. এর এস্তেআযা (পানা চাওয়ার) বাক্যটি বলেছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, রসুলেপাক স. এর সঙ্গে তার নিশিযাপন হয়েছিলো এবং রসুলেপাক স. এর কাছে থাকা অবস্থায়ই তার ওফাত হয়েছিলো। তবে প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, রসুলেপাক স.তাকে বিয়ে করেননি। বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এমনই বলা হয়েছে। 'রওজাতুল আহবাব'

গ্রন্থে এসেছে, রসুলেপাক স. তার সঙ্গে নির্জনবাস করেছিলেন। তার দেহের পোশাক উন্মোচিত হওয়ার পর দেখা গেলো, তার শরীরে রয়েছে শাদা দাগ। তৎক্ষণাৎ রসুলেপাক স. তার কাছে থেকে দূরে চলে এলেন। বললেন, তুমি তোমার কাপড় পরিধান করে নাও এবং আপন লোকদের কাছে চলে যাও। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকম কথা আছে যে, সে ছিলো গেফার কবীলার। তার পরবর্তী বর্ণনা উপরের মতোই।

অপর একজন ছিলেন শারাফ বিনতে খলীফা। তিনি ছিলেন বনু কেলাব গোত্রের। তিনি সাহাবী দাহিয়াতুল কালবির বোন ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বেই ইনতেকাল হয়ে গিয়েছিলো তাঁর।

আরেকজন ছিলো লায়লা বিনতে খতীম। সে ছিলো কায়েসের বোন। রসুলেপাক স. তাকে বিয়ে করেছিলেন। সে খুব আত্মমর্যাদাসম্পন্না মহিলা ছিলো। বিয়ের পর সে রসুলেপাক স. এর নিকট বিবাহবিচ্ছেদের দাবী করেছিলো। রসুলেপাক স. তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। পরে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এতোটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুলেপাক স. সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে বসে ছিলেন। লায়লা বিনতে খাতীম রসুলেপাক স. এর পিছন দিক দিয়ে এসে রসুলেপাক স. এর পিঠে একটি ধাক্কা মারলো। তিনি স. বললেন, তোমাকে তো বাঘে খেয়ে ফেলবে। সে বললো, আমি খাতীমের কন্যা। তারপর সে তার পিতার প্রশংসা করতে লাগলো। বললো, আমি এসেছি আপনার কাছে নিজেকে দান করার জন্য। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে পছন্দ করি। পরে সে তার কাওমের কাছে গিয়ে তাদের কাছে এ বিষয়ে অবহিত করলো। কবীলার লোকেরা বললো, তুমি কাজটি ভালো করোনি। কেননা তুমি প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না। আর তিনি তো অনেক স্ত্রী গ্রহণকারী। তুমি তো আত্মমর্যাদাবোধে জ্বলতে থাকবে। আর যখন মুখ খুলে কিছু বলবে, তখন তিনি তোমার উপর গজব নাজিল করে দিবেন এবং বদদোয়া করবেন। তাঁর দোয়া কিন্তু কবুল হয়ে যায়। বরং তুমি তাঁর কাছে যাও এবং বিবাহ ছিন্ন করার আবেদন করো। তারপর সে রসুলেপাক স. এর কাছে এসে বিবাহ ছিন্ন করার দাবী করলো। রসুলেপাক স. তার দাবী পূরণ করলেন। সে পরবর্তীতে আরেক স্বামী গ্রহণ করে। সেখানে তার কয়েকটি সন্তানের জন্ম হয়। একদিন দিনের বেলায় মদীনার কোনো এক বাগান থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

আরেক মহিলা ছিলো– সোনা, সোবা অথবা আসমা বিনতে সালত–সালামিয়া। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. তাকে পয়গাম দিয়েছিলেন। উক্ত

মহিলা এই খবর পাওয়া মাত্রই খুশিতে আত্মহারা হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এক বর্ণনায় এসেছে, বনী সুলায়ম গোত্রের এক লোক এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! একটি মেয়ের সন্ধান জানি। সে খুবই সুন্দরী। আপনি ছাড়া অন্য কেউই তার জন্য উপযুক্ত নয়। রসুলেপাক স. তাকে পাওয়ার আকাংখা করলেন। লোকটি মেয়েটির প্রশংসায় আরও বললো, তার আরেকটি গুণ আছে। সে কখনও অসুস্থ হয়নি এবং কখনো কোনো দুঃখ-কষ্টেও পড়েনি। রসুলেপাক স. বললেন, ওই মেয়ের প্রয়োজন আমার নেই। কেননা যে মাল থেকে খরচ করা হয় না, সে মালের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আর যে শরীরে কোনো অসুখ হয় না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

মারব ইবনে আউফ ইবনে সাআদ কবীলার আরেক মহিলা ছিলো। রসুলেপাক স. তার পিতার কাছে পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। সে বলেছিলো, আমার কন্যার শ্বেতী রোগ আছে। মেয়েকে যাতে পেশ করতে না হয়, সে জন্য সে মিথ্যা বলেছিলো। ঘরে ফিরে এসে সে দেখলো, তার কন্যা শ্বেতী রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, সে কন্যার পিতা তাকে আপন ভাতিজার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলো। তার থেকে একটি পুত্র সন্তানও হয়েছিলো। নাম ছিলো শায়ব ইবনে মুরতবা। বলা হয়, সে ছিলো কবি। তাবারী এরকম বলেছেন। আরেকজন মহিলা ছিলো উমামা বিনতে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তাঁকেও রসুলেপাক স. এর কাছে পেশ করা হয়েছিলো। তিনি স. বলেছিলেন, এতো আমার রেযায়ী ভাইয়ের কন্যা। কেননা তাঁদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছিলেন আবু লাহাবের বাঁদী ছুওয়াবা। আরেকজন ছিলেন গযওয়া বিনতে আবু সুফিয়ান। তিনি হজরত উম্মে হাবীবার বোন ছিলেন। তাঁকেও রসুলেপাক স. এর জন্য পেশ করা হয়েছিলো। তিনি স. বলেছিলেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা তার বোন উম্মে হাবীবা এখনও বিদ্যমান।

যাদের সঙ্গে রসুলেপাক স. এর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছিলো তাদের সম্পর্কে সীরাত গ্রন্থসমূহে এর চেয়ে বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। যাদের বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, যাদের কাছে বিয়ের পয়গাম দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু বিয়ে সংঘটিত হয়নি। তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব। তাঁর নাম ছিলো ফাখতা। কেউ কেউ বলেছেন, আতেকা, আবার কেউ বলেছেন হিন্দা। প্রথম মতটিই বেশী মশহুর এবং বিশুদ্ধ। তাঁর ব্যাপারে রসুলেপাক স. আবু তালেবকে বলেছিলেন, হে আমার চাচা! আপনার কন্যাকে হুবায়রা ইবনে ওয়াহাবের হাতে দিলেন– আমাকে দিলেন না। আবু তালেব বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তার সঙ্গে আমার বৈবাহিক সম্পর্ক আছে। আমি তার কাছে তার কন্যা চেয়েছিলাম। মহানুভবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আমি বিবেচনা করেছি এবং তার বদলা আমি পরিশোধ করছি। আমার কন্যাকে তার

সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। উম্মে হানীর গর্ভ থেকে হুবায়রার সন্তান হয়েছিলো জা'দা, আমর, ইউসুফ এবং হানী। হানীর নামানুসারেই তাঁর উপনাম হয়েছিলো উম্মে হানী। তারপর উম্মে হানী রা. মুসলমান হয়েছিলেন মক্কাবিজয়ের বৎসরে। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর ও হুবায়রার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিলো। পরে রসুলেপাক স. তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। উম্মে হানী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনাকে জাহেলী যুগেও পছন্দ করতাম। এখন যেহেতু আমি ইসলাম ধর্ম ভালোবাসি, সুতরাং আপনাকে অপছন্দ করি কেমন করে? নিঃসন্দেহে আপনি আমার নিকট আমার চোখ ও কানের চেয়েও প্রিয়। কিন্তু আমার রয়েছে কয়েকটি এতীম সন্তান। আমার আশংকা হয়, আমি আমার সন্তানদের দেখাশোনা করায় মনোযোগী হলে আপনার হক আদায় করতে ব্যর্থ হবো। আর আপনার হক ও খেদমতে মনোযোগী হলে সন্তানদের দেখাশোনা করা সম্ভব হবে না। আমার লজ্জা হয়, আপনি যখন আমার শয্যাপাশে আসবেন, তখন আমার এক সন্তানকে আমার এক পাশে দেখতে পাবেন। আরও দেখবেন অপর এক বাচ্চা দুধ পান করছে। রসুলেপাক স. বললেন, ওই নারীই উত্তম যে উটের উপর আরোহণ করে। অর্থাৎ আরব এবং কুরাইশ বংশের মেয়েরাই উত্তম। কেননা তারা আপন সন্তানদের প্রতি অতি স্নেহশীলা এবং আপন স্বামীর প্রতিও বিশ্বস্ত। তাফসীর গ্রন্থে এসেছে, তখন এই আয়াতটি নাযিল হলো– 'ইয়া আয়্যুহান নাবিয়্যু ইন্না আহলালনা লাকা আযওয়াজাকাল লাতী আতায়তা উজূরা হুন্না ওয়ামা মালাকাত ইয়ামীনুকা মিম্মা আফাআল্লাহু আলাইকা ওয়া বানাতি 'আম্মিকা ওয়া বানাতি আম্মাতিকা ওয়া বানাতি খলিকা ওয়া বানাতি খলাতিকা আল্লাতী হাজারনা মাআক'(হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাহাদের মাহ্‌র তুমি প্রদান করিয়াছ এবং বৈধ করিয়াছি ফায় হিসাবে আল্লাহ তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে তাহাদিগকে, এবং বিবাহের জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে যাহারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করিয়াছে)(৩৩ঃ৫০)। উম্মে হানী বললেন, রসুলুল্লাহ্ আমাকে পয়গাম দিয়েছিলেন। আমি আপত্তি উত্থাপন করেছিলাম। তিনি স. আমার আপত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণেই আল্লাহ্‌তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমি রসুলুল্লাহর জন্য হালাল হইনি। কেননা আমিতো তাঁর সঙ্গে হিজরত করিনি। তাছাড়া আমি তালাকপ্রাপ্তা ছিলাম। হাদিসটি তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন হজরত আলী ইবনে আব্বাস, ইবনে আবু লায়লা, ইকরামা, শা'বী, আতা, তাঁর আযাদকৃত গোলাম আবু সালেহ, তাঁর পুত্র জাদা, তাঁর নাতি ইবনে জা'দা এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ। তিনি পঞ্চাশ হিজরীতে হজরত আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। মক্কাবিজয়ের ঘটনা বর্ণনাকালে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তখন রসুলেপাক স. তাঁর ঘরে চাশতের নামাজ পড়েছিলেন। চাশতের নামাজ পড়ার বিধান সম্পর্কে তাঁর হাদিসটিই মূল দলীল।

রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাসীগণ

রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাসী ছিলেন চারজন— ১. হজরত মারিয়া কিবতিয়া বিনতে শামউন, যাকে তাঁর কাছে হাদিয়া হিসাবে পাঠানো হয়েছিলো মিশরের শাসক ও ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ্ মাকুকাসের পক্ষ থেকে। তিনি শুভ্রবর্ণা ও রূপবতী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে 'মিলকে ইয়ামীন' (ক্রীতদাসী) হিসাবে রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে রসুলেপাক স. এর গভীর ভালোবাসা ছিলো। সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা তাঁকে ঈর্ষা করতেন। রসুলুল্লাহ্ স. এর সাহেবজাদা হজরত ইব্রাহীম তাঁর গর্ভ থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আওয়ালীয়ে মদীনা (মদীনার উঁচু এলাকায়) তাঁর জন্য একটি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছিলো। যাকে এখনও মাশরাবায়ে উম্মে ইব্রাহীম বলা হয়। রসুলেপাক স. সেখানে যেতেন। ২. আরেকজন ক্রীতদাসী ছিলেন রায়হানা বিনতে যায়েদ ইবনে আমর। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন শামউনের কন্যা। তিনি বনু নাযীরের বাঁদীদের মধ্যে ছিলেন। এক বর্ণনামতে বনু কুরায়যার বাঁদী ছিলেন। প্রথম বর্ণনাটি অধিকতর সুস্পষ্ট। রসুলেপাক স. মিলকে ইয়ামীন হিসেবে তাঁকে রেখেছিলেন এবং সে হিসেবেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁকে আযাদ করে দিয়ে সপ্তম হিজরীতে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন রসুলেপাক স.। ওয়াকেদী এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ইবনে আবদুল বার প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রথম মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর ওফাত হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর পূর্বেই বিদায় হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন কালে। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। অপর এক বর্ণনামতে রসুলেপাক স. এর পর হজরত ওমর ফারুকের খেলাফত কালে তাঁর ওফাত হয়েছিলো। তবে প্রথম কথাটি অধিকতর বিশুদ্ধ। ৩. আরেকজন ক্রীতদাসী ছিলেন জামীলা। রসুলেপাক স. তাঁকে যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে পেয়েছিলেন। ৪. আরেকজন ক্রীতদাসী ছিলেন যাকে সাইয়্যেদা যয়নব বিনতে জাহাশ রসুলেপাক স. এর খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। প্রকৃত তত্ত্বের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্তায়ালাই।

রসুলেপাক স. এর চাচা, ফুফু, দুধ ভাই এবং দাদী নানীগণের বর্ণনা ঃ

'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল মুত্তালিবের ছিলেন তেরো জন পুত্র এবং দুই জন কন্যা। কেউ কেউ বলেছেন, দশজন পুত্র সন্তান। কেউ কেউ আবার এগারো জনের কথা বলেছেন। তবে চাচাগণের ব্যাপারে 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে 'যাখায়েরুল উকবা ফী মানাকেবে যুল কুরবা' নামক কিতাব থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, রসুলেপাক স. এর চাচা ছিলেন বারো জন। তাঁরা হজরত আবদুল মুত্তালিবের সন্তান ছিলেন। ১. হজরত আবদুল্লাহ্— যিনি রসুলেপাক স. এর সম্মানিত পিতা। ২. হারেছ ৩. আবু তালেব। তাঁর আসল নাম

ছিলো আবদে মানাফ। ৪. যুবায়ের– তাঁর উপনাম ছিলো আবুল হারেছ। ৫. হামযা ৬. আবু লাহাব, তার আসল নাম ছিলো আবদুল উয্যা। ৭. গায়দাক ৮. মাকুম ৯. দারার ১০. আব্বাস ১১. কছম ১২. আবদুল কাবা ও ১৩. জাহাল বা হাজাল। তাঁর অপর নাম ছিলো মুগিরা। কেউ কেউ বলেছেন, রসুলেপাক স. এর এগারো জন চাচা ছিলেন। তাঁরা মাকুমকে বাদ দিয়েছেন।

হজরত আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সন্তান ছিলেন ছয়জন। ১. উম্মে হাকীম– তাঁর আসল নাম ছিলো বায়দা ২. বাররা। ৩. আতেকা ৪-৫. দু'জন এক মায়ের গর্ভের সন্তান। তাঁর মায়ের নাম ছিলো ফাতেমা বিনতে আমর। আর হামযা, মাকুম ও জাহাল– এই তিন জন ছিলেন আরেক মায়ের গর্ভের পুত্রসন্তান এবং সফিয়া– এক কন্যাসন্তান। তাঁদের মায়ের নাম ছিলো হালা বিনতে ওহাব। হজরত আব্বাস, দারার এবং কছম– তাঁরা তিন জন ছিলেন এক মায়ের গর্ভের সন্তান, যার নাম ছিলো নাতিলা বিনতে হুবাব ইবনে কালব। হারেছ আবু লাহবের ইল্লাতী (বৈমাত্রেয়) ভাই। বোনের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। হারেছের মাতা ছিলেন সাফিয়া। আর আবু লাহাবের মাতা তুসী বিনতে হাজের। রসুলেপাক স. এর চাচাগণের মধ্যে হজরত আব্বাস এবং হজরত হামযা ব্যতীত আর কেউ মুসলমান হননি। আবু তালেব এবং আবু লাহাব ইসলামী যুগ পেয়েছিলো। কিন্তু ইসলামের তওফীক তাদের হয়নি। জমহুর উলামার মাযহাব এটাই। 'জামেউল উসুল' রচয়িতা বর্ণনা করেছেন, তাদের পরিবারস্থ লোকেরা মনে করতেন, তারা ইসলাম নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। এমনিভাবে রসুলেপাক স. এর ফুফুগণের মধ্যে হজরত সাফিয়া, যিনি হজরত যুবায়ের ইবনে আওয়ামের মাতা ছিলেন– সর্বসম্মতভাবে তিনি মুসলমান ছিলেন। হিজরতকারিণীগণের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়। তিনি খন্দকযুদ্ধের সময় যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে এক ইহুদী শহীদ করেছিলো এবং রসুলেপাক স. সেই ইহুদীকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। তবে আতেকার ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আবু জাফর উকায়লী তাঁর ইসলাম গ্রহণের দিকে মত দিয়েছেন এবং তিনি তাঁকে সাহাবীগণের মধ্যেই গণ্য করেছেন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। ৫. উমায়মা, যিনি আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, যয়নব বিনতে জাহাশ এবং হেমনা বিনতে জাহশের মা ছিলেন। রসুলে করীম স. এর দুই চাচা হজরত হামযা এবং হজরত আব্বাসের মর্যাদা সম্পর্কে বহু বর্ণনা রয়েছে।

সাইয়্যেদুশ শুহাদা হজরত হামযা রা.

হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের উপনাম ছিলো আবু আম্মারা এবং তাঁর উপাধি ছিলো সাইয়্যেদুস শুহাদা। আল্লামা বাগবী 'মু'জাম' গ্রন্থে বণর্না করেন রসুলেপাক স. বলেছেন, কসম ওই আল্লাহ্‌তায়ালার, যাঁর কুদরতী হাতে আমার

জীবন। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সপ্তম আকাশে লিখিত আছে– 'হামযাতু আসাদুল্লাহি ওয়া আসাদু রসূলিহী' (হামযা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের ব্যাঘ্র)। তিনি নবুওয়াতের দ্বিতীয় বৎসরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, নবুওয়াতের ষষ্ঠ বৎসরে রসুলেপাক স. এর দারে আরকামে প্রবেশ করার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি হজরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। বদরযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং উতবা ও শায়বা ইবনে রাবীয়াকে হত্যা করেন।

হজরত হামযার ইসলাম গ্রহণের কারণ এরকমঃ একদিন আবু জাহেল রসুলেপাক স.কে অত্যধিক উত্যক্ত করতে শুরু করলো। রসুলেপাক স. ধৈর্যধারণ করলেন। হজরত হামযা শিকারে গিয়েছিলেন। শিকার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর ক্রীতদাসী তাঁকে বললো, আজ আবু জাহেল আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এভাবে এভাবে কষ্ট দিয়েছে। হজরত হামযা রাগান্বিত হলেন। তৎক্ষণাৎ আবু জাহেলের কাছে গেলেন। তাঁর হাতে ছিলো ধনুক। ওই ধনুক দিয়ে তিনি আবু জাহেলের মস্ত কে আঘাত করলেন এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। এতে রসুলেপাক স. খুবই আনন্দিত হলেন। ইসলামে সর্বপ্রথম যে পতাকা প্রস্তুত করা হয়েছিলো, তা দেয়া হয়েছিলো হজরত হামযার হাতে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিলো, তা-ও ছিলো তাঁরই বাহিনী। রসুলেপাক স. বলেছেন, আমার চাচাগণের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন হজরত হামযা। তিনি আরও বলেছেন, সাইয়্যেদুস শুহাদা (শহীদগণের সরদার) হচ্ছেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। সালাফী বুরায়দা থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী 'ইয়া আইয়্যাতুহান নাফসুল মুতমাইন্নাতুর জিয়ী' ইলা রব্বিকি রাদ্বিইয়াতাম মারদ্বিয়্যা' (হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আইস সন্তুষ্ট ও সন্তে াষভাজন হইয়া)(৮৯ঃ২৭,২৮)– এর দ্বারা হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে বুঝানো হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'ফামিনহুম মান কাদা নাহবাহূ' (তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে ফেলেছে অর্থাৎ জীবন সমাপ্ত করেছে)। আল্লাহ্‌পাকের এই বাণী দ্বারাও হজরত হামযাকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর শাহাদতের ঘটনা উহুদযুদ্ধের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, আমি চিন্তা করি এবং বিস্মিত হই একথা ভেবে যে, হজরত হামযার হত্যাকারী কেমন করে নাজাত পাবে? সে হত্যাকারী তো খামীরের মধ্যে গেড়ে গিয়েছে। রসুলেপাক স. যখন হজরত হামযাকে নিহত দেখলেন, আরও দেখলেন তাঁকে মুছলা করা (নাক-কান কাটা) হয়েছে, তখন তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। বললেন, আমি অনেক মুসিবতে পড়েছি, কিন্তু আজকের মতো মুসিবতে কখনো পড়িনি। আর আজকের মতো

এরকম রাগান্বিত অবস্থায় অন্য কোথাও দাঁড়াইনি। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হজরত হামযার জন্য রসুলুল্লাহ্ যেভাবে ক্রন্দন করেছেন, অন্য কারও জন্য সেরকম ক্রন্দন করেননি। তিনি তাঁর জানাযার খাটিয়ার উপর দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করতে করতে বলছিলেন, হে হামযা। হে রসুলুল্লাহ্র পিতৃব্য! হে আসাদুল্লাহ্! হে আসাদু রসুলিহি! হে পুণ্যসমূহের যথাসম্পাদনকারী! হে বিপদে ধৈর্যধারণকারী! এ থেকে বুঝা যায়, নিজ ক্ষমতার বাইরে ফরিয়াদ ও রুনাজারীও রসুলেপাক স. এর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. যখন কোনো নামাজে জানাযা আদায় করতেন, তখন চার তকবীরের সাথে নামাজ পড়তেন। কিন্তু হজরত হামযার জানাযায় তিনি সত্তর বার তকবীর বলেছিলেন। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, উহুদযুদ্ধে যাঁরা শাহাদতবরণ করেছিলেন, তাঁদেরকে গোসল দেওয়া হয়নি এবং তাঁদের জন্য জানাযার নামাজও পড়া হয়নি। তবে যা কিছু হজরত হামযার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তা ছিলো কেবল তাঁরই জন্য নির্ধারিত। তাছাড়া অন্য যাঁদের নামাজে জানাযা পড়া সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, তাঁরা যুদ্ধের ময়দান থেকে বাইরে এসেছিলেন। তাঁরা যুদ্ধের ময়দানে জীবন দেননি।

হজরত হামযা যে দিন শাহাদতবরণ করেছিলেন, সেই দিন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৫৯ বৎসর। তিনি রসুলেপাক স. এর চেয়ে বয়সে চার বছরের বড় ছিলেন। কোনো কোনো কিতাবে দু' বৎসরের বড় বলা হয়েছে। হজরত হামযা এবং তাঁর ভাতিজা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিলো। এসব বর্ণনা 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

হজরত আব্বাস রা.

হজরত আব্বাসের উপনাম ছিলো আবুল ফজল। ফজল ছিলো তাঁর বড় ছেলের নাম। তিনি ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বড় ভাই। হজরত আব্বাসের মায়ের নাম ছিলো নাভিলা বিনতে হুবাব ইবনে কালব। বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, তিনিই সর্বপ্রথম আরবী মহিলা, যিনি সর্বপ্রথম বাইতুল হারামে স্বর্ণখচিত গিলাফ জড়িয়েছিলেন। কারণ হজরত আব্বাস বাল্যবেলায় হারিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মান্নত করেছিলেন, তাঁর পুত্র যদি ফিরে আসে, তাহলে তিনি বাইতুল্লাহ শরীফে গিলাফ পরিধান করাবেন। হজরত আব্বাস ছিলেন সুন্দর, সুপুরুষ, চুলের দুই বেনীবিশিষ্ট এবং দীর্ঘদেহী। বলা হয়ে থাকে, অন্যান্য মানুষের দেহের উচ্চতা হজরত ইবনে আব্বাসের কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছতো। আর হজরত ইবনে আব্বাসের উচ্চতা ছিলো হজরত আব্বাসের কাঁধ পর্যন্ত। আবার হজরত আব্বাসের উচ্চতা ছিলো হজরত আবদুল মুত্তালিবের কাঁধ পর্যন্ত। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত আব্বাসের দেহ ছিলো স্বাভাবিক। বাহ্যতঃ এই স্বাভাবিকের অর্থ স্বাভাবিক

দীর্ঘ। কিন্তু এখানে স্বাভাবিক অর্থ হবে তাঁর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই স্বাভাবিক ধরনের ছিলো। ওয়াল্লহু আ'লাম।

তাঁর জন্ম হয়েছিলো আমুল ফীলের (হস্তি বৎসরের) তিন বৎসর পূর্বে। তিনি রসুলেপাক স. এর চেয়ে দুই বা তিন বছরের বড় ছিলেন। তিনি কুরাইশ বংশের সরদার ছিলেন। বাইতুল হারামের ইমারতের দায়িত্ব তাঁর উপরই অর্পিত ছিলো। এখানে ইমারত অর্থ মসজিদে হারামের যাবতীয় নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। হাজীগণকে পানি পান করানোর দায়িত্বও তাঁর উপরে ছিলো।

আকাবার রাতে যখন আনসারগণ বায়াত গ্রহণ করেছিলেন, তখন তিনি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলেন। ওই সমাবেশে তিনি বলেছিলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, মোহাম্মদ মানুষের মধ্যে সম্মানিত ও মহান। তোমরা এখন যে অঙ্গীকার করতে যাচ্ছো, তা যেনো ভঙ্গ করতে না হয়। তাই খুব চিন্তা-ভাবনা করে অঙ্গীকার করো। রসুলেপাক স. হজরত আব্বাসের উপর সব বিষয়েই নির্ভর করতেন। বদর যুদ্ধের কয়েদীদের মধ্যে তাঁকেও কয়েদ করা হয়েছিলো। তাঁর বাঁধনটি খুব শক্ত করে দেয়া হয়েছিলো। রসুলেপাক স. তাঁর আহাজারী ও কান্নাকাটির কথা চিন্তা করে রাতে ঘুমাতে পারেননি। সাহাবা কেরাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি নিদ্রাভিভূত হচ্ছেন না কেনো? তিনি বললেন, আব্বাসের কারণে। অতঃপর এক ব্যক্তি উঠে তাঁর বাঁধনগুলো শিথিল করে দিলেন। তখন রসুলেপাক স. হুকুম দিলেন, সকল বন্দীর বাঁধন শিথিল করে দাও। হজরত আব্বাস বদর যুদ্ধের পূর্বেই ইমান এনেছিলেন। কিন্তু তিনি ইমান গোপন রেখে মক্কায় বসবাস করছিলেন। মুশরিকেরা তাঁকে জোর করে বদর যুদ্ধে নিয়ে এসেছিলো। রসুলেপাক স. হুকুম দিয়েছিলেন, আব্বাসকে কেউ যেনো হত্যা না করে। কেননা বলপূর্বক তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হয়েছে। মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

রসুলেপাক স. যখন মক্কাবিজয়ের জন্য মক্কার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন হজরত আব্বাস মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসছিলেন। পথিমধ্যে তিনি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁর পরিবার পরিজনকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। আর হজরত আব্বাস রসুলেপাক স. এর সঙ্গে থাকেন। সব সময় তিনি তাঁর সঙ্গেই থাকতেন। রসুলেপাক স. তাঁকে বলেছিলেন, আপনার হিজরত সম্পন্ন হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি খয়বর বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানদেরকে কোথাও সাহায্য ও বিজয় দান করলে তিনি মনে মনে খুব খুশি হতেন। অবশেষে মক্কাবিজয়ের দিন তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি হুনায়ন, তায়েফ ও তবুক অভিযানে শরীক ছিলেন।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, বদর যুদ্ধের পূর্বে তিনি মুসলমান ছিলেন। রসুলেপাক স. এর কাছে চিঠির মাধ্যমে মুশরিকদের অবস্থা জানাতেন। মক্কায় বাকী মুসলমান যাঁরা ছিলেন, তাদের সংবাদাদিও প্রেরণ করতেন। রসুলেপাক স. তাঁর সংবাদকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। রসুলেপাক স. এর খেদমতে আসার পূর্বেই তিনি তাঁকে মহব্বত করতেন। রসুলেপাক স.ই তাঁকে লিখে জানিয়েছিলেন যে, আমার জন্য আপনাকে মক্কায় অবস্থান করতে হবে এবং এটাই হবে উত্তম। হজরত সাহল ইবনে সাআদ সাঈদী বলেছেন, হজরত আব্বাস রসুলেপাক স. এর কাছে হিজরত করার অনুমতি চেয়েছিলেন। উত্তরে রসুলেপাক স. তাঁকে লিখে জানিয়েছিলেন, 'হে আমার পিতৃব্য! আপনি স্বস্থানেই অবস্থান করুন। আল্লাহতায়ালা আপনার উপর হিজরত পূর্ণ করে দিবেন, যেমন আমার উপর নবুওয়াত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন'। বাস্তবেও তাই হলো। মক্কাবিজয়ের বৎসর তিনি হিজরত করলেন এবং রসুলেপাক স. এর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন।

আল্লামা সাহমী তাঁর 'কিতাবুল ফাযায়েলে' বর্ণনা করেছেন, আবু রাফে রসুলেপাক স.কে হজরত আব্বাসের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শোনালেন, রসুলেপাক স. তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে আযাদ করে দিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে খুবই সম্মান করতেন এবং তাঁর অনেক প্রশংসা করতেন। তিনি স. বলতেন, আব্বাস মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর এবং সবচেয়ে দয়ালু। তিনি স. আরও বলতেন, আমার চাচা আব্বাস আমার পিতৃতুল্য। যে তাঁকে কষ্ট দিলো, নিঃসন্দেহে সে আমাকেই কষ্ট দিলো। রসুলেপাক স. তাঁর সম্বন্ধে একথা বলেছিলেন ওই সময়, যখন হজরত আব্বাস রসুলেপাক স. এর কাছে এসে অভিযোগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, লোকদের যে কী হলো? আমি যখনই তাদের কাছে যাই, তারা আমার আগমনকে অপছন্দ করে। তারা পরস্পরে কথাবার্তা বলে। কিন্তু আমি উপস্থিত হলেই তা বন্ধ করে দেয়। আর আমার প্রতি সুনজরে তাকায়ও না।

বর্ণিত আছে, একদিন হজরত আব্বাস রসুলেপাক স. এর দরবারে এলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে দেখে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাঁর দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে চুম্বন করলেন। তারপর তাঁর ডান দিকে বসিয়ে বললেন, ইনি আমার চাচা। প্রত্যেকেই আপন চাচার সুখ্যাতি করতে চায়। হজরত আব্বাস বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি কতো আনন্দদায়ক কথাই না বললেন। রসুলেপাক স. বললেন, কেনো বলবো না? আপনি তো আমার চাচা, পিতার সমতুল্য। আমার দাদাগণের অবশিষ্ট জন, আমার উত্তরাধিকারী। আমি যাদেরকে দুনিয়াতে রেখে যাবো, তন্মধ্যে আপনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি। আরেকবার রসুলেপাক স. হজরত আব্বাসকে বললেন, হে আমার চাচা! আপনি আপনার ঘরে থাকবেন। আপনার সন্তানদেরকেও বাইরে যেতে দিবেন না। আমি আগামীকাল আপনার ওখানে আসবো। আপনার সঙ্গে আমার কাজ আছে। অতঃপর রসুলেপাক স. তাঁর

কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর পবিত্র চাদর সকলের উপর রাখলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ওই চাদর দ্বারা তিনি স. সকলকে ঢেকে ফেললেন। অতঃপর তাঁদের জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! ইনি আমার পিতৃব্য আমার পিতার স্থলাভিষিক্ত। তাঁর এই সন্তান-সন্ততিগণ আমার আহলে বাইত (পরিবারবর্গ)। তুমি তাদেরকে দোজখের আগুন থেকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখো, যেমন করে আমি আমার চাদর দ্বারা তাঁদেরকে লুকিয়ে রেখেছি। সকলেই বললেন, আমীন। ঘরের সকল আসবাবপত্রও 'আমীন' 'আমীন' বলে উঠলো। এক বর্ণনায় এসেছে, ঘরের এমন কোনো পাথর বা মৃত্তিকাখণ্ড ছিলো না যেগুলো 'আমীন' 'আমীন' বলেনি। তিরমিযী শরীফে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রসুল স. আমাদের সকলকে চাদরের মধ্যে লুকিয়ে নিলেন। তারপর বললেন– আল্লাহুম্মা লিল আব্বাসি ওয়া ওয়ালাদাহু মাগফিরাতান যহিরাতাঁও ওয়া বাতিনাতুল লা তুগাদিরু যাম্বা -আল্লাহুম্মাহ ফিযহু ফী ওয়ালাদিহী (হে আল্লাহ্! তুমি আব্বাস ও তার সন্তানকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে ক্ষমা করে দাও। এমন ক্ষমা যেনো কোনো গোনা আর অবশিষ্ট না থাকে। হে আল্লাহ্! তুমি তাকে তার সন্তানের বিষয়ে হেফাযত করো)। তিরমিযী এই হাদিসকে হাসান ও গরীব (উত্তম ও দুর্লভ) বলেছেন। হজরত আব্বাস এবং তাঁর সন্তানগণের বিষয়ে যাঁরা পরবর্তীতে বেঁচে থাকবেন, তাঁদের খেলাফতের সংবাদ, তাঁদের প্রশংসা, পবিত্র চাদরে আবৃতকরণ, ধর্মের সম্মান, মিল্লাতের শক্তি বৃদ্ধি, তাঁদের প্রতি মহব্বত রাখার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কোনো কোনো হাদিসের বর্ণনাকারী দুর্বল, পরিত্যাজ্য। আবার অনেকের উপর মিথ্যা ও জাল হাদিস তৈরীর অভিযোগও রয়েছে। এ জাতীয় হাদিস, খবর ও আছার পরবর্তীতে আব্বাসীয় খেলাফতের জমানায় প্রকাশ পেয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালাই উত্তমরূপে অবগত।

হজরত আব্বাসের ওফাত হয়েছিলো হজরত ওছমানের খেলাফতকালে, তাঁর শাহাদতের দুই বৎসর পূর্বে ১২ বা ১৪ই রজব অথবা রমজানে, ৩২ বা ৩৩ হিজরীতে। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৮ অথবা ৮৯ বৎসর। তিনি ৩২ বৎসর ইসলামী জীবন পেয়েছিলেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁকে কবরে নামিয়েছিলেন তাঁর পুত্র হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের অনেক উপাধি ছিলো। যেমন– আযীম, জলীল, তরজমানুল কোরআন ও আবুল খুলাফা ইত্যাদি। বর্ণিত আছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মা যখন তাঁকে জন্ম দিলেন, তখন তাঁকে রসুলেপাক স. এর দরবারে নিয়ে যাওয়া হলো। রসুলেপাক স. তাঁর ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামত বললেন। অতঃপর বললেন, আবুল খুলাফাকে নিয়ে যাও। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে হেব্বান। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত

ইবনে আব্বাসের আওলাদ ফরযন্দ পৃথিবীতে এমন বিস্তার লাভ করেছিলো যে, খলীফা মামুনুর রশীদের জামানায় তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো আট হাজারে। এই সংখ্যাধিক্যকে অসম্ভব বলে মনে করা হয়। অবশ্য তাঁর ভক্ত ও অনুসারীদেরকে ধরা হলে একথা অসম্ভব বলে মনে হবে না। হজরত আব্বাস রসুলেপাক স. এর চাচাগণের মধ্যে সবচেয়ে কম হায়াত পেয়েছিলেন।

দাদী-নানীগণ

'জাদ্দাত' শব্দের অর্থ দাদী-নানীগণ। জাদ্দাত দুই প্রকারের। পিতার উর্ধ্বগামী নসব ও মাতার উর্ধ্বগামী নসব। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে সকলকে এক সঙ্গে গণনা করা হয়েছে। তাঁদের সকলের অবস্থা হাদিসসমূহে বর্ণনা করা হয়নি। শুধু তাঁদের নামের পরিচয় পাওয়া যায়।

দুধ ভাই

রসুলেপাক স. এর রেযায়ী ভাই অর্থাৎ দুধ শরীক ভাইগণের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর চাচা হজরত হামযা। আরেকজন ছিলেন আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ। তিনি ছিলেন উম্মে সালামার স্বামী। তাঁর মায়ের নাম বাররা বিনতে আবদুল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন রসুলেপাক স. এর ফুফু। আবু সালামা এবং রসুলেপাক স.কে দুধ পান করিয়েছিলেন আবু লাহাবের ক্রীতদাসী হজরত ছুওয়ায়বা। তিনি তাঁর পুত্র মাসরুহ ইবনে ছুওয়ায়বাকে দুধ পান করানোর চার বৎসর ব্যবধানে দুধ পান করিয়েছিলেন প্রথমে হজরত হামযাকে, তারপর রসুলেপাক স.কে এবং সবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদকে। আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ যিনি রসুলেপাক স. এর চাচা হারেছের পুত্র– তিনিও রসুলেপাক স. এর দুধ ভাই ছিলেন। তাঁকে এবং রসুলেপাক স.কে দুধ পান করিয়েছিলেন রসুলেপাক স. এর ধাত্রী মা হজরত হালীমা সাদিয়া রা.। তাছাড়া হজরত হালীমা সাদিয়ার সন্তানেরাও রসুলেপাক স. এর দুধ ভাই-বোন ছিলেন।

একবার রসুলেপাক স. এর সৈন্যবাহিনী হাওয়াযেন কবীলার উপর আক্রমণ করলো। সেখানকার যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা বন্দিনী হয়ে এলেন। মহিলাটি বললেন, আমি তোমাদের নেতার ভগ্নি। তাঁকে যখন রসুলেপাক স. এর সামনে উপস্থিত করা হলো, তখন তিনি বললেন, হে মোহাম্মদ! আমি তোমার দুধ বোন। রসুলেপাক স. বলে উঠলেন 'মারহাবা'। তারপর তাঁর পবিত্র চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর তাঁকে বসতে দিলেন। অতীতের স্মৃতিচারণ করলেন। অশ্রুসজল হয়ে উঠলো তাঁর পবিত্র নয়নযুগল। বললেন, তুমি চাইলে আমার কাছে থেকে যেতে পারো। সম্মান ও ভালোবাসার সাথেই থাকতে পারবে। আর যদি তা না চাও, তবে তোমার লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারবে। তোমাকে হুল্লা (দু'পাট্টা কাপড়) ও অন্যান্য উপঢৌকন দিয়ে সসম্মানে বিদায় দেবো। মহিলা বললেন,

আমি আমার কাওমের কাছেই ফিরে যেতে চাই। পরে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন এবং রসুলেপাক স. তাঁকে তিনটি গোলাম ও বাঁদী এবং অনেক উট-বকরী হাদিয়া দিয়ে বিদায় দিলেন।

বর্ণিত আছে, ধাত্রীমাতা বিবি হালীমা সা'দিয়াও একবার রসুলেপাক স. এর দরবারে এসেছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকেও অনেক আদব-সম্মান করে হাদিয়া দিয়েছিলেন। আবু লাহাবের বাঁদী হজরত ছুওয়ায়বাকেও অনেক সম্মান করে হাদিয়া দিয়েছিলেন। বিবি হালীমা সা'দিয়া ও ছুওয়ায়বা দু'জনের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারেই উলামা কেরাম মতভেদ করেছেন। জান্নাতুল বাকীতে কুব্বায়ে হালীমা সা'দিয়া নামে একটি কুব্বা ছিলো। নজদীরা তা ভেঙে দিয়েছে। বলা হয়ে থাকে, রসুলেপাক স. জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিবি হালীমার কবরের কাছে যেতেন। বিবি হালীমার স্বামীর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। তবে বাহ্যিকভাবে দেখা যায় তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ছুওয়ায়বা বাঁদীকে আবু লাহাব আযাদ করেছিলো ওই সময়, যখন তিনি রসুলেপাক স. এর জন্মের সংবাদ তার কাছে পৌঁছিয়েছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়, সোমবার দিন রসুলেপাক স. এর জন্মের দিন। এই দিন আবু লাহাবের আযাব স্থগিত রাখা হয়। হজরত খাদীজার সঙ্গে রসুলেপাক স. এর বিয়ে হওয়ার পর ছুওয়ায়বা হজরত খাদীজার কাছে এসেছিলেন। তখন হজরত খাদীজা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। রসুলেপাক স. মদীনা থেকে মক্কায় ছুওয়ায়বার জন্য হুল্লা (দুপাট্টা) ও অন্যান্য কাপড় প্রেরণ করতেন। খয়বর বিজয়ের পর ছুওয়ায়বার ইনতেকাল হয়।

রসুলেপাক স. এর আর একজন ধাত্রীমাতা ছিলেন। তিনি তাঁকে কোলে রেখে লালন পালন করেছেন। তিনি হচ্ছেন উম্মে আয়মান হাবশী। তাঁর আর এক নাম ছিলো বরকত। কিন্তু মূল নামের চেয়ে উপনামই বেশী প্রচার পেয়েছিলো। হজরত উম্মে আয়মান হাবশায় দু'বার হিজরত করেছিলেন। পরে হাবশা থেকে মদীনায় চলে আসেন। তিনি রসুলেপাক স. এর বাঁদী ছিলেন। তাকে তিনি তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। অতঃপর পৈত্রিক সূত্রে রসুলেপাক স. তাঁর মালিক হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, রসুলেপাক স. এর মাতা হজরত আমেনা তাঁকে পেয়েছিলেন। তারপর হজরত খাদীজার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার সময় রসুলেপাক স. তাঁকে আযাদ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন উবায়েদ ইবনে যায়েদ ইবনে ওমর বনী হারেছের সঙ্গে। তাঁদের ঔরস থেকে জন্মগ্রহণ করে আয়মান নামক এক সন্তান। সেই সন্তানের নামানুসারেই তাঁর উম্মে আয়মান উপনামটি প্রচার পেয়ে যায়। উবায়েদ থেকে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন হজরত যায়েদ ইবনে হারেছার সঙ্গে। তাঁদের ঔরস থেকে জন্মগ্রহণ করেন হজরত উসামা ইবনে যায়েদ। তখন রসুলেপাক স. ছিলেন নবুওয়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তিনি স.

বলতেন, উম্মে আয়মান উম্মী বা'দা উম্মী, অর্থাৎ উম্মে আয়মান আমার মা আসল মায়ের পর। হজরত ওমর ফারুকের ওফাতের বিশ দিন পর হজরত ওছমানের খেলাফতকালে তাঁর ওফাত হয়। হজরত উম্মে আয়মান থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর পুত্র আয়মান, হজরত আনাস ইবনে মালেক এবং তারেক ইবনে শেহাব রা.।

তাইমা বিনতে হালীমা সা'দিয়া রসুলেপাক স. এর দুধ বোন ছিলেন। তিনি এবং রসুলেপাক স. এক সঙ্গে হালীমা সা'দিয়া থেকে দুধ পান করেছেন।

রসুলুল্লাহ্ স. এর দরবারের খাদেমগণ

১. হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.

পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও পাবন্দীর সাথে রসুলেপাক স. এর খেদমত করেছিলেন হজরত আনাস ইবনে মালেক ইবনে নযর আনসারী খাযরাজী। তাঁর উপনাম ছিলো আবু হামযা। হামযা এক প্রকারের তেজস্ক্রীয় ফল। ফার্সীতে তাকে বলা হয় তেরা তিযক। বর্ণিত আছে, হজরত আনাস একদিন ওই ফলটি হাতে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে দেখে আবু হামযা বলে ডাক দিলেন। সেই থেকে তাঁর উপনাম হয়ে গেলো আবু হামযা। দশ বৎসর তিনি রসুলেপাক স. এর খেদমত করেছিলেন।

রসুলে পাক স. যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখন হজরত আনাসের পিতা তাঁকে রসুলেপাক স. এর দরবারে নিয়ে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এ আমার প্রিয় পুত্র। আপনার খেদমতে তাকে অর্পণ করলাম। তারপর থেকে তিনি দশ বৎসর পর্যন্ত রসুলেপাক স. এর খেদমত করেন। সফর ও মুকীম সর্বাবস্থায়ই তিনি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলেন। হজরত আনাস বলেছেন, রসুলেপাক স. আমাকে কখনও বলেননি তুমি একাজ কেনো করোনি অথবা এ কাজ তুমি কেনো করেছো। হজরত আনাস সকল গাযওয়ায় (অভিযানে) অংশগ্রহণ করেছেন। হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালে তিনি বসরায় ইনতেকাল করেন। ৯১ অথবা ৯৩ অথবা ৯৯ হিজরীতে তিনিই বসরায় ইনতেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী। তিনি অনেক লোককে ফকীহ্ বানিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে যখন রসুলেপাক স. এর দরবারে আনা হয়, তখন তাঁর মা তাঁর জন্য নেক দোয়া যাচ্ঞা করেছিলেন। বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার এই খাদেমের জন্য দোয়া করুন। তিনি স. তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন– 'আল্লাহুম্মা আকছারা মালাহু ওয়া ওয়ালাদাহু ওয়া দাখালাহুল জান্নাত' (হে আল্লাহ! তুমি তার মাল ও সন্তান বৃদ্ধি করে দাও এবং তুমি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দাও)। তিনি বলতেন, রসুলেপাক স. এর দোয়ায় মাল ও সন্তান বৃদ্ধি তো দেখলাম, এখন আশা করি, বেহেশতে প্রবেশের দোয়ারও বাস্তবরূপ দেখতে পাবো। তিনি আরও বলতেন, আমার সহায়-সম্পদ

অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে। আমার আঙ্গুরের বাগানে বছরে দু'বার ফল হয়। তাঁর বয়স একশ বছর অতিক্রম করেছিলো। তাঁর ঔরস থেকে ১০৬ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে ৭০ জন পুত্র আর বাদবাকী কন্যা। তাঁর থেকে দু'হাজার দু'শ ছিয়াশিটি (২২৮৬) হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন সাহাবীগণের এক বিরাট দল। তারপর তাঁর পুত্রগণ, নাতিগণ এবং পুতিগণ থেকেও অনেক হাদিস গ্রহণ করেছেন। ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের জমানায় তিনি ইনতেকাল করেন। মোহাম্মদ ইবনে সীরীন তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। সীরীন ছিলেন তাঁর একজন গোলাম। এক সময় ১২০টি সন্তান দাফনের দায়িত্ব তাঁর উপর পড়েছিলো। তিনি তাদের দাফন করেছিলেন। শাসক হাজ্জাজের জন্য অপেক্ষা করেননি। কেননা হজরত আনাসের সঙ্গে শাসক হাজ্জাজের কটুকথা বিনিময় হয়েছিলো। কিন্তু হাজ্জাজ তাঁকে কষ্ট দেয়ার ধৃষ্টতা করতো না। তার কারণ, তাঁর সন্তান সংখ্যা ছিলো অত্যধিক এবং রসুলেপাক স. এর খাদেম হিসেবেও তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। আর রসুলেপাক স. এর দোয়ার শক্তিতে তিনি সব সময়ই হাজ্জাজের উপর বিজয়ী থাকতেন। হজরত আনাসের সেই দোয়াটি বিখ্যাত একটি দোয়া। ফার্সী ভাষায় তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্‌র মতো করে নামাজ পড়তে হজরত আনাসের চেয়ে বেশী নিখুঁতভাবে আমি আর কাউকে দেখিনি।

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.

রসুলেপাক স. এর আরেকজন খাদেম ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে গাফেল হুযালী। তিনি ইসলাম গ্রহণে ষষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর পাদুকা, মেসওয়াক, তাকিয়া (কোল বালিশ) ও লাঠি মোবারক বহন করতেন। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে 'বেসাদা' (বালিশ) বলা হয়েছে। সেখানে তাকিয়ার উল্লেখ নেই। এ সব কিছুর দায়িত্বে থাকতেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। রসুলেপাক স. যখন দাঁড়াতেন, তখন তিনি নালাইন (পাদুকা) মোবারক পরিয়ে দিতেন। আবার তিনি যখন উপবেশ করতেন তখন কদম মোবারক থেকে পাদুকা খুলে নিয়ে নিজের জামার আস্তিনের মধ্যে হেফাযতে রাখতেন। তিনি সব সময় ও সব মজলিশে রসুলেপাক স. এর কাছে থাকতেন। তাই কোনো আগন্তুক তাঁকে দেখে রসুলেপাক স. এর পরিবারের লোক মনে করতো। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা আছে। তাঁর সম্পর্কে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আমি আমার উম্মতের মধ্য থেকে ওই ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট, ইবনে মাসউদ যার উপর সন্তুষ্ট। আর আমি তার উপর অসন্তুষ্ট ইবনে মাসউদ যার উপর অসন্তুষ্ট। তিনি মদীনায় ইনতেকাল করেন ৩১ অথবা ৩২ অথবা ৩৩ হিজরীতে। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬২ বছর। চার খলীফা ও অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর নিকট থেকে রেওয়ায়েত (বর্ণনাকৃত হাদিস) গ্রহণ করেছেন।

৩. আয়মান ইবনে উম্মে আয়মান রা.

রসুলেপাক স. এর আরেকজন খাদেম ছিলেন আয়মান ইবনে উম্মে আয়মান। তাঁর দায়িত্ব ছিলো পানির মশক বহন করা। তিনি হুনায়ন যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

৪. রবীআ ইবনে কাআব আসলামী রা.

রসুলেপাক স. এর আরেকজন খাদেম ছিলেন রবীআ ইবনে কাআব আসলামী। তিনি রসুলেপাক স. এর জন্য ওজুর পানির ব্যবস্থা করতেন। তিনি আসহাবে সুফ্ফার অন্তর্ভূত ছিলেন। দীর্ঘ দিন তিনি রসুলেপাক স. এর সোহবত পেয়েছিলেন। সফর ও মুকিমী সর্বাবস্থায় তিনি রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির থাকতেন। তিনি রসুলেপাক স. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাবেয়ীগণের একটি দল তাঁর কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। বোখারী তাঁর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাররা (এযিদী জুলুম) এর ঘটনার পর ৬৩ হিজরীতে তিনি ইনতেকাল করেন।

৫. হজরত উকবা ইবনে আমের রা.

রসুলেপাক স. এর আরেকজন খাদেম ছিলেন হজরত উকবা ইবনে আমের। তাঁর দায়িত্ব ছিলো সফরের সময় রসুলেপাক স. এর উট টেনে নিয়ে যাওয়া। ইমাম যাহাবী 'কাশেফ' গ্রন্থে তাঁর তারীফ এভাবে করেছেন যে, তিনি একাধারে ছিলেন বড় নেতা, শরীফ ব্যক্তি, ফাসাহাতবিদ, এলমে ক্বেরাতের শিক্ষক এবং স্বভাবকবি সাহাবী। বাহরাইনের অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব তাঁকেই দেয়া হয়। তিনি মিশরে ইনতেকাল করেন। যখন হজরত আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে তাঁর আপন ভাই উতবা ইবনে আবু সুফিয়ানকে পদচ্যুত করে তাঁকে গভর্নর বানানো হয়, তখন ৫৮ হিজরীতে তিনি ইনতেকাল করেন। রসুলেপাক স. থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন সাহাবীগণের মধ্য থেকে হজরত জাবের ও হজরত ইবনে আব্বাস। আর তাবেয়ীগণের মধ্য থেকে অনেকে। 'জামেউল উসুল' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। হজরত উকবা ইবনে আমের বলেছেন, একবার আমি পাহাড়ী পথ ধরে রসুলুল্লাহ্র উট টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে উকবা! ছওয়ার হও। আমি তাঁর ছওয়ারীতে আরোহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করলাম। আবার ভয় করলাম, হুকুম পালন না করলে কোনো বেআদবী হয়ে যায় কিনা। তাই হুকুম পালন করলাম। আরোহণ করে আবার তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। তারপর রসুলেপাক স. আরোহণ করলেন। আর আমি উট টেনে নিয়ে যেতে লাগলাম। তিনি স. বললেন, আমি কি তোমাকে এমন দু'টি সুরার কথা বলবো এবং তোমাকে তা শেখাবো, যা মানুষ পাঠ করবে? আমি নিবেদন করলাম, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পিতা-মাতা আপনার নামে কোরবান হোক, আপনি বলুন। তিনি বললেন, সুরা দু'টি হচ্ছে– 'কুল আঊযু

বিরব্বিন্নাস’ এবং ‘কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব’। রসুলেপাক স. আমার প্রতি লক্ষ্য করে দেখলেন, আমি যেনো এ সুরা দু’টির নাম শুনে খুব বেশী প্রীত হইনি। অর্থাৎ সমস্ত কোরআন, বিশেষ করে সুরা ফাতেহা ও সুরা বাক্বারার মোকাবেলায় এই দু’টি সুরা উত্তম হবে বরকতের দিক দিয়ে এতে আমি যেনো খুব খুশি হতে পারিনি। রসুলেপাক স. তখন ফজরের নামাজ পড়ার জন্য অবতরণ করলেন এবং ওই দুই সুরা দ্বারা ফজরের নামাজ পড়লেন। তারপর আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, দেখেছো? অর্থাৎ, তুমি দেখতে পেয়েছো, এ ছোটো দু’টি সুরাই আমি নামাজের মধ্যে পাঠ করেছি। কেননা কল্যাণ, মর্যাদা ও আশ্রয় যাচ্ঞার দিক দিয়ে এবং শারীরিক ও আত্মিক বালা-মুসিবত দূর করার ক্ষেত্রে এই সুরা দু’টি খুবই উপকারী। সফরে এবং ফজরের নামাজে এই দুই সুরা পাঠ করার কারণও তাই। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, আবু দাউদ এবং নাসায়ী। ইমাম আজমের বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন তিনটি সুরা বলবো, যা তাওরাত, ইঞ্জিল এবং ফুরকানে আছে? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহ্‌র রসুল! তিনি স. বললেন, ‘তুমি কুল হুয়াল্লাহু আহাদ’, ‘কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব’ এবং ‘কুল আউযু বিরব্বিান্নাস’ পাঠ করবে।

৬. হজরত আবু বকরের গোলাম হজরত সাআদ রা.

রসুলেপাক স. এর আরেকজন খাদেম ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের আযাদকৃত গোলাম হজরত সাআদ। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো সাঈদ। তবে সাআদ নামেই তিনি বেশী খ্যাত। তিনি রসুলেপাক স. এর সোহবত পেয়েছিলেন এবং তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থাকতেন। তার কাছ থেকে ইমাম হাসান বসরী হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাও একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি এই– হজরত সাআদ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুলেপাক স. এর দরবারে কিছু খেজুর এলো। লোকেরা (দুই জাতের) দু’টি দু’টি করে উঠাতে শুরু করলো। রসুলেপাক স. বললেন (দুই জাতের) দু’টি এক সাথে করে খেয়ো না। ইমাম যাহাবী এরকম বর্ণনা করেছেন। ‘ইস্তিআব’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, হাসান বসরী আবু বকরের আযাদকৃত গোলাম সাআদ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। অথচ তাঁর বর্ণিত কোনো হাদিস পাওয়া যায় না। তবে আবু আমের বলেছেন, আবুল হারার সাহেল ইবনে রুস্তম নামের এক ব্যক্তিকেই সাঈদ বলা হতো। তাঁর সাআদ নামটি বেশী প্রকাশ্য ছিলো। তাঁকে বসরার অধিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনিই রসুলুল্লাহ স. এর খেদমত করতেন। তাঁর বর্ণনায় কেবল এতোটুকু পরিচয়ই পাওয়া যায়। তাঁর বংশ পরিচয় কিছুই জানা যায়নি। তবে শুধু এতোটুকুই জানা গিয়েছে যে, তিনি হজরত আবু বকরের গোলাম ছিলেন।

৭. আফলাহ্ ইবনে শুরাইক রা.

রসুলেপাক স. এর আরেকজন খাদেম ছিলেন আফলাহ ইবনে শুরাইক। তাঁর দায়িত্ব ছিলো রসুলেপাক স. এর উটের পিঠে পালান বেঁধে দেয়া। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা বলেছেন, তাবারী রবী ইবনে বদর আর তিনি তাঁর পিতা বদর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার কাছে আফলাহ নামের এক ব্যক্তি বলেছেন, আমি রসুলেপাক স. এর খেদমত করতাম। একদিন রসুলেপাক স. আমাকে বললেন, হে আফলাহ! ওঠো। উটের উপর পালান বাঁধো। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার তো স্বপ্নদোষ হয়ে গিয়েছে। তিনি স. চুপ হয়ে গেলেন। তারপর জিবরাইল আ. রসুলেপাক স. এর কাছে তায়াম্মুমের আয়াত নিয়ে এলেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে আফলাহ! ওঠো। তায়াম্মুম করে নাও। আমি তায়াম্মুম করলাম এবং রসুলেপাক স. এর জন্য পালান বেঁধে দিলাম। তিনি স. রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে এক কূপের কাছে পৌঁছলে আমাকে বললেন, হে আফলাহ! তাড়াতাড়ি এই মিষ্টি পানি দ্বারা গোসল করে নাও। আফলাহ্ বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ আমাকে তায়াম্মুমের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, এক বার মাটিতে হাত মেরে মুখের উপর মাসেহ্ করতে হবে। আর একবার মাটিতে হাত মেরে দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে।

৮. হজরত আবু যর গেফারী রা.

রসুলেপাক স. এর আরেক জন খাদেম ছিলেন হজরত আবু যর গেফারী। তাঁর নাম ছিলো জুন্দুব ইবনে জুনাদ। তিনি দুনিয়াবিমুখ সাহাবী ছিলেন। ছিলেন মক্কা মুকাররমায় চতুর্থ অথবা পঞ্চম ইসলাম গ্রহণকারী। রসুলেপাক স. এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তিনি অনেক ইবাদত করেছেন। তাঁর মতবাদ ছিলো– সম্পদ, অর্থ ও স্বর্ণ জমা করা হারাম। তাঁর জীবনদর্শন ও জীবনধারা বড় বিস্ময়কর ছিলো। তাঁর মর্যাদা ছিলো অতি উচ্চ।

'ওয়াল্লাযীনা ইয়াকনিযূনায যাহাবা ওয়াল ফিদ্দাত' (যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে) এই আয়াতের ব্যাপারে হজরত আমীর মুয়াবিয়ার সঙ্গে তাঁর মতভেদ সৃষ্টি হলো। আমীর মুয়াবিয়া বললেন, এই আয়াত নাযিল হয়েছে আহলে কিতাবদের সম্পর্কে। তারপর তিনি এ বিষয়ে অভিযোগনামা লিখে পাঠালেন আমীরুল মুমিনীন হজরত ওছমানের কাছে। হজরত ওছমান তাঁকে শাম দেশ থেকে মদীনায় ডেকে আনালেন। তারপর রুবযা নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। স্থানটি মদীনা শরীফ থেকে তিন মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। সেখানেই তিনি বসবাস শুরু করেন। ৩১ বা ৩২ হিজরীতে তিনি ইনতেকাল করেন। 'ইসাবা' নামক কিতাবে বলা হয়েছে, ৩২ হিজরীতে তাঁর ইনতেকাল হয়। তাঁর নামাজে জানাযা পড়িয়েছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। এসেছিলেন কুফা থেকে। সেখানে পৌঁছে তিনি অনেকক্ষণ

পর্যন্ত কান্নাকাটি করলেন। বললেন, আমার ভাই ও বন্ধু একা একাই জীবন যাপন করেছেন, একা একাই প্রস্থান করেছেন, একা একাই হাশরের ময়দানে উঠবেন। তাঁর জন্য কতোই না শুভসংবাদ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সঙ্গে কয়েকজন আনসার ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কিছু চাদর ছিলো। এখান থেকে যাওয়ার দশদিন পর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও ইনতেকাল করেন। 'ইসাবা' নামক কিতাবে আছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রুবযায় হজরত আবু যর গেফারীর জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন। তারপর তিনি মদীনায় চলে আসেন। কিছুদিন পর তিনিও দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান। হজরত ইবনে মাসউদের সঙ্গেও হজরত ওছমানের একই বিষয়ে মতভেদ হয়েছিলো।

হজরত আবু যর গেফারীর মক্কা থেকে আসা এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বড়ই বিস্ময়কর। হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত আবু যরের চেয়ে অধিক সত্যবাদী অন্য কারও উপর আকাশ ছায়া প্রদান করেনি এবং যমীনও কারও ভার বহন করেনি। বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু যর ইবাদতের ক্ষেত্রে হজরত ঈসার মতো ছিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, কোনো ব্যক্তি যদি হজরত ঈসার যুহ্‌দ (দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততা) দেখে খুশি হতে চায়, তাহলে সে যেনো আবু যরকে দেখে। আর এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি হেদায়েত, যুহ্‌দ, পুণ্য ও উপাসনার ক্ষেত্রে হজরত ঈসার খুব কাছাকাছি কাউকে দেখতে চায়, তবে সে যেনো আবু যরকে দেখে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে– পুণ্য ও সত্যবাদিতার দিক দিয়ে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে– সুরত ও সীরতের দিক দিয়ে।

ইবনে আবদুল বার 'ইস্তিআব' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু যর গেফারীর উপর যখন মৃত্যুর জাকান্দানী শুরু হলো, তখন তাঁর মা ও তাঁর সহধর্মিণী কাঁদতে শুরু করলেন। হজরত আবু যর বললেন, কাঁদছো কেনো? তাঁরা বললেন, এ স্থান জনমানবহীন, মরুময়। আপনার বিদায়ের ক্ষণ সন্নিকটবর্তী। আমাদের কাছে কোনো কাপড়ও নেই যে, আপনাকে কাফন দিবো। এ সব কথা ভেবেই আমরা কাঁদছি। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি সুসংবাদ দেই শোনো। আমি রসুলেপাক স. এর কাছ থেকে কথাটি শুনেছি। তিনি স. একদল লোকের সম্মুখে বলেছিলেন, আমিও ছিলাম ওই দলে। তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে একজন মরুভূমিতে চলে যাবে এবং মুসলমানদের একটি দল তার কাছে পৌঁছে যাবে। সেই দলের সকলেই দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে এবং কারও অবস্থা এরকম হয়নি। সুতরাং আল্লাহ্‌র কসম, আমিই সেই ব্যক্তি, যার জন্য আল্লাহ্‌র রসুল এই এরশাদ করেছিলেন। তিনি আরও বললেন, যাও। পথের দিকে চেয়ে থাকো। দেখো, কোনো দল এদিকে আসছে কি না। তাঁর স্ত্রী বললেন, এখন তো কারো আসার সময় নয়। হাজীগণ হজ করতে চলে গিয়েছেন। এ পথে পথিকের আনাগোনা আর নেই। হজরত আবু যর বললেন, যাও, ভালো করে লক্ষ্য

করতে থাকো। তাঁর স্ত্রী বলেন, আমি তখন একটি টিলার উপর আরোহণ করলাম। হঠাৎ দেখলাম, একদল লোক এদিকেই এগিয়ে আসছে। কীকর কাঠের লাকড়ির উপর চাদর টেনে তারা এদিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা আমার নিকটবর্তী হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র বান্দী! তোমার অবস্থা কী? তুমি কে? আমি বললাম, এক মুসলমানের জাঁকান্দানী উপস্থিত হয়েছে। তাঁর জন্য কাফনের কাপড় প্রয়োজন। তাঁরা প্রশ্ন করলো, কে? আমি বললাম, আবু যর। তারা বললো, রসুলুল্লাহ্‌র সাহাবী? আমি বললাম, হাঁ। তারপর তাঁরা প্রথমে তাঁদের মা বাবার জন্য শোক প্রকাশ করলেন। পরে আবু যরের কাছে এলেন। হজরত আবু যর বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি সুসংবাদ শোনাচ্ছি, যা আমি শুনেছি রসুলুল্লাহ্ থেকে। তিনি স. একদিন একদল লোকের সামনে বললেন, তোমাদের মধ্যে একজন মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করবে এবং তার কাছে মুসলমানদের একটি জামাত আসবে। যাদের মধ্যে রসুলেপাক স. একথাটি বলেছিলেন, তাদের কেউই এখন বেঁচে নেই। প্রত্যেকেই আপন আপন কাওমের মধ্যে অথবা জামাতের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি মিথ্যা বলছি না। তিনি আরও বললেন, আমার কাছে বা আমার স্ত্রীর কাছে এতোটুকু কাপড়ও যদি থাকতো যাতে কাফন দেয়া যায়। আর আমি আপনাদেরকে কসম দিচ্ছি, আপনাদের মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি যেনো আমাকে কাফন না দেয়, যে ধনবান, রাজদরবারের লোক, রাজার দূত বা রাজকীয় কোনো ঘোষক। এক আনসারী যুবক বললো, হে চাচা! আমি আপনাকে এই চাদর দিয়ে কাফন দিবো, যা এনেছে আমার বাঁদী। হজরত আবু যর বললেন, ঠিক আছে। এই কাপড় দিয়েই আমাকে কাফন দিয়ো। হজরত আবু যর চিরবিদায় নিলেন। আনসারী যুবক ওই কাপড় দিয়েই তাঁকে কাফন পরিয়ে নামাজের জন্য দাঁড়ালেন এবং তাঁরা তাঁকে দাফন করলেন। 'ইস্তিআব' প্রণেতা বলেছেন, আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদুনা আলী মুর্তযাকে লোকেরা একবার প্রশ্ন করলো, আবু যর কেমন ছিলেন? হজরত আলী বললেন, তিনি এমন লোক ছিলেন যে, যে এলেমের বিষয়ে সকল লোক অক্ষম হতো, সে এলেম তাঁর কাছে ছিলো। তিনি যতো দিন জীবিত ছিলেন, তাঁর আসরার (জীবন রহস্য) কখনও প্রকাশ করেননি এবং তাঁর কাছ থেকে কোনো কিছু প্রকাশিতও হয়নি।

৯. সাইয়্যেদা উম্মে সালামার আযাদকৃত গোলাম মুহাজের রা.

রসুলেপাক স. এর আরেকজন খাদেম ছিলেন সাইয়্যেদা উম্মে সালামার আযাদকৃত গোলাম মুহাজের রা.। সাহাবা কেরামের মধ্যে মুহাজের নামে অনেকেই ছিলেন। একজন ছিলেন মুহাজের ইবনে জাবীব, যাঁর নিকট থেকে সামআদরিয়ার বিষয়ে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আরেকজন ছিলেন মুহাজের ইবনে কুনফুয। তিনি একবার রসুলেপাক স. এর কাছে এলেন। তিনি স. তাঁর সম্বন্ধে বললেন, এ

মুহাজের খাঁটি মুহাজের। তখন লোকেরা বুঝতে পারলো, রসুলেপাক স. এর মকসুদ ছিলো উপস্থিত লোকদেরকে তার নামটি শুনিয়ে দেয়া। তৃতীয় জন ছিলেন মুহাজেরে মক্কী। যার কাছ থেকে মেশকাত শরীফে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনা কোনো কিতাবে পাওয়া যায়নি। চতুর্থ জন হলেন সাইয়্যেদা উম্মে সালামার আযাদকৃত গোলাম মুহাজের। তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌র খেদমত করতাম। তাঁকে মিশরবাসী বলে গণ্য করা হতো। 'ইস্তিআব' প্রণেতা বলেছেন, আমি জানি না তিনি ওই মুহাজের কি না , যিনি বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্‌র পবিত্র পাদুকা ছিলো দুই ফিতাবিশিষ্ট। নাকি তিনি মুহাজের ইবনে যিয়াদ হারেছী, যিনি ছিলেন রবী ইবনে যিয়াদের ভাই। আরেকজন মুহাজের ছিলেন, যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, মুহাজের রাজুল মিনাস সাহাবা। তিনিও বর্ণনা করেছেন যে, রসুলেপাক স. এর নালাইন মুবারকের দু'টি ফিতা ছিলো। আরেকজন মুহাজের হলেন মুহাজের ইবনে মাসউদ। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তাঁকে সাহাবীর মধ্যে গণ্য করা ধারণামূলক।

১০. হুনায়ন রা.

আরেকজন খাদেম ছিলেন হুনায়ন, যিনি আবদুল্লাহর পিতা এবং হজরত ইবনে মাসউদের গোলাম ছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর খেদমত করতেন। রসুলেপাক স. তাঁকে তাঁর চাচা হজরত আব্বাসকে দান করে দিয়েছিলেন। 'কাশেফ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হুনায়ন হজরত ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। 'কাশেফ' এর টীকাভাষ্যে 'তাহযীব' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, হুনায়ন হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে হুনায়নের পিতা। হাশেমী আলী মুর্তযা থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। 'নাসায়ী' গ্রন্থে তাঁর থেকে চড়ুই পাখির গোশতের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

১১. নাঈম রা.

আরেকজন খাদেম ছিলেন নাঈম ইবনে আবু রবীআ আসলামী, অথবা নাঈম ইবনে রাবীআ ইবনে কাআব আসলামী। ইবনে মিন্দা তাঁকে সাহাবীর মধ্যে গণ্য করেছেন। তাঁরা হাদিস বর্ণনা করেছেন ইব্রাহীম ইবনে সাআদ, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে, তিনি মোহাম্মদ ইবনে আতা থেকে, তিনি নাঈম ইবনে রাবীআ থেকে। নাঈম ইবনে রাবীআ বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌র খেদমত করতাম।

১২. আবুল হামরা রা.

আরেকজন খাদেম ছিলেন আবুল হামরা। তিনি রসুলেপাক স. এর গোলাম এবং খাদেম ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো হেলাল ইবনুল হারেছ। তবে তিনি তাঁর উপনাম আবুল হামরা হিসেবেই পরিচিত। তিনি পরবর্তী জীবনে হেমসে বসবাস

করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ছিলো ইবনে জাফর। ইবনে ইসহাক 'তারিখে হেমস' গ্রন্থে এরকম উল্লেখ করেছেন। তিনিই বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ্ যখন সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার ঘরে তশরীফ নিতেন, তখন বলতেন 'আস্সালামু আলাইকুম আহলাল্ বাইতি ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউয্‌হিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল্ বাইতা ওয়া ইউতাহ্‌হিরুকুম তাত্‌হীরা'। হাদিসটি 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 'ইসাবা' কিতাবে বোখারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, তাঁর সোহবতের বিষয়টি সুপ্রমাণিত। তবে তাঁর হাদিস সহীহ্ নয়।

১৩. আবুস্ সামাহ রা.

আরেকজন খাদেম ছিলেন আবুস্ সামাহ। তাঁর আসল নাম ছিলো আবায। তিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর গোলাম এবং খাদেম ছিলেন। তাঁর থেকে মিহল ইবনে খলীফা একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি গ্রহণ করেছেন আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং নাসায়ী। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো আবাদ এবং তিনি নবী করীম স. এর খাদেম ছিলেন। আবু যুরআ বলেছেন, আমি তাকে চিনি না এবং তাঁর নামও জানি না। তবে তাঁর একটি হাদিস জানা আছে, যা বর্ণনা করেছেন আবু খুযায়মা, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা এবং বাগবী– ইয়াহইয়া ইবনে ওলীদের সূত্রে। হাদিসটি এই– আমাদের কাছে মিহল ইবনে খলীফা বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌র খেদমত করতাম। আর তিনি স. যখন গোসল করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন, তখন তাঁর পবিত্র পৃষ্ঠাদেশ আমার দ্বারা রগড়াতেন। বায্‌যার বলেছেন, আবুস্ সামাহর এই হাদিস উদ্ধৃত সনদ ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে আসেনি। তিনি শহীদ হয়েছিলেন। আসলে কী হয়েছিলো তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। এই তেরোজন সাহাবী রসুলেপাক স. এর খাদেম ছিলেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে তাঁদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

রসুলুল্লাহ স. এর দরবারে খেদমতকারী মহিলাগণ

রসুলেপাক স. এর দরবারে খেদমত করেছেন এমন মহিলাদের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে পেশ করা হচ্ছে।

১. উম্মে আয়মান রা.

উম্মে আয়মান একজন হাবশী মহিলা ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিলো বরকত। তিনি ছিলেন হজরত উসামা ইবনে যায়েদের মা। তাঁর জীবনচরিত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে রসুলেপাক স. এর চাচা এবং ফুফুগণের বর্ণনায়। এখানে তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। হজরত উসামা কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন এবং তাঁর দেহের এ কৃষ্ণতার কারণ ছিলেন তাঁর মা। যদিও তাঁর পিতা হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা ছিলেন শুভ্র ও সুন্দর।

২. খাওলা রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের আরেকজন খাদেমা ছিলেন হজরত হাফসের দাদী। তাঁর নাম খাওলা। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' ও 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবদ্বয়ে এতোটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে। এর চেয়ে বেশী কিছু লেখা হয়নি। আমি তাঁর নাম ও জীবনী বিষয়ে যখন অনেক অনুসন্ধান করলাম, তখন তাঁর নাম বিভিন্ন স্থানে পেলাম। এমন কি এক পর্যায়ে আমি শায়েখ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর 'আল ইসাবা ফী মারেফাতিস সাহাবা' কিতাবের দিকে ধাবিত হলাম। দেখলাম, তিনি এই নামের প্রায় বিশজন ব্যক্তির কথা বলেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনাও দিয়েছেন। তন্মধ্যে একজনকে এমন পেলাম না, যিনি হাফসের দাদী ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাতে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনিই রসুলেপাক স. এর দরবারের খাদেমা ছিলেন। শায়েখ আসকালানী বলেছেন, আবু আমর বলেছেন, হাফসা ইবনে সাআদ তাঁর পিতা সাআদ থেকে খাওলার মাধ্যমে সুরা ওয়াদ্দোহার তাফসীর সংক্রান্ত বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন। আবু আমর এও বলেছেন যে, এই হাদিসের সনদ এমন সুদৃঢ় নয়, যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়। তারপর শায়েখ আসকালানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির সনদ এরকম— আবু বকর ইবনে আবু শায়বা এবং তিবরানী আবু নাঈম মোল্লায়ী হাফস থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর মাতা যিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর খাদেমা ছিলেন, তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একটি কুকুর ছানা রসুলেপাক স. এর হুজরা শরীফের ভিতরে ঢুকে তাঁর চার পায়ার বা চৌকির নিচে লুকিয়ে রইলো। সকালে রসুলেপাক স. খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ভাবছেন? তিনি স. বললেন, আজ রাতে জিবরাইল এলেন না। বুঝতে পারছি না, এর কারণ কী। তারপর রসুলেপাক স. চাদর গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন, ঝাড়ু দিয়ে ঘর পরিষ্কার করো। আমি ঝাড়ু নিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, রসুলেপাক স. এর চার পায়ার নিচে একটি কুকুর ছানা মরে পড়ে আছে। আমি মৃতদেহটিকে বের করে বাইরে ফেলে দিলাম। রসুলেপাক স. ঘরে এলেন। তাঁর পবিত্র শ্মশ্রু ইষৎ কম্পিত হচ্ছিল। ওহী নাযিলের আলামত দেখা গেলো। তিনি কাঁপতে শুরু করলেন। তারপর আমাকে বললেন, হে খাওলা! আমাকে একটু একা থাকতে দাও। ঘরের বাইরে চলে যাও। তখন সুরা ওয়াদ্দোহা শেষ পর্যন্ত নাযিল হলো।

'মাদারেজুন নবুওয়াত' রচয়িতা শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী বলেন, এ হাদিসের অনুরূপ হাদিস মেশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে সাইয়্যেদা মায়মুনা থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে এরকম— রসুলুল্লাহ্ একদিন খুব চিন্তিত অবস্থায় রাত্রিযাপন

করলেন। সকালে বললেন, জিবরাইল আজ রাতে আমার কাছে আসার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু এলেন না। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ্র কসম, জিবরাইল কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। অর্থাৎ কোনো কারণ ও ওজর ছাড়া ওয়াদার বরখেলাফ তিনি কখনও করেননি। বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। তখন অন্তরে আপনা আপনিই এল্‌কা হলো যে, তাঁর তাঁবুর ভিতর একটি কুকুরের বাচ্চা মরে পড়ে আছে। তিনি স. কুকুর শাবকটিকে তাঁবুর ভিতর থেকে বের করে বাইরে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর হাতে পানি নিয়ে ওই জায়গাটিতে ছিটিয়ে দিলেন। রাত হলো। জিবরাইল আ. এর সঙ্গে রসুলেপাক স. এর সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি স. বললেন, হে জিবরাইল! আপনি কি গত রাতে আমার কাছে আসার অঙ্গীকার করেননি? জিবরাইল নিবেদন করলেন, নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি ওই ঘরে প্রবেশ করতে পারি না, যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে। তারপর রসুলেপাক স. ছোটো বাগানের কুকুরগুলো মেরে ফেলতে এবং বড় বড় বাগানের কুকুরগুলো বাগান পাহারা দেয়ার কাজে ব্যবহার করার জন্য রেখে দেওয়ার হুকুম দিলেন। এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিকার করার জন্য অথবা বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্য অথবা শস্যক্ষেত বা বাগান রক্ষার জন্য কুকুর রাখা জায়েয। ইমাম মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৩. উম্মে রাফে রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের আরেকজন খাদেমা ছিলেন রাফে'র মাতা সালমা। তিনি ছিলেন রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম আবু রাফে'র স্ত্রী। তিনি রসুলেপাক স. এর বাঁদী এবং খাদেমা ছিলেন। 'উসদুল গাবা' পুস্তকে বলা হয়েছে, সালমা সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের ক্রীতদাস আবু রাফে'র স্ত্রী ছিলেন। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তিনি রসুলেপাক স. এর খাদেমা ছিলেন। বনী ফাতেমার ধাত্রীমা এবং রসুলেপাক স. এর পুত্র হজরত ইব্রাহীমের ধাত্রীমা ছিলেন। তিনি সাইয়্যেদা ফাতেমার গোসল দিয়েছিলেন তাঁর স্বামী হজরত আলীর সঙ্গে। তিনি খয়বরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর আযাদকৃত গোলাম আবু রাফে'র স্ত্রী উম্মে রাফে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রসুল স. এর কাছে এলেন। বললেন, আমার স্বামী আমাকে প্রহার করেছে। রসুলেপাক স. আবু রাফেকে বললেন, হে আবু রাফে! তুমি তার সাথে কীরূপ আচরণ করেছো? প্রহার করেছে কেনো? তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সে আমাকে কষ্ট দেয়। রসুলেপাক স. বললেন, হে সালমা! তুমি তাকে কষ্ট দাও কেনো? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তাকে কোনো কষ্ট দেইনি। তবে সে নামাজের মধ্যে হদছ (বায়ু বের হওয়া) করেছে। সে জন্য আমি তাকে বলেছিলাম, হে আবু রাফে! আল্লাহ্র রসুল বলেছেন, কারো দেহ থেকে বায়ু বা অন্য কিছু বের হলে সে যেনো

ওজু করে নেয়। একথা শুনেই সে আমাকে প্রহার করেছে। রসুলেপাক স. হাসতে শুরু করলেন এবং বললেন, হে আবু রাফে! সালমা তো তোমাকে ভালো কথাই বলেছে। তুমি তাকে প্রহার কোরো না। এটি একটি আশ্চর্য ধরনের ঘটনা বটে। কেননা রসুল স. এর ক্রীতদাস ও সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি হদছ হওয়ার বিধান জানেন না। হতে পারে রসুলেপাক স. এর সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও হদছের কারণে যে ওজু ভঙ্গ হয়ে যায়– এই মাসআলাটি তাঁর জানা ছিলো না।

কেউ কেউ বলেছেন, হজরত আবু রাফে প্রথমে হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ক্রীতদাস ছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিয়োজিত করেন। তিনি যখন হজরত আব্বাসের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন, তখন রসুলেপাক স. তাঁকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। তাঁর মূল নাম ছিলো ছাবেত বা ইয়াযীদ। তাঁর মূল নামের উপর উপনামই প্রবল হয়ে গিয়েছিলো। তিনি উহুদ ও খন্দকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, আবু রাফে'র ইসলাম গ্রহণ হয়েছিলো বদর যুদ্ধের পূর্বে। কিন্তু তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন না। রসুলেপাক স. তাঁর ক্রীতদাসী উম্মে রাফে সালমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁদের ঔরস থেকেই হজরত রাফের জন্ম হয়।

৪. মায়মুনা বিনতে সাআদ রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের আরেকজন খাদেমা ছিলেন তাঁর ক্রীতদাসী মায়মুনা বিনতে সাআদ। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকেই তাঁর কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন শামবাসীদের বিষয়ে। রায়তুল মুকাদ্দাসের ফযিলত, চোগলখুরি ও প্রস্রাবের ছিঁটা থেকে আত্মরক্ষা না করার ফলে কবরের আযাব হওয়া ও লেবাস বিষয়ক হাদিস।

৫. উম্মে আয়াশ রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের আরেকজন খাদেমা ছিলেন উম্মে আয়াশ। তাঁর কাজ ছিলো রসুলেপাক স. এর কন্যা সাইয়্যেদা রুকিয়াকে ওজু করিয়ে দেয়া। তিনি বলেছেন, ওজু করানো কালে আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। আর রসুলেপাক স. সেখানে বসে থাকতেন। তিনি আরও বলেছেন, আমি রসুলেপাক স.কে বলতে শুনেছি, তিনি স. বলেছেন, আমি সাইয়্যেদা উম্মে কুলছুমকে বিয়ে দেইনি আসমানী ওহীর মাধ্যম ছাড়া।

এই হলো ওই সকল মহান ব্যক্তিগণের পরিচয়, যাঁরা রসুলেপাক স. এর খেদমত করে নিজেদেরকে ধন্য করেছেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় তাঁদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। 'রওজাতুল আহবাব' প্রণেতা বলেছেন, নবীজীবনীবিশেষজ্ঞদের কিতাবসমূহে একুশ জন পুরুষ ও এগারো জন মহিলার নাম পাওয়া যায়, যাঁরা রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তন্মধ্যে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে তাঁদের সম্পর্কে যতোটুকু জানা যায়, তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে। ওয়া বিল্লাহিত্ তাওফীক।

১. হজরত বেলাল হাবশী রা.

রসুলেপাক স. এর খাদেম সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন হজরত বেলাল হাবশী। তিনি মোয়াজ্জিনও ছিলেন। তাঁর মর্যাদা ও ফযিলত অনেক। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, রসুলেপাক স. বলেছেন, অগ্রগামী ব্যক্তি চারজন। তন্মধ্যে আমি আরবদের মধ্যে অগ্রগামী আর বেলাল হাবশার মধ্যে অগ্রগামী। হজরত ওমর ফারুক বলেছেন, আমাদের নেতা আবু বকর আমাদের আরেক নেতা বেলালকে আযাদ করেছেন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী। তিনি দামেশকে ২০ হিজরীতে ইনতেকাল করেন। আরেক বর্ণনা মতে ১৮ হিজরীতে ইনতেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো ষাট বছরের চেয়ে কিছু বেশী। এক বর্ণনা অনুসারে সত্তর বছর। রসুলেপাক স. এর সংসারের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব ছিলো তাঁর উপর। মোয়াজ্জিনের বর্ণনায় তাঁর সম্পর্কে আরও আলোচনা করা হবে।

২. দুমেখমার রা.

দুমেখমার একজন খাদেম সাহাবী ছিলেন। কেউ কেউ তাঁর নাম দুমুখবেরও বলেছেন। তিনি ছিলেন হাবশার বাদশাহ্'র ভাগিনা। 'রওজাতুল আহবাবে' এরকমই বলা হয়েছে। 'ইস্তিআব' প্রণেতা তাঁকে যু মুখবের বলেছেন। অবশ্য তাকে যু মুখমেরও বলা হয়। উক্ত গ্রন্থকার বলেছেন, ইমাম আওযায়ী তাঁকে যু মুখমেরই বলেছেন। তিনিও বলেছেন যে, তিনি নাজ্জাশীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তাঁর থেকে রসুলুল্লাহ্ স. এর বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। শামদেশের লোকেরাই তাঁর কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন বেশী। তাঁকে শামদেশের লোক বলেও গণ্য করা হয়। 'কামুস' প্রণেতা তাঁকে নাজ্জাশীর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেছেন। 'কাশেফ' গ্রন্থেও এরকমই বলা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, তিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি শামদেশে চলে যান এবং সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। হজরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের এবং খালেদ ইবনে মা'দান প্রমুখ বহু বর্ণনাকারী তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। 'জামেউল উসুলে' বলা হয়েছে, তাঁর নাম ছিলো যু মুখবেব। তিনি নাজ্জাশীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। রসুলেপাক স. এর খাদেম ছিলেন। এক বর্ণনামতে সুমুখমেরও পাওয়া যায়। শামদেশের লোক হিসেবে তাঁকে গণ্য করা হয়। আর শামদেশের লোকদের মধ্যেই তাঁর বর্ণিত হাদিস বেশী পাওয়া যায়। উপরোক্ত বর্ণনা আনুসারে 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'তিনি নাজ্জাশীর ভাগিনা ছিলেন' কথাটি ভুল বলে মনে হয়।

৩. বিকায়র ইবনে শাদ্দাখ লাইছী রা.

বিকায়র ইবনে শাদ্দাখ লাইছী একজন খাদেম সাহাবী ছিলেন। 'রওজাতুল আহবাবে' তাঁর নাম এভাবেই এসেছে। 'ইসাবা'য় বুকায়র ইবনে শাদ্দাখ বলা

হয়েছে। তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। রসুলেপাক স. এর খেদমত করতেন। তাঁর একটি ঘটনা আছে, যা আশআদ আনসারী শিরোনামে আবু বকর হুযালীর সূত্রে আবদুল মালেক ইয়া'লী লাইছী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। বিকায়র ইবনে শাদ্দাখ হজরত ওমর ফারুকের শাসনামলে এক ইহুদীকে হত্যা করেছিলেন। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হজরত ওমর ফারুক মিম্বরে উঠে বললেন, আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমি ওই ব্যক্তিকে খুঁজছি, যে খুনের ব্যাপারে আমাকে পুরোপুরি অবহিত করতে পারে। তখন হজরত বিকায়র ইবনে শাদ্দাখ দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এই ঘটনা সবচেয়ে বেশী জানি। হজরত ওমর খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলেন 'আল্লাহু আকবার'। হজরত বিকায়র বললেন, ওমুক ব্যক্তি যুদ্ধে চলে গিয়েছে। যুদ্ধে যাওয়ার আগে ঘর থেকে বাইরে এসে সে আমাকে তার পরিবার পরিজনের ওকীল বানিয়ে ছিলো। পরে আমি তার বাড়িতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি এক ইহুদী তার ঘরে অবস্থান করছে। সে তখন কবিতার একটি চরণ আবৃত্তি করছিলো−

ওয়া আশআছ ইয়্যাতুল ইসলাম + হাত্তা খালওয়াতা বিফারসিহী লাইলাতাল ফিহাম।

অর্থঃ আশআছকে ইসলামে সম্মানিত করেছে। এমনকি আমি তার ঘোড়া নিয়ে অন্ধকার রাত্রিতে এসে তোমার সঙ্গে নির্জনবাস করলাম− এ অবস্থা দেখে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করে ফেলি। হজরত ফারুকে আজম তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন এবং তাঁর কেসাস বাতিল করে দিলেন। আর এই আশআছই জেহাদে অংশগ্রহণ করে ইসলামী বাহিনীতে পড়ে রয়েছিলেন।

৪. শুরায়ক রা.

রসুলেপাক স. এর আরেকজন খাদেম ছিলেন হজরত শুরায়ক। শুরায়ক নামে বহু সাহাবী ছিলেন, যাঁরা রসুল স.কে দেখেছেন এবং তাঁর কাছে থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবার এ নামে এমনও কেউ কেউ আছেন, যাদের সাহাবী হওয়ার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। মতভেদপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের কোনো একজনের বিষয়েও রসুলেপাক স. এর খেদমত করার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

৫. আসআদ ইবনে মালেক আসাদী রা.

আরেকজন খাদেম ছিলেন আসআদ ইবনে মালেক আসাদী। আসআদ নামে অনেক সাহাবী ছিলেন। তবে উক্ত শিরোনামের সাহাবীর বর্ণনা কোনো কিতাবে পাওয়া যায়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৬. ছা'লাবা ইবনে আবদুর রহমান আনসারী রা.

আরেকজন খাদেম ছিলেন ছা'লাবা ইবনে আবদুর রহমান আনসারী। এ নামেও উক্ত শিরোনামের সাথে সম্পৃক্ত কোনো সাহাবীকে পাওয়া যায়নি। তবে

‘ইস্তিআব’ গ্রন্থে আবদুর রহমান ইবনে ছা’লাবা আনসারীর নাম রয়েছে। যিনি চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটার বিধান বর্ণনা করেছেন। ওয়াল্লাহু আ’লাম।

৭. জায’ ইবনে মালেক রা.

আরেকজন খাদেম ছিলেন জায’ ইবনে মালেক। কেউ কেউ বলেছেন, জাযী ইবনে মালেক। কেউ কেউ বলেন, জাযযী ইবনে মালেক। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

৮. সালেম রা.

আরেকজন খাদেম ছিলেন সালেম। সালেম নামের অনেক সাহাবী ছিলেন। একজন সালেম ছিলেন হজরত আবু হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম। যিনি আযাদকৃত গোলামের মধ্যে একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি আখইয়ার ও আকাবের সাহাবী ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ পারস্যের লোক ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতনামা ক্বারী ছিলেন। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, তোমরা কোরআন হাসিল করো ইবনে উম্মে আবদ, ইবনে কাআব এবং হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালেম থেকে। আর কোরআন শেখো মুআয ইবনে জাবাল থেকে। তাঁরা প্রথম দিকে হিজরতকারীগণের ইমামতী করতেন। তাঁদের মধ্যে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব এবং আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদও ছিলেন। হজরত ওমর ফারুক সালেমের খুব প্রশংসা করতেন। তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফত কালে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন।

সালেম নামে আরেকজন সাহাবী ছিলেন। সালেম ইবনে উবায়দ আশজায়ী। তিনি ছিলেন আহলে সুফ্‌ফার লোক। তিনি রসুলেপাক স. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন যুবক। মাথার চুলে বেনী ছিলো তাঁর। পরে রসুলেপাক স. তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর বেঁচে যাওয়া ওজুর পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন। সালেম নামে আরেকজন সাহাবী ছিলেন, যিনি রসুলেপাক স.কে শিঙ্গা লাগাতেন এবং শিঙ্গার পবিত্র রক্ত পান করে ফেলতেন। রসুলেপাক স. তাঁকে বলেছিলেন, তুমি কি জানো না, রক্ত হারাম। আরেকজন সালেম ছিলেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর গোলাম। এই কয়েকজন ছাড়াও সালেম নামে আরও অনেকেই ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে রসুল স. এর খাদেম ছিলেন কোন সালেম, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে প্রকাশ্যতঃ মনে হয়, যিনি রসুল স. এর গোলাম ছিলেন, তিনিই হয়তো খাদেম হয়ে থাকবেন। এই সকল প্রিয় ও সম্মানিতজনদের প্রতি একথা ভেবে আশ্চর্যান্বিত হতে হয় যে, তাঁরা এ সকল নামের মধ্যে এমন কোনো আলামত ব্যক্ত করেননি, যা দ্বারা তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়। এরকম করলে জ্ঞানানুসন্ধানীদের কাজ সহজসাধ্য হতো।

৯. সাবেক ইবনে হাতেব রা.

ইবনে আবদুল বার তাঁর 'ইস্তিআব' এ বর্ণনা করেছেন, হজরত সাবেক ইবনে হাতেব রসুলেপাক স. এর খাদেম ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সাহাবী কি না এ বিষয়ে মতভেদ করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, সাবেক যে সাহাবী ছিলেন– এ বিষয়টি বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি।

১০. সালমা রা.

সালমা নামটি সুস্পষ্ট নয়। হতে পারে নামটি হবে সালামা। আর সালামা নাম যদি হয়ে থাকে, তা হলে এ নামে অনেক সাহাবী ছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

১১. আবু সালাম রা.

'কাশেফ' নামক কিতাবে বলা হয়েছে, আবু সালাম রসুলেপাক স. এর খাদেম এবং ক্রীতদাস ছিলেন। 'তাহযীব' কিতাবে তাঁর নিকট থেকে ইবনে নাদিয়া হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, 'খলীফা' তাঁকে সাহাবীর মধ্যে গণ্য করেছেন। তারপর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা আবু দাউদের নিকট জিকিরের অধ্যায়ে এসেছে যে, সাবেক নাজিয়া থেকে, তিনি আবু সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি আরেকটি হাদিসে বর্ণনা করেছেন, আবু সালাম দামেশকের মসজিদে ছিলেন। লোকেরা বললো, ইনি নবী করীম স. এর খেদমত করেছেন। 'ইস্তিআবে' বর্ণিত হয়েছে, আবু সালাম হাশেমী রসুলুল্লাহ্ স. এর খাদেম এবং ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁকে 'খলীফা' বনী হাশেম ইবনে আবদে মানাফের আযাদকৃত গোলাম সাহাবী হিসেবে গণ্য করেছেন। তাছাড়া আবু আকীল একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন সাবেক ইবনে নাজিয়া থেকে, তিনি আবু সালাম খাদেমুর রাসুলুল্লাহ্ থেকে, তিনি রসুলেপাক স. থেকে। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে– 'রাদ্বীতু বিল্লাহি রব্বাওঁ ওয়াবিল ইসলামি দীনাওঁ ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা' আল্লাহ্তায়ালা হবেন কিয়ামতের দিনে তাকে রাজী করানোর জিম্মাদার। ইবনে আবদুল বার একথাও বলেছেন, যে আবু সালামকে আবু সালামা বলেছে, সে ভুল করেছে। আর 'রওজাতুল আহবাব' যে আবু সালামকে আবু সালেম বলা হয়েছে– তার আলোচনা কোথাও পাওয়া যায় না।

১২. রসুলুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম আবু উবায়দা রা.

রসুলুল্লাহ্ স. এর আরেকজন খাদেম এবং গোলাম ছিলেন আবু উবায়দা। বর্ণিত আছে, তিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর জন্য আহার প্রস্তুত করতেন। রসুলেপাক স. তাঁকে একবার বললেন, হাতার গোশত আমাকে দাও। উল্লেখ্য, রসুলেপাক স. হাতার গোশত খেতে পছন্দ করতেন। আল হাদিস। কাতাদা এই হাদিস বর্ণনা করেছেন শাহর ইবনে হাওশাব থেকে, তিনি আবু উবায়দা থেকে। ইবনে আবদুল

বার তাঁর 'ইস্তিআবে' এরকমই বর্ণনা করেছেন। তিনি এরকমও বলেছেন যে, আবু উবায়দা নামের সাথে আমি পরিচিত নই। ইমাম তিরমিজীও এই হাদিস 'শামালুন্নবুওয়াতে' বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি এই– 'হাদ্দাসানা মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার হাদ্দাসানা আবান ইবনে ইয়াযিদ আন হাওশাব আন আবী উবায়দা ক্বালা তাবাখ্‌তা লিন্নাবিয়্যি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বদ রায়াওকানা ইউযিবুহুয্ যারাউ'। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার। তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন– আবান ইবনে ইয়াযীদ, হাওশাব থেকে, তিনি উবায়দা থেকে। তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌র জন্য খানা পাক করলাম। তিনি স. সামনের রানের গোশত খুব পছন্দ করতেন। মেশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে মসনদে ইমাম আহমদ থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন আবু রাফে থেকে। এই হাদিসের শেষে বলা হয়েছে– এ হাদিসটি দারেমী আবু উবায়দা থেকে বর্ণনা করেছেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবু উবায়দা রসুলুল্লাহ্‌র আযাদকৃত গোলাম ছিলেন এবং তিনি ওই সকল সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের নাম পরিচয় বিশেষভাবে জানা যায়নি। তাঁর থেকে ইমাম তিরমিযী 'শামায়েল' কিতাবে এবং দারেমী শাহর ইবনে হাওশাবের মাধ্যমে হাদিস বর্ণনা করেছেন। শাহর ইবনে হাওশাব ব্যতীত এই সনদের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। বাগবী বলেছেন, আবু উবায়দা রসুলেপাক স. এর সোহবত পেয়েছিলেন। বাগবী আরও বলেছেন, আব্বাস ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুঈন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু উবায়দা থেকে শাহর ইবনে হাওশাব বর্ণনা করেছেন। নেতৃস্থানীয়গণের বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায় যে, আবু উবায়দার পরিচিতির মধ্যে এক প্রকারের স্পষ্টতা রয়েছে। তাঁর মূল নাম কী তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। তবে আবু রাফের অবস্থা এরকম নয়। তিনি একজন পরিচিত ও খ্যাতিমান সাহাবী ছিলেন। ওয়ালাল্লাহু আ'লাম।

১৩. হিন্দা এবং আসমা রা.

হিন্দা এবং আসমা ছিলেন হারেছার দুই পুত্র। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, হারেছা আসলামীর আট পুত্র ছিলো। তাঁরা সকলেই বায়আতে রেদওয়ানের সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন, ১. হিন্দা ২. আসমা ৩. খেরাশ ৪. যুওয়ায়ব ৫. ফুযালা ৬. সালামা ৭. মালেক এবং ৮. এমরান। এই আট ভাইয়ের মধ্যে কেউ কোনো অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি। বাগবীও এরকম বলেছেন। এই আট ভাইয়ের মধ্যে হিন্দা ও আসমা রসুলেপাক স. এর খেদমত করতেন। হিন্দা ছিলেন ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে হিন্দার পিতা। আবদুর রহমান ইবনে হারমালা তাঁর নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। 'কাশেফ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবদুর রহমান ইবনে হারমালা তাবেয়ী ও কুফাবাসী ছিলেন। তিনি হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর কাছ থেকে কাসেম ইবনে হাস্‌সান হাদিস বর্ণনা

করেছেন। তাঁর কাছ থেকে আবু দাউদ ও নাসায়ী হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন। বোখারী বলেছেন, তাঁর হাদিস সহীহ্ নয়। 'ইসাবা' কিতাকে যে হাদিসটি আবদুর রহমান ইবনে হারমালা ইয়াহ্ইয়া ইবনে হিন্দা থেকে বর্ণনা করেছেন, সেটি এই– একবার রসুলুল্লাহ্ কতিপয় লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তীর নিক্ষেপ করছিলো। রসুলেপাক স. তাদেরকে বললেন, হে ইসমাইলের সন্তানেরা! তোমরা তীরন্দাজী করো। কেননা তোমাদের বুজুর্গ পিতামহ ইসমাইলও তীরন্দাজী করতেন। আল হাদিস। পুরো হাদিস মেশকাত শরীফে সালামা ইবনে আকওয়া থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম বোখারী তা 'কিতাবুল জিহাদে' জেহাদের সাজ-সরঞ্জাম সম্পর্কে উদ্ধৃত করেছেন।

তাছাড়া এক আনসারী নওজোয়ান রসুলেপাক স. এর খেদমত করতেন। তিনি ছিলেন হজরত আনাসের সমবয়সী। তাঁর নাম কী ছিলো তা নিয়ে বেশ জটিলতা রয়েছে। তাঁর নামই খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই 'আসমাউর রিজালে' কী আর অনুসন্ধান করবো? 'জামেউল উসুলে' অস্পষ্ট নামে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানেও তাঁর নাম পাওয়া যায়নি। হতে পারে কোনো হাদিসের মধ্যে অস্পষ্টভাবে তাঁর নাম এসে যেতে পারে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. এর দরবারে খেদমতকারী মহিলাদের সংখ্যা বলা হয়েছে এগারো জন। তন্মধ্যে পাঁচ জনের নাম 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় পাওয়া যায়। আর অবশিষ্টদের বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো। ১. আমাতুল্লাহ বিনতে রুযিনা ২. সাফিয়া। তাঁর থেকে আমাতুল্লাহ বিনতে রুযিনা সুর্যগ্রহণের নামাজ সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জনেই রসুলেপাক স. এর খাদেমা ছিলেন। ৩. খাদরা। উম্মে রাফে সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি এবং খাদরা দু'জনেই রসুলুল্লাহ্র ঘরে খেদমত করতাম ৪. মায়মুনা বিনতে সাআদ। রসুলেপাক স. তাঁদের সকলকেই আযাদ করে দিয়েছিলেন। ৫. যুরবিয়া উম্মে আতাবা। তিনি আসলে পূর্বোল্লিখিত আমাতুল্লাহ্র মাতা. যার নাম বলা হয়েছিলো রুযিনা। ৬. মারিয়া উম্মে রেবাব। তাঁর উপনাম উম্মে রেবাব। বসরাবাসীরা তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি রসুলেপাক স. এর জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যেনো দেয়াল ভেদ করে বাইরে চলে যেতে পারেন, যে রাতে রসুলেপাক স.কে কাফের মুশরিকদের কাছ থেকে গোপনে চলে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েছিলো। প্রকাশ থাকে যে, রাতটি ছিলো হিজরতের। ওই রাতে রসুলেপাক স.কে নিজ বাড়ির আঙ্গিনা থেকে দেয়াল পেরিয়ে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের বাড়িতে যেতে হয়েছিলো। বর্ণিত ঘটনা ওই রাতের ঘটনা হতে পারে। অথবা হতে পারে অন্য কোনো স্থানের ঘটনাও। আল্লাহ্ই ভালো জানেন। ৭. মারিয়া মুছান্না ইবনে সালেহ'র দাদী। তিনিও রসুলেপাক স. এর খাদেমা ছিলেন। তিনি মুছান্না ইবনে সালেহ ইবনে মেহরানের দাদী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কুফাবাসীরা একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনে আব্বাস মুছান্না ইবনে সালেহ

থেকে। তিনি তাঁর দাদী মারিয়া থেকে। তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্র সাথে মুসাফেহা করেছি। আমি তাঁর হাতের তালু থেকে নরম আর কারও হাতের তালু দেখিনি। ৮. সাইয়্যেদা মারিয়া কিবতিয়া। তিনি রসুলেপাক স. এর পুত্র হজরত ইব্রাহীমের মাতা। তিনি রসুল স. এর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও খাদেমা ছিলেন। কিন্তু 'ইস্তিআব' গ্রন্থকার তাঁকে রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাসী বলেছেন। তিনি তাঁকে খাদেমা বলেননি। তাঁর অবস্থা সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এখানে 'ইস্তিআব' গ্রন্থ প্রণেতা একটি দুর্বল ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত ছাবেত ইবনে কায়স থেকে। এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর পুত্র হজরত ইব্রাহীমের মাতা সাইয়্যেদা মারিয়াকে অপবাদ দিলো। রসুলেপাক স. হজরত আলীকে বললেন, যাও তার গর্দান উড়িয়ে দাও। হজরত আলী লোকটির কাছে গেলেন। দেখলেন লোকটি ঝর্ণার মধ্যে নেমে গোসল করে তার শরীর শীতল করছে। হজরত আলী তাকে বললেন, এদিকে এসো। একথা বলে তিনি তার গায়ে হাত লাগিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে এলেন। অকস্মাৎ তিনি দেখতে পেলেন লোকটি নপুংসক। সহবাস করার কোনো ক্ষমতাই তার মধ্যে নেই। তা দেখে হজরত আলী তাকে কতল করা থেকে বিরত হলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সে তো নপুংসক। আবু আমর বলেছেন, যে লোকটিকে অপবাদ দেয়া হয়েছিলো, সে সাইয়্যেদা মারিয়া কিবতিয়ার চাচাতো ভাই ছিলো। তাকে মাকুকাস বাদশাহ্ হাদিয়াস্বরূপ মারিয়া কিবতিয়ার সঙ্গে দিয়েছিলেন।

রসুলেপাক স. এর খেদমত করার সৌভাগ্য পেয়ে যে সকল পুরুষ ও নারী ধন্য হয়েছিলেন, নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ তাঁদেরকে খেদমতগার হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আসলে তো সাহাবা কেরাম সকলেই রসুলেপাক স. এর খেদমতে সব সময় হাজির থাকতেন। তিনি স. যাকে যে খেদমতের জন্য চাইতেন, হুকুম দিয়ে দিতেন। অবশ্য বিভিন্ন সাহাবীকে বিভিন্ন খেদমতের জন্য নির্ধারণ করতেন। হজরত আলী ইবনে আবু তালেব, যুবায়ের ইবনে আওয়াম, মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং আরও কতিপয় সাহাবীকে কাফেরদের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। হজরত বেলালকে আহারের জোগাড় যন্ত্রের কাজে নিয়োজিত রাখতেন। মুয়াইকিব নামক এক সাহাবী রসুলেপাক স. এর পবিত্র আঙটি অর্থাৎ শিলমোহর হেফাযতে রাখার কাজ করতেন। হজরত কায়স ইবনে সাআদ ইবনে উবায়দা পাহারা দেওয়ার কাজ করতেন।

রসুলেপাক স. এর মাওয়ালী

'মাওয়ালী' 'মাওলা' শব্দের বহুবচন। 'মাওলা' শব্দের অনেক অর্থ আছে। যথা– প্রেমিক, বন্ধু, সাহায্যকারী, মালিক, ক্রীতদাস, আযাদকৃত গোলাম, সাথী, নিকটজন,

চাচাতো ভাই ইত্যাদি। তাছাড়া প্রতিবেশী, সমপর্যায়, চুক্তিবদ্ধ, আঁচল, শরীক, ভাগিনা, পিতা, নেয়ামতপ্রাপ্ত, অনুসারী, শ্বশুর ইত্যাদি অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এখানে মাওলা অর্থ মুক্ত করে দেয়া ক্রীতদাস। রসুলেপাক স. যে সকল ক্রীতদাসের মালিক হয়েছিলেন, তাঁদেরকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

১. হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা। তিনি ছিলেন হারেছা ইবনে শারামিল ইবনে কাআব কালবীর পুত্র। তাঁর নসবনামা হচ্ছে— আমর ইবনে সাবা ইবনে নাখশাব ইবনে ইয়ারব ইবনে কাহতান। হজরত আবু উসামা অর্থাৎ যায়েদ ইবনে হারেছা রসুলেপাক স. এর অগ্রগামী সাহাবী ও গোলামগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর মাতার নাম সাদী বিনতে ছা'লাবা। মাআন ইবনে তাঈ কবীলার লোক ছিলেন। বর্ণিত আছে, একদিন তাঁর মাতা আপন কাওমের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। বনী মাআন ইবনে জারীরের একটি সম্প্রদায় মুর্খতার যুগে কোনো এক জনপদে লুটপাট করেছিলো। পরে সেই সম্প্রদায়ের কিছু লোক ওই বনী মাআনের বস্তির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো। সেখানে হজরত যায়েদের মাতা বেড়াতে এসেছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের লোকগুলো সেখান থেকে হজরত যায়েদকে উঠিয়ে নিয়ে গেলো। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় সাত আট বৎসর হবে। তারা তাঁকে উকাযার বাজারে নিয়ে গেলো। ওই বাজারে ক্রীতদাস কেনা-বেচা করা হতো। সেখান থেকে হজরত যায়েদকে হাকীম ইবনে খেরাম ইবনে খোয়ায়লেদ তাঁর ফুফু সাইয়্যেদা খাদীজা বিনতে খোয়ায়লেদের জন্য চারশ দেরহাম দিয়ে কিনে নিলেন। রসুলেপাক স. যখন হজরত খাদীজাতুল কুবরাকে বিয়ে করলেন, তখন তিনি হজরত যায়েদকে রসুলেপাক স. এর জন্য হেবা করে দিলেন। তাঁর সংবাদ তাঁর কওমের কাছে যখন গেলো তখন তাঁর পিতা হারেছা এবং তাঁর চাচা কাআব তাঁকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ নিয়ে উপস্থিত হলেন। রসুলেপাক স. বিষয়টি হজরত যায়েদের উপরেই ছেড়ে দিলেন। বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে তোমার পিতার সঙ্গে আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যেতে পারো। আর ইচ্ছা করলে এখানেও থেকে যেতে পারো। হজরত যায়েদ রসুলেপাক স. এর দয়া-মায়া ও মহানুভবতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি রসুলুল্লাহ্র সান্নিধ্যেই থেকে গেলেন। বললেন, আমি আপনার উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না। রসুলেপাক স. তাঁকে লোকদের সামনে উপস্থিত করিয়ে বললেন, লোক সকল! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি যায়েদকে আমার পুত্র বানিয়ে নিলাম। সে আমার পালিত পুত্র। সে আমার উত্তরাধিকারী এবং আমিও তার উত্তরাধিকারী। তারপর থেকে লোকেরা তাঁকে যায়েদ ইবনে মোহাম্মদ বলে ডাকতো। তারপর ইসলামী জামানা এসে গেলো। আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করলেন— 'উদ্‌উহুম লিআবাইহিম হুয়া আক্বসাতু-ইনদাল্লাহি'(তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহাদের পিতৃ পরিচয়ে; আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ইহা অধিক ন্যায়সংগত) (৩৩ঃ৫)। তারপর থেকে লোকেরা তাঁকে যায়েদ ইবনে হারেছা বলে ডাকতে শুরু করলো।

এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী। তিনি রসুলেপাক স. এর চেয়ে বয়সে দশ বৎসরের বড় ছিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী বিশ বৎসরের বড় ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর চিঠিপত্র লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন আপন বাঁদী হজরত উম্মে আয়মানের সঙ্গে। তাঁর গর্ভ থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত উসামা। পরে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন হজরত যয়নব বিনতে জাহাশের সঙ্গে।

হজরত যায়েদ বদর, খন্দক ও খয়বর যুদ্ধ এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তীরন্দাজ সাহাবী হিসেবে তিনি খ্যাত ছিলেন। রসুলেপাক স. যখন মুরায়সীর যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তখন তিনি হজরত যায়েদকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। তাঁকে বিভিন্ন সময়ে সাতটি বাহিনীর সেনাপ্রধান করেছিলেন। কোরআনে করীমে তাঁর নাম ব্যতীত আর অন্য কোনো সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। কোরআনে করীমে তাঁর নাম এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে – 'ফাল্লাম্মা ক্বাদা যায়দুন মিনহা ওয়াতারা যাও্ওয়াজনাকাহা' (অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল)(৩৩-৩৭) কোনো কোনো তাফসীর গ্রন্থে এসেছে– 'কাতায়্যিস সিজিল্লি লিল্‌কুতুবি' এই আয়াতের মধ্যে যে 'সিজিল' শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা একজন সাহাবীর নাম। রসুলেপাক স. হজরত যায়েদকে ভ্রাতৃত্বস্থাপন করে দিয়েছিলেন হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে। উক্ত সিজিল সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত উসামা ইবনে যায়েদ এবং হজরত ইবনে আব্বাস। তিনি মুতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ওই যুদ্ধে তিনি ছিলেন তাঁর বাহিনীর প্রধান। তিনি পঞ্চান্ন বৎসরের হায়াত পেয়েছিলেন। রসুলেপাক স. এর দরবারে যায়েদ ইবনে হারেছা ছাড়াও যায়েদ নামে আরেকজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

এখন প্রসঙ্গতঃ হজরত যায়েদের পুত্র হজরত উসামার মর্যাদা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হবে। হজরত উসামা ইবনে যায়েদের মর্যাদা অনেক। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, লোকেরা তাঁকে 'হুববে রসুল' বলতো। রসুলেপাক স. তাঁর কোলের এক পাশে হজরত ইমাম হাসান এবং অপর পাশে হজরত উসামা ইবনে যায়েদকে বসিয়ে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! এদের দু'জনকেই আমি ভালোবাসি। তুমিও তাদেরকে ভালোবাসো। রসুলেপাক স. আরও বলেছেন, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসে, সে যেনো উসামাকে ভালোবাসে। রসুলেপাক স. এর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণকালে হজরত উসামার বয়স হয়েছিলো ঊনিশ বা বিশ বৎসর। তিনি পঁচাত্তর বৎসর হায়াত পেয়েছিলেন। তাঁর ইনতেকালের সন নিয়ে মতভেদ আছে। ইবনে সফী বলেছেন, আমার নিকট বিশুদ্ধ মত এই যে, ৫১ হিজরীতে হজরত আলীর অথবা মুয়াবিয়ার শাসনামলে তাঁর ইনতেকাল হয়। আবার কারও কারও মতে তিনি পরলোকগমন করেন

হজরত ওছমানের শাহাদতের পর। আবার কারও কারও মতে হজরত আলীর শাহাদতের পর। তাঁর কাছ থেকে হজরত ইবনে আব্বাস, ওরওয়া ইবনে যুবায়ের, আবু ওছমান আনমভী এবং আরও অনেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

২. ছাওবান ইবনে বাজদুমা। তিনিও রসুলুল্লাহ্ স. এর ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিলো আবু উবায়দা। অপর এক উক্তি অনুসারে আবু আবদুর রহমান। তবে প্রথম উক্তিটি অধিকতর বিশুদ্ধ। তিনি মক্কা ও ইয়ামনের মধ্যবর্তী সুররা নামক স্থানের লোক ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন হিমইয়ার গোত্রের। বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. তাঁকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর মহাপ্রস্থান পর্যন্ত সফর ও মুকিমী সর্বাবস্থায় রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির থাকতেন। পরে তিনি শামদেশে চলে যান এবং রামলা নামক স্থানে বসবাস করেন। তারপর রামলা থেকে চলে যান হেমসে। সেখানে তিনি একটি বসতবাটি নির্মাণ করেন। তিনি লোকদেরকে রসুলেপাক স. এর হাদিস মুখস্থ করাতেন। যে হাদিসগুলো তিনি জানতেন, সেগুলো তিনি লোকদেরকে মুখস্থ করাতেন। ৫৪ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। তাবেয়ীগণের অনেকে তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। চারজন মোহাদ্দেছ তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ আসেম থেকে, তিনি আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি স. বলেছেন, কেউ যদি আমার হুকুমের অধীনে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, সে অন্য কারও কাছে যাচ্ঞা করবে না, তবে আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হয়ে যাবো। উল্লেখ্য, হজরত ছাওবান কখনও কারও কাছে কোনো কিছু যাচ্ঞা করতেন না।

৩. আবু কাবশা। তিনিও রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধ এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে হেশাম বলেছেন, তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছাড়া অন্যেরা বলেছেন, হজরত আবু কাবশা মক্কাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, আউস গোত্রের জনপদে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রসুলুল্লাহ্ স. তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দিয়েছিলেন। আবু কাবশা তাঁর উপনাম। মূল নাম ছিলো সলীম। ইবনে হেব্বান বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো আউস। কেউ কেউ বলেছেন, সালামা। যেদিন হজরত ওমর ফারুক খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন, সে দিন তাঁর ইনতেকাল হয়। তাঁর ইনতেকালের বৎসর ছিলো ১৩ হিজরী।

প্রকাশ থাকে যে, মক্কার কাফেরেরা রসুলেপাক স.কে ইবনে আবী কাবশা বলতো। তার কারণ হিসেবে কেউ কেউ বলেছেন, আবু কাবশা রসুলেপাক স. এর মাতামহগণের একজন ছিলেন। এ জন্য তারা তাঁকে ইবনে আবী কাবশা বলতো। রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতের প্রকাশকালে আরবরা তাঁর বিরোধিতা করে বলতে লাগলো, সে তো আবু কাবশার পুত্র। কেউ কেউ বলেছেন, আবু কাবশা রসুলেপাক

স. এর পিতামহগণের মধ্যে একজন ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, আমর ইবনে যায়েদ ইবনে আসাদ নাজ্জারী ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের মাতা সালমার পিতা। তাঁকে আবু কাবশা বলা হতো। সেই সম্বন্ধের দিক দিয়ে তারা রসুলেপাক স,কে ইবনে আবী কাবশা বলতো। কেউ কেউ বলেছেন, রসুলেপাক স. এর রেযায়ী পিতা হারেছ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদুল উযযা ইবনে রেফাআ সা'দী, যিনি ছিলেন হজরত হালীমা সা'দিয়ার স্বামী, তাঁকে আবু কাবশা বলা হতো। সেই সম্পর্কের দিক দিয়ে তাঁকে তারা ইবনে আবী কাবশা বলতো। এ সকল তথ্য সংকলন করা হলো 'ইস্তিআব' থেকে।

৪. আনেসা। রসুলুল্লাহ্ স. এর আরেকজন আযাদকৃত গোলাম ছিলেন আনেসা। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো আবু আনেসা। এক উক্তি অনুসারে তাঁর নাম ছিলো আবু মাসরুহ। মুসআব যুবায়রী বলেছেন, তাঁর কুনিয়াতী নাম ছিলো আবু সারাহ। তিনি সুরাতের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতকালে ইনতেকাল করেন। খতীব বলেছেন, তিনি রসুলেপাক স. থেকে কিছু বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। মুসা ইবনে উকবা ইবনে শেহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন অথবা বদর যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। ওয়াকেদী বলেছেন, আমি আহলে এলেমদেরকে দেখেছি। তাঁরা সাব্যস্ত করেছেন হজরত আনেসা উহুদযুদ্ধে হাজির ছিলেন এবং তার পরেও তিনি জীবিত ছিলেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এর পর হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতকালে হজরত আনেসার ওফাত হয়।

হজরত আনেসার দায়িত্ব ছিলো, তিনি নবী করীম স. এর কাছে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের জন্য অনুমতি গ্রহণ করতেন। রসুলেপাক স. দেখা করার অনুমতি দিলে তিনি লোকদেরকে দেখা করতে দিতেন। এ সকল কথা উল্লেখ করা হয়েছে 'ইসাবা' নামক পুস্তকে।

৫. শুকরান। রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত আরেকজন গোলাম ছিলেন শুকরান। তাঁর সম্বন্ধে রসুলেপাক স. এর দাফন সম্পর্কিত আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিই রসুলেপাক স. এর কবর শরীফে তাঁর নীচে কাতীফা (মখমলের চাদর) বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং এ কথাও বলেছিলেন যে, আমি চাই না অন্য কারও কবরে এরূপ চাদর বিছিয়ে বা টানিয়ে দেয়া হোক। আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে রসুলেপাক স. এর জন্য হাদিয়া দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, রসুলেপাক স. তাঁকে খরীদ করেছিলেন এবং বদরযুদ্ধের পর আযাদ করে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, রসুলেপাক স. তাঁর পিতার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁকে এবং হজরত উম্মে আয়মানকে পেয়েছিলেন। ইমাম বাগবী একথা বলেছেন। আবু মুশয়ের বলেছেন, তিনি বদর যুদ্ধে হাজির হয়েছিলেন, কিন্তু

তাঁকে গনিমতের মালের অংশ দেয়া হয়নি। কারণ তখনও তিনি গোলাম ছিলেন। তবে তিনি বদর যুদ্ধবন্দীদের পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন। কেউ মুক্তিপণ দিলে সেখান থেকে তাঁকেও আংশিক দান করা হতো। এভাবে তিনি অন্যদের চেয়ে অধিক পরিমাণে সম্পদ পেয়েছিলেন। তাঁর নিকট থেকে হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্কে খয়বরে যেতে দেখেছি। তিনি গাধার উপর ছওয়ার হওয়া অবস্থায় ইশারায় নামাজ পড়েছেন।

৬. রেবাহ রা.। রসুলেপাক স. এর আরেকজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন রেবাহ। বোখারী ও মুসলিম শরীফে রসুলেপাক স. এর স্ত্রীগণের সঙ্গে ইলা করার বিষয়ে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ওই হাদিসে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। হজরত ওমর ফারুক বর্ণনা করেন, আমি রসুলুল্লাহ্র পবিত্র প্রকোষ্ঠের দরজায় উপস্থিত হলাম। বললাম, হে রেবাহ্! আমার জন্য রসুলুল্লাহ্র কাছে অনুমতি নাও। আল হাদিস। আবিসিনিয়ার ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারে দর্শনার্থী ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্য অনুমতি গ্রহণের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। রসুলেপাক স. এর আরেক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ইয়াসারকে ইরনীনবাসীরা শহীদ করে ফেলেছিলো। তাঁকে দাফন করার পর তাঁর ঘর হজরত রেবাহ্র জন্য রবাদ্দ করা হয়। তিনি কখনও কখনও আজান দেওয়ার দায়িত্বও পালন করতেন।

৭. ইয়াসার রা.। রসুলেপাক স. এর আরেকজন মুক্তকৃত ক্রীতদাস ছিলেন ইয়াসার। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি রসুলুল্লাহ্ স. এর চারণভূমিতে উট চরাচ্ছিলেন। বদবখত ইরনীনবাসীরা তাঁকে ধরে তাঁর হাত পা কেটে দিয়েছিলো এবং তাঁর চোখ উপড়ে দিয়েছিলো। তার পর উত্তপ্ত মাটির উপর ফেলে রেখে তাঁকে শহীদ করেছিলো। রসুলেপাক স. এর উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তারা। ইরনীনবাসীরা ইয়াসারের সঙ্গে যে রকম আচরণ করেছিলো, রসুলুল্লাহ্ স.ও তাদের সঙ্গে সে রকম আচরণ করেছিলেন।

৮. আবু রাফে আসলাম রা.। রসুলেপাক স. এর বিখ্যাত মুক্তকৃত ক্রীতদাস ছিলেন আবু রাফে আসলাম। আবু রাফে উপনাম। আর আসলাম তাঁর মূল নাম। আরও কয়েকটি নাম ছিলো তাঁর। যেমন– আসলাম, ছাবেত, ইয়াযীদ, ইব্রাহীম ও হরমুয। ইমাম বোখারী আসলাম নামের উপর জোর দিয়েছেন। তবে তিনি খ্যাত ছিলেন আবু রাফে নামেই।

৯. মুওয়ায়হাবা রা.। রসুলেপাক স. এর আরেকজন মুক্তকৃত ক্রীতদাস ছিলেন মুওয়ায়হাবা। তিনি মুযনিয়া নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে এতোটুকুই বলা হয়েছে। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তাঁর নাম ছিলো আবু মুওয়ায়হাবা। ওয়াকেদী বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো আবু মাওহাব। তিনি রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাস ছিলেন। মুযনিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি মুরাইসির যুদ্ধে হাজির ছিলেন।

সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার উট যাঁরা টানতেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস। তিনি তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। ইমাম আহমদ ও দারেমী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে, তিনি আবু মুওয়ায়হাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমাকে রসুলুল্লাহ্ বলেছেন, আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে, আমি যেনো জান্নাতুল বাকী গোরস্তানের মৃতদের জন্য দোয়া করি। রসুলেপাক স. তাই রাতে জান্নাতুল বাকীতে গেলেন। সকাল হলো। রসুলেপাক স. এর মাথার যন্ত্রণা শুরু হলো। ওই যন্ত্রণা সহকারেই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে এ দুনিয়া থেকে নিয়ে গেলেন।

১০. আবুল বাহী রা.। 'ইসাবা' গ্রন্থে তাঁর নাম বলা হয়েছে রাফে। উপনাম আবুল বাহী। তিনি রসুলেপাক স. এর মুক্তকৃত ক্রীতদাস ছিলেন। ইবনে মাজায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! মানুষের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার নিকট সবচেয়ে উত্তম কে? তিনি স. বললেন, যার হৃদয় উষ্ণ, যে অসুস্থ এবং সত্যবাদী। আল হাদিস। হাদিসের শেষাংশে বলা হয়েছে, আমি তখন বললাম, এ সকল গুণ তো রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাস রাফে'র মধ্যেই পাওয়া যায়। কায়েস বলেছেন, এই হাদিসের বর্ধিতাংশ ইবনে মাজাতে নেই। হাকীম তিরমিযী 'নাওয়াদেরুল উসুল' বর্ধিতাংশসহ সম্পূর্ণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, হাদিসটি আবু রাফে থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বর্ণিত হয়েছে রাফে ইবনে খাদীজ থেকে। তবে রাফে থেকে বর্ণিত হয়েছে একথাই বিশুদ্ধ।

১১. মিদআম রা.। রসুলেপাক স. কর্তৃক মুক্তিপ্রদত্ত আরেকজন ক্রীতদাসের নাম মিদআম। তিনি হাবশী গোলাম ছিলেন। তাঁকে রেফাআ ইবনে যায়িদ ইবনে জুযানী রসুলেপাক স. এর খেদমতের জন্য পেশ করেছিলেন। তাঁকে রসুলেপাক স. মুক্তি দিয়েছিলেন, না ক্রীতদাস অবস্থাতেই তাঁর ওফাত হয়েছিলো, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তাঁর সম্পর্কে এই খবরটি সুবিদিত যে, তিনি খয়বর যুদ্ধের সময় ছোট একটি চাদর গনিমতের মাল থেকে অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করেছিলেন। খয়বর যুদ্ধে তীরবিদ্ধ হয়ে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, উপরে যার সম্পর্কে বলা হলো, তিনি হাবশী গোলাম মিদআম ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন। মেশকাত শরীফে হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর খেদমতের জন্য একটি হাবশী গোলাম পেশ করেছিলেন। তাঁকে মিদআম বলা হতো। মিদআম রসুলেপাক স. এর মালপত্র নামাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটি তীর এসে তাঁর শরীরে বিদ্ধ হলো। তীর নিক্ষেপকারীকে শনাক্ত করা গেলো না। সেই তীরের আঘাতেই তাঁর ইনতেকাল হয়ে গেলো। লোকেরা বলতে লাগলো, এ তো জান্নাত

পাবে। কেননা সে রসুলেপাক স. এর খেদমত করা অবস্থায় জীবন বিসর্জন দিয়েছে। রসুলেপাক স. বললেন, কক্ষণও এমন নয়। শপথ ওই পবিত্র সত্তার, যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, এ খয়বরের গণিমতের মাল থেকে বণ্টনের পূর্বেই একটি চাদর নিয়েছে। নিশ্চয়ই দোজখের অগ্নি শিখা তার দিকে ধেয়ে আসছে। লোকেরা যখন একথা শুনলো, তখন কেউ জুতার একটি ফিতা, কেউ দু'টি ফিতা এনে রসুলেপাক স. এর সামনে রাখলো। তিনি স. বললেন, এটি আগুনের একটি ফিতা। আর এ দু'টি ফিতা দোযখের আগুনের। বোখারী ও মুসলিম।

রেফাআ ইবনে যায়েদ জুযামী সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাব থেকে জানা যায় যে, তিনি হচ্ছেন ওই ব্যক্তি যিনি মিদআমকে রসুলেপাক স. এর খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। একথা থেকে অবশ্য মিদআমের রসুলুল্লাহ্ স. এর ক্রীতদাস হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পায় না। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে রেফাআ ইবনে যায়েদ ইবনে ওহাব জুযানীকে 'সাহাবী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁর জন্য একটি পতাকা তৈরী করেছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর জন্য একটি হাবশী গোলাম পেশ করেছিলেন– যার নাম ছিলো মিদআম এবং তাঁকে হত্যা করা হয়েছিলো। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

১২. যায়েদ রা.। তিনি ছিলেন হেলাল ইবনে ইয়াসারের দাদা। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যায়েদ রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাস ছিলেন। 'ইস্তেগফার' সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনা করেছেন হেলাল তাঁর পিতা ইয়াসার ইবনে যায়েদ থেকে। 'ইসাবা' গ্রন্থেও বলা হয়েছে, যায়েদ রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাস ছিলেন। যায়েদ ইবনে বেলাল, যিনি ছিলেন বাশারের পিতা। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। আর তিরমিযী হেলাল ইবনে ইয়াসার ইবনে যায়েদ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে শাহীন বলেছেন, যায়েদ কয়েদখানায় বন্দী ছিলেন। রসুলেপাক স. গযওয়ায়ে বনী ছা'লাবায় পৌঁছে তাঁকে মুক্ত করেছিলেন। কোনো কোনো 'আসমাউর রিজাল' গ্রন্থে হেলালের স্থলে বেলাল নাম পাওয়া যায়।

১৩. উবায়দ ইবনে আবদুল গেফার রা.। তিনি রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁকে আবদুল্লাহ ইবনুল গেফারও বলা হয়। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন সুলায়মান তায়মী। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন বলে জানা যায় না। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. এর আরেক ক্রীতদাস ছিলো উবায়দ। তাঁর সাথে কোনো নিসবত যোগ করা হয়নি। 'ইসাবা' গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে, ইবনে হেব্বান বলেছেন, তিনি রসুলেপাক স. এর সোহবত পেয়েছিলেন। ইবনুস্ সিক্কীন তাঁকে সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন, তাঁর হাদিস বিশুদ্ধতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি। বালাজুরি বলেছেন, রসুলেপাক স. এর এক ক্রীতদাস ছিলো, তাঁকে উবায়দ বলা হতো। তিনি তাঁর থেকে দু'টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

১৪. সফিনা আবু আবদুর রহমান রা.। রসুলেপাক স. এর আরেকজন গোলাম ছিলেন সফিনা আবু আবদুর রহমান। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি মুমিনজননী সাইয়্যেদা উম্মে সালামার ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তাঁকে এই শর্তের উপর মুক্তি দিয়েছিলেন যে, তিনি রসুলেপাক স. এর খেদমত করবেন। সফিনা ছিলো তাঁর উপাধি। আর তাঁর উপনাম ছিলো আবু আব্দুর রহমান। তবে তাঁর মূল নাম নিয়ে মতভেদ আছে। মেহরান, মালহান, রুমান, কায়সান বা ফররুখ ইত্যাদি নামে তাঁর সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে। তিনি আরবের অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে পারস্য বংশোদ্ভূত বলেছেন।

সফিনা উপাধি লাভ হওয়ার কারণ এই যে, একবার এক সফরে তিনি রসুলেপাক স. এর সঙ্গী ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে কেউ কোনো কিছু বহন করতে অক্ষম হলে তাঁর কাছে তা হাওলা করে দিতো। এভাবে তিনি অনেকের অনেক মাল সামলিয়ে রাখতেন। তাই রসুলেপাক স. তাঁকে সফিনা বা নৌকা বলতেন। পরবর্তীতে তিনি এই নামেই খ্যাত হলেন। কেউ তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, আমার নাম সফিনা। আল্লাহ্র রসুল আমার এই নাম রেখেছেন। তাই এই নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম আমার পছন্দ নয়। 'আল খিলাফাতু বা'দী ছালাছূনা সিনাতান' (আমার পরে খেলাফতে রাশেদা ত্রিশ বছর বিদ্যমান থাকবে) হাদিসের বর্ণনাকারী তিনিই। তাঁকে বলা হয়েছিলো, বনু উমাইয়াগণ ধারণা করেন, তাঁদের মধ্যে খেলাফত আছে। তিনি বলেছিলেন, বনু যারকারা মিথ্যা বলছে। তাদের শাসন হচ্ছে মুলুকিয়াত (রাজতন্ত্র)। এমন কি জঘন্য রাজতন্ত্র। 'উসদুল গাবা' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে আরও বর্ণিত হয়েছে, মোহাম্মদ ইবনুল মুনকাদের হজরত সফিনা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একবার আমি নৌকায় আরোহণ করলাম। চলতে চলতে নৌকাটি ভেঙে গেলো। আমি নৌকার একটি তক্তার উপর ভর করে ভাসতে লাগলাম। এক সময় কিনারায় পৌঁছলাম। সেটি ছিলো একটি জনমানবহীন জায়গা। আমি পথ হারিয়ে ফেললাম। এমন সময় সেখানে একটি বাঘ উপস্থিত হলো। আমি তাকে বললাম, হে আবুল হারেছ! আমি সফিনা। রসুলুল্লাহ্র ক্রীতদাস। বাঘটি মস্তক অবনত করে দিলো এবং ঘাড় ইশারা করে আমাকে তার সঙ্গে যেতে বললো। আমি তার উপর আরোহণ করলাম। সে আমাকে একটি রাস্তায় পৌঁছে দিলো। তারপর একটি শব্দ করলো। আমি বুঝতে পারলাম, সে আমার কাছ থেকে বিদায় প্রার্থনা করছে।

তাঁর ফরজন্দ আবদুর রহমান, মোহাম্মদ এবং যিয়াদ প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

১৫. মাবুর কিবতী রা.। তিনি রসুলেপাক স. এর উম্মে ওয়ালাদ সাইয়্যেদা মরিয়া কিবতিয়ার প্রিয়জন ছিলেন। তাঁকে ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ্ মাকুকাস সাইয়্যেদা

মারিয়া কিবতিয়ার সঙ্গে হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে সাইয়্যেদা মারিয়া কিবতিয়ার সঙ্গে জড়িত করে অপবাদ দিলো। রসুলেপাক স. তাকে হত্যা করার জন্য হজরত আলীকে প্রেরণ করলেন। হজরত আলী তাঁর কাছে পৌঁছে দেখতে পেলেন, লোকটি নপুংসক। তিনি প্রকৃত অবস্থা রসুলেপাক স.কে জানালেন। 'ইসাবা' প্রণেতা বলেছেন, ইমাম মুসলিম তাঁর নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবু বকর ইবনে খায়ছামা মুসআব যুবায়রী থেকে নকল করে তাঁর নাম 'মাবুর' বলেছেন। ইবনে আবদুল হাকাম 'ফতুহে মেসের' পুস্তকে তাঁর নিজস্ব সনদের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুলেপাক স. এর পুত্র হজরত ইব্রাহীমের মাতা সাইয়্যেদা মারিয়া কিবতিয়ার কাছে গেলেন। সেখানে তাঁর প্রিয়জন মাবুর কিবতীকে দেখতে পেলেন। তিনি অধিকাংশ সময় সাইয়্যেদা মারিয়া কিবতিয়ার কাছে আসতেন। রসুলেপাক স. মনোক্ষুণ্ন হলেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন। পথিমধ্যে হজরত ওমর ফারুকের দেখা পেলেন। হজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনাকে চিন্তিত দেখছি যে? রসুলেপাক স. ঘটনা বর্ণনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হজরত ওমর তরবারী নিয়ে সাইয়্যেদা মারিয়ার কাছে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, সেখানে মাবুরও আছে। তৎক্ষণাত তিনি তরবারী উত্তোলন করলেন। হঠাৎ দেখলেন, মাবুর তাঁর বস্ত্র উন্মোচন করেছেন। বুঝলেন, তিনি নপুংসক। তিনি রসুলেপাক স. এর কাছে ফিরে এসে যাবতীয় বৃত্তান্ত পেশ করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, এখনই জিবরাইল আমার কাছে এসে এই মর্মে সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহতায়ালা মারিয়া এবং তাঁর প্রিয় লোকটিকে অপবাদ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্তায়ালা আরও জানালেন, মারিয়ার উদরে আমার একটি সন্তান আছে, যে সন্তান আমার সঙ্গে অন্যপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য রাখে। আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেনো তার নাম রাখি ইব্রাহীম।

'ইসাবা' রচয়িতা বলেছেন, হজরত মাবুর কিবতী হজরত মারিয়ার সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গেই ছিলেন এবং তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণও ছিলো পুণ্যময়। এই ঘটনার পর রসুলেপাক স. তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলামগণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। 'মাবুর' নামটি মীম এর স্থলে বা বর্ণ দ্বারা 'বাবুর' আবার মীম বর্ণ দ্বারা মাবুর– দু'ভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

১৬. ওয়াকেদ অথবা আবু ওয়াকেদ রা.। ইবনে মিন্দা বর্ণনা করেছেন, ওয়াকেদ রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে যাদান বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য করলো, সে যেনো আল্লাহ্র জিকির করলো। যদিও তার নামাজ, রোজা, কোরআন তেলাওয়াত কম হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী করলো, সে যেনো

আল্লাহ্‌র জিকির করলো না, যদিও নামাজ, রোজা ও কোরআন তেলাওয়াত তার বেশী হয়। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে তাঁর নাম বলা হয়েছে ওয়াকেদ, উপনামের আবু শব্দটি বাদ দিয়ে।

১৭. হেশাম রা.। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হেশাম রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবুয যুবায়ের। হজরত হেশাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার আমি রসুলেপাক স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার স্ত্রীকে কেউ স্পর্শ করতে চাইলে সে তাকে বাধা দেয় না। অর্থাৎ কেউ তার সাথে খারাপ কাজ করতে চাইলে সে তাকে বাধা প্রদান করে না। রসুলেপাক স. বললেন, তাকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি বললেন, ওকে আমি ভালোবাসি। ওর বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতে পারবো না। রসুলেপাক স. বললেন, তাহলে তুমি তার দ্বারা উপকার গ্রহণ করো। হাদিসটি ইবনে আবদুল বার তাঁর 'ইস্তিআব' নামক পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। 'কিফায়া' পুস্তকে আবুয যুবায়ের বর্ণনা করেছেন রসুলেপাক স. এর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস হেশাম থেকে। তিনি বলেছেন, তাঁর স্ত্রী কোনো স্পর্শকারীকে প্রতিহত করে না। আল হাদিস। উভয় হাদিসেই 'তুমি তার দ্বারা উপকার গ্রহণ করো' এই বাক্যটি এসেছে। এই হাদিসটি মেশকাত শরীফে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। নাসায়ী শরীফেও উক্ত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর কাছে এসে বললো, তার স্ত্রী কোনো স্পর্শকারীকে বাধা দেয় না। রসুলেপাক স. বললেন, তাহলে তালাক দিয়ে দাও। সে বললো, আমি তাকে ভালোবাসি। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি তাকে বাধা দাও। এ হাদিসের মধ্যে 'তুমি তার দ্বারা উপকার গ্রহণ করো' বাক্যটি নেই। আলেমগণ বলেছেন 'তাকে বাধা দাও' কথাটির অর্থ তাকে হেফাযত করো, সে যেনো খারাপ কাজ করতে না পারে। ব্যভিচারে লিপ্ত না হয়। 'মেশকাত' রচয়িতা বলেছেন, ইমাম নাসায়ী বলেছেন, এ হাদিসকে কেউ কেউ মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ করেননি। এই হাদিস বিশুদ্ধ ও সুপ্রমাণিত নয়।

কোনো কোনো হাদিস ব্যাখ্যাকার বলেছেন, একথার অর্থ এই যে– কোনো যাচ্ঞাকারীর হাতকে সে ফিরায় না। আমার মাল থেকে যা চায় সে তাই দিয়ে দেয়– কাউকে না করে না। এরূপ ব্যাখ্যা হাদিসের প্রকাশ্য অর্থের পরিপন্থী। আমি আল্লাহ্‌তায়ালার তওফীকে বলতে চাই যে, রসুলেপাক স. একথাটি তাঁর রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বলেছিলেন। রসুলেপাক স. এর উদ্দেশ্য ছিলো এরকম– তুমি তার নিন্দনীয় কার্যকলাপের শেকায়েত করছো আবার তাকে তালাকও দিচ্ছো না। তুমি যখন তাকে কামনা করো এবং তুমি তাকে রাখতে চাচ্ছো, তা হলে যাও। তার কাজের প্রতি সম্মতিপ্রদান করা নয়, বরং তার উপর কঠোরতা প্রদর্শন করাই ছিলো রসুলেপাক স. এর উদ্দেশ্য। ওয়াল্লহু আ'লাম।

১৮. আবু যুমায়রা রা.। এটি তাঁর কুনিয়াতী নাম (উপনাম)। তাঁর মূল নাম ছিলো সাওদ। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো রাওহ। তিনি ছিলেন সিন্দরের পুত্র। অথবা রাওহ ইবনে শিরযাদ যুমায়রী। 'রওজাতুল আহবাবে' এরকম বলা হয়েছে। 'ইস্তিআবে' বলা হয়েছে, আবু যুমায়রা রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাস ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে গনিমতের মাল হিসেবে পেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, আবু যুমায়রার নাম ছিলো সাআদ হিময়ারী। বোখারী তাঁকে যি ইয়াযেনের আওলাদদের মধ্যে গণ্য করেছেন। আবু হাতেম বলেছেন, তাঁর নাম সাআদ যুমায়রী। কেউ কেউ বলেছেন, আবু যুমায়রার নাম রওহ ইবনে সিন্দর। কেউ বলেছেন, রওহ ইবনে শিরযাদ। তবে প্রথমোক্ত উক্তিটি অধিকতর বিশুদ্ধ। আর তিনি হচ্ছেন হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুমায়রা ইবনে আবু যুমায়রার দাদা। তাঁর কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন তাঁর পুত্রগণ। তিনি আরব বংশীয় লোক ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর নামে এক ওসিয়তনামা লিখে দিয়েছিলেন। সেই ওসিয়তনামা তাঁর মাতার কাছে রক্ষিত ছিলো। হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুমায়রা রসুলেপাক স. এর ওসিয়তনামা, যা আবু যুমায়রার জন্য লিখেছিলেন, সেটি নিয়ে খলীফা মাহদীর নিকট গিয়েছিলেন। খলীফা মাহদী পবিত্র পত্রখানা হাতে নিয়ে তাঁর দু'চোখের উপর স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁকে অনেক সম্পদ দান করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, সেই সম্পদের পরিমাণ ছিলো তিন শত আশরাফী। 'ইসাবা' গ্রন্থেও এরকম বর্ণনা আছে। তাতে আরও বলা হয়েছে, আবু যুমায়রা হিময়ারী যুমায়রার পিতা ছিলেন। তাতে আরও বলা হয়েছে, ইবনে আবু যুমায়রা, আবু যুমায়রা হজরত আলীর ক্রীতদাস ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন। খলীফা মাহদীর ঘটনার শেষাংশে বলা হয়েছে, হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ওই আশরাফীগুলো নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে ছিনতাইকারীদের হামলার শিকার হন। তিনি তখন রসুলেপাক স. এর পবিত্র চিঠিটি তাদেরকে দেখান। ছিনতাইকারীরাও তাঁর সমস্ত মাল ফিরিয়ে দেয়।

১৯. হুসাইন রা.। এই নামটি রসুলেপাক স. এর খাদেমগণের নামের তালিকায় আছে। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় তাঁর পরিচিতি রয়েছে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থকার খাদেমগণের নামে তাঁর বর্ণনা পেশ করেছেন। এখানে তার পুনরোল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

২০. আবু আসীব রা.। আবু আসীব তাঁর কুনিয়াতী নাম ছিলো। মূল নাম আহমার বা মুররা। 'ইস্তিআবে' বলা হয়েছে, আবু আসীব রসুলেপাক স. এর গোলাম ছিলেন এবং তিনি রসুলেপাক স. এর সোহবত লাভ করেছিলেন। তাঁর দু'টি বর্ণনার সূত্রপরম্পরা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। একটি হাদিস বোখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে তাউন সম্পর্কে। কাসেম ইবনে হামযা বলেছেন, আমি রসুলেপাক স. এর খাদেম আবু আসীবকে

দাড়ি ও মাথায় খেযাব লাগাতে দেখিনি। বলা হয়ে থাকে, হজরত আবু আসীবের মূল নাম ছিলো আহমার। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবু আসীব রসুলেপাক স. এর গোলাম ছিলেন। তিনি তাঁর কুনিয়াতী নামেই খ্যাত ছিলেন। তাঁর মূল নাম ছিলো আহমার। সেজদার বিষয়ে তাঁর নিকট হতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ, ইবনে মাজা, আহমদ ও তাহাবী হাসান বসরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন এরকম– 'রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম আহমার আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন'।

২১. আবু উবায়দ রা.। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে আবু উবায়দের নাম উল্লেখ করা হয়েছে্ রসুলেপাক স. এর খাদেমগণের সঙ্গে। সেখানে বলা হয়েছে, আবু উবায়দ রসুলেপাক স. এর গোলাম ছিলেন। 'ইস্তিআব' ও 'ইসাবা' গ্রন্থদ্বয়েও উক্ত শিরোনামেই তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে আবু উবায়দকে আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লিখিত দুই ধরনের পরিচয়ে মূলতঃ কোনো বৈপরীত্য নেই।

২২. আসলাম ইবনে উবায়দ রা.। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এই নামটিই এসেছে। প্রকাশ থাকে যে, আসলাম নামের ব্যক্তিটির কুনিয়াতী নাম ছিলো আবু রাফে। তিনি রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে আসলাম নামের কয়েকজন সাহাবী ছিলেন বলে বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, আসলাম রসুলেপাক স. এর খাদেম ছিলেন। ইবনে মিন্দা থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইসহাক ইবনে সুলায়মান সাআদ ইবনে আবদুর রহমান মাদানী থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু রাফে ও আসলাম রসুলেপাক স. এর দু'জন খাদেম ছিলেন। তবে অন্যরা বলেছেন, আসলাম আবু রাফেরই নাম– যিনি রসুলেপাক স. এর খাদেম ছিলেন। তিনি তাঁর মূল নামের চেয়ে কুনিয়াতী নামেই বেশী খ্যাত ছিলেন। তাঁর নামের মধ্যে মতভেদ আছে, তবে আসলাম নামের উপরেই দৃঢ়তা রয়েছে। ইমাম বোখারীও এমতের পক্ষে। ইমাম বোখারী আবু রাশেদ কিবতীর কুনিয়াতী নাম নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনিও রসুলেপাক স. এর গোলাম ছিলেন। আবু রাফে'র নামের মতভেদ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন, বেশী বিখ্যাত নাম আসলাম। তিনি বলেছেন, আসলাম হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের গোলাম ছিলেন। তিনিই তাঁকে রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিয়োজিত করেছিলেন। আর এই আসলামই রসুলেপাক স. এর কাছে হজরত আব্বাসের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ পৌঁছিয়েছিলেন। তাই তিনি স. খুশি হয়ে তাঁকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। তারপর ইমাম বোখারী উক্ত কিবতী আবু রাফে ছাড়া রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম অন্য এক আবু রাফে ছিলেন বলেও উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন আবু উজায়হা সাঈদ ইবনুল আস ইবনে উমাইয়ার গোলাম। তাঁর আট পুত্র, সকলেই নিজ নিজ অংশ ছেড়ে দিয়ে তাঁকে আযাদ করে

দিয়েছিলো, এক পুত্র খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস ব্যতীত। পরে রসুলেপাক স. উক্ত হিস্‌সা ক্রয় করে সেটি মাফ করে দিয়ে তাঁকে আযাদী দান করেছিলেন। সেই থেকে আবু রাফে বলতেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌র গোলাম। সুতরাং জানা গেলো, আবু রাফে নামে দু'জন গোলাম ছিলেন। আবার আসলাম নামেও কয়েকজন ছিলেন। তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে আবু রাফে কিবতীর নামই ছিলো আবু রাফে।

২৩. আফলাহ রা.। হজরত আফলাহ রসুলেপাক স. এর একজন আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, আবু ওমর বলেছেন, ইউসুফ ইবনে খালেদ সালেম ইবনে বশীর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হানাফী এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, ওই ব্যক্তি বলেছেন, আমি রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম আফলাহ থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্ থেকে শুনেছি, তিনি স. এরশাদ করেছেন, আমি আমার পরে আমার উম্মতের তিনটি বিষয়ে আশংকা করছি, ১. পথভ্রষ্টতা ২. প্রবৃত্তির অনুসরণ। তৃতীয় বিষয়টি বর্ণনাকারী ভুলে গিয়েছেন। তিরমিযী তাঁর 'নাওয়াদেরুল উসুল' কিতাবে তৃতীয়টির উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তৃতীয়টি হচ্ছে অহংকার। ইবনে শাহীনের বর্ণনায় এসেছে, তৃতীয়টি হচ্ছে মারেফতের পর গাফলত।

২৪. আনজেশা রা.। তিনি একজন হাবশী গোলাম ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর সুকণ্ঠবিশিষ্ট খাদেম ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে বলতেন, ইয়া আনজিশাতু। রিফকান বিল কাওয়ারীর। এক বর্ণনায় এসেছে– রুওয়াইদা সূক্বাকা বিল ক্বাওয়ারীর। আরেক বর্ণনায় আছে– লা তুক্বসিরীল ক্বাওয়ারীর অর্থাৎ হে আনজাশা উটকে আস্তে আস্তে চালাও, আর আস্তে আস্তে হুদী বলো ওই রকমভাবে, কাঁচের সাথে যেরকম নম্রতা করা হয়, যাতে সে ভেঙে না যায়। এখানে 'ক্বাওয়ারীর' (কাঁচ) দ্বারা নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জোরে জোরে উট চালালে মেয়েলোকদের কষ্ট হয়। তাই আস্তে আস্তে নম্রতার সাথে চালানোর কথা বলা হয়েছে। অথবা 'ক্বাওয়ারীর' (কাঁচ) শব্দ দ্বারা 'চিত্তাকর্ষণ' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হে আনজেশা! হুদী গেয়ে মেয়েলোকদের চিত্তাকর্ষণ করে তাদের একাগ্রতাকে নষ্ট করে দিয়ো না। সাবধানতা অবলম্বন কোরো, যেমন কাঁচের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। হুদী হচ্ছে সুরের মাধ্যমে ছন্দবদ্ধ পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করা। তা অনেকটা গান সদৃশ। আর গান শরীয়তে নিষিদ্ধ। যেমন রসুলেপাক স. বলেছেন– 'আলগিনাউ রুকবাতুয যিনা' (গান হচ্ছে ব্যভিচারের মন্ত্র)। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, হজরত বারা ইবনে আযেব পুরুষদের জন্য হুদী গাইতেন। আর আনজেশা গাইতেন মেয়েদের জন্য। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি একজন হাবশী গোলাম ছিলেন। তিনি বিদায় হজের সময় রসুলেপাক স. এর বিবিগণের উট টানতেন এবং হুদী গাইতেন। তিনি সব চেয়ে সুন্দর করে হুদী গাইতে পারতেন। উটও তাঁর

হুদীর সুরে দ্রুতগতিতে চলতো। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ওয়াসেলা ইবনে আসকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, আনজেশা রসুলেপাক স. এর জামানায় একজন হিজড়া (নপুংসক) ছিলেন। রসুলেপাক স. হিজড়াদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে তাকিদ দিতেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। তাতে হজরত আলী আনজেশাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এমনিভাবে হজরত ওমর ফারুকও কোনো কোনো হিজড়াকে বের করে দিয়েছিলেন।

২৫. বাযাম রা.। বাযাম শব্দের অর্থ এক প্রকারের মশহুর ফল। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে 'বাযাম' এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, বাযাম নবী করীম স. এর একজন আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। ইমাম বাগবীও তাঁকে রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলামদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইবনে আসাকেরও তাঁর অনুসরণ করেছেন।

২৬. হাতেম রা.। তাঁর নাম 'ইস্তিআব' গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। তবে 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হাতেম নামের সঙ্গে কোনো নেসবত যোগ করা হয়নি। তাঁর নাম শুধু হাতেম। তবে মিথ্যাবাদীরা তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। আবু ইসহাক সালমা এবং আবু মুসা বর্ণনা করেছেন, তাঁরা নযর ইবনে সুফিয়ান ইবনে আহমদ ইবনে নাসীর থেকে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, আমি হাতেমকে বলতে শুনেছি, রসুলুল্লাহ্ আমাকে আশি দীনার দিয়ে ক্রয় করে আযাদ করেছিলেন। অতঃপর আমি চল্লিশ বৎসর রসুলেপাক স. এর খেদমতে ছিলাম। আবু ইসহাক সালমা বর্ণনা করেছেন, নযর বলেছেন হাতেমের বয়স হয়েছিলো ১৬৫ বছর। শায়েখ বলেছেন, তাঁর কাছে মনে হয়েছে হাতেমের বয়স দু'শ বছর হয়েছিলো।। তবে 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, দু'শ বছর বয়স হওয়াটি অবাস্তবতামুক্ত নয়। বিষয়টি সুস্পষ্টও নয়।

২৭. বদর রা.। বদর ছিলেন আযাদকৃত গোলাম। তাঁর কুনিয়াতী নাম ছিলো আবু আবদুল্লাহ। এর চেয়ে বেশী আর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

২৮. রোওয়ায়ফা রা.। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে এসেছে, রোওয়ায়ফা রসুলেপাক স. এর গোলাম ছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থেও তাই পাওয়া যায়। আবু আহমদ আসকারী রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলামের মধ্যে তাঁকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, একবার রোওয়ায়ফা হজরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের নিকট এসেছিলেন এবং তিনি তাঁর পিছনে পিছনে এসেছিলেন। ইবনে আসাকের এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, রোওয়ায়ফা সম্পর্কে কেউ কোনো আলোচনা করেছেন বলে আমি জানি না। আবু আমর বলেছেন, তাঁর বর্ণনাকৃত কোনো হাদিস আছে বলে আমি জানি না।

২৯. যায়েদ ইবনে হেলাল রা.। 'রওজাতুল আহবাবের' ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, হজরত যায়েদ ইবনে হেলাল, হেলাল ইবনে ইয়াসারের দাদা ছাড়া অন্য কেউ

ছিলেন। 'আসমাউর রিজাল' গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায়, তিনিই হেলাল ইবনে ইয়াসারের দাদা ছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যায়েদ ইবনে হেলাল রসুলেপাক স. এর গোলাম ছিলেন। আবু দাউদ ও তিরমিযীর মতে হেলাল ইবনে যায়েদের নাতি থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রসুলেপাক স. তাঁকে কোনো এক যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে দেখেছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে হজরত যায়েদ ইবনে হারেছার মতো আযাদী দান করেছিলেন।

৩০. সাঈদ ইবনে যায়েদ রা.। হজরত সাঈদ ইবনে যায়েদ একজন খ্যাতনামা সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাবের ভগ্নিপতি। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্যতম সাহাবী ছিলেন। তিনি কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের মধ্য থেকে প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হজরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ তাঁর ঘরেই হয়েছিলো। কাজেই রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম অন্য কোনো সাঈদ ইবনে যায়েদ হয়তো হবেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হজরত সাঈদ রসুলেপাক স. এর গোলাম ছিলেন। বলা হয়েছে, তাঁর নাম ছিলো হেরান, তহমান, রুমান, বা রিয়াহ। এমনকি তাঁর নাম সম্পর্কে একুশটি উক্তি আছে। বলা হয়েছে, তিনি পারস্য বংশোদ্ভূত ছিলেন। সাইয়্যেদা উম্মে সালামা তাঁকে ক্রয় করে এই শর্তে মুক্ত করে দিয়েছিলেন যে, তিনি রসুলেপাক স. এর খেদমত করবেন। তিনি রসুলেপাক স. হজরত উম্মে সালামা এবং হজরত আলী থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর দুই পুত্র এবং সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর প্রমুখ সাহাবীগণ। হাসনাত ইবনে সালামা সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি এক সফরে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে ছিলাম। ওই সফরে যে মুসলমান তার কোনো বোঝা বহন করতে অক্ষম হতো, সে বোঝা আমার উপর ফেলে দিতো। এভাবে আমি তাদের অনেক মাল বহন করেছিলাম। রসুলেপাক স. তখন বলেছিলেন 'তুমি তো একটি নৌকা'। এই ঘটনা রসুলেপাক স.এর অন্যতম আযাদকৃত গোলাম হজরত সফিনার বেলায়ও ঘটেছিলো। তাঁর নামের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। আর এই সাঈদ নামটি উক্ত সফিনার নামও হতে পারে। অথবা অন্য কারও। ওয়াল্লহু আ'লাম।

৩১. সাঈদ ইবনে কিন্দিয়া রা.। তাঁর নামের আলোচনা 'ইস্তিআব' গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। 'ইস্তিআবে' নেসবত ছাড়া শুধু 'সাঈদ' নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সাঈদ রসুলেপাক স. এর গোলাম ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আবু ওছমান নাহদী হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর কিন্দিয়া শব্দ দ্বারাও কোনো ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। অভিধান গ্রন্থে রয়েছে 'কিন্‌দিয়া' অর্থ মোটা গাধা। সাঈদের পিতাকে কিন্দিয়া বলা হতো সম্ভবতঃ তিনি স্থূল দেহের অধিকারী ছিলেন বলেই।

৩২. সালমান ফার্সী রা.। তিনি রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি একজন মহাসম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তাঁকে যদি প্রশ্ন করা হতো, তোমার পিতা কে? তোমার বংশ কী? তিনি জবাব দিতেন, আমার বংশ ইসলাম, আমার পিতা ইসলাম, আর আমি হচ্ছি সালমান ইবনে ইসলাম। হজরত সালমান পারস্য দেশের সন্তান এবং হরমুয শহরের লোক ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইস্পাহানের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ওই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, যারা আবলাক (যে কালো ঘোড়ার পা ও মুখ শাদা) ঘোড়ার পূজা করতো। তিনি সত্যধর্মের অন্বেষণে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। বহুদিন পর্যন্ত তিনি সত্যের সন্ধানে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে এক পর্যায়ে আখেরী নবীর সন্ধান পেয়ে আরব দেশে চলে আসেন। রসুলেপাক স. এর রূপ-সৌন্দর্যের দর্শন লাভে ধন্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে তিনি বিভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হতে হতে এক পর্যায়ে মদীনার এক ইহুদীর হস্তগত হয়েছিলেন। পরে তার কাছ থেকে রসুলেপাক স. তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। তাঁর বয়স সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। এক উক্তি অনুসারে তাঁর বয়স হয়েছিলো তিনশ' ষাট বছর। তবে অধিকাংশের মতানুসারে তাঁর বয়স হয়েছিলো দুইশত পঞ্চাশ বছর। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ঈসাকে তিনি পেয়েছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

তাঁর প্রথম যুদ্ধ ছিলো খন্দকের যুদ্ধ। তাঁর পরামর্শ অনুসারেই খন্দক খনন করা হয়েছিলো। খন্দকের যুদ্ধে খন্দক খনন করা নিয়ে দুই দলের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। মুহাজিরগণ দাবী করলেন, সালমান আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এদিকে আনসারগণও দাবী করলেন, সালমানকে আমাদের ভাগে দিতে হবে। তখন রসুলেপাক স. বললেন, সালমান আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভূত। তিনি শক্তিশালী, দীর্ঘ ও বিশাল দেহের অধিকারী ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারের প্রেমিক, প্রেমাস্পদ ও নৈকট্যভাজন লোকদের মধ্যে ছিলেন। এমনকি তিনি আহ্বান ব্যতীতই রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হতেন। ইমাম সুয়ূতী 'জমউল জাওয়ামে' উদ্ধৃত করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, অগ্রগামী ব্যক্তি চারজন– আমি আরবদের মধ্যে। সালমান পারস্যবাসীদের মধ্যে, বেলাল হাবশাবাসীদের মধ্যে এবং সুহায়ব রোমকদের মধ্যে।

তিনি ওই মহান ব্যক্তিগণের অন্যতম, যাঁদের জন্য বেহেশত লালায়িত হয়ে আছে। তাঁরা হচ্ছেন হজরত আলী মুর্তযা ও হজরত সালমান ফার্সী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। হজরত ওমর ফারুক হজরত সালমান ফার্সীকে মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। মাদায়েন ছিলো বাদশাহ নওশেরওয়ার শহর। নওশেরওয়াই ছিলেন ওই শহরের স্থপতি। হজরত সালমান ফার্সী স্বহস্তলব্ধ উপার্জন ভক্ষণ করতেন। হাদিয়া ও বেতন তিনি দান করে দিতেন। দারিদ্রের জিন্দেগী পছন্দ

করতেন। তিনি আহলে সুফ্ফার সদস্য ছিলেন। তাঁর পরিধেয় পোশাক বলতে একটি আবা ছিলো– যা তিনি পরিধান করতেন। আবার গায়েও দিতেন। দেয়াল বা কোনো গাছের ছায়ায় তিনি নিদ্রা যেতেন। তাঁর কোনো ঘর ছিলো না। বসবাসের কোনো জায়গাও ছিলো না। তাঁর কোনো এক বন্ধু তাঁর জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এমন ঘর বানাও, যা দাঁড়ানোর সময় মাথায় না লাগে আর তার প্রশস্ততা যেনো এমন হয় যে, পা মেলে নিদ্রা যাওয়া যায়। তিনি ৩৫ অথবা ৩৬ হিজরীতে হজরত ওছমানের খেলাফতের শেষের দিকে ইনতেকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ইনতেকাল করেন হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতের সময়। তবে প্রথম উক্তিটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আনাস ইবনে মালেক এবং আবু ওছমান নাহদী। তিনি আজমী লোকদের ন্যায় খোশ মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি কখনও কখনও হজরত আবু হুরায়রার সঙ্গে হাসি তামাশা করতেন। রসুলেপাক স. তাঁকে এমতো স্বভাব পরিত্যাগ করতে বলেছিলেন এবং হজরত আবু হুরায়রাকে সমর্থন করেছিলেন।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, একদিন হজরত সালমান এবং হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিলো। কোনো এক ব্যক্তি হজরত সাআদকে বললেন, আপনি আপনার বংশপরিচয় বলুন। এভাবে প্রত্যেকেই আপন আপন বংশপরিচয় বর্ণনা করলেন। এক পর্যায়ে যখন হজরত সালমানের পালা পড়লো তখন তিনি বললেন, ইসলাম ধর্মে আমার কোনো পিতা নেই। আমার পিতা হচ্ছে ইসলাম। আমি ইসলামের সন্তান সালমান। হজরত ওমর ফারুক বলতেন, জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ জানতো, খাত্তাব লোকদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। আমি ইসলামের সন্তান ওমর– আর ইসলামের সন্তান সালমানের ভাই। বর্ণিত আছে, একবার হজরত সালমান হজরত ওমরের নিকটে গেলেন। হজরত ওমর উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, চলো আমরা তাঁকে ইস্তেকবাল করি। সকল মুসলমান তাঁকে স্বাগতম জানালেন। হজরত সালমান থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি যখন হরমুজ শহরে আমার পরিবার পরিজনের সঙ্গে ছিলাম, তখন বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে যে পথে ফিরে আসতাম, সে পথের ধারে এক স্থানে বাস করতেন একজন খৃষ্টান ধর্মযাজক (রাহেব)। আমি তাঁর কাছে বসতাম। তিনি আমাকে আসমান যমীনের খবর বলতেন। এভাবে এক পর্যায়ে আমি বিদ্যালয়বিমুখ হলাম। ওই রাহেবের সাহচর্যকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিলাম। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আমাদের বাড়ীতে এসে বললেন, ওমুক রাহেব তোমাদের ছেলেকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা ওই রাহেবকে শহর থেকে বের করে দিলো। আমিও লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই রাহেবের কাছে পৌঁছে গেলাম। ঘটনা অনেক দীর্ঘ। যাহোক, এক পর্যায়ে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছলাম। এক পঙ্গু ভিক্ষুক তাঁর কাছে কিছু চাইলো। তবে আমি

বুঝতে পারলাম না, আসলে সে কী কথা বললো। রাহেব তাকে বললেন, তুমি কি দাঁড়াতে চাও? সে বললো, হাঁ। রাহেব তার জন্য দোয়া করলেন। আর সে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেলো এবং পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো। রাহেব চলতে লাগলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। কিন্তু পথ হারিয়ে ফেললাম। তাঁকে আর খুঁজে পেলাম না। পথ চলতে চলতে এক পর্যায়ে মদীনার আনসারদের এক ছওয়ারী দলের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। আমি তাদের কাছে উক্ত রাহেবের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলতে লাগলো, এ এক পলায়নকারী গোলাম। একে ধরে ফেলো। তাদের মধ্যে একজন আমাকে তার ছওয়ারীর পিছনে বসিয়ে মদীনায় নিয়ে এলো। আমাকে এক বাগানে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করলো। আমি বাগানে পানি সিঞ্চন করতাম। ওই রাহেব আমাকে আখেরী নবীর আবির্ভাবের সংবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁর নবুওয়াতের আলামতসমূহ সম্পর্কেও অবহিত করেছিলেন। আমাকে ওসিয়ত করে বলেছিলেন, ওই নবীকে পেলে তখন তাঁকে বিশ্বাস কোরো। তাঁর উপর ইমান এনো। আমি রসুলুল্লাহ্র মধ্যে উক্ত আলামতসমূহ দেখতে পেলাম এবং তাঁর উপর ইমান আনয়ন করলাম।

হজরত সালমান ফার্সীর ঘটনার মধ্যে তালেবে হক, সত্য পথের পথিক এবং তরিকতের সালেকদের জন্য এক অমূল্য নসীহত রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার সবকিছুর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে যতোক্ষণ না কারও সোহবত গ্রহণ করা হবে, ততোক্ষণ উদ্দেশ্য সফল হবে না। অভিজ্ঞ কোনো একজন শায়েখ বলেছেন, যে হকতায়ালার তলবগার হয়, সে দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে ফিরে। মাশায়েখগণ বলেছেন, হক তায়ালাকে অন্বেষণ করার নেয়ামত অন্তরে স্থিত হলে, ওই নেয়ামতই একদিন না একদিন তাকে রাহবারের (পথপ্রদর্শকের) সঙ্গে মিলিয়ে দিবে। অথবা রাহবারকে তার কাছে পৌঁছে দিবে। আর যার ভাগ্যে এই নেয়ামত নেই, সে হতভাগ্য বঞ্চিতই থাকবে। নাউযুবিল্লাহ্।

সাহাবা কেরামের মধ্যে উক্ত দুই নেয়ামত বিদ্যমান ছিলো। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাহাবী তো এমন ছিলেন, যাঁদের নিকট রসুলেপাক স. স্বয়ং তশরীফ নিয়ে গিয়েছেন। আবার কেউ কেউ এমন ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্তায়ালা রসুলেপাক স.এর দরবারে পৌঁছে যাওয়ার সৌভাগ্য দান করেছিলেন। এ দুই প্রকারের নেয়ামত লাভকারী সাহাবীগণ সকলেই রসুলেপাক স. এর পবিত্র সত্তা থেকে ফয়েজ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩৩. সান্দর রা.। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে এসেছে, সান্দর যিম্বা খারামীর গোলাম ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর সোহবত লাভ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আমর ইবনে শুআয়েব। তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন সান্দর তাঁর মনীব যিম্বা খারামীর বাঁদীর সাথে মিলিত হন। তাই যিম্বা তার পুরুষাঙ্গ কেটে দেন। সান্দর রসুলেপাক স. এর কাছে বিচার

প্রার্থনা করলেন। তখন রসুলেপাক স. যিম্বা খারামীর কাছে লোক পাঠিয়ে দিয়ে জানালেন, কেউ যদি কারও অঙ্গ কেটে দেয় বা আগুনে পুড়িয়ে দেয়, তাহলে তার আযাব তাকেই ভোগ করতে হবে। যিম্বা খারামী রসুলেপাক স. এর নিকট এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এ আপনার গোলাম। আপনি তাকে আযাদ করে দিয়ে তাকে খুশি করে দিন। রসুলেপাক স. তখন সান্দরকে বললেন, আমি সকল মুসলমানকে নসিহত করে দিচ্ছি, তারা যেনো তোমার সঙ্গে সদাচরণ করে।

রসুলেপাক স. এর ওফাতের পর সান্দর রা. হজরত ওমর ফারুকের কাছে নিবেদন করলেন, আমার ব্যাপারে রসুলেপাক স. যে ওসিয়ত করেছিলেন, তা বাস্তবায়ন করুন। হজরত ওমর ফারুক বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে আমাদের এখানে থাকতে পারো। আমি তোমার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিবো। অন্যথায় যেখানে তুমি যেতে চাও, তোমার জন্য আমি ফরমান লিখে দিবো। সান্দর মিশরে থাকতে পছন্দ করলেন। হজরত ফারুকে আযম মিশরের শাসনকর্তা হজরত আমর ইবনুল আসের কাছে পত্র লিখে তাঁর ব্যাপারে রসুলেপাক স. এর ওসিয়ত বাস্তবায়নের তাকিদ দিলেন। সান্দর দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে হজরত আমর ইবনুল আসের কাছে পৌঁছলেন। তাঁর জন্য একটি বড় ধরনের যমীন বরাদ্দ দিয়ে দিলেন। সান্দর সেখানেই বাস করতেন এবং তার উৎপাদিত শস্য দিয়ে জীবন যাপন করতেন। তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেলে জমিনটি বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইবনে গোফায়র তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যিম্বা একজন লেখাপড়া না জানা ধনী লোক ছিলেন। তিনি আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যিম্বা সালামার পুত্র ছিলেন।

৩৪. শামউন রা.। তিনিও রসুলেপাক স. এর একজন আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, শামউন হচ্ছেন যায়েদ ইবনে খোশাফা বনু কুরায়যার লোক। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু রায়হানা। তিনি আনসারদের মিত্র ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি রসুলেপাক স. এর গোলাম ছিলেন। তিনি ছিলেন রায়হানার পিতা, যে রায়হানা রসুলেপাক স. এর হেরেমে ছিলেন। রায়হানার মাধ্যমেই তাঁর কুনিয়াত হয়েছিলো। তিনি রসুলেপাক স. এর সোহবত পেয়েছিলেন। তাঁর কাছে থেকে হাদিসও বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাশীল যাহেদ (সাধক) শ্রেণীর। শামদেশে বসবাস করতেন। শামবাসীরা তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। 'কাশেফ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি পরহেজগার ছিলেন। ছিলেন গযওয়াসমূহের বর্ণনাকারী। 'তাহযীব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কেউ কেউ তাঁর নাম বলেছেন শামগুন (গইন) বর্ণ দ্বারা। 'ইসাবা' গ্রন্থে শামউন আইন বর্ণ দ্বারা আবার শামগুণ গইন বর্ণ দ্বারা উভয় ভাবেই বলা

হয়েছে। আবু রায়হানা তাঁর বিখ্যাত কুনিয়াত। তাঁকে কেউ ইযদী, কেউ আনসারী এবং কেউ কুরাশী বলেছেন। ইবনে আসাকের বলেছেন, প্রথমোক্তটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। শায়েখ বলেছেন, সকল আনসারকেই ইযদী বলা হয়। হতে পারে তিনি কোনো কোনো কুরাইশের মিত্র ছিলেন। তিনি শামদেশে বসবাস করতেন। তার কাছ থেকে বর্ণিত হাদিস প্রচলিত রয়েছে মিশরীদের মধ্যে। আবুল হাসান রাযী তাঁর বিভিন্ন শায়েখগণের নির্ভরতায় বলেছেন, তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি দামেশকে ওই বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন, যেখানে তাঁর পূর্ব পুরুষগণ বসবাস করতেন। তিনি রসুলেপাক স. এর সোহবত পেয়েছিলেন। তাঁর থেকে পাঁচটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে তিনি বসবাস শুরু করে দিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করা হয়েছিলো। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি রসুলেপাক স. এর নিকটে হাজির হয়ে নিবেদন করলাম, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা আমার কাছে কঠিন ও কষ্টকর। রসুলেপাক স. আমাকে বললেন, যা করতে তুমি অক্ষম তা পালন করার বিষয়টি তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নি। তুমি সেজদা করাটি (অধিক নামাজ পড়া) তোমার উপর অপরিহার্য করে নাও। তারপর থেকে তিনি বেশী বেশী করে নামাজ পড়া শুরু করে দিলেন। বর্ণিত হয়েছে, আবু রায়হানা একবার নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কোরআনে করীম ও একটি সূঁই ছিলো। সুঁইটি নদীতে পড়ে গেলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! তোমার কসম। আমার সূঁইটি ফিরিয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে সূঁইটি ভেসে উঠলো এবং তিনি তা নিয়ে নিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে আরও বর্ণনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে তাঁর কুনিয়াত আবু রায়হানা বলা হয়েছে। উপরোক্ত কথা দ্বারা অবশ্য সাব্যস্ত হয় যে, শামউন আবু রায়হানা রসুলেপাক স. এর গোলাম ছিলেন। রসুলেপাক স. এর বাঁদীগণের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, রায়হানা যায়েদ ইবনে আমরের কন্যা ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, রায়হানা বিনতে শামউন বনী নাযীর বা বনী কুরায়যার বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। রায়হানা মিলকে ইয়ামীন বাঁদী হিসেবে রসুলেপাক স. এর শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁকে রসুলেপাক স. আযাদ করে দিয়ে বিয়ে করেছিলেন। তবে বিষয়টি সুস্পষ্ট নয় যে, এই রায়হানাই কয়েদীদের মধ্যে ছিলেন। শামউনকে যখন কুরায়যী বলা হয়, তখন মনে হয় 'রায়হান' বনী কুরায়যার বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৩৫. যুমায়রা রা.। তিনি ছিলেন আবু যুমায়রার সন্তান। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. এর গোলাম আবু যুমায়রার পুত্র ছিলেন যুমায়রা। আবু যুমায়রা ও তাঁর পুত্র যুমায়রা উভয়েই রসুলেপাক স. এর সোহবত লাভ করেছিলেন। তিনি হুসাইন ইবনে আবদুল মালেক ইবনে যুমায়রার দাদা ছিলেন। তাঁকে মদীনাবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইবনে আবু ওয়াহাব হুসাইন ইবনে

আবদুল মালেক ইবনে যুমায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. একবার যুমায়রার মাতার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি ক্রন্দন করছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে বললেন, কাঁদছো কেনো? তুমি কি অভুক্ত? বিবস্ত্র? সে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পুত্রকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। তখন রসুলেপাক স. বললেন, মা ও তার সন্তানের মধ্যে পৃথক করে দেওয়া উচিত নয়। অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে যুমায়রা ছিলেন তার কাছে রসুলেপাক স. লোক পাঠিয়ে দিলেন। একটি উটের বিনিময়ে তিনি তাঁকে খরিদ করে নিলেন।

অতঃপর যুমায়রা ইবনে আবু যুমায়রার নামে রসুলেপাক স. এই মর্মে একটি ফরমান লিখে দিলেন। কেননা তিনি আরব বংশদ্ভূত ছিলেন এবং ছিলেন ওই গনিমতের মালের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবীর জন্য হালাল করে দিয়েছিলেন। হজরত যুমায়রা নিবেদন করলেন, আমি আমার কাওমের লোকদের সঙ্গে মিলিত হতে চাই। একথা শুনে রসুলেপাক স. তাঁকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু যুমায়রা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে পছন্দ করলেন। রসুলেপাক স. নির্দেশ দিলেন, কল্যাণকর আচরণ ছাড়া কেউ যেনো তাঁর প্রতি অগ্রসর না হয়। মুসলমানগণ যখন তাঁর সাথে মোলাকাত করবে, তখন যেনো কল্যাণের সাথে অগ্রসর হয়। হাদিসটি 'ইসাবা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন উবাই ইবনে কাআব এবং আবদুল্লাহ ইবনে আসলাম।

৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে আসলাম হাশেমী রা.। তিনি রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। বাগবী একথা বলেছেন। তিনি ব্যতীত অন্যান্যরা তাঁকে সাহাবী বলেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে লাহিআহ, বকর ইবনে সাওদা, আবদুল্লাহ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রসুলেপাক স. এর গোলাম ছিলেন।

৩৭. গায়লান রা.। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, গায়লান রসুলেপাক স. এর গোলাম ছিলেন। ইবনুস সাকান এরকম বলেছেন। আরও বলেছেন, গায়লান থেকে একটি হাদিস বর্নিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, দাজ্জাল এ অবস্থায় বের হবে যে, সে হক ও ইনসাফের দাওয়াত দিবে। কোনো কাফেরই তার অনুসরণ করা ছাড়া থাকবে না। মানুষ তাকে চিনতে পারবে না। পরে তার দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে 'কাফের' শব্দটি ভেসে উঠবে। সকল মুমিনই তা পড়তে পারবে। উক্ত লেখাটি উদ্ভাসিত হওয়ার পর মুসলমানগণ তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে, শুধু কাফেররাই তার অনুসরণ করবে।

৩৮. ফুযালা রা.। তিনি ইয়ামনের অধিবাসী। রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাস ছিলেন। জাফর মুস্তাফেরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি শামদেশের অধিবাসী ছিলেন। আবু বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাযাম তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তিনি রসুলেপাক স. কর্তৃক মুক্তিদানকৃত ক্রীতদাস ছিলেন। মোহাম্মদ ইবনে সাআদ ওয়াকেদী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি শামদেশে গিয়ে বসবাস করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর সন্তান-সন্ততি হয়েছিলো। তাঁর বিষয়ে এর বেশী আর কিছু জানা যায়নি।

৩৯. নুফায়র রা.। নুফায়র নামে দু'জন ছিলেন। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে একজনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে নুফায়র ইবনুল মুগলেস ইবনে নফর আল হাযরামী। তাকে নফর ইবনে মালেক ইবনে আমের আল হাযরামী বলা হয়। তিনি জুবায়েরের পিতা। আবু জুবায়ের তাঁর কুনিয়াত। তাঁকে শামদেশের বাসিন্দা হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর পুত্র হজরত জুবায়ের ইবনে নুফায়র বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কিছু কিছু হাদিস ওজু সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আর কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন দাজ্জালের আলামত সম্পর্কে। আরেকজন নুফায়র 'ইসাবা' গ্রন্থে যাঁর পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে– নুফায়র ইবনে নাজাব শামী ও ইয়ামানী। বলা হয়ে থাকে, তিনি রসুলেপাক স. এর সোহবত পেয়েছিলেন। সুতরাং বুঝতে হবে, নুফায়র নামে সাহাবী ছিলেন দু'জন। তবে তাঁদের মধ্যে কোন নুফায়র রসুলেপাক স. এর ক্রীতদাস ছিলেন– তা জানা যায়নি। আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন।

৪০. কুরায়ব রা.। 'ইসাবা' গ্রন্থে এসেছে, কুরায়ব রসুলেপাক স. এর দাস ছিলেন। আয়দান মারুযী তাঁকে সাহাবীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তবে শায়েখ বলেছেন, এটি লেখার ভুল ছিলো। মূলতঃ তাঁর নাম ছিলো হারব আবু সালামা।

৪১. মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান। মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ছাড়াও মোহাম্মদ নামে আরেকজন ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো নাহেবা। রসুলেপাক স. নাম পরিবর্তন করে তাঁর নাম রেখেছিলেন মোহাম্মদ। 'ইসাবা' গ্রন্থে' 'মোহাম্মদ' নামের অনেক সাহাবী ছিলেন বলা হয়েছে। সেই সব নামের সঙ্গে নেসবত যোগ করা আছে। কেবল একটি 'মোহাম্মদ' নাম পাওয়া যায় নেসবত ছাড়া। বলা হয় তিনিই রসুলেপাক স. এর দাস ছিলেন। এই বর্ণনাটি দিয়েছেন হাকেম তাঁর 'তারিখে নিশাপুর' গ্রন্থে। তিনি বর্ণনাটি দিয়েছেন ওই সকল লোকের মধ্যে যারা খোরাসান থেকে নিশাপুরে এসেছিলো। মোহাম্মদের বংশধরদের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা বলেছেন, আমাদের পিতার নাম নাহিয়া। তিনি অগ্নিপূজক ছিলেন। তিনি যখন রসুলেপাক স. এর আবির্ভাবের সংবাদ পান, তখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন এবং মদীনায় পৌঁছেন। তারপর তিনি মুসলমান হয়ে যান। রসুলেপাক স. তাঁর নাম রেখেছিলেন মোহাম্মদ। মুসলমান হওয়ার পর তিনি আপন শহরে ফিরে আসেন। তাঁকেই রসুলেপাক স. এর দাস বলা হয়। তাঁর বাড়ি ছিলো মার্ভ এলাকায়। হাকেম সূত্রে বর্ণনাটি দিয়েছেন আবু মুসা। তিনি ছাড়াও আরেকজন মোহাম্মদ ছিলেন। তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান। বলা হয়ে থাকে, মোহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমানই রসুলেপাক স. এর দাস ছিলেন। সাবতীন, আইদান মারুযী এবং মাওরদী তাঁকে সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রসুলেপাক স. কর্তৃক মুক্তিদানকৃত দাস মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান বলেছেন, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সতর উন্মোচিত করবে, তার উপর মহর ওয়াজিব হয়ে যাবে। অর্থাৎ সঙ্গম করলে মহর ওয়াজিব হয়ে যাবে।

তাঁকে 'মাওলা' (মুক্তিদানকৃত দাস) বলার কারণটি অবশ্য এখানে সুস্পষ্ট হয়নি। এমন হতে পারে যে, যেহেতু তিনি অগ্নিপূজক ছিলেন, সে কারণে বন্দী হয়েছিলেন এবং রসুলেপাক স. তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

৪২. মাকহুল। পূর্বোল্লেখিত পুস্তকগুলোতে মাকহুল নামে কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে শামদেশের মাকহুল নামে যাকে পাওয়া যায়, তিনি তাবেয়ী ছিলেন।

৪৩. নাফে আবুস সায়েব রা.। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, নাফে রসুলেপাক স. এর দাস ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. থেকে বর্ণনা করেছেন, অহংকারকারী, অনেক বেশী ব্যভিচারকারী ও নিজের আমলের এহসান প্রকাশকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হাদিসটি নাফে থেকে খালেদ ইবনে উমাইয়া বর্ণনা করেছেন। কিন্তু নাফে আবুস সায়েব নামে যাকে বলা হয়েছে, তার বর্ণনা 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে পাওয়া যায় না। তবে নাফে ছাড়া আবুস সায়েব কুনিয়াতে অনেক সাহাবীকেই পাওয়া যায়। আবুস সায়েব গায়লান রা. এর দাস ছিলেন। তিনি গায়লানের ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন। তার পর রসুলেপাক স. তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তারপর গায়লান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন রসুলেপাক স. নাফেকে গায়লানের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। হতে পারে তাঁকে রসুলেপাক স. কর্তৃক মুক্তিদানকৃত দাস বলা হয়েছে একারণেই। তবে তা দ্বারা এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয় না যে, এই আবুস সায়েব কুনিয়াতটি উক্ত নাফেরই। 'রওজাতুল আহবাব' এর বর্ণনা দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয়।

৪৪. মুনাইহ রা.। কেউ কেউ তাঁর নাম বলেছেন মানীহ। ইবনে আবদুল বার তাঁর 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলেছেন, আমি তাঁর বিষয়ে এর চেয়ে বেশী কিছু জানি না। কেউ কেউ তাঁকে রসুলেপাক স. কর্তৃক মুক্তিদানকৃত দাস বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা একথাও বলেছেন, তিনি স. তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে 'সাহেবুল জাওহার' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি সুরাতের অধিবাসী ছিলেন।

৪৫. নাহীক রা.। নাহীক নামে রসুলেপাক স. এর একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, নাহীক ইবনুল আসওয়াদ রসুলেপাক স. এর দাস ছিলেন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, শেষ অসুস্থতার কালে রসুলেপাক স. এক পর্যায়ে বেঁহুশ হয়ে গেলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তখন নামাজ পড়ানোর জন্য দাঁড়ালেন। যখন তিনি স. হুঁশ ফিরে পেলেন, মসজিদে যেতে চাইলেন। সে সময় এক হাবশী দাস রসুলেপাক স.কে সাহায্য করেন। 'ইসাবা' গ্রন্থের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, এই নাহীক ইবনুল আসওয়াদই ছিলেন উক্ত হাবশী দাস। ওয়াল্লহু আ'লাম।

৪৬. নুফায় আবু বুকরা রা.। তাঁর নাম নুফায় ইবনুল হারেছ ইবনে কালদা ছাকাফী। কেউ কেউ বলেছেন, নুফায় ইবনে মাসরুহ। আবার কেউ বলেছেন, তার নাম মাসরুহ ইবনে কালদা। কেউ বলেছেন, তিনি হারেছ ইবনে কালদা ছাকাফীর

দাস ছিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর পুত্র বানিয়েছিলেন। আবু বকরার মা শাম্মা হারেছের দাসী ছিলেন। আর তিনি যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ানেরও মা ছিলেন। তিনি মুর্খতার যুগে তার সঙ্গে ব্যাভিচার করেছিলেন এবং সে কারণেই যিয়াদের নামের সাথে ইবনে আবু সুফিয়ান উপনামটি প্রবল হয়। নুফায়ের উপনাম আবু বুকরা রসুলেপাক স.ই রেখেছিলেন। কেননা তিনি তায়েফের দিন তাঁর মালপত্র কূপের বালতির মধ্যে রেখে কূপে নামিয়ে দিয়েছিলেন। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. যখন তায়েফের কেল্লা অবরোধ করেছিলেন, তখন নুফায় ইসলাম গ্রহণ করেন। রসুলেপাক স. এর দীদারের আশায় নিজে কূপের বালতিতে উঠে (অবরোধ থেকে বেরিয়ে) নিচে নেমে এসেছিলেন। তখনই রসুলেপাক স. তাঁর নাম রেখে ছিলেন আবু বুকরা (বুকরা শব্দের অর্থ বালতি)।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. তায়েফের দুর্গ অবরোধ করলেন। ঘোষণা দিলেন, কোনো দাস দুর্গ থেকে নিচে নেমে আমাদের দিকে এলে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। এই ঘোষণা শুনে দশজন দাস নিচে নেমে এসেছিলো। তন্মধ্যে হজরত নুফায়ও ছিলেন। মুগলতায়ীর মতে সেদিন তেইশজন দাস নিচে নেমে এসেছিলো। রসুলেপাক স. প্রত্যেককে মুক্ত করে দিয়ে একেক জনকে একেক জন সাহাবীর দায়িত্বে দিয়েছিলেন তাদের দেখাশোনা করার জন্য। বিষয়টি তায়েফবাসীর কাছে খুব কঠিন মনে হলো। তায়েফবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোক রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর তাঁর কাছে গোলামদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন করলো। রসুলেপাক স. বললেন, তারা সকলেই আল্লাহ্ কর্তৃক মুক্তিদানকৃত। ঘটনাটি ইতোপূর্বে তায়েফে অভিযান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। বর্ণনাটি ওই কথাটিকেই সহায়তা করে যে, আবু বুকরা হারেছের দাস ছিলেন। আর যদি তা নাও হয়, তবু তিনি নিজে রসুলেপাক স. কর্তৃক মুক্ত দাস বলে দাবী করেছেন। তিনি অন্যান্য মুসলমানদের বলতেন, আমি তোমাদের দ্বীনী ভাই এবং আল্লাহ্‌র রসুলের দাস। একথা যদি তোমরা অস্বীকার করো, তাহলে আমি নুফায় ইবনে মাসরুহ।

এ নুফায় একজন অন্যতম সম্মানিত ও বুযুর্গ সাহাবী ছিলেন। পরে তিনি বসরায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। বসরায় তাঁর সন্তান-সন্ততিও ছিলো। তাঁর সম্পর্কে হজরত হাসান বসরী বলেছেন, বসরাতে হজরত এমরান ইবনে হাসান এবং আবু বুকরার চেয়ে উত্তম কোনো সাহাবী বসতি স্থাপন করেননি। তিনি জামালযুদ্ধের দিন নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন এবং কারও পক্ষেই তাঁর সম্মতি প্রকাশ করেননি। কোনো পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধেও অংশ নেননি। হজরত আবু বুকরা ৪৯ অথবা ৫১ অথবা ৫২ হিজরীতে বসরায় ইনতেকাল করেন। তিনি ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন, হজরত আবু বুরদা আসলামী যেনো তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান।

৪৭. হুরমুয আবু কায়সান রা.। ‘ইসাবা’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, কায়সান রসুলেপাক স. কর্তৃক মুক্তিদানকৃত দাস ছিলেন। তাঁকে হরমুযও বলা হতো। ‘ইস্তি আব’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, কায়সান রসুলেপাক স. এর অন্যতম আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তাঁর আরেক নাম ছিলো হুরমুয। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু কায়সান। তাঁর মূল নাম নিয়ে মতভেদ আছে। কায়সান, মেহরান, তহমান ও যাকওয়ান ইত্যাদি নাম এসেছে। রসুলেপাক স. এর উপর সদকার মাল হারাম সম্পর্কিত এই নামগুলো পাওয়া যায়।

৪৮. ওয়ারদান রা.। ‘ইসাবা’ গ্রন্থে এসেছে, ওয়ারদান রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। আবু নাঈম তাঁকে সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইকরামা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এর গোলাম খেজুর গাছের ডাল থেকে পড়ে গিয়ে ইনতেকাল করেন। তখন তিনি স. বলেন, তার সন্তান-সন্ততিদেরকে তার রেখে যাওয়া সম্পদ দিয়ে দাও। অনুসন্ধান করে এক ব্যক্তিকে পাওয়া গেলো এবং তাকে তাঁর মীরাছ প্রদান করা হলো।

৪৯. ইয়াসার রা.। ইয়াসারের বর্ণনা রেবাহ এর আলোচনার সময় পূর্বে কিঞ্চিত উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াসার রসুলেপাক স. এর একজন অন্যতম রাখাল ছিলেন, যাকে ইরনীনবাসীরা শহীদ করেছিলো। রসুলেপাক স. হজরত ইয়াসারের কেসাসে তাদেরকে কতল করেছিলেন এবং হজরত রেবাহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। এখানে যে ইয়াসার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা হতে পারে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। অথবা অন্য কোনো ইয়াসারও হতে পারেন। ইয়াসার নামে অনেক সাহাবীই ছিলেন। মনে করা হয়, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রসুলেপাক স. কর্তৃক মুক্তিদানকৃত দাস ছিলেন। ইয়াসার নামে একজন আবিসিনিয়ার দাস ছিলেন, যিনি রসুলেপাক স. এর রাখাল ছিলেন। রসুলেপাক স. যখন বনী ছা’লাবা গোত্রের গাতফানদের উপর আক্রমণ করেছিলেন, তখন পথিমধ্যে এক দাস পেয়েছিলেন, যার নাম ছিলো ইয়াসার। আরেকজন ইয়াসার ছিলেন ওই লোকদের মধ্যে, যাঁরা তায়েফের দুর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন এবং মুসলমান হয়েছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁদের সকলকেই মুক্তি দিয়েছিলেন। তবে এখানে যে ইয়াসার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, ‘ইসাবা’ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কেই বলা হয়েছে, তিনি হজরত ওছমানের দাস ছিলেন। এ থেকে এই বিষয়টিই সুস্পষ্ট হয় যে, তায়েফে যতোজন দাস নেমে এসেছিলেন, রসুলেপাক স. তাঁদেরকে একেকজন সাহাবীর তত্ত্বাবধানে দিয়ে দিয়েছিলেন। উক্ত ইয়াসারকে হজরত ওছমানের দায়িত্বে দেয়া হয়েছিলো। সবশেষে সকলকেই মুক্ত করে দেওয়া হয়। রসুলেপাক স. তাঁদের সম্পর্কে বলেন ‘হুম উতাকাউল্লাহ’ (এরা আল্লাহ্ কর্তৃক মুক্ত দাস)। এই ইয়াসারকে যদি হজরত ওছমানের দাস বলা হয়, তবুও তা ঠিক হবে। আর তাঁকে রসুলেপাক স. এর দাস বললেও ভুল হবে না। আবু বুকরাও নিজেকে রসুলেপাক স.

এর দাস মনে করতেন। তাঁদের সকলকেই রসুলেপাক স. কর্তৃক মুক্ত দাস বলা যেতে পারে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

৫০. আবু উছায়লা বা আবু আছীলা রা.। 'তালকীহ' নামক গ্রন্থে তাঁর পরিচয় এভাবে দেওয়া হয়েছে– তিনি নবী করীম স. এর দাস ছিলেন। এখানে যে আবু আছীলার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ভিন্নজন। তাঁর নাম ছিলো রাশেদ। বর্ণিত আছে, মুর্খতার যুগে তাঁর নাম ছিলো জালেম। রসুলেপাক স. বলতেন 'আনতা রাশেদ' (আজ থেকে তোমার নাম রাশেদ)। রাশেদ নামেও দুই ব্যক্তি ছিলেন। একজন রাশেদ ইবনে হাফস ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ। অপর জন ছিলেন রাশেদ ইবনে আবদারিয়া আসলামী। 'ইসাবা' গ্রন্থে এসেছে, রাশেদ ইবনে আবদারিয়ার নাম ছিলো গউছ। রসুলেপাক স. তাঁর নাম রেখেছিলেন রাশেদ। দু'জনেরই উপনাম ছিলো আবু আছীলা। যে আবু আছীলাকে রসুলেপাক স. এর দাস বলা হয়, তাঁর মূল নাম কী ছিলো, তা জানা যায় না। এ সব কথা 'ইসাবা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫১. আবুল বাশার রা.। 'ইস্তিআব' ও ইসাবা' গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে, আবুল বাশার আনসারী নামে এক সাহাবী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সূর্য উদয় কালে নামাজ পড়া সম্পর্কিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি অনেক দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়েছে, এই আবুল বাশার ছাড়া এ নামে আর কোনো সাহাবী ছিলেন না। তবে তিনি যে দাস ছিলেন– একথা কেউ বলেননি। ওয়াল্লহু আ'লাম।

৫২. আবু সফিয়া রা.। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবু সফিয়া রসুলেপাক স.এর দাস ছিলেন। সেখানে আরও বলা হয়েছে, ইমাম বোখারী তাঁকে মুহাজিরগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইউনুস ইবনে উবায়দা তাঁর মাতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আবু সফিয়াকে দেখেছি, যিনি একজন অন্যতম মুহাজির ছিলেন। তিনি খেজুরের আঁটি গণনা করে তসবীহ পাঠ করতেন। ইমাম বাগবী। আরেকটি সূত্রপরম্পরায় হজরত উবাই ইবনে কাআব রসুলেপাক স. কর্তৃক মুক্তিদানকৃত দাস আবু সফিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সামনে পাথরের টুকরা জমা করে রাখা হতো। সন্ধ্যা থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত এবং জোহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি তা দিয়ে তসবীহ পাঠ করতেন। 'ইস্তিআব' গ্রন্থেও বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. কর্তৃক মুক্ত দাস অন্যতম মুহাজির ছিলেন। তিনি বিচি দ্বারা গণনা করে তসবীহ পাঠ করতেন।

৫৩। আবু কবীলা। আবু কবীলার যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায় না। আবু কবীলার মূল নাম মুরশেদ। তবে তিনি সাহাবী ছিলেন, না তাবেয়ী ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ আছে। যা হোক রসুলেপাক স. এর দাস বা সাহাবী কোনোটিই প্রমাণিত নয়। ওয়াল্লহু আ'লাম।

৫৪. আবু লুবাবা রা.। 'ইসাবা' গ্রন্থে এসেছে, আবু লুবাবা রা. রসুলেপাক স. এর দাস ছিলেন। মোহাম্মদ ইবনে হাবীব 'মুহরেয' নামক পুস্তকে একথা লিখেছেন। বালাযুরি বর্ণনা করেছেন, তিনি বনু কুরায়যার লোক ছিলেন। তিনি একজনের চুক্তিবদ্ধ

দাস ছিলেন। যখন তিনি তাঁর চুক্তির মূল্য পরিশোধ করতে পারছিলেন না, তখন রসুলেপাক স.তাঁকে তাঁর মনীবের কাছ থেকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তি 'আসতাগফিরুল্লাহাল লাজী লা ইলাহা ইল্লাহু আলহায়্যুল কায়্যুম ওয়া আতূবু ইলাইহি' পাঠ করবে তার সকল গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে, যদি সে কাফেরের সঙ্গে মোকাবেলা করা থেকে পলায়নও করে। আবু লুবাবা ইয়াসার ইবনে যায়েদ ইবনুল মুনযিরের পিতা। শায়েখ বলেছেন, হাদিসটি যায়েদ ইবনে হেলালের বর্ণনা হিসেবেই খ্যাত, যিনি রসুলেপাক স. এর দাস ছিলেন। উক্ত আবু লুবাবা আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির ভিন্ন অন্য কেউ, যাঁর নাম ছিলো রেফাআ, যিনি তাঁর নিজেকে মসজিদে নববীর খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ছিলেন।

৫৫. আবু লাকীত রা.। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবু লাকীত রসুলেপাক স. এর আবিসিনীয় অথবা কুফী গোলাম ছিলেন। তিনি হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতকাল পর্যন্ত হায়াত পেয়েছিলেন। 'ইস্তিআব' প্রণেতা বলেছেন, কোনো কোনো সীরাতবিশেষজ্ঞ তাঁকে রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম বলেছেন। তবে আমার কাছে তার পরিচয় নেই। শায়েখ বলেছেন, মোহাম্মদ ইবনে জাবীর তাঁর কিতাব 'মুহরেয' এ তাঁর উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এও বলেছেন, জাফর মুসতাগফেরী বলেছেন, তিনি হজরত ওমর ফারুকের খেলাফত পর্যন্ত দপ্তর বহন করার কাজ করতেন।

৫৬. আবুল ইয়াসার রা.। তিনি একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। 'ইস্তিআব', 'জামেউল উসুল', 'ইসাবা' এবং বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে তাঁর উল্লেখ আছে। তবে এই নামে কেউ রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, এরকম জানা যায়নি। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে তাঁর পিতা ও পিতামহের বংশধারা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, তিনি আনসারী এবং সালামা ছিলেন। আকাবার শপথের পর বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই হিসেবে তিনি ছিলেন আকাবী ও বদরী। বদরযুদ্ধে তিনিই হজরত আব্বাসকে বন্দী করেছিলেন। তিনি একজন বেঁটে খাটো গর্দানওয়ালা এবং স্ফীত উদরবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এরকম বীরত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অথচ হজরত আব্বাস রা. ছিলেন দীর্ঘদেহী বীরপুরুষ। এই মর্মে রসুলেপাক স. তাঁকে বলেছিলেন, 'লাকাদ আ'আনাকা আ'লাইহি মালাকুন কারীম' (নিশ্চয়ই এক সম্মানিত ফেরেশতা তোমাকে সাহায্য করেছেন)। বদরযুদ্ধের দিন তিনিই মুশরিকদের হাত থেকে পতাকা ছিনিয়ে এনেছিলেন। সেই পতাকা ছিলো আবু আযীয ইবনে ওমরের কাছে। সিফ্ফীনের যুদ্ধে তিনি হজরত আলীর সহযোগিতায় ছিলেন। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। তিনি ৫৫ হিজরীতে পরলোকগমন করেন। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। 'ইসাবা' গ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। তাতে তাঁর নাম, কুনিয়াত এবং নসবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আবুল ইয়াসার আনসারী ছিলেন। তাঁর নাম কাআব ইবনে ওমর। তিনি

তাঁর কুনিয়াতী নামেই মশহুর ছিলেন। আকাবার শপথের পর বদরে হাজির হয়েছিলেন এবং অন্যান্য গযওয়াতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। বোখারী বলেছেন, তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে হাজির ছিলেন। খাটো গর্দান ও বড় পেটের অধিকারী ছিলেন। তিনি ৫৫ হিজরীতে মদীনায় ইনতেকাল করেন। বদরী সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন উবাদা ইবনে ওলীদ ইবনে উবাদা ইবনে সামেত। তাঁর বর্ণিত হাদিসটি অতি দীর্ঘ, যা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এ সব কথা 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে। 'জামেউল উসুল' কিতাবে তাঁর কুনিয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে, আবুল ইয়াসার কাআব ইবনে আমর আনসারী একজন মশহুর সাহাবী ছিলেন। আর তাঁর নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি আবুল ইয়াসার কাআব ইবনে আমর আনসারী সালমী। আকাবা ও বদরে অংশগ্রহণকারী। তিনি ওই ব্যক্তি, যিনি হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে বন্দী করেছিলেন। মদীনা তাইয়্যেবায় ৫৫ হিজরীতে ইনতেকাল করেন। তিনি ছাড়া আর অন্য কোনো আবুল ইয়াসারের নামের উল্লেখ নেই। আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন। নবীজীবনীলেখকগণ কেনো যে তাঁকে আযাদকৃত গোলাম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বোঝা যায় না।

৫৭. যাকওয়ান রা.। তিনিও রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। 'ইসাবা' ও 'ইস্তিআব' গ্রন্থদ্বয়ে একথা বলা হয়েছে। আতা ইবনুস সায়েরের এই হাদিসটি তিনিও বর্ণনা করেছেন। রসুলেপাক স. বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সদকা আমার এবং আমার আহলে বাইতের জন্য হালাল নয়'। আর কাওমের আযাদকৃত গোলাম তাদের মধ্য থেকেই। কেউ কেউ তাঁর নাম বলেছেন তহমান। আবার কেউ কেউ তাঁর বিষয়ে সন্দেহ করেছেন। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. যে সকল ক্রীতদাসীদের মুক্তি দিয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন–

১. উম্মে রাফে। তিনি ছিলেন রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত গোলাম আবু রাফে'র স্ত্রী। তিনি রসুলেপাক স. এর খাদেমা ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি রসুলেপাক স. এর ফুফু সফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের ক্রীতদাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁকে রসুলেপাক স. এর আযাদকৃত বাঁদীগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। খাদেমাগণের মধ্যে তাঁর আলোচনা করা হয়েছে। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে সালমা উম্মে রাফে নাম এসেছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী সফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের বাঁদী সালমা থেকে উম্মে রাফে সালমাকে যেনো পৃথক করা হয়েছে। শায়েখ 'ইসাবা' গ্রন্থে বলেছেন, আমি 'মজমুআয়ে আদীবা' গ্রন্থে আবু ইয়াকুব জুরমীর লেখা একটি পত্র দেখেছি। তিনি লিখেছেন, ওই মহিলা যিনি হজরত হামযাকে শিকার থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বলেছিলেন, তুমি কি দেখছো না আবু জাহেল মালউন তোমার ভাতিজার সঙ্গে কীরূপ দুর্ব্যবহার করছে? তখন হজরত হামযা রাগান্বিত হয়ে আবু জাহেলের কাছে গিয়ে তার মাথায় তীরের আঘাত করে

তাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছিলেন। তারপর হজরত হামযা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই সালমা হজরত সফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের বাঁদী ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর খেদমতে সারাক্ষণ নিয়োজিত থাকতেন।

২. সাইয়্যেদা মারিয়া কিবতিয়া রা.। তিনি রসুলেপাক স. এর পুত্র হজরত ইব্রাহীমের মাতা। সাইয়্যেদা মারিয়া কিবতীয়ার বোন ছিলেন শিরীন। ইসকান্দারিয়ার বাদশাহ মাকুকাস তাঁদের দু'জনকে পাঠিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. শিরীনকে হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেতের হাতে দিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভ থেকে আবদুর রহমান ইবনে হাসসান ইবনে ছাবেত জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৩. রেজবী রা.। 'ইসাবা' গ্রন্থে এসেছে, রেজবী রসুলেপাক স. এর বাঁদী ছিলেন। আবু মুসা বলেছেন, মুস্তাগফেরী তাঁর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি।

৪. উমায়মা রা.। 'ইসাবা' গ্রন্থে এসেছে, আবু ওমর বলেছেন, একবার তিনি রসুলেপাক স.কে ওজু করাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর পবিত্র হাতে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ করে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আমার বাড়ি যেতে চাই। এ মুহূর্তে আমাকে কিছু নসীহত করুন। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক কোরো না, তোমাকে যদি কেটে টুকরো টুকুরোও করে দেয়া হয়। আল হাদিস।

৫. দুরায়হা রা.। তিনিও রসুলেপাক স. এর দাসী ছিলেন। ইবনে সাআদ এরকম বর্ণনা করেছেন।

৬. সায়েবা রা.। 'ইসাবা' গ্রন্থে এসেছে, সায়েবা রসুলেপাক স. এর দাসী ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. থেকে ইয়াকযা এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। তারেক ইবনে আবদুর রহমান তা স্বীয় গ্রন্থ 'তারিখে নাসায়ী'তে বর্ণনা করেছেন। আরও বর্ণনা করেছেন আবু মুসা তাঁর 'যায়ল' নামক কিতাবে।

৭. উম্মে যুমায়রা রা.। তিনি রসুলেপাক স. এর বাঁদী, আবু যুমায়রার স্ত্রী। আর যুমায়রা ছিলেন তাঁর পুত্র।

রসুলেপাক স. এর দরবারের প্রহরীগণ

'হারাসাত' শব্দের শাব্দিক অর্থ সংরক্ষণ করা, দেখা শোনা করা। 'হারেছ' শব্দের অর্থ পাহারাদার। 'এহতেরাম' এর অর্থ নিজে নিজের নেগাবানী করার জন্য অথবা নিজের নেগাবানী করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করা। যেমন কোনো কোনো সাহাবী এরকম করতেন। তবে সাহাবা কেরামের নেগাবানীর বিষয়টি এমন ছিলো না যে, তাঁরা নেগাবানীর জন্য অন্যকে নিযুক্ত করতেন। বরং সাহাবা কেরামের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিলেন যে, নিজেই একাজে আত্মনিয়োগ করে সৌভাগ্যশালী হওয়ার প্রয়াস চালাতেন। হাদিসবেত্তাগণ এ রকম নেগাবান সাহাবীগণের পরিচিতি সংরক্ষণ

করেছেন। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো সাহাবী সব সময়ই একাজে নিয়োজিত ছিলেন। আর রসুলেপাক স. আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌তায়ালার রীতির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতেন। আল্লাহ্‌তায়ালা যখন 'ওয়াল্লাহু ইয়া'সিমুকা মিনান্নাসি' (আল্লাহতায়ালা আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষের ক্ষতি থেকে) আয়াত নাযিল করলেন, তখন প্রহরী ও পাহারা ব্যবস্থার অবসান ঘটে। রসুলেপাক স.কে হেফাযত করার জন্য যাঁরা পাহারা দেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন–

১. হজরত সাআদ ইবনে মুআয আনসারী রা.। তিনি বনু আশহাল আউস বংশীয় আকাবের সাহাবী ছিলেন। তিনি আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথের মধ্যবর্তী সময় মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হজরত মুসআব ইবনে ওমায়রের হাত ধরে, যাঁকে হিজরতের পূর্বে মদীনার সাহাবীগণকে ধর্ম শিক্ষাদানের জন্য পাঠানো হয়েছিলো। আনসারগণের মধ্য থেকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর কওমের মধ্যে সেবাপ্রাপ্ত নেতা এবং শ্রদ্ধেয়জন ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে সাইয়্যেদুল আনসার উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি বদর ও উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং উহুদযুদ্ধে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন। খন্দকযুদ্ধে তাঁর রগে তীর লেগেছিলো। এক মাস পর ওই জখমেই তাঁর ওফাত হয়। রসুলেপাক স. বলেছেন, সাআদ ইবনে মুআযের জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিলো। হজরত জিবরাইল আ. এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার সাহাবীগণকে এই সুসংবাদ জানিয়ে দিন যে, তাঁকে সাদরে বরণ করার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে। আর তাঁর ওফাতে আল্লাহ্‌র আরশ প্রকম্পিত হয়েছে। বদর যুদ্ধের দিন রসুলেপাক স. এর নেগাবানী (পরিচর্যা) করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত ছিলো। বদর প্রান্তরে রসুলেপাক স. এর বিশ্রামের জন্য কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করা হয়েছিলো। হজরত সাআদ ইবনে মুআয সেই কুঁড়ে ঘর পাহারায় নিয়োজিত থাকতেন।

হজরত আবু বকর সিদ্দীকও বদর যুদ্ধের দিন খাপমুক্ত তরবারী নিয়ে রসুলেপাক স. এর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছেন। একথা লিখেছেন ইবনুস সেমাক তাঁর 'আল মুওয়াফেকাত' নামক পুস্তকে।

২. মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা.। তিনি মদীনার আনসার ও আশহাল কবীলার লোক ছিলেন। তবুকযুদ্ধ ছাড়া বদর ও অন্যান্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তবুকযুদ্ধের সময় রসুলেপাক স. তাঁকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে রেখে গিয়েছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর নাম রাখা হয়েছিলো মোহাম্মদ। তাঁর গায়ের রঙ ছিলো গাঢ়-গন্ধম বর্ণ। দীর্ঘদেহী ও মোটা লোক ছিলেন তিনি। অর্থাৎ ছিলেন কৃষ্ণবর্ণের স্থূলদেহী। ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য রসুলেপাক স. এর

নির্দেশে তিনি নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন। সে কারণে তিনি জামাল ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। 'ইসাবা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আমি ওই ব্যক্তিকে চিনি, যাকে ফেতনায় কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। একথা বলে তিনি মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে বুঝিয়েছিলেন। বাগবী প্রমুখ রাবীগণ একথা বর্ণনা করেছেন। মেশকাত শরীফে আবু দাউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বলেছেন, রসুলেপাক স. আমাকে একটি তরবারী দিয়ে বলেছিলেন, এ তরবারী দিয়ে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, যতো দিন যুদ্ধ চলে। আর যখন উম্মতের এরকম অবস্থা হবে যে, তারা একে অপরের গর্দানে আঘাত করছে, তখন তরবারীটি পাথরের উপর নিক্ষেপ করে ভেঙে ফেলবে এবং তুমি গৃহাভ্যন্তরে বসে থাকবে। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ফেতনার যমানায় যারা ঘরে বসে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা ও উসামা ইবনে যায়েদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার দশ পুত্র এবং দুই কন্যা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই রসুলেপাক স. এর হিজরতের পূর্বে হজরত মুসআব ইবনে ওমায়েরের হাতে প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। মেশকাত শরীফে হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা থেকে নাসায়ী বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. যখন নফল নামাজের জন্য দাঁড়াতেন, তখন বলতেন– 'আল্লাহু আকবার ইন্নি ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্‌লাজী ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন' (আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি, যিনি আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি)(৬ঃ৭৯)। তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো ৪৬ বা ৪৭ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৭ বছর। মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা উহুদ যুদ্ধের দিন রসুলেপাক স.কে পাহারা দিয়ে রেখেছিলেন।

৩. যাকওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়স রা.। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে তাঁর উল্লেখ করা হয়নি। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা ও যাকওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়স উহুদ যুদ্ধের সময় রসুলেপাক স.কে পাহারা দিতেন। উহুদযুদ্ধের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেদিন চৌদ্দজন সাহাবী রসুলেপাক স. এর কাছে ছিলেন– সাতজন মুহাজির এবং সাতজন আনসার। ওই দু'দলের বর্ণনা দেয়ার পর শেষে বলা হয়েছে, নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ওই চৌদ্দজনের মধ্যে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাও ছিলেন। কিন্তু যাকওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়সের উল্লেখ সেখানে একেবারেই নেই। 'ইস্তিআব' ও 'ইসাবা' গ্রন্থদ্বয়ে নাম বলা হয়েছে যাকওয়ান ইবনে কায়স। যাকওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়স বলা হয়নি।

হজরত যাকওয়ান ছিলেন উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের অন্যতম। 'ইসাবা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. যখন উহুদযুদ্ধের জন্য বের হন, তখন বলেছিলেন– কেউ যদি এমন ব্যক্তিকে দেখতে চায়, আগামী কাল যার পা বেহেশতের সবুজ ঘাস দলিত করবে, সে যেনো এই লোকটিকে দেখে। রসুলেপাক স. একথা দ্বারা হজরত যাকওয়ানের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলা হয়েছে হজরত যাকওয়ান আকাবার প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় শপথেই হাজির ছিলেন। তারপর তিনি মদীনা থেকে মক্কায় রসুলেপাক স. এর কাছে এসে তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। সে কারণে তাঁকে আনসার ও মুহাজির উভয় পরিচয়েই উল্লেখ করা হয়। তিনি বদরযুদ্ধে হাজির ছিলেন। উহুদযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ওই দুই কিতাবের কোনোটিতে রসুলেপাক স.কে পাহারা দিয়েছিলেন, একথা উল্লেখ করা হয়নি। তবে হতে পারে যাকওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কায়স যিনি রসুলেপাক স.কে পাহারা দিয়েছিলেন, তিনি অন্য কেউ হবেন। কিন্তু তাঁর আলোচনা পাওয়া যায় না। ওয়াল্লহু আ'লাম।

৪. হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.। তাঁর বংশপরম্পরা এরকম– যুবায়ের আওয়ামের পুত্র, তিনি খোওয়ায়লেদের পুত্র, তিনি আসাদের পুত্র, তিনি আবদুল উয্যার পুত্র, তিনি কুসাইয়ের পুত্র, তিনি কেলাব আসাদীর পুত্র। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশীয়। তাঁর নসব রসুলেপাক স. এর নসবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে কুসাইয়ের মাধ্যমে। রসুলেপাক স. এর ফুফু সফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন হজরত যুবায়েরের মাতা। উম্মুল মুমিনীন সাইয়্যেদা খাদীজা বিনতে খোওয়ায়লেদ ছিলেন তাঁর ফুফু। আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি ষোল বছর বয়সে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন পঁচিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে বারো বছর ও আট বছরের কথাও বলা হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর চাচা তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিলো। ধর্মত্যাগ করানোর জন্য তাঁকে চাটাইয়ের উপর ফেলে রেখে ধোঁয়া দিয়ে কষ্ট দেওয়া হতো। কিন্তু তিনি সুদৃঢ় হস্তে ইসলামের অঞ্চল ধরে রাখেন এবং পরে হাবশায় হিজরত করেন। বদর ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। উহুদযুদ্ধে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। খন্দকযুদ্ধে তিনি রসুলেপাক স. এর নেগাবানী (পরিচর্যা) করেছেন। তিনি ওই দশজন সাহাবীর অন্তর্গত, যাঁদের জন্য রসুলেপাক স. বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি ওই ছয় ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন, যাঁদের উপর হজরত ওমর ফারুক খেলাফত পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। তিনি দীর্ঘদেহী, হালকা পাতলা শরীরবিশিষ্ট এবং গন্দম বর্ণের ছিলেন। তাঁর মাথার চুল এতো লম্বা ছিলো যে, তিনি যখন কোথাও আরোহণ করতেন, তখন তাঁর কেশরাশি ভূমি পর্যন্ত ঝুলে যেতো। তাঁর এক হাজার গোলাম

ছিলো, যারা প্রত্যেকেই ধার্যকৃত উপার্জন এনে তাঁর কাছে জমা দিতো। তা থেকে তিনি কিছুই ঘরে নিতেন না, সবই সদকা করে দিতেন। লোকেরা তাঁকে রসুলেপাক স. এর হাদিস কম বর্ণনা করার কারণ জিজ্ঞেস করতো। তিনি বলতেন, রসুলেপাক স. এর সঙ্গে আমার কীরূপ নৈকট্য ছিলো, তা তো আমার জানাই আছে। কিন্তু আমি রসুলেপাক স.কে বলতে শুনেছি, যে আমার উপর মিথ্যা বলবে, সে যেনো জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়। সে আশংকায়ই আমি হাদিস বর্ণনা করি না। না জানি আমি মিথ্যায় জড়িয়ে যাই। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্র রাস্তায় তরবারী উত্তোলন করেছেন। এভাবে হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস প্রথম ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করেছেন।

হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের ফযিলত ও মর্যাদা অনেক। রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (খাস সাহায্যকারী) থাকে। আমার উম্মতের মধ্য থেকে আমার হাওয়ারী হচ্ছে যুবায়ের। এক বর্ণনায় এসেছে রসুলেপাক স. হজরত যুবায়ের ও হজরত তালহাকে বলেছিলেন, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী থাকে। আর তোমরা দু'জন আমার হাওয়ারী। মহব্বতকারী ও খাঁটি ব্যক্তিকে হাওয়ারী বলা হয়। যেমন হজরত ঈসার হাওয়ারী ছিলেন। আরও বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. হজরত যুবায়েরকে বলেছিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! জিবরাইল তোমার কাছে সালাম পেশ করে বলেছেন, আমি কিয়ামতের দিন তোমার সঙ্গে থাকবো তোমা থেকে জাহান্নামের স্ফুলিঙ্গ দূর করার জন্য। এ কথার দ্বারা তাঁর দোযখে প্রবেশ না করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এটি বেহেশতে প্রবেশের সুসংবাদও। তিনি ৩৬ হিজরীতে ৬৪ বছর বয়সে জামালযুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন। 'ওয়াদীয়ে সেবা'তে তাঁকে দাফন করা হয় এবং পরে বসরায় স্থানান্তরিত করা হয়।

হজরত যুবায়েরের শাহাদতের ঘটনা নবীজীবনীবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন এভাবে– জামাল যুদ্ধের সূত্রপাত হলো। হজরত আলী মুর্তযা আওয়াজ দিলেন, যুবায়ের আমার কাছে যেনো চলে আসে। হজরত আলীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি তাঁর কাছে এলেন। হজরত আলী বললেন, হে যুবায়ের! আমি তোমাকে আল্লাহ্তায়ালার কসম দিয়ে বলছি, তুমি এবং আমি দু'জনে একদা ছাকীফায়ে বনী ফুলানের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলাম। তখন রসুলেপাক স. আমাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে যুবায়ের! তুমি আলী মুর্তযাকে ভালোবাসো? তুমি বলেছিলে, আলীকে ভালো না বাসার কোনো কারণ তো নেই। তিনি তো আমার মামা। আমার ফুফাতো ভাই এবং আমার ধর্মের উপর আছেন। রসুলেপাক স. আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আলী! তুমি কি যুবায়েরকে ভালোবাসো? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তাকে কেনো মহব্বত করবো না, যেহেতু সে আমার ফুফাতো ভাই এবং সে আমার দ্বীনের উপর আছে।

তখন রসুলেপাক স. বললেন, এমতাবস্থায় তোমরা যদি (একে অপরের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করো তাহলে তোমাদের যুদ্ধ হবে অযথা। একথা শুনে হজরত যুবায়ের হজরত আলীকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসুলেপাক স. এরকম বলেছিলেন। কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। এই সময় তিনি এরকমও বলেছিলেন, এখন আমার মনে পড়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। একথা বলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে চললেন। তাঁর পুত্র হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, কী হলো? আপনি ফিরে যাচ্ছেন কেনো? তিনি বললেন, আলী আমাকে ওই হাদিস শুনিয়েছেন, যা তিনি রসুলেপাক স. এর কাছ থেকে শুনেছেন। সুতরাং আমি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, আপনি এখন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসেননি, বরং আপনি এসেছেন মানুষকে সংশোধন করার জন্য। আল্লাহ্‌তায়ালা এ বিষয়ে সংশোধন করে দিবেন। হজরত যুবায়ের বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর সঙ্গে কসম করেছি, আমি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। একথা লোকদের মাঝে ছড়িয়ে গেলো। হজরত যুবায়ের স্বীয় অশ্বে আরোহণ করে ময়দান থেকে ফিরে চললেন। হজরত কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, জামালযুদ্ধ থেকে হজরত যুবায়ের যখন ফিরে চললেন এবং এই সংবাদ যখন হজরত আলীর কাছে পৌঁছে গেলো তখন তিনি বললেন, ইবনে সফিয়া যদি জানতো যে, সে হকের উপর আছে, তাহলে কক্ষণও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতো না। হজরত যুবায়ের এক স্থানে পৌঁছে সেখানে নামাজে রত হলেন। এমন সময় হজরত আলীর বাহিনীর জরমুয নামের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে পৌঁছলো এবং নামাজে রত থাকা অবস্থায়ই সে তাঁর মস্তক কেটে ফেললো। তারপর সে হজরত আলীর কাছে এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে বললেন, আমি রসুলেপাক স.কে বলতে শুনেছি, যুবায়েরের হত্যাকারী হবে জাহান্নামী। এক বর্ণনায় এসেছে, জরমুয বললো, আপনি যুবায়েরের হত্যার সুসংবাদ গ্রহণ করুন। হজরত আলী বললেন, তুমিও দোযখে যাওয়ার সুসংবাদ গ্রহণ করো। তিনি আরও বললেন, তুমি ইবনে সফিয়াকে হত্যার আনন্দে মেতোছো? অথচ তুমি তোমার ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো জাহান্নামে। আমি রসুলেপাক স.কে বলতে শুনেছি, সকল নবীরই কোনো না কোনো হাওয়ারী থাকে, আর আমার হাওয়ারী হচ্ছে যুবায়ের। এক বর্ণনায় এসেছে, জরমুয যখন হজরত যুবায়েরকে শহীদ করে হজরত আলীর কাছে এলো, তখন তার কাছে হজরত যুবায়েরের তলোয়ার ছিলো। ওই তলোয়ারের উপর যখন হজরত আলীর দৃষ্টি পতিত হলো, তখন তিনি বললেন, হুঁশিয়ার হয়ে যাও। আল্লাহ্‌র কসম! এই তলোয়ারের মালিক এই তলোয়ারের মাধ্যমে রসুলেপাক স. এর সামনে থেকে অনেক বিপদাপদ প্রতিহত করেছে। এক বর্ণনায় এসেছে, এই তলোয়ার রসুলেপাক স. এর সামনে থেকে অনেক বাধাবিপত্তি দূর করেছে। আর

এক বর্ণনায় এসেছে, জরমুযের পুত্র তখন হজরত আলীর কাছে এসে ইঙ্গিতে বললো, এ ধরনের ফেতনাগ্রস্ত লোকদের সাথে এরকম আচরণই করা হয়ে থাকে। হজরত আলী বললেন, তোমার মুখে ছাই পড়ুক। আমি আশা রাখি, আমি, তালহা ও যুবায়ের আমরা ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন– 'আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা তুলে নিয়েছি। তারা ভাই ভাই হিসেবে (বেহেশতের মধ্যে) খাটের উপর সামনাসামনি অবস্থান করবে।'

৫. হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.। সাআদ ইবনে মালেক রা.। সাআদ মালেকের পুত্র। মালেক মূল নাম, আর তাঁর কুনিয়াতী নাম আবু ওয়াক্কাস। হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস আশারা মুবাশ্শারার অন্যতম সাহাবী ছিলেন। দশজনের মধ্যে তিনি সর্বশেষে ইনতেকাল করেন। 'মজলিশে সুরা'র ছয় সদস্যের মধ্যে তিনিও ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে আকাবের সাহাবাগণের এক বিরাট জামাত হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন– হজরত আয়েশা সিদ্দীকা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, জাবের ইবনে সামুরা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। আকাবের তাবেয়ীর মধ্য থেকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, আবু ওছমান নাহদী, আলকামা ও আহনাফ। তাঁদের ছাড়াও অনেকেই এবং তাঁর সন্তানগণ– ইব্রাহীম, আমের, মুসআব এবং মোহাম্মদ প্রমুখ বর্ণনাকারীগণও হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ওই মহাসম্মানিত সাহাবী, যিনি আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদে প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। যারা ইরাক জয় করেছিলেন তিনি তাঁদের আমীর ছিলেন। হজরত ওমর ফারুকের পক্ষ থেকে তিনি কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি কুফা নগরী নির্মাণ করেছিলেন। কুফা একটি ইসলামী শহর, যার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিলো হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতের সময়। তারপর তাঁকে অপসারণ করে হজরত ওছমানকে কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। হজরত সাআদ 'মুসতাজাবুদ্দাওয়াত' (যার দোয়া গৃহীত হয়) হিসেবে মশহুর ছিলেন। তাঁর জন্য রসুলেপাক স. দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ্! সাআদ যখন তোমার কাছে দোয়া করবে, তখন তুমি তার দোয়া কবুল কোরো। সহীহ্ বোখারীতে এসেছে, তিনি বলেছেন, আমি সাত দিন পর্যন্ত নীরব ছিলাম এমতাবস্থায় যে, আমি ইসলামে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম। আর আমি হজরত সিদ্দীক আকবরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিলো ১৭ বা ১৯ বছর। তিনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর হাতে মাদায়েন ও অন্যান্য আজমী দেশসমূহ বিজিত হয়েছিলো। পারস্যের শাহানশাহীর বুনিয়াদ তিনি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তিরমিযী হজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত সাআদ রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হলে তিনি স. বললেন, সাআদ আমার মামা। কে আছে এমন, যে আমার

মামাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে? রসুলেপাক স. তাঁকে মামা বলেছিলেন এই হিসেবে যে, তিনি আবদে মানাফের আওলাদের মধ্য থেকে যোহরার ফরজন্দ ছিলেন। রসুলেপাক স. এর মাতা আমেনাও আবদে মানাফের আওলাদ। সে হিসেবে যোহরার আওলাদ রসুলেপাক স. এর ভাই।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, মক্কায় সাহাবা কেরাম লুকিয়ে লুকিয়ে নামাজ আদায় করতেন। একবার হজরত সাআদ মক্কা মুকাররমার কোনো এক বিশেষ জায়গায় সাহাবা কেরামের এক জামাত নিয়ে নামাজ আদায় করছিলেন। এই দৃশ্য দেখে মুশরিকেরা ঘৃণা প্রকাশ করলো এবং মুসলমানদেরকে দোষারোপ করতে লাগলো। এক পর্যায়ে মারামারি হওয়ার উপক্রম হয়ে গেলো। মুশরিকেরা উটের চোয়ালের হাড় হজরত সাআদের দিকে নিক্ষেপ করলো। তাঁর মাথা ফেটে গেলো। তাঁর মাধ্যমেই ইসলামে প্রথম রক্তপাত ঘটানো হয়েছিলো।

হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রসুলেপাক স. এর নেগাবানী করেছেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, একরাত্রে রসুলেপাক স. জাগ্রত ছিলেন। তাঁর ঘুম আসছিলো না। তিনি স. বললেন, আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে কোনো নেককার ব্যক্তি যদি আমার পাহারাদারী করতো। হঠাৎ করে তিনি হাতিয়ারের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, কে? হজরত সাআদ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি সাআদ। একথা বলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাহারা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। রসুলেপাক স. তাঁর জন্য দোয়া করলেন। ফলে তিনি ইসলামে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন ফেতনা থেকে দূরে ছিলেন। ফেতনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। একবার হাশেম ইবনে উতবা তাঁকে বললো, তুমি তো আমীর মুয়াবিয়ার মামা। তোমার মাতার দিক দিয়ে তার সাথে তোমার ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য আছে। তাঁর কাছে এক লাখ তলোয়ারও আছে। তিনি একথাও জানেন যে, এ বিষয়ে তোমারও হক আছে। হজরত সাআদ বললেন, আমি এমন তলোয়ার চাই, যা মুসলমানের উপর উত্তোলন করলে অকার্যকর হয়ে যায়। আর কাফেরের উপর উত্তোলন করলে কার্যকর হয়।

হজরত সাআদ হ্রস্ব অবয়ববিশিষ্ট ছিলেন। গাত্রবর্ণ ছিলো গন্দম। তিনি মদীনা থেকে দশ মাইল দূরে আকীক নামক স্থানে নিজ বাড়িতে ইনতেকাল করেন। লোকেরা তাঁর খাটিয়া কাঁধে করে বহন করে মদীনায় নিয়ে আসেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। ৫৫ বা ৫৮ হিজরীতে তাঁর ইনতেকাল হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো সত্তুর বছরের অধিক। কেউ কেউ বলেছেন, বিরাশি বছর। তিনি নবী করীম স. এর চেয়ে বিশ বছরের ছোটো ছিলেন– এই হিসাব অনুসারে তাঁর বয়স হয় অষ্টাশি বছর। এমনকি একানব্বই বছরও হয়। ওয়াল্লহু আ'লাম।

৬. আববাদ ইবনে বিশর রা.। তিনি আনসার আশহাল গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি হজরত মুসআব ইবনে ওমায়রের হাতে হজরত সাআদ ইবনে মুআযের পূর্বে

ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদর, উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রসুলেপাক স. এর অনেক খেদমত করেছেন তিনি। খন্দকযুদ্ধের সময় তিনি রসুলেপাক স.কে পাহারা দেয়ার কাজ করেছিলেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে বলা হয়েছে, হজরত আব্বাদ ইবনে বিশর পাহারাদারীর কাজ করতেন। 'ওয়াল্লহু ইয়া'সিমুকা মিনান্নাসি' এ আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি পাহারা দেয়ার কাজ ছেড়ে দেন। তিনি একজন মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে এসেছে, রসুলেপাক স. হজরত আববাদ ইবনে বিশরের আওয়াজ শুনে বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি আববাদের উপর রহম করো। তাঁর দ্বীন পালনের বিষয়ে অনেক বর্ণনা রয়েছে। কাআব ইবনে আশরাফ ইহুদীকে যাঁরা কতল করেছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন ছিলেন। তিনি দু'জন সাহাবীর মধ্যে একজন ছিলেন, যাঁদের হাতের লাঠি থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো। তিনি অন্ধকার রাতে যখন রসুলেপাক স. এর দরবার থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তাঁর হাতের লাঠি থেকে আলো বের হতো এবং তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো। তাঁর কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন হজরত আনাস ইবনে মালেক ও হজরত আবদুর রহমান ইবনে ছাবেত। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৫৫ বছর।

৭. হজরত আবু আইয়্যুব আনসারী রা.। তাঁর মূল নাম খালেদ ইবনে যায়েদ। তিনি ছিলেন বনী নাজ্জার কবীলার লোক। তিনি আকাবা, বদর, উহুদ, খন্দক ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। রোম দেশের কুস্তুন্তুনিয়ায় (কনস্টান্টিনোপলে) ৫০ বা ৫১ হিজরীতে হজরত আমীর মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে এযীদের পতাকাতলে তিনি ইনতেকাল করেন। নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, হজরত আবু আইয়্যুব আনসারীর দাফনের কাজে নিয়োজিত মুসলমানদেরকে রোমকরা বললো, এই লোকটির খুবই উচ্চ মর্যাদা ছিলো। মুসলমানগণ বললেন, তিনি আমাদের নবীর আকাবের সাহাবী ছিলেন। তিনি আমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আমরা তাঁকে এই স্থানে দাফন করলাম। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছো। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি তাঁর কবর শরীফের অমর্যাদা করো, তাহলে জেনে রেখো, যতো দিন আমাদের রাজত্ব টিকে থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত তোমরা তোমাদের শঙ্খ বাজাতে পারবে না। এরই মর্মার্থ প্রকাশ করে মুজাহিদ এমন একটি বর্ণনা দিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে, রোমকরা আবু আইয়্যুব আনসারীর কবর শরীফের অসম্মান করতে চেয়েছিলো। যখনই তারা কবর উপড়ে ফেলার ইচ্ছা করতো, তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতো মুষলধারায়। তারা আর অগ্রসর হতে পারতো না। ইবনে কাসেম মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমার জানা আছে, রোমদেশে যখনই অনাবৃষ্টি হতো, তখন রোমকরা তাঁর কবর শরীফের পাশে বসে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতো। তাঁর কবর জিয়ারত করতো এবং বরকত হাসিল করতো। শু'বা

বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু আইয়্যুব আনসারী সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হজরত আলীর সাথে শরীক ছিলেন। নাহরওয়ানের যুদ্ধে তাঁকে অগ্রবর্তী বাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। মোহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমার জানা আছে যে, আবু আইয়্যুব আনসারী বদরযুদ্ধে রসুলেপাক স.এর সঙ্গে ছিলেন। অন্য কোনো যুদ্ধ থেকেও কখনও পিছপা হননি তিনি। অবশেষে রোমের মাটিতে তিনি ইনতেকাল করেন। হজরত আমীর মুয়াবিয়া যখন এযীদকে কুস্তুন্তুনিয়া বাহিনীর আমীর বানিয়েছিলেন, তখন আবু আইয়্যুব আনসারী তাঁকে বলেছিলেন, আমাদের কী হলো? এক যুবককে আমাদের আমীর বানানো হলো। উত্তরে হজরত মুয়াবিয়া বলেছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন– ইনফিরূ খিফাফাওঁ ওয়া ছিক্বালান' (অভিযানে বাহির হইয়া পড়, হাল্‌কা অবস্থায় হোক অথবা ভারী অবস্থায়) (৯ঃ৪১)। এই যুদ্ধে হজরত আবু আইয়্যুব আনসারী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এযীদ ইবনে মুয়াবিয়া তাঁকে দেখতে এলো। বললো, আমার জন্য ওসিয়ত করুন। হজরত আবু আইয়্যুব আনসারী বললেন, আমি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবো, তখন আমাকে কাফন দিয়ে লোকদেরকে হুকুম দিয়ো, তারা যেনো দুশমনদের যমীন থেকে আমাকে নিয়ে যায়। তারপর যেখানে সক্ষম হয়, আমাকে যেনো সেখানে দাফন করে। এযীদ সেই ওসিয়ত মোতাবেকই আমল করেছিলো। বর্ণিত আছে, তখন এযীদ লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলো, তোমরা আসা যাওয়ার মধ্যে ঘোড়া দৌড়াতে থাকো, যাতে তাঁর কবরের চিহ্ন অনুমান করা না যায়। এটি মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন। এযীদ একাজটি করার নির্দেশ দিয়েছিলো সম্ভবতঃ একারণে যে, শত্রুরা যেনো তার কবরের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করতে না পারে। কবরকে উন্মুক্ত না করতে পারে। অথবা একাজটি তার অন্যতম একটি অপকর্ম ছিলো। সে হয়তো পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এসেছিলো। এটি ইবনে আবদুল বার 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

হজরত আবু আইয়ূ্যব আনসারীর ফযিলত ও মর্যাদা অনেক। রসুলেপাক স. হিজরতের পর মসজিদে নববী নির্মাণ করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর বাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন– ঘটনাটি সর্বজনবিদিত। তিনি রসুলেপাক স. এবং উবাই ইবনে কাআব থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন বারা ইবনে আযেব, আনাস ইবনে আব্বাস, জাবের ইবনে সামুরা এবং আরও অনেকে। হজরত আলী মুর্তযা ইরাক গমনকালে তাঁকেই মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন।

হজরত আবু আইয়্যুব আনসারী রসুলেপাক স.কে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিলেন খয়বর যুদ্ধের সময় রসুলেপাক স. ও উম্মুল মুমিনীন হজরত সফিয়ার বাসর যাপন কালে। তখন ইহুদীদের দুষ্কৃতির আশংকা ছিলো খুব বেশী।

৮. হজরত বেলাল হাবশী রা.। তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারের একজন নৈকট্যভাজন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ওয়াদিয়ে কুরা নামক স্থানে রসুলেপাক স. এর নেগাবানীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর বিস্তারিত বর্ণনা মুয়াজ্জিনগণের বর্ণনায় পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

৯. হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা.। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে বলা হয়েছে, হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা হুদায়বিয়ার সন্ধি দিবসে রসুলেপাক স.কে পাহারা দেওয়ার জন্য খোলা তরবারী নিয়ে তাঁর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখকবৃন্দ

প্রকাশ থাকে যে, রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখক ছিলেন বেশ কয়েকজন এবং তাঁদের দায়িত্বও ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। কেউ কেউ ওহী লেখার কাজ করতেন। কেউ বাদশাহ ও আমীর ওমরাদের নামে চিঠি লিখতেন। কেউ জাকাত ও সদকার মালের হিসাব লেখার কাজ করতেন। আবার কেউ নাগরিকতার বিষয়, লেনদেন ও শর্ত-শারায়েত– এ সব বিষয়ে লেখালেখির দায়িত্ব পালন করতেন। যেহেতু রসুলেপাক স. লেখালেখির কর্ম থেকে পবিত্র ছিলেন, তাছাড়া অধিকাংশ আরবদের স্বভাব ছিলো এ বিদ্যা থেকে মুক্ত থাকা, সুতরাং স্বভাবতঃই যে সকল সাহাবী লেখার কাজে উপযুক্ত ছিলেন, তাঁদেরকে এ কাজে নিয়োজিত করা হতো।

'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে বলা হয়েছে, লেখকদের নিয়োগ করা হয়েছিলো এভাবে– হজরত ওছমান ইবনে আফ্ফান এবং হজরত আলী ইবনে আবু তালেব ওহী লেখার কাজ করতেন। এই দু'জন অনুপস্থিত থাকলে লেখার কাজ করতেন হজরত উবাই ইবনে কাআব এবং যায়েদ ইবনে ছাবেত। এই চার জন সাহাবীর মধ্য থেকে কেউ যদি কখনও অনুপস্থিত থাকতেন, তাহলে রসুলেপাক স. এর কাতেবে ওহী সাহাবীগণের মধ্য থেকে অন্য কাউকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিতেন। প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত ধারাবাহিকতা অনুসারেই কাজ করা হতো। বরং হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত এবং হজরত উবাই ইবনে কাআব ওহী লেখার জন্যই নির্ধারিত ছিলেন। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে লেখকগণের সংখ্যা চল্লিশজন ছিলো বলে বলা হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদার চারজনকে তাঁদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। তাঁদের ফযিলত ও মর্যাদার কথা সর্বজনবিদিত। তৎসত্ত্বেও পৃথক পৃথক নামে তাঁদের জীবনের কিছু তথ্য যেমন ওফাতের তারিখ এবং খেলাফতের সময়কাল এ সব বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

১. হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা.

লেখক সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীক। জাহেলী যুগে তাঁর নাম ছিলো আবদুল কাবা। কেউ কেউ বলেছেন, আবদু রব্বিল কাবা। রসুলেপাক স. তাঁর নাম রেখেছিলেন আবদুল্লাহ। এক বর্ণনামতে তাঁর নাম রেখেছিলেন আতিক। আতিক মানে আযাদ (মুক্ত)। রসুলেপাক স. তাঁর নাম আতিক রেখেছিলেন এ জন্য যে, তিনি দোযখের আগুন থেকে আযাদ হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর মায়ের কোনো সন্তান জীবিত থাকতো না। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁকে তাঁর মা কেবলার দিকে করে দাঁড় করিয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে মৃত্যু থেকে রেহাই দাও এবং তাকে আমার জন্য দান করো। কেউ কেউ বলেছেন, আবদুল্লাহও তাঁর পুরাতন নাম ছিলো। তবে সঠিক ও বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, তাঁর এই নাম ও লকব উভয়টিই ইসলামী যুগের। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, কেউ যদি দোযখের আগুন থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত কাউকে দেখতে চায়, তাহলে সে যেনো আবু বকরের দিকে তাকায়। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম আতিক এ জন্য হয়েছিলো যে, তাঁর নসবে এমন কোনো কিছু ছিলো না, যার দরুন নসবকে দোষযুক্ত করা যায়। প্রথম থেকেই তিনি কল্যাণের উপর ছিলেন। সমস্ত উম্মত তাঁর 'সিদ্দীক' নামের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছে। কারণ, রসুলেপাক স.কে বিশ্বাস করার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। সর্বাবস্থায় তিনি রসুলেপাক স.কে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন। দারা কুতনী ও হাকেম আবু ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হজরত আলী মুর্তযা মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে কতোবার যে বলেছেন, তা গণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর পক্ষে নবীর যবানীতে আবু বকরের নাম সিদ্দীক বলেছেন। হজরত আবু বকরের জন্ম হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর জন্মের দুই বৎসর কয়েক মাস পর। তাঁর খেলাফতের সময়সীমাও তাই ছিলো, যা রসুলেপাক স. এর ওফাতের পর আবু বকর সিদ্দীক পুরো করেছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বৎসর। তাঁর ফযিলত ও মর্যাদা অসংখ্য।

২. হজরত ওমর ফারুক রা.

দ্বিতীয় লেখক ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদার দ্বিতীয় খলীফা হজরত ওমর ফারুক। আমুল ফীলের তেরো বৎসর পর মহররম মাসের চাঁদ রাতে তাঁর জন্ম হয়েছিলো। তিনি কুরাইশ বংশের সম্মানিত জনদের অন্যতম ছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগে তাঁর দায়িত্ব ছিলো দূতের কাজ করা। কুরাইশ বংশের মধ্যে যখন কোনো গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হতো, তখন তাঁকে দূত বানিয়ে পাঠানো হতো। তিনি দীর্ঘদেহী লোকদের মধ্যেও তুলনামূলকভাবে অধিক দীর্ঘ ছিলেন। দেখলে

মনে হতো যেনো তিনি কোনো কিছুর উপর ছওয়ার হয়ে যাচ্ছেন, আর অন্যান্যরা যাচ্ছে পদব্রজে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বর্ণনা করেছেন, তাঁর গুণাবলীর কথা তৌরাত কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে– ক্বারনুন জাদীদুন শাদীদুন আমীনুন ওয়াল ক্বারনুল জাবালুস সাগীরু ওয়া সুম্মিয়াল ফারুক্বু বিফুর্‌ক্বাতিন বাইনাল হাক্বি ওয়াল বাতীল (তিনি নতুন শক্ত নিরাপদ কারনতুল্য। আর 'ক্বারনুন জাবালুস সাগীর' মানে হচ্ছে ছোটো পাহাড়। তাঁর নাম রাখা হবে ফারুক– হক ও বাতেলের মধ্যে পার্থক্য করার কারণে। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন জিবরাইল আ. এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আকাশবাসীরা ওমরের ইসলাম গ্রহণে আনন্দ উল্লাস করছে। তখন রসুলেপাক স. এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলো– 'ইয়া আয়্যুহান নাবিয়্যু হাসবুকাল্লহু ওয়া মানিত্‌তাবা'আকা মিনাল মু'মিনীন' (হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট)(৮ঃ৬৪)। তাঁর খেলাফতকালে ১০৩৬টি শহর, তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও গ্রাম সহকারে বিজিত হয়। নির্মিত হয় ৪০০০ মসজিদ। ধ্বংস করা হয় ৪০০০ মূর্তিপূজক ও অগ্নিউপাসকদের উপাসনালয়। ১৯০০ মিম্বর জামে মসজিদসমূহে স্থাপন করা হয়। তাঁর ফযিলত ও মর্যাদার বিবরণ রয়েছে হাদিস শরীফে। তাঁর ফযিলত সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে এই – 'ইন্নাল্লাহা জা'আলাল হাক্বক্বা আলা লিসানি উমারা' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা ওমরের জবানে হক রেখেছেন)। বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী যারা ছিলেন (আম্বিয়া কেরাম) তাঁদের পক্ষ থেকে বর্ণনাকারী ছিলো। আমার উম্মতের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে একজন আছে। আর সে হচ্ছে ওমর। তাঁর সম্পর্কে হজরত আলী বলেছেন, 'কুন্না আসহাবু মুহাম্মাদিন লা নাশুক্কা আন্নাস সাকীনাতা ইয়ানতিক্বু আলা লিসানু উমারা' (আমরা রসুলুল্লাহ্‌র সাহাবীগণ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করতাম না যে, সাকীনা বা শান্তিধারা ওমরের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়)। তাঁর ফযিলতের কথা এতো বেশী বর্ণিত হয়েছে যে, তা গণনা করা যায় না।

তাঁর খেলাফতকাল ছিলো দশ বছর ছয়মাস। তাঁর ওফাত হয়েছিলো হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। হজরত ওমর ফারুক দোয়া করতেন– হে আল্লাহ্! তোমার পথে আমার শাহাদত নসীব করো আর তোমার রসুলের শহরে আমার মৃত্যু নির্ধারণ করো। হজরত কা'ব আহবার বলতেন, তৌরাত কিতাবে তাঁকে আমি শহীদ হিসেবে পেয়েছি।

৩. হজরত ওছমান যুন্‌নুরাইন রা.

খোলাফায়ে রাশেদার তৃতীয় খলীফা ও লেখক ছিলেন হজরত ওছমান যুন্‌নুরাইন। তাঁর জন্ম হয়েছিলো আমুল ফীলের ষষ্ঠ বৎসরে। তিনি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন। রসুলেপাক স. এর দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চতুর্থ মুসলমান ছিলেন। সর্বপ্রথম ইসলাম

গ্রহণ করেছিলেন পর্যায়ক্রমে হজরত আবু বকর সিদ্দীক, হজরত আলী মুর্তযা ও হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা। হজরত ওছমান হজরত আবু বকর সিদ্দীকের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন হাকাম ইবনুল আস তাঁকে ধরে বেঁধে ফেলে এবং সাংঘাতিক কষ্ট দেয়। দ্বীনের উপর তাঁর দৃঢ়তা দেখে অবশেষে সে তাঁকে ছেড়ে দেয়। ইবনে আসাকের হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, আমাকে একবার ওছমানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো। আমি বললাম, তিনি এমন ব্যক্তি, উর্ধ্বজগতে যাঁকে যুন্নুরাইন (দু'টি নূরের অধিকারী) বলে ডাকা হয়। ইবনে আসাকের হজরত আলী থেকে আরও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্কে হজরত ওছমান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, আমার যদি চল্লিশটি কন্যা থাকতো, তাহলে আমি পর পর তাদেরকে ওছমানের হাতে দিতাম। রসুলেপাক স. যখন তাঁর কন্যা উম্মে কুলছুমকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিলেন, তখন বললেন, তোমার স্বামী তোমার উর্ধ্বতন দাদা নবী ইব্রাহীম এবং তোমার সম্মানিত পিতা মোহাম্মদের সাথে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ। রসুলেপাক স. হজরত উসামাকে বলেছিলেন, তুমি কি এই দম্পতির চেয়ে উত্তম কোনো দম্পতিকে দেখেছো? তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তাদের চেয়ে উত্তম কোনো দম্পতি আমি দেখিনি।

হজরত ওছমান যুন্নুরাইনের শানে বহু হাদিস বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী মশহুর হাদিস হচ্ছে হায়া (লজ্জা) সম্পর্কিত হাদিস। ইবনে আসাকের হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রসুলেপাক স.কে বলতে শুনেছি একবার তিনি হজরত ওছমান সম্পর্কে বললেন, আমার নিকট আল্লাহ্র ফেরেশতাবৃন্দের মধ্য থেকে একজন ফেরেশতা এসেছিলো। সে বলছিলো, সে শহীদ হবে। তাকে হত্যা করবে তার কওমের লোক। আমি তার নাম বলতে লজ্জা পাচ্ছি। এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী। হাকেম এই হাদিসটিকে সহীহ্ বলেছেন। ইবনে মাজা মুররা ইবনে কাআব থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. একবার এক ফেতনার কথা উল্লেখ করলেন। আরও বললেন, ওই ফেতনা খুবই নিকটবর্তী। এমন সময় এক ব্যক্তি মাথায় চাদর পেঁচিয়ে সে স্থান অতিক্রম করছিলেন। রসুলেপাক স. বললেন, এই ব্যক্তি সে দিন হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আমি তাঁকে দেখার জন্য দাঁড়ালাম। দেখলাম, তিনি ওছমান ইবনে আফ্ফান। তাঁর হত্যার ঘটনাটি সর্বজনবিদিত। সেটি ছিলো ইসলাম ধর্মে সৃষ্ট সর্বপ্রথম ফেতনা। হজরত ওছমান যুন্নুরাইনের খেলাফতকাল ছিলো বারো বৎসর। তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো ৩৫ হিরজীতে আইয়ামে তাশরীকের মধ্যে শুক্রবার দিন। শনিবার দিন মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে তাঁকে দাফন করা হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর। কেউ কেউ ৮৬, ৮৮, ৮৯ বছরও বলেছেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

৪. হজরত আলী মুর্তযা রা.

খোলাফায়ে রাশেদার চতুর্থ খলিফা এবং লেখক ছিলেন আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী মুর্তযা। আলী তাঁর নাম আর তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবুল হাসান এবং আবু তুরাব। তিনি ছিলেন রসুলেপাক স. এর চাচা আবু তালেবের পুত্র। তিনি রসুলেপাক স. এর কন্যা ফাতেমার স্বামী এবং ইমাম হাসান-হুসাইনের পিতা ছিলেন। জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই তাঁর নাম ছিলো আলী।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তাঁর মাতা ফাতেমা বিনতে আসাদ তাঁর পিতার নামানুসারে তাঁর নাম রেখেছিলেন হায়দর। পিতা আবু তালেব এই নাম অপছন্দ করেন। নতুন নাম রাখেন আলী। রসুলেপাক স. তাঁর নাম রাখেন সিদ্দীক। 'রিয়াযুন্নাদরা' পুস্তকে এরকম বর্ণনা এসেছে। তাঁর কুনিয়াতী নাম রাখা হয়েছিলো আবুর রায়হানীন। তাঁর উপাধি ছিলো অনেক– বায়দাতুল বালাদ, আমীন, শরীফ, হাদী, মাহদী, যিলইযন, আযযারইয়া, ইয়াসুবুল উম্মা ইত্যাদি।

সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তাঁর জন্ম হয়েছিলো পবিত্র কাবায়। তিনি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত যায়েদ ইবনে আরকাম, হজরত সালমান ফারসী, হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ এবং আরো অনেক সাহাবী এইমত পোষণ করেছেন যে, তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। শায়েখ ইবনে হাজার 'ইসাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা' পুস্তকে বলেছেন, অধিকাংশ আহলে এলেমের মত এটাই। আবু ইয়ালা হজরত আলী মুর্তযা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. সোমবার দিন নবুওয়াত লাভ করেন। আর আমিও সোমবার দিন ইসলাম গ্রহণ করি। ইবনে আবদুল বার তাঁর 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলেছেন, হজরত আলী মুর্তযা ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর পিতার কাছে তা গোপন রাখেন। আর হজরত আবু বকর সিদ্দীক ইমান আনেন এবং তা সাথে সাথে প্রকাশ করে দেন। ওয়াল্লহু আ'লাম। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো দশ বছর বা আট বছর। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'জামেউল উসুলে' এরকম উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণের বয়স নিয়ে মতভেদ করা হয়েছে। কারও কারও ধারণা পনেরো বছর, আবার কারও ধারণা চৌদ্দ বছর। তবে বিশুদ্ধ কথা এই যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কখনও মূর্তিপূজা করেননি। তাঁর দাড়ি খুব বড় এবং লম্বা ছিলো। 'ফসলুল খিতাব' গ্রন্থে তাজুল ইসলামের 'আরবাঈন' কিতাব থেকে সংকলিত হয়েছে যে, হজরত আলীর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর ছিলো। তিনি তাবুক যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাবুক যাত্রার সময় রসুলেপাক স. তাঁকে আহলে বাইতের দেখাশোনার জন্য মদীনায় রেখে যান। তাঁর ফযিলত ও মর্যাদা এবং বীরত্বের কথা সুবিখ্যাত। রসুলেপাক স. তাঁকে খয়বর যুদ্ধে একটি পতাকা দান প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আজ আমি এমন একজনকে

পতাকা দান করবো, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলও তাকে ভালোবাসেন। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি আলী মুর্তযাকে কষ্ট দিলো, সে আমাকেই কষ্ট দিলো। যে আলী মুর্তযাকে গালি দিলো, সে যেনো আমাকেই গালি দিলো। মুমিন মুসলমানগণই কেবল আলীকে ভালোবাসবে। আর মুনাফিকেরাই কেবল আলীর প্রতি হিংসা পোষণ করবে।

খেলাফতে রাশেদার ত্রিশ বছর পূর্তির প্রথম বছরে তাঁকে শহীদ করা হয়েছিলো। তাঁর খেলাফতের সময়সীমা ছিলো চার বছর সাত মাস ছয়দিন অথবা বারো দিন। কেউ কেউ বলেছেন, চার বছর নয় মাস। পঞ্চম বছর পুরো করেছিলেন তদীয় পুত্র হজরত ইমাম হাসান।

৫. হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা.

পঞ্চম লেখক ছিলেন হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে ওছমান। ওছমান ছিলো হজরত আবু কুহাফার নাম– যিনি ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পিতা। সুতরাং হজরত তালহা ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের ভ্রাতুষ্পুত্র। হজরত আবু বকর ও উবায়দুল্লাহ উভয়েই আবু কুহাফা ওছমানের সন্তান। হজরত তালহার কুনিয়াত ছিলো আবু মোহাম্মদ। তিনি ওই আট ব্যক্তির অন্যতম, যাঁরা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি ওই পাঁচজনের অন্যতম, যাঁরা হজরত আবু বকর সিদ্দীকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ওই আটজন শুরা সদস্যের একজন, রসুলেপাক স. যাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি ওই দশজন সাহাবীর একজন, যাঁদেরকে রসুলেপাক স. জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বদরযুদ্ধ ছাড়া অন্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণ ছিলো, রসুলেপাক স. তাঁকে আবু সুফিয়ানের কাফেলার খবর সংগ্রহের জন্য সাঈদ ইবনে যায়েদের সঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন। উহুদযুদ্ধের দিন হজরত আবু তালহা রসুলেপাক স. এর প্রহরীর দায়িত্ব যথাথভাবে পালন করেন। সেদিন তিনি দুশমনদের আঘাত এমনভাবে প্রতিহত করেন যে, তাতে তাঁর আঙ্গুলসমূহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলো। সেদিন তাঁর দেহে দুশমনদের চব্বিশটি আঘাত লেগেছিলো। নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, সেদিন তাঁর দেহে তীর ও বল্লমের পচাঁত্তরটি জখম হয়েছিলো।

উহুদযুদ্ধের দিন রসুলেপাক স. দু'টি যেরা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। সে দিন রসুলেপাক স. অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি একটি পাথরের উপর আরোহণ করতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। হজরত তালহা রসুলেপাক স. এর সামনে এসে বসে পড়লেন। রসুলেপাক স. তাঁর পীঠের উপর পবিত্র পদযুগল রেখে পাথরের উপর আরোহণ করলেন। তাঁকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন 'আওজাবা তালহা'। অর্থাৎ তালহা এই আমলের মাধ্যমে তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব করে নিলো। তিনি স. আরও বললেন, হে তালহা! জিবরাইল তোমাকে সালাম বলছে।

আরও বলছে, ‘কিয়ামতের মহাআতংক থেকে রক্ষা করার জন্য আমি তোমার সঙ্গে থাকবো’। উহুদযুদ্ধের দিন মুসলিমবাহিনী যখন পরাজয়বরণ করলো, তখন আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে কেবল বারো জন সাহাবী রসুলেপাক স. এর নিকট ছিলেন। ওই বারো জনের মধ্যে হজরত তালহা ছিলেন। তখন এক মুশরিক রসুলেপাক স. এর উপর আক্রমণ করে তাঁর পবিত্র চেহারার উপর তলোয়ার চালাতে চেয়েছিলো। হজরত তালহা ওই মুশরিকের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। তখন রসুলেপাক স. বলেছিলেন, বিসমিল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি তোমার ঘর দেখেছি জান্নাতে। অথচ তুমি এখনও রয়েছো পৃথিবীতে। রসুলেপাক স. উহুদযুদ্ধের দিন তাঁর নাম রেখেছিলেন তালহাতুল খায়র। যাতুল উসায়রা অভিযানে নাম রেখেছিলেন তালহাতুল ফাইয়ায। আর খয়বরযুদ্ধে নাম রেখেছিলেন তালহাতুল জাওয়াদ। হজরত আবু বকর সিদ্দীক যখন উহুদযুদ্ধের আলোচনা করতেন, তখন বলতেন, দিবসটি সম্পূর্ণই ছিলো তালহার জন্য।

৩৬ হিজরী জমাদিউস্‌সানী মাসের বৃহস্পতিবার জামালের যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬০। কেউ কেউ বলেছেন ৬২। আবার কেউ বলেছেন ৬৪ বছর। বলা হয়ে থাকে যে, মারওয়ান ইবনুল হাকাম পূর্ব প্রতিহিংসাবশতঃ তাঁকে শহীদ করেছিলো। তাঁকে এভাবে তীর মারা হয়েছিলো যে, তীরটি তাঁর কণ্ঠনালী ভেদ করে গিয়েছিলো। হজরত তালহা জামালযুদ্ধে এজতেহাদী ভুলবশতঃ হজরত আয়েশা সিদ্দীকার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ছাওর ইবনে মাজরা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, জামাল যুদ্ধের দিন আমি হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর নিকট পৌঁছলাম। তখন তিনি মাটির উপর পড়ে ছিলেন। প্রাণবায়ু তখনও বিদ্যমান ছিলো। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, আমি এমন এক লোককে দেখতে পাচ্ছি, যার চেহারা চাঁদের মতো। বলুন তো আপনি কে? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আমি আমীরুল মুমিনীন হজরত আলীর এক সাথী। হজরত তালহা বললেন, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করবো। আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি বায়াত গ্রহণ করলেন। পরক্ষণেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর আমি হজরত আলী মুর্তযার নিকটে উপস্থিত হলাম এবং হজরত তালহার কথা বললাম। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার! রসুলেপাক স. সত্য বলেছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তালহাকে বেহেশতে প্রবেশ করতে আমার কাছে বায়াত গ্রহণ ব্যতীত নিষেধ করছেন। বর্ণিত আছে, জামালযুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি এসে বললো, তালহার হত্যাকারীকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিন। হজরত আলী বললেন, তাকে দোযখে প্রবেশের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী বলেছেন, আমি আশা পোষণ করছি যে, আমি, তালহা ও যুবায়ের ওই লোকদের মধ্যে গণ্য হবো, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন– আমি তাদের বক্ষসমূহ থেকে প্রতিহিংসা বের করে দিয়েছি। তারা ভাই ভাই হিসেবে বসবে পরস্পরের সামনা সামনি।

৬. হজরত যুবায়ের রা.

ষষ্ঠ লেখক ছিলেন হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে পাহারাদারগণের বর্ণনায়।

৭. হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.

সপ্তম লেখক ছিলেন হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্‌কাস। তাঁর সম্পর্কেও পাহারাদারগণের বর্ণনায় আলোকপাত করা হয়েছে। ওহী লেখা সংক্রান্ত কোনো হাদিস যদি পাওয়া যেতো, তাহলে তাঁর কথা পুনরায় উল্লেখ করা যেতো।

৮. হজরত আমের ইবনে ফুহায়রা রা.

অষ্টম লেখক ছিলেন হজরত আমের ইবনে ফুহায়রা। তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের আযাদকৃত হাবশী গোলাম ছিলেন। তাঁকে হজরত আবু বকর সিদ্দীক ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর দারে আরকামে প্রবেশ করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হিজরতের সফরের সময় তিনি রসুলেপাক স. এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সঙ্গে ছিলেন। বদর ও উহুদযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হজরত আবুদর রহমান ইবনে আউফ এবং হজরত আয়েশা সিদ্দীকা। বীরে মাউনার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো চল্লিশ বছর। যখন তাঁর পৃষ্ঠদেশে তীর মারা হলো, তখন তিনি বললেন, কাবার রবের কসম, আমি সফল হয়েছি। তখন অন্যান্য শহীদগণের লাশের মধ্যে তাঁকে তালাশ করা হলো, কিন্তু কেউ তাঁর লাশ খুঁজে পেলো না। লোকেরা বললো, ফেরেশতারা তাঁকে দাফন করেছে। জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, লোকেরা তাঁকে আসমান ও যমীনের মধ্যখানে নিয়ে যাওয়া অবস্থায় দেখেছে। তারপর এক পর্যায়ে তাঁর লাশ আকাশের দিকে অন্তর্হিত হয়।

৯. হজরত ছাবেত ইবনে কায়েস রা.

নবম লেখক ছিলেন হজরত ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শামাস মাদানী আনসারী খাযরাজী। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু মোহাম্মদ। তাঁকে আবু আবদুর রহমান বলে ডাকা হতো। তিনি উহুদ যুদ্ধে এবং তৎপরবর্তী সকল অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় সাহাবী এবং আনসারদের মধ্যে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। রসুলেপাক স. তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি আনসারদের মুখপাত্র ছিলেন। তাঁকে রসুলেপাক স. এর খতীব বলা হতো। একবার বনু তামীম গোত্রের লোক অহংকারী মনোভাব নিয়ে রসুলেপাক স. এর সামনে বক্তৃতা দিলো। রসুলেপাক স. হজরত ছাবেত ইবনে কায়েসকে হুকুম দিলেন, তাদের বক্তৃতার জবাব দাও। তিনি তৎক্ষণাৎ এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ

দিলেন। লোকেরা তাঁর ভাষণ শুনে লজ্জিত ও অভিভূত হলো। বলতে লাগলো, মোহাম্মদ আলেমুল গায়েবের পক্ষ থেকে এমন সাহায্য পেয়ে থাকেন, যা অন্য কেউ পায় না। তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য বিষয় ও শাহাদতের বর্ণনা রসুলেপাক স. এর খতীবগণ শিরোনামে উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

তাঁর কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন হজরত আনাস ইবনে মালেক ও তাঁর সন্তানগণ। তাঁর বর্ণিত হাদিসসমূহ রয়েছে বোখারী, আবু দাউদ এবং নাসায়ী প্রভৃতি হাদিসগ্রন্থে। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের সঙ্গে মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে শাহাদতবরণ করেন। 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজকে উচ্চ কোরো না' আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি নিজেকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করলেন। রসুলেপাক স. এর মজলিশে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কেননা তাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো উচ্চ। তিনি মনে করলেন, উচ্চ আওয়াজের কারণে তাঁর আমল হয়তো বাতিল হয়ে যাবে। রসুলেপাক স. তাঁকে তাঁর পবিত্র মজলিশে দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, ছাবেত আসে না কেনো! কী হয়েছে? কোথায় আছে সে? তাঁর খবর নেয়ার জন্য এক লোককে পাঠালেন। লোকটি দেখলেন, তিনি মাথা নিচু করে বসে আছেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, একি অবস্থা? হজরত ছাবেত ইবনে কায়েস বললেন, আমি জোরে কথা বলি। তাই আমল বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে ভীত। লোকটি রসুলেপাক স. এর দরবারে এসে সকল কথা খুলে বললেন। রসুলেপাক স. বললেন, যাও, তাকে যেয়ে বলো, সে ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে কল্যাণের সাথে জীবনযাপন করবে, কল্যাণের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তারপর এই আয়াত নাযিল হলো– 'ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বু কুল্লা মুখতালিন ফাকূর' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না)(৩১ঃ১৮)। আবার তিনি গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করলেন। রসুলেপাক স. তাঁর অবস্থা জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং দেখতেও চাই। এ বিষয়ে হয়তো আমি আমার কওমের মধ্যে অগ্রগামী হবো। কিন্তু আমার ভয় হয়, না জানি দাম্ভিক ও অহংকারীদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাই। তখন রসুলেপাক স. বললেন, তুমি ওই লোকদের মধ্যে নও। তুমি প্রশংসিত জীবন যাপন করছো। তোমার শহীদী মৃত্যু হবে এবং তুমি বেহেশতে প্রবেশ করবে।

১০. হজরত খালেদ রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখকগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হজরত খালেদ। যিনি সাঈদ ইবনুল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ কুরাইশির সন্তান। তিনি বনু উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন। তাঁর

পিতা সাঈদ ইবনুল আসের আট পুত্র ছিলো। তন্মধ্যে তিনজন ছিলো কাফের। ১. উজায়হা আর তার নামানুসারেই সাঈদ ইবনুল আসের কুনিয়াত হয়েছিলো। তাকে বলা হতো আবু উজায়হা সাঈদ ইবনুল আস ২. আস ৩. উবায়দা। আর বাকী পাঁচ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রসুলেপাক স. এর সোহবতও লাভ করেছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন শাসন কার্যে অবদানও রেখেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন– ১. খালেদ, ২. আমর, ৩. সাঈদ ৪. আবান এবং ৫. হাকাম। তবে রসুলেপাক স. হাকাম পরিবর্তন করে নাম রেখেছিলেন আবদুল্লাহ। হজরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারও কারও মতে ইসলাম গ্রহণে তিনি ছিলেন তৃতীয়। কেউ বলেছেন, চতুর্থ। আবার কেউ বলেছেন, পঞ্চম। আশ্চর্যের কথা এই যে, তিনি দাবি করতেন এবং হজরত আলীর সঙ্গে বলতেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহ্‌র সামনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করবো। আমি তো আপনার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমার পিতার ভয়ে আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম। আর আপনি গোপন করেননি। ইবনে আসাকের এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতোই হজরত আলী, হজরত আবু বকর সিদ্দীকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে জীবনচরিত-বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌ই উত্তমরূপে অবগত।

হজরত খালেদের এক ছোট কন্যা ছিলো। তার নাম ছিলো উম্মে খালেদ। রসুলেপাক স. একদিন তাকে নিজের কাছে ডেকে আনলেন এবং তাকে একটি ছোট্ট ওড়না পরিয়ে দিলেন। বললেন, হে উম্মে খালেদ! এটি খুব সুন্দর। 'আওয়ারেফ' গ্রন্থে এসেছে, রসুলেপাক স. উম্মে খালেদকে উড়না পরিয়ে দিয়েছিলেন। এটি সুফীগণের খেরকা পরিধান করানোর বৈধতার দলিল। দারা কুতনী 'ইফরাদ' গ্রন্থে তারিখে ইবনে আসাকের থেকে মুসা ইবনে আকাবারের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, খালেদ ইবনে সাঈদ রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে স্বপ্নে দেখেছিলেন, সমগ্র মক্কা অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছে। এতো অন্ধকার যে, নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ যমযম কূপ থেকে একটি আলো বিচ্ছুরিত হয়ে আসমান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। কাবা শরীফও আলোকিত হলো। আলোকিত হলো সমস্ত মক্কা নগরী। ওই আলোতে ইয়াসরিবের খেজুরের বাগানগুলোও আমার দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বলেন, ঘুম যখন ভাঙলো তখন আমার ভাই আমর ইবনে সাঈদকে আমি আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি স্বপ্নের তাবীর করতে পারতেন। বললেন, আবদুল মুত্তালিবের বংশধর দ্বারা একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে। হজরত খালেদ বলেন, তারপর আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেন। উম্মে খালেদ বলেছেন, সর্বপ্রথম আমার পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা রসুলেপাক স.কে জানান। রসুলেপাক স. বলেন, হে খালেদ! আমিই সেই নূর এবং

আমি আল্লাহ্‌র রসুল। অতঃপর রসুলেপাক স. সত্যধর্মের বর্ণনা দিলেন, যা আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ভাই আমর ইবনে সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা সুয়ূ্তী 'জামেউল জাওয়াম' কিতাবে এ সকল তথ্যের বর্ণনা করেছেন। হজরত খালেদের ভাই আমর ইবনে সাঈদের সঙ্গে হাবশায় হিজরত করেন এবং সেখানে দশ বছরের অধিককাল অবস্থান করেন। সেখানে তাঁর পুত্র সাঈদ ইবনে খালেদের কন্যা উম্মে খালেদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খয়বরযুদ্ধের সময় রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হন এবং তারপর বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। জাকাতের মাল সংগ্রহের জন্য তাঁকে ইয়ামনে পাঠানো হয়েছিলো। তিনি সেখানে থাকা অবস্থায়ই রসুলেপাক স. এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান।

১১. হজরত আবান রা.

তিনিও সাঈদ ইবনুল আস ইবনে উমাইয়ার পুত্র। তিনি আপন ভাই খালেদ ও আমরের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। হজরত আবান প্রথমে তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়কে অনুযোগ ও দোষারোপ করতেন তাঁদের ইসলাম গ্রহণের বিষয় নিয়ে। পরে তিনি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেন। রসুলেপাক স. যখন হুদায়বিয়ার ঘটনায় হজরত ওছমান ইবনে আফ্‌ফানকে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাঁকে আমান দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে বলেছিলেন আপনি বিনা ভয় ও বাঁধায় আসা যাওয়া করবেন। আপনাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না। হজরত আবানের ইসলাম গ্রহণ হয়েছিলো হুদায়বিয়া ও খয়বরের মধ্যবর্তী স্থানে। রসুলেপাক স. তাঁকে এক বাহিনীর আমীর বানিয়ে নজদের দিকে প্রেরণ করেছিলেন। আলাউল হাযরামীকে অপসারিত করার পর তাঁকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিলো। তিনি বাহরাইনে নিযুক্ত থাকা অবস্থায়ই রসুলেপাক স. এই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

সাঈদ ইবনুল আসের পুত্রদ্বয় খালেদ ও আবানকে সীরাতবিশেষজ্ঞগণ রসুলেপাক স. এর লেখকগণের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁরা যদি তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কিত কোনো খবর বা আছার বর্ণনা করতেন, তাহলে খুব ভালো হতো। তাঁদের বাকী তিন ভাই অর্থাৎ আমর, সাঈদ ও হাকাম– রসুলেপাক স. যাঁর নাম রেখেছিলেন আবদুল্লাহ। 'আসমাউর রিজাল' গ্রন্থসমূহে তাঁদের নাম উল্লেখ আছে। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে সাঈদের পুত্র আবদুল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জাহেলী যুগে তাঁর নাম ছিলো হাকাম। রসুলেপাক স. তাঁর নাম রেখেছিলেন আবদুল্লাহ এবং তাঁকে লিখতে শেখার হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি একজন সুন্দর লেখক হয়েছিলেন। তিনি বদরযুদ্ধে শহীদ হন। কেউ বলেছেন, মুতাযুদ্ধে। আবার কেউ বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তিনি।

১২. হজরত হানযালা রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখকগণের অন্যতম লেখক ছিলেন গাছীলে মালাইকা হজরত হানযালা ইবনুর রুবাই। তাঁকে হানযালা ইবনে রবীআও বলা হয়। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু রেবঈ। 'ইসাবা' গ্রন্থের উদ্ধৃতি অনুসারে 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় তাঁকে বলা হয়েছে গাছীলে মালাইকা। 'ইস্তিআব' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, হানযালা ইবনুর রুবাই, যিনি লেখক ছিলেন, তিনি 'গাছীলে মালাইকা' ভিন্ন অন্য কেউ ছিলেন। 'গাছীলে মালাইকা' যিনি, তাঁর নাম হানযালা ইবনে আবু আমের রাহেব।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, লেখক হানযালা আকতাম যাইফীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। আকতাম আরবের কোনো এক পল্লীর এক বয়োবৃদ্ধ লোক ছিলেন। রসুলেপাক স. এর নবুওয়াতের যমানা তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো ১৯০ বছর। তিনি তাঁর কাওমের লোকদের কাছে রসুলেপাক স. এর আগমনের সুসংবাদ দিতেন এবং তাঁর উপর ইমান আনার ব্যাপারে ওসিয়ত করতেন। রসুলেপাক স. যখন আবির্ভূত হলেন, তখন তিনি তাঁর কাওমের লোকদেরকে একত্রিত করে ইমান আনার জন্য তাঁর দরবারে প্রেরণ করলেন। অতঃপর মালেক ইবনে নোয়ায়রা ইয়ারবুয়ী নামক এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে ওই সমাবেশকে বিক্ষিপ্ত করে দিলো। পরে আকতাম তাঁর ছেলেদেরকে তাঁর আনুগত্য করে কতিপয় লোকের সঙ্গে রসুলেপাক স. এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকগুলো ছিলো কুরাইশ বংশের। তারা পথিমধ্যেই বাদানুবাদ শুরু করে দিলো এবং শেষ পর্যন্ত তারা রসুলেপাক স. এর নিকট পৌঁছতে ব্যর্থ হলো। আকতাম গোত্রের মধ্যে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাণী আছে। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তির মধ্যে কল্যাণ নেই, সে যেনো কারও কাছ থেকে কল্যাণ পাওয়ার আশা না করে। তিনি আরও বলতেন, যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান এবং সম্পদের মালিক, তার আকল ও আকংখাসমূহ তার খেদমত করে থাকে। আর যার উপর দুনিয়াবিমুখতা আসে এবং সম্পদ চলে যায়, তার আকল অন্যের খেদমত করে।

হজরত হানযালা বসরাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য জামালযুদ্ধে হজরত আলীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর হাদিস কুফাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু ওছমান নাহদী এবং যায়েদ ইবনে মাজার। তিনি হজরত আলী ও হজরত মুয়াবিয়ার শাসনামলের প্রথম দিকে ইনতেকাল করেন।

১৩. আবু সুফিয়ান ইবনে হারব রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখকগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হজরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব। তাঁর দুই পুত্র ছিলেন– এযীদ ও মুয়াবিয়া। আবু

সুফিয়ানের আরেকটি কুনিয়াতী নাম ছিলো আবু হানযালা। তিনি হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফের পুত্র। আমুল ফীলের দশ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জাহেলী যুগে তিনি কুরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। রসুলেপাক স.এর সঙ্গে চূড়ান্ত পর্যায়ের দুশমনী ও হিংসা পোষণ করতেন তিনি। পরে মক্কাবিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হুনায়ন ও তায়েফে হাজির ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের আছার ও খবর বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় তাঁর সুন্দর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ পেয়েছে। আবার কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা সুন্দর ইসলাম গ্রহণ সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, হুনায়নযুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে যখন বিক্ষিপ্ততা ছড়িয়ে পড়েছিলো, তখন তিনি বলেছিলেন ‘জাদু টুটে গেছে’। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে উলামা কেরাম যা বর্ণনা করেছেন, এখানে তাই উল্লেখ করা হচ্ছে। শায়েখ আবু আমর ইবনে আবদুল বার ‘ইস্তিআব’ গ্রন্থে উভয় দিকের খবরই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এক সম্প্রদায় বর্ণনা করেছেন, আবু সুফিয়ান যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন তাঁর ইসলাম গ্রহণ সুন্দরই হয়েছে। হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব যিনি একজন অগ্রগণ্য তাবেয়ী ছিলেন, তিনি তাঁর পিতা সাহাবী হজরত মুসাইয়্যেবের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানকে তাঁর পুত্র এযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের পতাকা তলে দেখেছি। আমীরুল মুমিনীন ওমর ফারুক এযীদকে আমীর বানিয়ে তাঁর কাছে পতাকা সমর্পণ করেছিলেন এবং আবু সুফিয়ানকে তাঁর সঙ্গী বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সে সময় আমি কোনো এক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সে বলছে, ইয়া নাসরাল্লহ্ আকরিব (হে আল্লাহ্র সাহায্য! নিকটবর্তী হও)। সে কেবলই একথা বলে যাচ্ছে। তারপর আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, ওই লোক আর কেউ নয়, আবু সুফিয়ান স্বয়ং। তিনি যুদ্ধ করে যাচ্ছেন এবং বলছেন, ইয়া নাসরাল্লহ্ আকরিব। আরও বর্ণিত হয়েছে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান অশ্বারোহীদের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলেন। বলে যাচ্ছিলেন, আল্লাহ্! আল্লাহ্! (হে যোদ্ধারা) তোমরা আরব অশ্বারোহী, ইসলামের সাহায্যকারী। আর ওরা রোমক অশ্বারোহী নাসারা ও মুশরিক। হে আল্লাহ্! এদিনটি তোমার দিনসমূহের অন্যতম। তোমার সাহায্য তোমার বান্দাদের জন্য প্রেরণ করো। শায়েখ ইবনে হাজার আসকালানী ‘ইসাবা’ গ্রন্থে উক্ত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তার সাথে তার বিপরীত বর্ণনাও এসেছে। আবার পরিশেষে এমতো মন্তব্যও করেছেন যে, প্রথমোক্ত বর্ণনাই অধিকতর বিশুদ্ধ। ওয়াল্লহু আ’লাম।

‘ইস্তিআব’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, একদল লোক এরকম বর্ণনা করেছেন, যা থেকে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের মধ্যে মুনাফিকীর স্বভাব বিদ্যমান ছিলো বলে প্রতীয়মান হয়। জাহেলী যুগে তিনি যিন্দিক স্বভাবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। হজরত

হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদুনা ওছমান যুন্নুরাইনের খেলাফতকালে আবু সুফিয়ান একদিন তাঁর কাছে এলেন। তখন তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, অর্ধেক ওয়াদা বাস্তবায়িত হওয়ার পর খেলাফত তোমার কাছে ফিরে এসেছে। কাজেই এ সুযোগে বনু উমাইয়ার মধ্য থেকে বেশী বেশী করে শাসক নিযুক্ত করো। একাজ কেবলমাত্র হুকুমত। আমি বেহেশত দোযখ কিছু জানি না। একথা শুনে হজরত ওছমান তাঁকে শাসিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা আপনার সাথে ওইরূপ আচরণই করবেন, আপনি যার উপযুক্ত। একথা বলে তিনি তাকে তাঁর নিকট থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। 'ইস্তি আব' প্রণেতা বলেছেন, আবু সুফিয়ান সম্পর্কে এ ধরনের নিম্নমানের ও অকথ্য কথা-বার্তা আরও আছে, যা বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন। তবে ওই সকল বর্ণনা উপস্থাপন করার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি। ওই সকল বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণ সুন্দর ছিলো না। অথচ হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেবের হাদিস তাঁর ইসলামকেই প্রমাণ করে। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি 'মুওয়াল্লাফাতুল কুলুব' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি উহুদ ও আহযাবযুদ্ধে মুশরিকদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বলা হয়ে থাকে যে ,তাকে রসুলেপাক স. বাহরাইনে সরকারী কর্মচারী বানিয়েছিলেন। কিন্তু একথাটি সুসাব্যস্ত নয়। ইবনে ইসহাক বলেছেন, রসুলেপাক স. তাকে মানাত মূর্তিশালা ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি তা করেছিলেন। আবুস সফর ইবনে সাআদ থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু সুফিয়ান মক্কাবিজয়ের দিন যখন লোকদের দেখলেন যে, তারা রসুলেপাক স. এর পিছনে পিছনে চলছে, তখন তিনি তাঁর প্রতি হিংসা করে মনে মনে বলেছিলেন, লোকগুলো যদি মোহাম্মদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতো। তখন রসুলেপাক স. আবু সুফিয়ানের বুকের উপর হাত মেরে বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা এখন আপনাকে অপদস্থ করবেন। আবু সুফিয়ান মনে মনে ভাবলেন, যে কথা আমি ধারণা করেছি মাত্র, মুখে উচ্চারণ করিনি, তা তিনি জানলেন কেমন করে, তখন তিনি বললেন, আসতাগফিরুল্লাহ ওয়া আতূবু ইলাইহি। মক্কাবিজয়ের দিন হজরত আবু সুফিয়ান হজরত ইবনে আব্বাসের সাথে ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে বললেন, এখনও কি সময় হয়নি যে, আপনি বলবেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তিনি চুপ রইলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে আবার বললেন, আপনার কি এখনও সময় আসেনি যে, আপনি বলবেন 'মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্'। আবু সুফিয়ান বললেন, এখনও আমার বিশ্বাস হয়নি। এখনও আমি সন্দেহের উপর আছি। এক বর্ণনায় এসেছে, আবু সুফিয়ান মনে মনে বলেছিলেন, মোহাম্মদ কিসের কারণে আমাদের উপর বিজয় লাভ করে? রসুলেপাক স. উত্তরে বলেছিলেন আল্লাহ্র সাহায্যে। সে সময় তিনি বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রসুল।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তায়েফ যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ানের চোখে একটি তীর লেগেছিলো। তিনি রসুলেপাক স. এর কাছে নিবেদন করেছিলেন, আমার চোখে তীর লেগেছে। তিনি স. বললেন, আপনি যদি চান, তাহলে চোখ ফিরে পাওয়ার জন্য আমি দোয়া করবো। আর যদি বেহেশত চান তাহলে সবর করুন। আবু সুফিয়ান বললেন, আমি বেহেশত চাই। পরে ইয়ারমুকের যুদ্ধে তাঁর অপর চক্ষুতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এভাবে তাঁর দুই চোখই অন্ধ হয়ে যায়। আবু সুফিয়ান ব্যবসায়ী ছিলেন। শাম ও আজমের বিভিন্ন দেশে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। এ সকল দেশে তিনি ব্যবসার মালামাল পাঠাতেন। আবার কখনও নিজেও মাল নিয়ে যেতেন। বদর ও উহুদযুদ্ধে তিনি মক্কাবাসীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। তিনি কৃপণ প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা একবার রসুলেপাক স. এর নিকট অভিযোগ করলেন, আমার স্বামী আবু সুফিয়ান বড়ই কৃপণ। সে তার বাচ্চাদেরকে পেট ভরে আহার দেয় না। তাহলে কি আমার বাচ্চাদের প্রয়োজনে তার মাল থেকে তার অজ্ঞাতে আমি কিছু নিয়ে নিতে পারি? রসুলেপাক স. বললেন, নিতে পারো, তবে বেশী নয়।

আবু সুফিয়ান রসুলেপাক স. এর নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, কায়স ইবনে আবু হাযেম এবং তাঁর পুত্র মুয়াবিয়া রা.। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিনি ওই বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন, যা রোমের বাদশাহ হারকেল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ৩৪ অথবা ৩১ হিজরীতে হজরত ওছমান যুন্নূরাইনের খেলাফতকালে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। হজরত মুয়াবিয়া তাঁর নামাজে জানাযা পড়ান। আরেক বর্ণনা অনুসারে হজরত ওছমান তাঁর নামাজে জানাযা পড়িয়েছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৮ বছর। আরেক বর্ণনা মতে ৯০ বছরের চেয়ে কিছু অধিক।

১৪. এযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখকগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন এযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান। তিনি মক্কাবিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুনায়নযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বলা হয়ে থাকে, আবু সুফিয়ানের সন্তানদের মধ্যে এযীদই সর্বোত্তম ছিলেন। তাঁকে এযীদুলহারমী বলা হয়। রসুলেপাক স. তাঁকে বনী আ'রাস গোত্রের জাকাত সংগ্রহের আমেল নিযুক্ত করেছিলেন। এই বংশটি তাঁর খালুর বংশ ছিলো। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে ১২ হিজরীতে আমেল বানিয়েছিলেন। আমর ইবনুল আস, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও শারজীল ইবনে হাসানাকে ফিলিস্তিনে পাঠিয়েছিলেন। আর এযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে বালকা নামক স্থানে যাওয়ার জন্য হুকুম দেন। প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্নভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। কেউ কেউ মনে করেন, আমর ইবনুল আস তাঁদের আমীর

ছিলেন। ১৩ হিজরীতে আল্লাহ্‌র দুশমনরা যখন পরাস্ত হলো এবং হজরত ওমর ফারুককে খলীফা বানানো হলো, তখন তিনি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্‌কে আমীর বানিয়ে শামদেশে প্রেরণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে শামদেশ বিজিত হয়। এযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে ফিলিস্তিন ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করা হয়। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন হজরত মুআয ইবনে জাবালকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তাঁর মৃত্যু হলে আবু সুফিয়ান সেখানকার শাসক হন। তার মৃত্যুর পর শাসনকর্তা হন এযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান। তাঁর পর তাঁর ভাই আমীর মুয়াবিয়াকে সেখানকার গভর্নর বানানো হয়। তাঁরা সকলেই প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ১৮ হিজরীতে সেখানে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিলো।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান একদিন তাঁর পেটের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, পেটের চামড়া পুরু হয়ে উঁচু হয়ে আছে। পেটে মেদ জমেছে। তখন তিনি পেটের কাপড় সরিয়ে বললেন, দেখো আমার চামড়া কাফের হয়ে গেছে। তিনি রসুলেপাক স. এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন হজরত আবদুল্লাহ আশআরী এবং আয়ায আশআরী। এযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান ১৭ হিজরীতে ইনতেকাল করেন।

১৫. হজরত আমীর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখকগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হজরত আমীর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবদুর রহমান। তিনি তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান এবং তাঁর ভাই এযীদ মক্কাবিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা মুআল্লাফাতুল কুলুব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, হজরত আমীর মুয়াবিয়া মক্কাবিজয়ের দিন রসুলেপাক স. এর মক্কায় আগমনের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি বদরযুদ্ধের আগেই রসুলেপাক স. এর নিকট এসে ইসলামের তরীকা শিক্ষা করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন, আমি ওমরাতুল কাযার দিন ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুসলমান অবস্থায়ই আমি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি ওই সকল সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা রসুলেপাক স. এর চিঠিপত্র লেখার কাজ করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ওহী লেখার কাজ করতেন। উপরন্তু চিঠিপত্র ও রাষ্ট্রীয় ফরমানসমূহ লেখার কাজ করতেন। হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালে তাঁর ভাই এযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানের মৃত্যুর পর তাঁকে শাম দেশের গভর্নর বানানো হয়েছিলো। শামদেশের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে ছিলো ৪৪ বছর। তন্মধ্যে চার বছর ছিলো হজরত ওমর ফারুকের খেলাফত কালে। তারপর হজরত ওছমান, হজরত আলী ও হজরত ইমাম হাসানের

শাসনামলে ২০ বছর। আর বিশ বছর ছিলো এমারত শাসনে। ৪১ হিজরীতে ইমাম হাসান তাঁর কাছে খেলাফতের দায়িত্ব সমর্পণ করার পর থেকে শুরু হয়েছিলো এমারত শাসন। এমারত শাসন চলেছিলো বিশ বছর। এভাবে তাঁর সামগ্রিক শাসনকাল ছিলো ৪৪ বছর।

হজরত আমীর মুয়াবিয়া ৬০ হিজরীর রজব মাসে ৭৮ বছর বয়সে দামেশকে ইনতেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৬ বছর। কেউ কেউ এরকমও বলেছেন, শেষ বয়সে তিনি লাকওয়া (মুখের পক্ষাঘাত) রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বলতেন, আফসোস! আমি যদি যি তোয়া উপত্যকায় পড়ে থাকার মতো কুরাইশদের কোনো এক ব্যক্তি হতাম। যি তোয়া জান্নাতুল মুআল্লার কবরস্থানের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তাঁর কাছে রসুলেপাক স. এর পবিত্র চাদর, কামীস, কয়েকখানা চুল ও নখ রক্ষিত ছিলো। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণকালে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন, রসুলেপাক স. এর পবিত্র কামীস পরিধান করিয়ে পবিত্র চাদর দিয়ে পেঁচিয়ে যেনো তাঁকে কাফন দেয়া হয়। তারপর রসুলেপাক স. এর পবিত্র নখ ও পবিত্র চুল তাঁর নাক, মুখ ও সেজদার জায়গাসমূহে রেখে যেনো আল্লাহ্তায়ালার কাছে তাঁকে সোপর্দ করা হয়। আল্লামা সুয়ূতী রচিত 'আদায়েল' নামক একটি কিতাবে ওই সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, যে সকল বিষয় তিনি নতুন আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর পূর্বে কোনো খোলাফায়ে রাশেদীন যা করেননি। হজরত আলী ও হজরত মুয়াবিয়ার মধ্যে সৃষ্ট মতানৈক্যের কারণ ছিলো হজরত ওছমান যুন্নুরাইনের শাহাদত। আমীর মুয়াবিয়া এবং হজরত আয়েশা সিদ্দীকা উভয়েই বলতেন, ওছমানের হত্যাকারীদের কেসাস কায়েম করার কাজটি দ্রুত করতে হবে, যাতে করে সাধারণ মানুষ খলীফাগণের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে না পারে। কিন্তু হজরত আলী ধীরস্থিরতার পথ গ্রহণ করলেন এবং এটাকেই কল্যাণকর মনে করলেন। খেলাফতের কাজ নির্বিঘ্ন রাখতে চাইলেন। এই মতানৈক্যের ভিত্তি ছিলো ইজতেহাদী ভুল। তারপর হজরত আলী আমীর মুয়াবিয়াকে অপসারিত করলেন। বিরোধিতা বৃদ্ধি পেলো। ফলে যা না হওয়ার তাই সংঘটিত হলো। আল্লামা সুয়ূতী 'মসনদে ইমাম আহমদ' কিতাব থেকে এরবায্ ইবনে সারিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! মুয়াবিয়াকে লেখা ও গণিত শিক্ষা দাও এবং তাকে আযাব থেকে রক্ষা করো।

ইবনে আবু শায়বা এবং তিবরানী মালিক ইবনে ওমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, আমীর মুয়াবিয়া বলতেন, আমি সব সময় রাজ্যশাসনের আকাঙ্খী ছিলাম। রসুলেপাক স. আমাকে বলেছিলেন, 'ইযা সালাফতা ফাআহসিন' (যখন তুমি শাসক হবে, তখন জনগণের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছিলেন 'ওয়াসমাহ' (এবং ক্ষমা করে দিয়ো)। মোহাদ্দেছগণ বলেছেন, হজরত আমীর মুয়াবিয়ার ফযিলত সংক্রান্ত কোনো হাদিস পাওয়া যায় না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হজরত আলী বলেছেন, মুয়াবিয়ার শাসনকে তোমরা অপছন্দ কোরো না। তিনি না থাকলে বহু লোকের মস্তক তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তিনি একথা দ্বারা সম্ভবতঃ তাঁর পুত্র নাপাক এযীদের কার্যকলাপের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

১৬. হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত আনসারী রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখকগণের মধ্যে অন্যতম লেখক ছিলেন হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত ইবনে যেহাক আনসারী নাজ্জারী। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু সাঈদ বা আবু ছাবেত। তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারের ওহী লেখক ছিলেন। তিনি একজন ফকীহ্ ও ফরায়েয বিষয়ের আলেম ছিলেন। রসুলেপাক স. হিজরত করে যখন মদীনায় চলে যান, তখন তাঁর বয়স ছিলো ১১ বছর। বদরযুদ্ধে সম্ভবতঃ অল্প বয়সের কারণে রসুলেপাক স. তাঁকে সৈন্যবাহিনীতে শামিল করেননি। উহুদ ও তাঁর পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর সর্বপ্রথম জেহাদ ছিলো খন্দকযুদ্ধ। তিনি রসুলেপাক স., হজরত আবু বকর ও হজরত ওছমান থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে সাহাবা কেরামের অনেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন হজরত আবু হুরায়রা, হজরত আবু সাঈদ, হজরত আনাস ও হজরত সাহাল ইবনে সাআদ। তাবেয়ীগণের মধ্য থেকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, তাঁর পুত্রদ্বয় খারেজা ও সালমান এবং কাসেম ইবনে মোহাম্মদ প্রমুখ। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে একজন ছিলেন, যাঁরা হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতকালে কোরআন সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে কোরআন সংকলনের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি তাতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। হজরত আবু বকর তাঁকে বলেছিলেন, তুমি নওজোয়ান ও বুদ্ধিমান। আমি তোমার উপর কোনোরূপ অনাস্থা রাখি না। তাঁর পুত্র খারেজা ইবনে যায়েদ পিতা যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. যখন মদীনায় এলেন, তখন আমার পিতা ছাবেত রসুলেপাক স. এর দরবারে আমাকে নিয়ে এসে বললেন, এ আমার ফরজন্দ বনী নাজ্জার গোত্রের ছেলে। সে কোরআন মজীদের ১৭টি সুরা মুখস্থ করেছে। তখন আমি রসুলেপাক স. এর সামনে অগ্রসর হলাম। রসুলেপাক স. আমার ক্বেরাত শুনে খুশি হলেন। বললেন, হে যায়েদ! ইহুদীদের লেখার পদ্ধতি শিখে নাও। কেননা ইহুদীদের লেখার উপর আমি নির্ভর করতে পারি না। তারা লেখার মধ্যে কম-বেশী করতে পারে। অতঃপর আমি সুরিয়ানী ভাষা শিখি। পনেরো দিন না যেতেই আমি ওই ভাষা আয়ত্ত করি। তারপর থেকে আমি রসুলেপাক স. এর দরবারে লেখার কাজ করতাম। তাঁর কাছে কোনো চিঠি বা ফরমান এলে আমি তা পাঠ করে শোনাতাম।

হজরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার বলেন, হজরত ওমর ও হজরত ওছমান ফতওয়া ও ফরায়েয এবং বিচার করার ক্ষেত্রে হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেতের চেয়ে কাউকে অধিক প্রাধান্য দিতেন না। কাসেম ইবনে মোহাম্মদ বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর ফারুক সফরে গেলে হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন এবং বলতেন, আমার উপর যায়েদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু শহরবাসীর জন্য তার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া এলেম, বিচারকার্য ও ফতওয়া প্রদানে সে এতো পরিপূর্ণ যে, অন্য কেউ এরকম নয়। হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত যে দিন ইনতেকাল করেন, সে দিন হজরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, আজ আলেমুন্নাসের ইনতেকাল হলো। হজরত আবু হোরায়রা বলেন, আজ এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তির তিরোধান ঘটলো। আমি আশা করি, আল্লাহ্তায়ালা হয়তো হজরত ইবনে আব্বাসকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত বানাবেন। আবু আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি হজরত ওছমানের কাছে কোরআন মজীদ পড়তাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি মানুষের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে আমাকে বিরত রাখছো। তুমি বরং যায়েদ ইবনে ছাবেতের কাছে যাও এবং তার কাছ থেকে কোরআন পাঠ শিক্ষা করো। কেননা সে কালামে পাকের জন্যই নিয়োজিত। আমার ক্বেরাত আর তার ক্বেরাত একই। আমার ও তার মধ্যে কোনো (ক্বেরাত বিষয়ে) মতভেদ নেই। ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান শা'বী বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একদিন হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত ছওয়ার করছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস তাঁর সম্মানার্থে তাঁর ছওয়ারীর রেকাব ধরলেন। তিনি বললেন, হে রসুলুল্লাহ্র চাচাতো ভাই! আপনি একদিকে চলে যান এবং ছওয়ারীর রেকাব ছেড়ে দিন। হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, আমাদেরকে এরকমই শিক্ষা দেয়া হয়েছে– উলামা ও মাশায়েখগণের সঙ্গে আমরা যেনো এরকম আদব ও এহতেরাম বজায় রেখে চলি। হজরত যায়েদ বললেন, হস্ত প্রসারিত করুন। হজরত ইবনে আব্বাস তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত তাঁর হাত ধরে চুম্বন করে বললেন, আমাদেরকে এরকমই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্র আহলে বাইতের সঙ্গে যেনো এরকমই আচরণ করি। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বললেন, আমাদের বুযুর্গগণের সঙ্গে আমরা যেনো এরকম আমল করি। ইবনে সাআদ বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে এরকমই বর্ণনা করেছেন। হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত একজন মুফতী সাহাবীও ছিলেন। রসুলেপাক স. এর দরবারে ছয়জন মুফতী সাহাবী ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ১. হজরত ওমর ২. হজরত আলী ৩. হজরত ইবনে মাসউদ ৪. হজরত আবু মুসা ৫. হজরত আবু যায়েদ এবং ৬. হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত। তিনি ৪২ অথবা ৪৩ মতান্তরে ৪৫ হিজরীতে ইনতেকাল করেন।

১৭. হজরত শারজিল ইবনে হাসানা রা.

রসুলেপাক স.এর দরবারের আরেকজন লেখক সাহাবী ছিলেন হজরত শারজিল ইবনে হাসানা। তাঁর আসল নাম ছিলো আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন জামাহ্ গোত্রভূত। তিনি সাহাবী এবং হাবশায় হিজরতকারীদের আমীর ছিলেন। তিনি কুরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতেন। তাঁর ভাইয়ের নাম ছিলো আবদুর রহমান ইবনে হাসানা। আর তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু আবদুল্লাহ। কেউ কেউ বলেছেন, আবু আবদুর রহমান। হজরত শারজিল ও তার ভাই আবদুর রহমান দু'জনকেই হাসানার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হতো। কেননা তাঁদের উভয়ের মাতা ছিলেন হাসানা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এই দুই ভাই-ই হাসানার মুখ বুলানো পুত্র ছিলেন। সে কারণে তাঁর সম্পর্কের প্রভাব এই দুই ভাইয়ের উপর প্রবল হয়ে গিয়েছে। ইবনে মাজা হজরত শারজিল ইবনে হাসানা থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা নামাজের মধ্যে এতমিনান তরক করার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি ওই হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, যে হাদিসে নাজ্জাশী সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবার বিবাহের আকদ রসুলেপাক স.এর সঙ্গে করিয়েছিলেন– এই তথ্যটি বর্ণিত হয়েছে। রসুলেপাক স. তাঁকে দূত নির্বাচিত করে মিশরে পাঠিয়েছিলেন। তিনি মিশরে থাকা অবস্থায়ই রসুলেপাক স. এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি হজরত উবাদা ইবনে সামেত এবং রসুলেপাক স. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তাঁর পুত্র রবীআ হাদিস গ্রহণ করেছেন। তিনি যে লেখক ছিলেন, এ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। এমন হতে পারে যে, মিশরের দূতের দায়িত্ব পালনের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে লেখার কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। ওয়াল্লহু আ'লাম।

১৮. হজরত আলা আলহাযরামী রা.

রসুলেপাক স.এর দরবারের আরেকজন লেখক ছিলেন হজরত আলা আলহাযরামী। তিনি রসুলেপাক স. এর একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। রসুলেপাক স. এর তরফ থেকে তিনি বাহরাইনে আমেল নিযুক্ত হয়েছিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীকও তাঁকে উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি ১৪ হিজরীতে ইনতেকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ওমর তাঁকে বসরার প্রশাসক বানিয়েছিলেন। বনী তামীমের ভূখণ্ডে ওই বৎসর তিনি ইনতেকাল করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ১১ হিজরীতে বাহরাইনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তদস্থলে হজরত আবু হুরায়রাকে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।

তাঁর নাম ও নসব সম্পর্কে উলামা কেরাম অনেক মতভেদ করেছেন। তবে এ সম্পর্কে সকলেই একমত পোষণ করেছেন যে, তিনি হাযরামাওতের বাসিন্দা ছিলেন। 'জামেউল উসুল' কিতাবে এরকম বলা হয়েছে। 'কাশেফ' গ্রন্থে বলা

হয়েছে, তিনি বনু উমাইয়ার মিত্র ছিলেন। তাঁর দশ ভাই ছিলো। হজরত আবু হুরায়রা এবং আরও কয়েকজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, আলা আলহাযরামী কিছু কলেমা পাঠ করে সমুদ্রে প্রবেশ করতেন এবং সেখান থেকে নির্বিঘ্নে বের হয়ে আসতে পারতেন। এটি একটি বিখ্যাত ঘটনা। তিনি কলেমা পাঠ করতেন 'ইয়া হালীমু ইয়া আলীমু'। তিনি মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত ছিলেন।

১৯. হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ রা.

হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ রসুলেপাক স. এর দরবারের একজন লেখক ছিলেন। ইবনে ওলীদ সাইফুল্লাহ ও তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু সুলায়মান। তাঁর মাতার নাম ছিলো লুবাবা সুগরা বিনতে হারেছ। তিনি ভগ্নি ছিলেন লুবাবা কুবরার, যিনি হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী ছিলেন। এই দুই বোন উম্মুল মুমিনীন হজরত মায়মুনার ভগ্নি ছিলেন। হজরত খালেদ জাহেলীযুগ থেকেই ছিলেন কুরাইশ বংশের একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। জাহেলী যুগে তিনি অশ্ব ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি হুদায়বিয়ার ওমরার সময় পর্যন্ত কাফেরদের সঙ্গে ছিলেন। বিশেষ করে উহুদযুদ্ধে মুশরিক বাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন। সপ্তম হিজরীতে খয়বরযুদ্ধের পর মুতার যুদ্ধের দুইমাস পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুতার যুদ্ধবিজয় তাঁর হাতেই সংঘটিত হয়। আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিলো প্রশংসনীয়। রসুলেপাক স. এর পৃথিবীর জীবনে এবং পরবর্তীকালেও দ্বীনের সাহায্য-সহায়তার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিলো অনন্য।

তিরমিযী শরীফে হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার রসুলেপাক স. এর সঙ্গে কোনো এক জায়গায় অবস্থান করছিলাম। লোকজন তাঁর সামনে দিয়ে এক এক করে অতিক্রম করে যাচ্ছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন 'এ কে?' 'এ কে?' উত্তর দেয়া হচ্ছিলো 'এ ওমুক' 'এ ওমুক'। এক পর্যায়ে হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ অতিক্রম করলেন। রসুলেপাক স. জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কে?' আমি বললাম, খালেদ ইবনে ওলীদ। রসুলেপাক স. বললেন, সে আল্লাহ্‌র এক পুণ্যবান দাস এবং আল্লাহ্‌র তরবারীসমূহের মধ্যে একটি তরবারী। হজরত আবু বকর সিদ্দীক যখন মুরতাদদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে প্রেরণ করেছিলেন তখন তাঁর হাতে পতাকা দিয়ে বলেছিলেন, আমি রসুলেপাক স.কে বলতে শুনেছি, খালেদ ইবনে ওলীদ কতোই না উত্তম আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্‌র তলোয়ারসমূহের মধ্যে অন্যতম তলোয়ার।

বর্ণিত আছে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের টুপি হারিয়ে গেলো। টুপি তালাশ করার জন্য তিনি লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন। লোকেরা অনেক অনুসন্ধান করলো। কিন্তু টুপিটির হদিস করতে পারলো না। অনুসন্ধান অভিযান চললো। অবশেষে টুপিটি পাওয়া গেলো। দেখা গেলো টুপিটি অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ, পুরানো। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, এমন একটি টুপির জন্য

আমাদেরকে কতোই না পরিশ্রম করতে হলো। তিনি বললেন, রসুলেপাক স. ওমরা করে যখন তাঁর পবিত্র মস্তক মুণ্ডন করছিলেন, তখন লোকেরা তাঁর পবিত্র কেশ হস্তগত করার জন্য তাড়াহুড়া করছিলো। আমি তাঁর পবিত্র মস্তকের সামনের দিকের কেশ সংগ্রহ করার জন্য এগিয়ে গেলাম। রসুলেপাক স. তাঁর মাথার অগ্রভাগের চুলসমূহ নিয়ে এই টুপির মধ্যে সংরক্ষণ করে টুপিটি আমাকে দান করলেন। তারপর থেকে আমি যখনই কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, এই টুপি আমার সঙ্গে রেখেছি। আল্লাহ্তায়ালা এর বরকতে সকল যুদ্ধে আমাকে বিজয় দান করেছেন। হজরত খালেদ যখন জুসরায় পৌঁছলেন, তখন তাঁর সামনে বিষ উপস্থিত করা হয়। তিনি তা তাঁর হাতের তালুতে রাখেন এবং পান করে ফেলেন। কিন্তু বিষ তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। আরও বর্ণনা আছে, একবার এক ব্যক্তি মশকভর্তি করে শরাব নিয়ে এসেছিলো। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মশকের মধ্যে কী আছে? লোকটি বললো, সিরকা। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! একে সিরকা বানিয়ে দাও। তৎক্ষণাৎ তা সিরকায় পরিণত হলো। এক বর্ণনায় আছে, তিনি তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি একে মধু বানিয়ে দাও। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তা মধুতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো। বর্ণিত আছে, হজরত খালেদ বলতেন, মুহাজিরদের লশকরে প্রকট অন্ধকার রজনী আবর্তিত হওয়ার চেয়ে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় কোনো জিনিস নেই। তিনি আরও বলতেন, যে রাতে নববধুকে উপস্থিত করা হয়, অথবা যে রাতে কোনো শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়, সে রাত ওই রাতের চেয়ে উত্তম নয়, যে রাতে প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া হয়। তিনি আরও বলতেন, কোরআন শরীফের অধিক শিক্ষা আমাকে জেহাদ থেকে বিরত রেখেছে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে দৃঢ়তা ও উত্তপ্ততা ছিলো, যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে একজন বীর সৈনিকের চরিত্রে। একদিনের ঘটনা। তিনি হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসারকে প্রচণ্ড অলস বলে আখ্যায়িত করলেন। হজরত আম্মার বলেন, আমি তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, খালেদের সঙ্গে কথা বলবো না। পরে হজরত আম্মার রসুলেপাক স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে হজরত খালেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, খালেদ! আম্মারের সঙ্গে মনোমালিন্য করার কী প্রয়োজন? সে তো একজন জান্নাতী ব্যক্তি, যে বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। এদিকে হজরত আম্মারকে ডেকে বললেন, খালেদ আল্লাহ্র তরবারীসমূহের মধ্যে একটি তরবারী। হজরত খালেদ হজরত আম্মারের নিকটে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। হজরত খালেদ বলেন, তারপর থেকে আমি সব সময় আম্মারকে মহব্বত করতাম। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফও একদিন হজরত খালেদের বিষয়ে রসুলেপাক স. এর কাছে অভিযোগ করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, হে খালেদ! ওই ব্যক্তিকে তুমি কেনো কষ্ট দাও, যে বদরে অংশগ্রহণ করেছিলো? তুমি যদি

উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহ্র রাস্তায় দান করো, তবু তার আমলের বরাবর হবে না। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তিনি আমার পিছনে লাগেন এবং আমাকে কষ্ট দেন। তাই আমি তাকে এমন এমন কথা বলেছি। রসুলেপাক স. বললেন, খালেদকে কষ্ট দিয়ো না। কেননা সে আল্লাহ্র তরবারীসমূহের মধ্যে একটি তরবারী।

হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের নিকট যখনই কোনো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আসতো, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা বণ্টন করে দিতেন এবং তার কোনো হিসাব তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের কাছে প্রেরণ করতেন না। হজরত ওমর হজরত আবু বকর সিদ্দীককে বললেন, আপনি খালেদ ইবনে ওলীদের কাছে পত্র লিখে জানিয়ে দিন, তিনি যেনো অনুমতি ছাড়া কাউকে কোনো কিছু দান না করেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক হজরত ওমরের কথা মতো পত্র প্রেরণ করলেন। হজরত খালেদ পত্রের উত্তরে বললেন, আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দিন। আমি যা চাইবো, তাই করবো এবং যাকে চাইবো, তাকেই দান করবো। তা না হলে আপনি জানেন, আপনি কী করবেন। অর্থাৎ এই দায়িত্ব আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিন। তখন হজরত ওমর ফারুকের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হলো। কেননা হজরত ওমর ফারুক ও হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে একটি সমস্যা বিদ্যমান ছিলো। তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীককে বললেন, খালেদ ইবনে ওলীদকে অপসারিত করুন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, আমার পক্ষ থেকে খালেদ ইবনে ওলীদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিবে কে? হজরত ওমর বললেন, আমিই। তিনি বললেন, তুমি জানো তোমার কাজের বিষয়ে। তারপর হজরত ওমর যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ইতোমধ্যে সাহাবা কেরাম হজরত আবু বকর সিদ্দীককে বললেন, ওমর আপনার কাছ থেকে বাইরে যাচ্ছেন, অথচ আপনারই প্রয়োজন ছিলো তাঁকে সঙ্গে রাখার। কী এমন ঘটলো যে, আপনি খালেদকে অপসারণ করছেন? অথচ তিনি মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। হজরত সিদ্দীকে আকবর বললেন, তোমরা বলো, আমি কী করতে পারি? তাঁরা বললেন, আপনি ওমরকে হুকুম দিন, তিনি যেনো বাইরে না যান। এখানেই যেনো অবস্থান করেন। আর খালেদকে লিখে জানিয়ে দিন, তিনি যেনো তাঁর দায়িত্ব পালন করে যান। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাই করলেন। পরে হজরত ওমর ফারুক যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন তিনি তাঁকে লিখে জানিয়ে দিলেন, বকরী, উট যাই হোক না কেনো, আমার হুকুম ছাড়া কাউকে কিছু দেয়া যাবে না। হজরত খালেদ ওই একই রকম উত্তর জানিয়ে দিলেন, যেমন উত্তর দিয়েছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীককে। ফলে হজরত ওমর ফারুক তাঁকে অপসারিত করে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে আসেন। হজরত ওমর ফারুকের নিকট হজরত খালেদকে অপসারণ করার একটি কারণ ছিলো এই– তিনি মালেক ইবনে

নোয়ায়রা নামক এক ব্যক্তিকে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের জমানায় কতল করেছিলেন। লোকেরা তার হত্যার বিষয়ে মতানৈক্য করেছিলো। তাদের মতে মালেক ইবনে নোয়ায়রাকে ইসলামের অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিলো। অনেকেই মনে করেছিলেন, মালেক ইবনে নোয়ায়রাকে কাফের হওয়ার কারণে হত্যা করা হয়েছিলো। হজরত আবু কাতাদা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কসম করে বলেছিলেন, হজরত খালেদের তরবারীর নিচে কাফেরকেই কতল করা হয়েছে। 'ইস্তি আব' প্রণেতা বলেছেন, হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের হাতে অনেক মুর্তাদ কতল হয়েছিলো। মুসলিম ও মালেক সে সব মুর্তাদদেরই অন্যতম ছিলো। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, মালেক ইবনে নোয়ায়রা তামীমী ইয়ারবোয়ীর উপনাম ছিলো আবু হানযালা। আর তার উপাধি ছিলো হফুল। সে ফার্সী ভাষাভাষীদের একজন সম্মানিত কবি ছিলো। জাহেলী যুগে ইয়ারবো কাওমের অন্যতম অশ্বারোহী হিসেবে তাকে গণ্য করা হতো। রসুলেপাক স. তাকে কওমের জাকাত উসুল করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। রসুলেপাক স. এর ওফাতের সংবাদ পাওয়ার পর সে জাকাতের মাল আটক করে এবং কাওমের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে। সকলকে এই কবিতা পাঠ করে শোনায়–

فقلت خذوا اموالكم غير خائف + ولانظر فيما يحئ من الغد
فان قام بالدين المحقق قايم + اطعنا وقلنا الدين دين محمد

অর্থঃ অতঃপর আমি বললাম, তোমরা তোমাদের মাল গ্রহণ করো নির্ভয়ে এবং দৃষ্টিপাত না করে যে, আগামী কাল কে বেঁচে থাকবে। সঠিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যদি প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে আমরা তার আনুগত্য করবো এবং বলবো যে, প্রকৃত ধর্ম মোহাম্মদের ধর্ম।

এই মালেক ইবনে নোয়ায়রা রসুলেপাক স. সম্পর্কে যখন কথা বলতো, তখন এরকম বলতো 'তোমাদের মনিবের বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই, তিনি এমন বলেছেন', 'আমি তোমাদের মনীবকে এরকম বলতে শুনেছি' রসুলেপাক স. সম্পর্কে তার উক্তি ছিলো এরকম। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের নিকট এ ধরনের বে-আদবী অসহ্য হয়ে উঠেছিলো। তারপর যারার ইবনে ইযদ আসাদী হজরত খালেদের হুকুমে তাকে কতল করেন। রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধ সমাপ্ত করে ফিরে এসে তিনি তার স্ত্রী উম্মে তামীম বিনতে মেনহালকে বিয়ে করেন। সে ছিলো খুবই রূপসী। লোকেরা অপবাদ দিয়ে থাকে, ওই মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যেই মালেক ইবনে নোয়ায়রাকে হত্যা করা হয়েছিলো। কথাটি ঠিক নয়। মালেক ইবনে নোয়ায়রার এক ভাই ছিলো মুতমেম ইবনে নোয়ায়রা। সেও একজন কবি ছিলো। সে তার ভাই মালেক ইবনে নোয়ায়রার হত্যার এবং জুলুমের কাহিনী হজরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকট বর্ণনা করলো। যুবায়ের ইবনে বোকা বর্ণনা করেছেন,

হজরত আবু বকর সিদ্দীক তখন হজরত খালেদকে পত্র লিখে জানালেন, মালেকের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।

হজরত ওমর ফারুক হজরত খালেদের বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেন। কিন্তু হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে মনে করেন মাযুর (অক্ষম)। হজরত ওমর ফারুক বললেন, খালেদের তলোয়ারের মুখ আছে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক একথার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে বললেন, তিনি ভুল করেছেন। তবে তাঁর উন্মুক্ত তরবারীতে কোনো গোনাহ্ ছিলো না, সে তরবারী আল্লাহ্তায়ালাই মুশরিকদের উপর পরিচালিত করেছেন। তারপর হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে নিজের কাছে ডেকে আনালেন। তিনি মদীনায় পৌঁছে ওই সময় হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সঙ্গে দেখা করলেন, যখন হজরত ওমর তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন না। হজরত আবু বকর সিদ্দীক মালেককে হত্যা করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ কারণ বর্ণনা করলেন। তারপর হজরত আবু বকর সিদ্দীক তার স্ত্রীকে বিয়ে করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, যেহেতু সে স্বামীহীনা ছিলো, তাই তাকে আমি বিয়ের পয়গাম দিয়েছি। তারপর বললেন, আপনি কি রসুলেপাক স. এর এই এরশাদ শোনেননি, খালেদ আল্লাহ্র তরবারীসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি তরবারী। আল্লাহ্র তরবারী হক পথ ছাড়া অন্য কোথাও পরিচালিত হয় না। একথা বলে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। পরক্ষণেই সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত ওমর। তিনি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হজরত খালেদ বললেন, আমাকে রসুলুল্লাহ্র খলীফা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। যেখানে ছিলাম সেখানেই দায়িত্ব পালন করতে বলেছেন। হজরত ওমর তাঁর মনের কথা আর প্রকাশ করলেন না।

পরবর্তীতে হজরত ওমর ফারুক যখন খলীফা হলেন, তখন তিনি তাঁকে ডেকে আনালেন এবং তাঁর সাথে কঠোর আচরণ করলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক যেভাবে তাঁর কাছে কৈফিয়ত চেয়েছিলেন, তিনি সেভাবে কৈফিয়ত চাইলেন। তিনিও ওই জবাবই দিলেন, যেমন দিয়েছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দীককে। হজরত ওমর বললেন, তুমি অপবাদের স্থলে তাকওয়ার নীতি গ্রহণ করলে না কেনো? যাহোক, তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন। বললেন, 'আল্লাহ্তায়ালা খালেদের উপর রহম করুন'। আরও বলেন, আমি খালেদকে তিরস্কার করতাম না, কিন্তু সে অতিরঞ্জিত করেছে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বললেন, খালেদ বিরাট দায়িত্ব পালন করেছে– কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তার অন্তরে অহংকার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে কি না।

হজরত খালেদের ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলো। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! আমি একশত বা তার চেয়ে বেশী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমার শরীরে এক বিঘত জায়গাও এমন নেই, যেখানে তলোয়ার, তীর অথবা বল্লমের আঘাত

লাগেনি। কিন্তু আজ আমি এমন অবস্থায় জীবন সাঙ্গ করছি, যেভাবে জীবন সাঙ্গ করে একটি উট। হজরত খালেদের ওফাত হয়েছিলো হেমস নামক স্থানে। কারও কারও মতে মদীনায়। ২১ হিজরীতে, অথবা ২২ হিজরীতে হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালে। হজরত খালেদ হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত সমরাস্ত্র ও অশ্বসমূহ যেনো আল্লাহ্‌র রাস্তায় কাজে লাগানো হয়। ইনতেকালের পর হজরত ওমর ফারুক হজরত খালেদের জানাযায় হাজির হয়েছিলেন। হজরত ওমর যখন সেখানে উপস্থিত হন, তখন বনী মুগীরার নারীরা একত্রিত হয়ে কান্নাকাটি করছিলো। হজরত ওমর বললেন, এতে কোনো দোষ নেই, তারা তার জন্য কান্নাকাটি করতে পারে। তবে তারা যেনো বিলাপ না করে। এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত খালেদের ইনতেকাল হয়েছিলো মদীনা মুনাওয়ারায়।

মোহাম্মদ ইবনে সালাম বর্ণনা করেছেন, বনী মুগীরার এমন কোনো নারী ছিলো না, যে হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের কবরের পাশে এসে তার মাথার চুল কর্তন করেনি। এর কারণ, সময়টি ছিলো জাহেলী যুগের খুব কাছাকাছি। তাছাড়া বনী মুগীরার লোকদের উপর জাহেলী যুগের অপসংস্কৃতি তখন পর্যন্ত ছিলো প্রবল। আর হজরত খালেদের পিতা ওলীদ ইবনে মুগীরাও ছিলো কাট্টা কাফের ও মুর্খ। তার সন্তানদের মধ্যে কেবল হজরত খালেদই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হজরত খালেদ রসুলেপাক স. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে খালেদ, ইবনে আব্বাস, আলকামা ও জুবায়ের ইবনে নুফায়ের প্রমুখ সাহাবীগণ।

২০. মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখক সাহাবীগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হজরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা। তাঁর জীবনচরিত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে পাহারাদারগণের বর্ণনায়। তিনি পাহারাদার এবং লেখক দুই-ই ছিলেন।।

২১. আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখক সাহাবীগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু মোহাম্মদ। তিনি আনসারী খাযরাজী এবং আনসারগণের একজন মুখপাত্র ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, আবু মোহাম্মদ এবং আবু রওয়াহা ছিলো তাঁর উপনাম। রসুলেপাক স. তাঁর এবং হজরত মেকদাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। জাহেলী যুগে তিনি একজন উচ্চ মর্যাদার লোক ছিলেন। বদর, উহুদ, খন্দক ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে মক্কা বিজয় ও তৎপরবর্তী অভিযানসমূহে অংশ নিতে পারেননি। কেননা তিনি মুতাযুদ্ধে ৮ম হিজরীতে শাহাদতবরণ করেছিলেন।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. মুতাযুদ্ধের সেনাদলকে বিদায় জানানোর প্রাক্কালে বললেন, তোমরা শান্তির সাথে যাও এবং শান্তির সাথে প্রত্যাবর্তন করো। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা তখন বললেন,–

لكني اسال الرحمن مغفرة + وضربه ذات فرغ تقذف الزند

অর্থঃ আমি কিন্তু দয়াময়ের কাছে ক্ষমা ও যুদ্ধ চাই, যা বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত আল্লাহ্দ্রোহীদের নিক্ষেপ করবে। তিনি শাহাদতের প্রত্যাশী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন ইসলামের অন্যতম এক কবি। কাফেরেরা রসুলেপাক স.কে যে মানসিক যন্ত্রণা দিতো, রসুল স. এর পক্ষ থেকে তিনি তার জবাব দিতেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা, হজরত হাস্সান ইবনে ছাবেত ও হজরত কাআব ইবনে মালেকের বিষয়ে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়– 'ইল্লাল্লাজীনা আমানূ ওয়া আমিলুস্ সলিহাতি ওয়াযকুরুল্লাহা কাছীরা ওয়ানতাসিরূ মিম্ বা'দি মা যলামূ' (কিন্তু উহারা ব্যতীত যাহারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে)(২৬ঃ২২৭)। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত উসামা ইবনে যায়েদ এবং হজরত আনাস ইবনে মালেক প্রমুখ সাহাবীগণ। তাবেয়ীগণের একটি দলও তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান এবং ইকরামা। তিনি রসুলেপাক স.এর দরবারে লেখালেখির কাজ করতেন। তিনিই সর্বপ্রথম বদরযুদ্ধজয়ের সংবাদ মদীনায় প্রচার করেন। রসুলেপাক স. ত্রিশজন আরোহীর সঙ্গে তাঁকে উসায়দ ইবনে আযাম ইহুদীকে হত্যা করার জন্য খয়বরের দিকে প্রেরণ করেছিলেন। তিনিই তাকে হত্যা করেছিলেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা খুব ভালো মানুষ। এটি একটি সুদীর্ঘ হাদিস। এখানে তার অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলো। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা যখন কোনো সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তাঁদেরকে বলতেন, বসুন আমরা কিছু সময় রব তাবারক ওয়া তায়ালাকে স্মরণ করি। আল হাদিস। বায়হাকী বিশুদ্ধ সূত্রপরম্পরায় ছাবেত থেকে তিনি আবু ইয়ালা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. ভাষণ দিচ্ছিলেন, এমন সময় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা সেখানে উপস্থিত হলেন। রসুলেপাক স. বললেন, বসে যাও। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানেই বসে পড়লেন। তখন তিনি মসজিদের বাইরে ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করে বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে তাঁর রসুলের আনুগত্য করার আরও বেশী তৌফিক দান করুন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহার শাহাদতের পর এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। সেই

ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর কাছে তাঁর আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি যখন ঘর থেকে বাইরে যেতেন, তখন দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। আবার যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, তখনও দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। এই আমল তিনি কখনও বাদ দিতেন না। হেশাম ইবনে ওরওয়া থেকে বর্ণিত আছে 'আশ্‌শুআরাউ ইয়াত্তাবিউ হুমুল গবুন' অর্থাৎ গবেটরা কবিদের অনুসরণ করে– আয়াত যখন নাযিল হলো, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা খুব ভালোভাবেই জানেন যে, আমি ওই দলের অন্তর্ভুক্ত। তখন এই আয়াত নাযিল হলো– 'ইল্লাল্লাজীনা আমানূ ওয়ামিলুস্ সলিহাতি'(কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে)(১০৩ঃ৩)।

২২. হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা.

হজরত মুগীরা ইবনে শু'বাকেও লেখক সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে তাঁকে প্রহরীগণের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, হুদায়বিয়ার দিন তিনি রসুলেপাক স. এর শিয়রের কাছে খোলা তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। উরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফীর সঙ্গে হজরত মুগীরা ইবনে শু'বার ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। ওই সকল বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, তাঁরা ওই সাহাবীগণের দলে পড়েন, যাঁদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত দোষারোপ করা থেকে জবানকে সংযত রাখতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ তাঁর সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন এখানে তাই উল্লেখ করা হচ্ছে।

হজরত মুগীরা ইবনে শু'বার অপর নাম ছিলো আবু আবদুল্লাহ। বলা হয়ে থাকে, তাঁর কুনিয়াত আবু ঈসাও ছিলো। মুগীরা ইবনে শু'বা ইবনে আবু আমের ছাকাফী খন্দকযুদ্ধের বছর মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম ঘটনা হুদায়বিয়ার ঘটনা। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি হুদায়বিয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বায়আতে রেদওয়ানে হাজির ছিলেন। আরবদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন কঠোর পরিশ্রমী। বর্ণিত হয়েছে কঠোর পরিশ্রমের কাজ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সম্পাদন করার মতো ব্যক্তি সমগ্র আরব দেশে ছিলেন চার জন। ১. হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ২. হজরত আমর ইবনুল আস ৩. হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা এবং ৪. হজরত যিয়াদ। হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা ছিলেন দীর্ঘদেহী, বড় বড় চোখবিশিষ্ট এবং গৌর বর্ণের। মাথার চুল ছিলো কোঁকড়ানো, লম্বা। ওষ্ঠাধর ছিলো পুরু। মস্তক ছিলো বৃহদাকৃতির। আর বাহুযুগল ছিলো সুদৃঢ়। প্রশস্ত স্কন্ধদেশের অধিকারী ছিলেন তিনি। হজরত ওমর ফারুক তাঁকে বসরার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি হামাদানসহ আরও কয়েকটি শহর জয় করেছিলেন। তারপর কোনো একটি অসুন্দর কাজে জড়িত হওয়ার

কারণে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। এ বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে হজরত আবু বুকরা এবং আরও কেউ সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন, যদিও শরীয়তের বিধান মতে সে সাক্ষ্য পূর্ণাঙ্গ ছিলো না।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, তিনি তিন শত মেয়েকে ইসলামে প্রবেশ করিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ তার সংখ্যা হাজার বলেছেন। তারপর তাঁকে কুফার শাসক নিযুক্ত করা হয়। হজরত ওমর ফারুকের শাহাদতবরণের পর হজরত ওছমান খলীফা নিযুক্ত হন। তিনিও তাঁকে স্বপদে বহাল রাখেন। যখন হজরত আলী মুর্তযা ও হজরত মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন তিনি তাতে মনোযোগী হোন। দ্বৈত্য শাসনের ঘটনা যখন ঘটলো, তখন তিনি আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করলেন। যখন ইমাম হাসান ইবনে আলী ও আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হলো এবং লোকেরা তাঁর দিকে সমবেত হতে লাগলো, তখন তিনি মুয়াবিয়ার কাছে বায়াত গ্রহণ করলেন। আমীর মুয়াবিয়া তাঁকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তিনি এযীদের শাসনের তদবীর করেছিলেন এবং লোকদেরকে তার প্রতি উদ্বুদ্ধও করেছিলেন। কথিত আছে একবার আমীর মুয়াবিয়া তাঁকে কুফা থেকে নিজের কাছে তলব করলেন। তিনি উপস্থিত হলেন বিলম্বে। তাই আমীর মুয়াবিয়া তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, বিলম্ব করা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি নয়। আমি স্বদায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছি। এযীদের শাসনের তদবীরের কাজে ব্যস্ত আছি। তারপর তিনি কুফার গভর্নর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ৫০ হিজরীতে তাঁর ইনতেকাল পর্যন্ত তিনি স্বপদেই বহাল ছিলেন। ইনতেকালের সময় তিনি তাঁর পুত্র ওরওয়াকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া তা মঞ্জুর করেননি। কুফা ও বসরায় যিয়াদকে গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং ইরাকের ওই দুই প্রদেশকে একত্রিত করে দেন।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুকের দরবারে এসে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। লোকেরা বললো, আবু ঈসা অনুমতি চাচ্ছেন। একথা শুনে হজরত ওমর ফারুক বললেন, ঈসার কোনো পিতা ছিলো না। একথা বলার কারণ তিনি আবু ঈসা কুনিয়াতটি পছন্দ করতেন না। লোকেরা বললো, রসুলুল্লাহ্ তো তাঁকে এই নামে স্মরণ করতেন। হজরত ওমর ফারুক বললেন, আল্লাহ্‌র রসুল তো মাগফুর ছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর শানেই 'মা তাক্বাদ্দামা মিন যামবিকা ওয়া মা তাআখ্‌খারা' বলেছেন। কিন্তু আমাদের বিষয়টি জটিলতাপূর্ণ। আমরা জানি না, আমাদের সঙ্গে কী আচরণ করা হবে। তাকে শুধু মুগীরা ইবনে শু'বা বলো। সে কী আবু আবদুল্লাহ কুনিয়াত পছন্দ করে না। অবশ্য এই ঘটনাটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বাদানুবাদ আছে।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, আমীরুল মুমিনীন হজরত ওছমান যুন্নুরাইন যখন শহীদ হলেন, তখন খলিফা হলেন হজরত আলী মুর্তযা। লোকজন এসে তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করতে লাগলো। হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা তাঁর কাছে এসে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার প্রতি আমার একটি নসিহত আছে। আমীরুল মুমিনীন তাঁকে বললেন, সেটি কী? তিনি বললেন, আপনি যদি আপনার খেলাফতকে সুদৃঢ় রাখতে চান, তাহলে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে কুফার এবং যুবায়ের ইবনুল আওয়ামকে বসরার শাসক নিযুক্ত করুন। আর আমীর মুয়াবিয়াকে শামদেশে তাঁর স্বপদে বহাল রাখুন। তাহলে তাঁরা আপনার আনুগত্যের মধ্যে থাকবেন। এভাবে আপনার খেলাফতের কার্যাবলী যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন যেভাবে ইচ্ছে কার্য পরিচালনা করতে পারবেন। একথা শুনে হজরত আলী বললেন, তালহা ও যুবায়েরের ব্যাপারে আমি চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। তবে মুয়াবিয়ার ব্যাপারে কক্ষণও এরকম হবে না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি একাজ কখনও করতে পারি না এবং তাঁর কাছ থেকে কোনো সহযোগিতাও নিতে পারি না যতোক্ষণ তিনি আপন অবস্থায় অটল থাকবেন। তবে আমি চাই অন্য মুসলমানগণ যা করেছেন, তিনিও তাই করবেন (তিনি আমার কাছে বায়াত গ্রহণ করবেন)। তিনি যদি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করেন, তাহলে তাঁর বিষয় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সমর্পিত। একথা শুনে হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাগান্বিত হয়ে আমীরুল মুমিনীনের দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। কেননা তিনি তাঁর নসিহত গ্রহণ করেননি। পরের দিন তিনি আবার এলেন। বললেন, গত কাল আমি আপনাকে যা বলেছিলাম এবং আপনি যা উত্তর দিয়েছিলেন, সে বিষয়টি নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, আপনিই সত্যের অনুসন্ধান করেছেন এবং আপনিই সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। একথা বলে হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে দেখা হলো হজরত ইমাম হাসান ইবনে আলীর সঙ্গে। তিনি তাঁর পিতার নিকটে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর আগমনের হেতু কী? তিনি বললেন, কাল তিনি আমাকে এরকম কথা বলেছিলেন। আর আজ আমার কাছে এরকম কথা বলার জন্য এসেছিলেন। ইমাম হাসান বললেন, কাল তিনি যা বলেছিলেন, তা কল্যাণকামী হয়েই বলেছিলেন। আর আজ যা বলেছেন, তা নিছক মনোরঞ্জনের জন্য। হজরত আলী বললেন, আমি যদি মুয়াবিয়াকে বহাল রাখি তাহলে আমি আল্লাহ্‌তায়ালার এই আয়াত– 'ওয়ামা কুনতু মুত্তাখিযাল মুদ্বিল্লীনা আদুদা' (আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিবার নহি)(১৭ঃ৫১) এর দায়ে পড়ে যাবো। হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা হজরত আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে যেরকম কথা বলেছিলেন, হজরত তালহাও বলেছিলেন সেরকম। আমীরুল মুমিনীন তাঁর প্রস্তাবও কবুল করেননি। অতঃপর হজরত তালহা ও হজরত যুবায়েরের কী অবস্থা হয়েছিলো, সেকথা আমরা জানি।

২৩. হজরত আমর ইবনুল আস রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখকগণের মধ্যে আরেকজন সাহাবী ছিলেন হজরত আমর ইবনুল আস ইবনে ওয়ায়েল। তিনি সাহমী ইবনে আমর কবীলার লোক ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু আবদুল্লাহ। অপর এক বর্ণনা মতে তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু মোহাম্মদ। বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে তিনি ৮ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ওয়াকেদী বলেছেন, হজরত আমর ইবনুল আস ৮ম হিজরীতে নাজ্জাশীর কাছ থেকে মুসলমান হয়ে রসুলেপাক স. এর নিকট এসেছিলেন। নাজ্জাশী তাঁকে বলেছিলেন, হে আমর! তোমার চাচাতো ভাইয়ের ধর্ম তোমার কাছে অস্পষ্ট রইলো কেমন করে? আল্লাহর কসম! তিনি তো আল্লাহ্র রসুল। তিনি তাঁকে বললেন, আপনি কি সত্য বিশ্বাসের সাথে একথা বলছেন? নাজ্জাশী বললেন, আল্লাহ্র কসম! দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গেই আমি একথা বলছি। তারপর তিনি নাজ্জাশীর নিকট থেকে রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হন মক্কাবিজয়ের ছয়মাস পূর্বে।

রসুলেপাক স. এর ওফাতের পর তিনি হজরত ওমর ফারুক, হজরত ওছমান যুন্নুরাইন এবং হজরত আমীর মুয়াবিয়ার কর্মচারী ছিলেন। হজরত ফারুকে আযম তাঁকে মিশরে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি মিশর জয় করেন এবং তথাকার শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। হজরত ফারুকে আযম শহীদ হন। তারপর হজরত ওছমান যুন্নুরাইন তাঁকে ওই দায়িত্বে চার বছর বহাল রাখেন। পরে তাঁকে অপসারণ করে তদস্থলে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস্সারাহকে শাসক নিযুক্ত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবুস্সারাহ, হজরত ওছমানের রেযাবী ভাই (দুগ্ধভ্রাতা) ছিলেন। হজরত আমর ইবনুল আসকে ইস্কান্দারিয়ার দিকে প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং তিনি তা জয়ও করেছিলেন। হজরত ওছমান যখন শহীদ হন, তখন হজরত আমর ইবনুল আস হজরত আমীর মুয়াবিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে সমর্থন করেন। তারপর তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিতে পরিগণিত হন। সিফ্ফীনের যুদ্ধে তিনি হজরত আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং যুদ্ধের ফয়সালার কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। তারপর হজরত আমীর মুয়াবিয়া তাঁর শাসনামলে মিশরে তাঁকে জায়গীরদারী দান করেছিলেন। তিনি ৪১ অথবা ৪৩ অথবা ৫১ হিজরীতে ঈদুল ফিতরের দিন মিশরে ইনতেকাল করেন। তবে ৪৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন, একথাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। তাঁর মৃত্যুর পর আমীর মুয়াবিয়া তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯০ বছর। কেউ কেউ বলেছেন ৯৯ বছর। তাঁর জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন তাঁর পুত্র হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর। পিতার জানাযার নামাজ আদায় করার পর ঈদগাহে এসে মানুষের সঙ্গে ঈদের নামাজ আদায় করেন। পরে আমীর মুয়াবিয়া আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে অপসারিত করে তদস্থলে তাঁর আপন ভাই উতবা ইবনে আবু সুফিয়ানকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

বর্ণিত আছে, হজরত আমর ইবনুল আস আরবদের মধ্যে একজন জ্ঞানী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। খর্বদেহের অধিকারী ছিলেন তিনি। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার, তিনি বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও হজরত আলীর পক্ষ ত্যাগ করে আমীর মুয়াবিয়ার অনুগত হয়ে গিয়েছিলেন। হাকীম ফারাবী 'তাকাসীমে আকল' নামক পুস্তিকায় বলেছেন, 'আকল' শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার করা যায়। কখনও 'কুওয়াতে আকেলা' (জ্ঞানগত শক্তি) কে 'নফসে নাতেকা' (বাকশীল মন) এর উপর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কখনও এমন বিষয়ের বিবেক বিবেচনাকে আকল বলা হয়, যা মাবদা ও মা'আদ (দুনিয়া ও আখেরাত) এর সঠিকতার সঙ্গে জড়িত। আবার কখনও আকল বলা হয় দুনিয়াবী উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্বন্ধে অবগত হওয়াকে, যদিও তা সঠিকতার অনুকূল না হয়। যেমন আমর ইবনুল আস ও তাঁর অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের বেলায় ঘটে। বাহ্যিকভাবে যতোটুকু জানা যায়, হজরত আমর ইবনুল আসের জন্ম হয়েছিলো হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের পূর্বে। তিনি বলতেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব যে রাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে রাতে আমি তাঁকে দেখেছিলাম বলে আমার স্পষ্ট মনে আছে। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যুবায়ের ইবনে বুকা বর্ণনা করেছেন, একবার কোনো এক ব্যক্তি হজরত আমর ইবনুল আসকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বুদ্ধিমান লোক হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণে এতো বিলম্ব করেছিলেন কেনো? তিনি বললেন, আমার উপর আমার কাওমের প্রাধান্য ছিলো সীমাহীন। তাদের আকল ছিলো পাহাড়ের মতো অটল। একথা দ্বারা তিনি তাদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের বিষয়টিকেই বুঝিয়েছিলেন। রসুলেপাক স. যখন আবির্ভূত হলেন, তখন তারা বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতার পথ ধরলো। তাদের অনুসরণ করা ব্যতীত আমার আর কোনো পথ ছিলো না। তারা যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো এবং আমি আমার বিষয়ে স্বাধীনতা পেলাম, তখন আমি সুস্থভাবে চিন্তা ভাবনা করলাম এবং সুস্পষ্ট সত্য আমার সামনে উদ্ভাসিত হলো। ইসলামের মহব্বত আমার অন্তরে গ্রথিত হলো। তারপর কুরাইশরা আমার পক্ষ থেকে তা জানতে পারলো। আমি তাদের সাহায্যকারী হলাম এই শর্তে, যদি তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এরপর কুরাইশরা আমার সঙ্গে বিতর্ক করার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালো। আমি ওই লোকটিকে বললাম, আমি তোমাকে ওই আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, যিনি তোমার প্রভুপালক, তোমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের প্রভুপালক, তুমি বলো দেখি আমরা অধিক সত্যাধিষ্ঠিত, না অধিক সত্যাধিষ্ঠিত পারস্য ও রোমকগণ? লোকটি বললো, আমরা। আমি বললাম, বলো দেখি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আমরা বেশী, না তারা? লোকটি বললো, তারা। আমি বললাম, তাহলে তাদের উপর আমাদের মর্যাদার অর্থ কী? যেহেতু তাদের জগতে তারা, আর আমাদের জগতে আমরা। এ জগতে তারাই উচ্চতর। এখন আমার অন্তরে আল্লাহ্‌র রসুলের এই বাণীটি গ্রথিত হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেছেন, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবে, যাতে করে পুণ্যবানদের পুণ্যের বিনিময় এবং পাপীষ্ঠদের পাপের প্রতিফল দেয়া যায়।

একথা সত্য যে, আমর ইবনুল আস যখন ইমান গ্রহণ করেন, তখন রসুলেপাক স. তাঁকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং বীরত্বের ভিত্তিতে সামনে অগ্রসর করিয়ে দেন এবং নিজের নৈকট্যভাজন বানিয়ে যাতুস্‌সালাসেল যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাঁর সহযোগী বানিয়ে দেন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে। রসুলেপাক স. তাঁর জ্ঞান ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কোনো বিষয়ে কোথাও বিতর্ক সৃষ্টি হলে হজরত ওমর সেখানে দৌড়ে যেতেন এবং নিজে পক্ষাবলম্বন করে জবাব দিতেন এবং বিতর্ক প্রতিহত করতেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলতেন, হে ওমর! আমরকে তার নিজস্ব অবস্থায় ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ্‌র রসুল তাকে সমরকৌশল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মনে করেই তাকে যুদ্ধের সেনাপতি বানিয়েছেন।

আমর ইবনুল আস হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালে শাম, হলব, এনতাকিয়া এবং ফিলিস্তিন জয় করেন। তিনি হজরত ওমর ফারুক থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর দুই পুত্র আবদুল্লাহ এবং মোহাম্মদ। তাছাড়া আরও বর্ণনা করেছেন আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, আবু ওছমান নাহ্‌দী এবং আরো অনেক তাবেয়ী। মসনদে ইমাম আহমদ গ্রন্থে হজরত তালহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারা সাহাবীগণের একজন ছিলেন। রসুলেপাক স. বলেছেন, আমর ইবনুল আস কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম পুণ্যবান ব্যক্তি। আরও বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. একবার বললেন, হে আমর! তুমি তোমার বর্ম পরিধান করে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আমার কাছে এসো। আমি তোমাকে যুদ্ধে প্রেরণ করতে চাই, যাতে গনিমত অর্জিত হয় এবং তুমিও কিছু সম্পদ লাভ করতে পারো। একথা শুনে তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি সম্পদ লাভের জন্য ইসলাম গ্রহণ করিনি। ইসলামের মহব্বত ও আকর্ষণের কারণেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। রসুলেপাক স. বললেন, বিশুদ্ধ সম্পদ বিশুদ্ধ ব্যক্তির জন্যই শোভনীয়। তাঁর সম্পর্কে রসুলেপাক স. আরও বলেছেন, আসলামান্নাসু ওয়া আমানা আমরু (লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর আমর ইমান গ্রহণ করেছে)।

আমর ইবনুল আসের মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনার মধ্যেও উপকারিতা রয়েছে। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আমর ইবনুল আসের দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। তখন তাঁর অস্থিরতা ও মনের অশান্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। লোকেরা তাঁকে দেখতে এলে তিনি খুব বেশী কান্নাকাটি করতেন এবং তাঁর চেহারা দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে নিতেন। এমতাবস্থায় তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আমর বললেন, হে আমার সম্মানিত পিতা! এরকম ভয়ভীতি ও অশান্তির কারণ কী? আপনি রসুলেপাক স.এর পবিত্র সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ

করেছেন। তিনি তাঁর চেহারা ফিরিয়ে বললেন, হে আমার পুত্র! আমার জীবনে তিনটি অবস্থা অতিবাহিত হয়েছে। প্রথম জীবনে আমি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে প্রচণ্ড শত্রুতা করতাম। আমি যদি সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতাম তাহলে নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। তারপর আমি মুসলমান হলাম এবং রসুলেপাক স. এর সাহচর্য লাভ করলাম। তখন আমার অবস্থা এমন হলো যে, আমার নিকট রসুলেপাক স. এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ রইলো না। সীমাহীন আদব-সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে আমি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারতাম না। তখন কেউ আমাকে তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারার বর্ণনা দিতে বললে আমি তাও করতে পারতাম না। ওই অবস্থায় আমার যদি মৃত্যু হতো, তাহলে আশা করতাম যে, আমি জান্নাতবাসী হবো। তারপর আমার জীবনে আমীর ও গভর্নরের শাসনামল অতিবাহিত হলো। আমার জীবনে রাজকীয় শাসনের প্রতিক্রিয়া পৌঁছলো। এখন আমি জানি না, আমার শেষ পরিণাম কী হবে? আমি ওসিয়ত করছি, আমার মৃত্যুর পর রোদনকারীরা যেনো আমার সঙ্গে না যায়। আমাকে যখন তোমরা দাফন করবে, তখন আস্তে আস্তে যেয়ো, যেনো আমার উপর মাটি দেয়ার কাজ বিলম্বিত হয়। দাফন শেষে তোমরা আমার কবরের পাশে এতোটুকু সময় দাঁড়িয়ে থেকো, একটি উট জবেহ করে তার গোশত বণ্টন করতে যতোটুকু সময় লাগে। তোমাদেরকে দেখে যেনো আমি শান্তি পাই এবং আমি যেনো দেখতে পারি, আল্লাহ্র ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর আমি যথাযথভাবে দিয়েছি। মুসলিম শরীফ থেকে 'জামেউল উসুল' কিতাবে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসার যখন সিফ্ফীনের যুদ্ধে শহীদ হন, তখন হজরত আমর ইবনুল আস আমীর মুয়াবিয়ার নিকট উপস্থিত হয়ে দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশ করলেন। বললেন, আমি রসুলেপাক স.কে বলতে শুনেছি তিনি আম্মারকে বলেছিলেন, 'তাক্বতুলুকাল ফিয়াতুল বাগিয়্যাতু' (তোমাকে এক বিদ্রোহীদল কতল করবে)। আম্মার আমাদের হাতে নিহত হয়েছেন। সুতরাং আমরাই সেই বিদ্রোহীদল। হজরত আমীর মুয়াবিয়া বললেন, তুমি তো এক আশ্চর্য ব্যক্তি! নিজের প্রস্রাবে নিজেই গড়াগড়ি খাচ্ছো। প্রকৃতপক্ষে আম্মারকে হত্যা করেছেন আলী। কেননা তিনিই তাঁকে যুদ্ধে এনেছিলেন। একথা শুনে লোকেরা বললো, এটি একটি অপব্যাখ্যা। কেননা এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে ধরে নিতে হয় সাইয়্যেদুশ শুহাদা হজরত হামযার হত্যাকারী রসুলেপাক স. (নাউযুবিল্লাহ)। যেহেতু রসুলেপাক স.ই তাঁকে যুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত আমর ইবনুল আসের অন্তরে ভয়-ভীতি ও সত্যাশ্রয়প্রবণতা ছিলো সুপ্রকট। সহীহ্ বোখারী শরীফে ইমাম হাসানের সন্ধির ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের অন্যতম লেখক ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। হজরত আবদুল্লাহর পিতার নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিলো কুখ্যাত মুনাফিক। তাকে মুনাফিকদের সর্দার বলা হতো। হজরত আয়েশা সিদ্দীকার ইফ্‌ক এর কাহিনী তৈরীর মূল নায়ক ছিলো সে। তাছাড়াও তার অপকর্ম ছিলো অনেক। সে খাযরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোক ছিলো। রসুলেপাক স. এর মদীনায় আগমনের পূর্বে খাযরাজ গোত্র আশা করে আসছিলো, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলকে তাদের গোত্রাধিপতি বানাবে। কিন্তু রসুলেপাক স. যখন মদীনায় তশরীফ আনলেন, তখন তার মধ্যে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। রসুলেপাক স. এর প্রতি দুশমনি এবং মুনাফিকীই ছিলো তার নীতি। ওই নরাধমের এক পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধচিত্ত মুমিন। সিদ্দীকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর পূর্ব নাম ছিলো হুবাব। কিন্তু রসুলেপাক স. তাঁর নাম রেখেছিলেন আবদুল্লাহ। তিনিই ছিলেন রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখক। তিনি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে বদর এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারে চিঠিপত্রসমূহ লেখা ও পড়ার কাজ করতেন। ১২ হিজরীতে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা এবং হজরত জাহাম ইবনে সাআদ তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে তাঁর নাম বলা হয়েছে জাহাম ইবনে সাআদ আসলামী। কাযায়ী তাঁকেও রসুলেপাক স.এর দরবারের লেখকগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি এবং হজরত যুবায়ের জাকাতের মালের হিসাব লিখতেন। ইমাম কুরতুবী তাঁর রচিত 'মাওলুদে নববী' নামক পুস্তকে এরকম বর্ণনা করেছেন।

২৫. জাহাম ইবনুস সালত রা.

হজরত জাহাম ইবনুস সালত ইবনে মাখরামা ইবনে আবদুল মুত্তালিবও ছিলেন রসুলেপাক স. এর দরবারের একজন লেখক। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে এসেছে, তিনি খয়বর যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। রসুলেপাক স. তাঁকে খয়বরযুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মধ্য থেকে তিন ওয়াসাক পরিমাণ মাল দান করেছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে এসেছে, তিনি চিঠিপত্র লেখার কাজ করতেন এবং এই বিষয়টি সুপ্রমাণিত যে, তিনি রসুলেপাক স. এর চিঠিপত্র স্বহস্তে সম্পাদন করতেন। ইবনে ইসহাক 'মাগাযী' অধ্যায়ে লিখেছেন, রসুলেপাক স. যখন তাবুক প্রান্তরে পৌঁছলেন, তখন তাহসীনা ইবনে রোওয়ায়দ নামক এক ব্যক্তি এসে সন্ধির প্রস্তাব দিলো। রসুলেপাক স. তখন একটি সন্ধিনামা লেখালেন। ওই সন্ধিনামা লিখেছিলেন হজরত জাহাম ইবনুস সালত। জাহাম এবং যুবায়ের উভয়েই জাকাতের মালের হিসাব লেখার কাজ করতেন।

২৬. আরকাম ইবনে আবু আরকাম রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখক সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন হজরত আরকাম ইবনে আবু আরকাম কুরাশী মাখযুমী। তিনি প্রথম দিকের হিজরতকারী ছিলেন। সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী সাতজন সাহাবীর মধ্যে সপ্তম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। কেউ কেউ বলেছেন, দশ জনের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে আকাবা ও ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তিনি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রসুলেপাক স. তখন দারে আরকাম অর্থাৎ হজরত আরকামের বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করে গোপনে ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছিলেন। হজরত আরকামের বাড়িটি ছিলো সাফা পর্বতের উপর। সেখানেই শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের এক বড় দল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ হয়েছিলো। আর চল্লিশতম ব্যক্তি ছিলেন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব। চল্লিশজন পূর্ণ হবার পর রসুলেপাক স. বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। হজরত আরকাম রসুলেপাক স. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৫৫ হিজরীতে মদীনায় ইনতেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো আশি বছরের অধিক। তিনি ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন, তাঁর জানাযার নামাজ যেনো পড়ান হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস। হজরত আরকাম ইবনে আবু আরকামের জানাযা নিয়ে জনতা হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। মারওয়ান বললেন, রসুলুল্লাহ্‌র একজন সাহাবীকে আটকে রাখবো অনুপস্থিত একজনের জন্য? আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম মারওয়ানকে বাধা দেন এবং হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে তিনি হাজির হওয়ার পরই জানাযার নামাজ পড়ানো হয়।

২৭. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখক সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রব্বিহি আনসারী খাযরাজী। তিনি বনী হারেছ ইবনে খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি সাহেবে আজান ছিলেন। অর্থাৎ তিনি আজানের বাক্যসমূহ স্বপ্নে শুনেছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বেলালকে আজানের বাক্যসমূহ শিক্ষা দাও। তিনি তাঁকে আজানের বাক্যসমূহ শিক্ষা দিয়েছিলেন।

কোনো কোনো নবীচরিতবিশেষজ্ঞ তাঁর নসবনামায় ছা'লাবা বৃদ্ধি করে বলেছেন, তাঁর নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে ছা'লাবা ইবনে আবদে রব্বিহি। তবে নসবনামায় ছা'লাবা না হওয়াটাই বিশুদ্ধ। কেননা ছা'লাবা ইবনে আবদে রব্বিহি হজরত আবদুল্লাহর চাচা এবং হজরত যায়েদের ভাই ছিলেন। লোকেরা ছা'লাবাকে তাঁর নসবনামায় অন্তর্ভুক্ত করে ভুল করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে

যায়েদ ইবনে আবদে রব্বিহি একজন সুপরিচিত সাহাবী ছিলেন। তাঁকে সাহেবে আজান বলা হতো। তাঁকে রসুলেপাক স. এর লেখকগণের মধ্যে গণ্য করা হতো। আকাবা, বদর এবং অন্যান্য যুদ্ধে তিনি রসুলেপাক স.এর সঙ্গে ছিলেন। মক্কাবিজয়ের দিন তাঁর হাতেই বনী হারেছ ইবনে খাযরাজ গোত্রের পতাকা ছিলো। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা এবং তাঁর পুত্র মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ। 'ইস্তি আব' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। 'ইসাবা' গ্রন্থেও এরকম বলা হয়েছে। তাছাড়া 'ইসাবা' গ্রন্থে এরকমও বলা হয়েছে যে, তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, আজানসংক্রান্ত হাদিস ছাড়া তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত অন্যান্য হাদিস খ্যাতি লাভ করেনি। ইবনে আদী, বাগবী এবং অন্যান্যগণও বলেছেন, আজানসংক্রান্ত হাদিসটি ছাড়া আর কোনো হাদিস তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হয়নি। তবে শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী বলেছেন, কথাটি ভুল। কেননা তাঁর কাছ থেকে বেশ কয়েকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর সংখ্যা ছয় অথবা সাত। মাদায়েনী মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন, ৩২ হিজরীতে তাঁর ইনতেকাল হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৪ বছর। হাকিম বলেছেন, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, তিনি উহুদযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর দলীলস্বরূপ এই ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়– আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের কন্যা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদের কন্যা, যিনি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং উহুদযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ওমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁকে বলেছিলেন, আপনার প্রয়োজন আমার কাছে ব্যক্ত করুন। তিনি কিছু প্রয়োজন ব্যক্ত করেন এবং ওমর ইবনে আবদুল আযীয তা পূরণ করে দেন।

প্রকাশ থাকে যে, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ নামে আরেক সাহাবী ছিলেন, যিনি রসুলেপাক স. এর ওজুসংক্রান্ত হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে খ্যাত। তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আনসারী। বনী নাজ্জার জনপদের বনী মাযেনের লোক ছিলেন তিনি। তাঁর কুনিয়াতও ছিলো আবু মোহাম্মদ। তিনি উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি রসুলেপাক স. এর ওজুর হাদিস এবং আরও কয়েকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর এক ভাই ছিলেন খুবায়েব ইবনে যায়েদ, যাঁকে মালউন মুসায়লামা কায্যাব শহীদ করেছিলো। সাহাবীগণ যখন ইয়ামামার যুদ্ধে লড়ছিলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের পুত্র ওয়াহ্শী ইবনে হারবের সঙ্গে মুসায়লামাকে হত্যা করার কাজে শরীক হয়েছিলেন। তিনি ৬৩ হিজরীতে ইয়াউমুল হাররাতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনুল মুসাইয়্যেব, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র উব্বাদ ইবনে তামীম ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম এবং ওয়াসে ইবনে হেব্বান।

২৮. আল আলা ইবনে আতাবা রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখক সাহাবীগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন আল আলা ইবনে আতাবা। মুস্তাগফেরী 'ইসাবা' গ্রন্থে কথাটি বর্ণনা করেছেন। মুরযেবানী বর্ণনা করেছেন, তিনি এবং আরকাম আনসারদের জামানায় ছিলেন। 'তারিখে মু'তাসিম ইবনে সারেহ্' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আলা ইবনে আতাবা এবং আরকাম উভয়েই চুক্তি, অঙ্গীকার এবং লেনদেন বিষয়ে লেখার কাজ করতেন।

২৯. আবু আইয়ুব আনসারী রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখকগণের মধ্যে হজরত আবু আইয়ুব আনসারীও ছিলেন। এই মহাসম্মানিত সাহাবীর জীবন সম্পর্কে প্রহরীগণের জীবনীতে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩০. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা.

রসুলেপাক স. এর লেখকগণের অন্যতম ছিলেন হজরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু আবদুল্লাহ। তিনি আকাবের সাহাবীগণের মধ্যে আসরারে রসুলের অধিকারী ছিলেন। মুনাফিকদের বিষয়ে তাঁর এলেম ছিলো। রসুলেপাক স. তাঁকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছিলেন। তিনি মুনাফিকদের ব্যক্তিসত্তা এবং তাদের নামধাম সম্পর্কে ভালো করে জানতেন। মুসলিম শরীফে হজরত হুযায়ফা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য সকল ঘটনা এবং সৃষ্টিতব্য সকল ফেতনা সম্পর্কে জানিয়েছেন। সম্ভবতঃ সেগুলো সামগ্রিক ঘটনাবলী, কিংবা আংশিক যা বিভিন্ন ফেতনার সাথে সম্পৃক্ত। ওয়াল্লহু আ'লাম।

হজরত ওমর ফারুক হজরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানের কাছে ফেতনা সম্পর্কিত হাদিস এবং নেফাকের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ওমর ফারুক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মধ্যে কি মুনাফিকের কোনো আলামত পাওয়া যায়? তিনি উত্তর দিলেন, আমি তো আপনার মধ্যে মুনাফিকীর কোনো আলামত দেখতে পাই না। তবে আপনার দস্তরখানায় দুই রঙের খানা থাকে। হজরত ওমর বললেন, কখনও নয়। এমন হতেই পারে না। পরে যখন এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা হলো, তখন জানা গেলো যে, তিনি ডিম খেতেন। আর ডিমের মধ্যে তো শাদা এবং হলুদ দু'টি রঙ থাকে। অন্যান্য সাহাবীও তাঁর কাছে মুনাফিকদের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। হজরত ওমর ফারুক কারও জানাযার নামাজ পড়ানোর প্রয়োজন হলে হজরত হুযায়ফার আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। যখন তিনি এসে নামাজে শরীক হতেন, তখন নামাজ পড়াতেন। আর তিনি উপস্থিত না হলে নামাজেই শরীক হতেন না।

হজরত হুযায়ফার পিতার নাম ছিলো হিসল। কেউ কেউ বলেছেন হুসায়ল। হিসল ছিলেন জাবের ইবনে উসায়দ আসীর পুত্র। আসী আসা ইবনে বাগীয জনপদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ইয়ামান হজরত হুযায়ফার পিতার উপাধি। এই উপাধিপ্রাপ্তির কারণ হচ্ছে, তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে সেখান থেকে মদীনায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। আনসারদের কবীলা বনী নাহশালিলের হালিফ (মিত্র) হয়েছিলেন। 'হলফ' শব্দের প্রতিশব্দ ইয়ামীন, যার অর্থ কসম। ওই জনপদের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার কারণে তাঁর নাম হয়েছিলো ইয়ামান। হজরত হুয়ায়ফা এবং তাঁর পিতা ইয়ামান উভয়েই উহুদযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রসুলেপাক স. এর সাহাবীগণ তাঁকে সন্দেহবশতঃ শহীদ করে দিয়েছিলেন। তিনি মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সাহাবীগণ বুঝতে পারেননি। তাঁকে কতল করে দিয়েছিলেন। তখন হজরত হুযায়ফা ডেকে ডেকে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তিনি আমার পিতা'। কিন্তু তাঁরা তাঁর কোনো কথাতেই কর্ণপাত করেননি। তখন হজরত হুযায়ফা বলেছিলেন 'ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম' (আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন)। হজরত ওরওয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত হুযায়ফা যতোদিন বেঁচে ছিলেন, ততোদিন তাঁর পিতার হত্যাকারীদের জন্য সব সময় দোয়া এস্তেগফার করেছিলেন। হজরত হুযায়ফাকে তাঁর পিতা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধা দিয়েছিলেন। কেননা মুশরিকরা তাঁর পিতাকে প্ররোচিত করেছিলো। খন্দকযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য যুদ্ধেও তাঁর অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। তিনি ২২ হিজরীতে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

হজরত হুযায়ফাকে একবার প্রশ্ন করা হলো, কোন্ ফেতনা সবচেয়ে কঠিন? তিনি বললেন, যখন তোমার সামনে ভালো মন্দ দু'টি বিষয় উপস্থাপন করা হয়, আর তুমি সে বিষয়ে যখন কারও কাছেই কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে না পারো। তাকেই মনে করতে হবে সবচেয়ে বড় ফেতনা। হজরত হুযায়ফা বলতেন, ওই সময় পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ না প্রত্যেক জনপদে মুনাফিকেরা প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেছেন, রসুলেপাক স. এর নিকট সকলেই ভালো কাজের বিষয়ে প্রশ্ন করতো। কিন্তু আমি মন্দ কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম, উদ্দেশ্য আমি যেনো তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

হজরত হুযায়ফা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব, হজরত আলী ইবনে আবু তালেব, হজরত আবু দারদা এবং অনেক তাবেয়ী। তিনি মাদায়েনে ইনতেকাল করেন। তাঁর কবর শরীফের শীলালিপি অনুযায়ী দেখা যায়, তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো ৩৫ হিজরীতে। অপর এক বর্ণনামতে হজরত ওছমানের শাহাদতের কয়েকদিন পর, হজরত আলীর খেলাফতের প্রথম দিকে ৩৬ হিজরীতে। মাদায়েনে তাঁকে কবর দেয়া হয়। কবরে লেখা রয়েছে, তাঁর মৃত্যুকাল

৩৫ হিজরী। উষ্ট্রের যুদ্ধের জামানা তিনি পাননি। হজরত হুযায়ফার দুই পুত্র– সফওয়ান ও সাঈদ সিফ্ফীন যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের পিতার ওসিয়ত অনুসারে হজরত আলীর অনুসরণ করেছিলেন।

৩১. বুরায়দা ইবনুল হুসায়ব রা.

হজরত বুরায়দা ইবনুল হুসায়বও ছিলেন রসুলেপাক স. এর দরবারের একজন লেখক। বহুল প্রচারিত নাম ছিলো বুরায়দা আসলামী। কুনিয়াত আবু আবদুল্লাহ্। আরেক বর্ণনামতে তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু সাহল। আবার আরেক বর্ণনানুসারে আবু সাসান। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো আবু আমের, আর বুরায়দা ছিলো তাঁর উপাধি। তিনি বদরযুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং বদরযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

রসুলেপাক স. হিজরত করে মদীনার দিকে অগ্রসর হলেন। পৌঁছলেন কারাউল গায়ম নামক স্থানে। এটি দুই হেরেমের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম, যা মক্কা থেকে দুই মনজিল দূরে অবস্থিত। ওই সময় কুরাইশদের লোকজন হজরত বুরায়দাকে এই মর্মে প্ররোচিত করলো যে, হয় তুমি মোহাম্মদকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে, আর না হয় তাকে হত্যা করবে। নাউযুবিল্লাহ্! এ কাজটি করতে পারলে বিনিময়স্বরূপ তাঁকে একশ' উট দেয়া হবে বলে সাব্যস্ত হলো। তিনি সত্তর জন আরোহী নিয়ে রসুলেপাক স. এর সামনে উপস্থিত হলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তোমার নাম কী? তিনি বললেন, আমি বুরায়দা। রসুলেপাক স. হজরত আবু বকর সিদ্দীকের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, বারাদা আমরুনা (আমাদের কাজ শীতল ও আনন্দময় হয়েছে)। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন মহল্লার লোক? তিনি বললেন, আমি আসলাম মহল্লার। রসুলেপাক স. বললেন, সালামনা (আমরা শান্তিতে থাকবো এবং আমাদের শেষ পরিণাম শান্তিময় হবে)। রসুলেপাক স. বললেন, আসলাম সম্প্রদায়ের কোন শাখার লোক তুমি? তিনি বললেন, বনী সাহাম শাখার। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি তোমার হিস্সায় (নির্ধারিত অংশে) পৌঁছে গিয়েছো। রসুলেপাক স. কোনো কিছুর বদ ফালী গ্রহণ করতেন না। কিন্তু নেক ফালী গ্রহণ করতেন, বিশেষ করে নামের ক্ষেত্রে। তারপর হজরত বুরায়দা তাঁর সকল সঙ্গী-সাথীসহ ইসলাম গ্রহণ করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! বাহিনীর সঙ্গে পতাকা থাকা উচিত। রসুলেপাক স. তখন তাঁর পবিত্র পাগড়ি ছিঁড়ে তা বল্লমের অগ্রভাগে উড়িয়ে দিয়ে তাঁদেরকে সামনে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। তাঁরা কোরআনুল করীমের কিছু অংশ শিখে নিলেন। তারপর ফিরলেন স্ব স্ব লোকালয়ে। হজরত বুরায়দা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। উহুদযুদ্ধের পর মদীনায় আগমন করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হতে বেশ বিলম্ব করেছিলেন। হুদায়বিয়ার সময় উপিস্থিত

ছিলেন। তিনি বায়আতে রেদওয়ান পেয়েছিলেন। রসুলেপাক স. এর সঙ্গে থেকে ষোলটি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। বোখারী ও মুসলিম কিতাবে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। রসুলেপাক স. এর দরবারে তাঁর অনেক অংশগ্রহণ রয়েছে। রসুলেপাক স. এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের সঙ্গে ছিলেন। উষ্ট্র ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে তিনি হজরত আলীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি হজরত আলীর সঙ্গে যখন ইয়ামনে ছিলেন, তখন হজরত আলী সম্পর্কে তাঁর কোনো বিষয়ে অপধারণা জন্মে। রসুলেপাক স. যখন বিদায়হজ্ব সম্পন্ন করে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তিনি তাঁর কাছে বিষয়টি ব্যক্ত করেন। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রসুলেপাক স. গাদীরে খুমে খোতবা দিয়েছিলেন। সেই খোতবায় তিনি হজরত আলীর সঙ্গে মহব্বত ও বন্ধুত্বের বাঁধন সুদৃঢ় করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। হজরত বুরায়দা বলেন, ওই ঘটনার পর থেকে আলীর প্রতি আমার ভালোবাসা এমন সুদৃঢ় হলো যে, তিনি আমার নিকট সকলের চেয়ে অধিক প্রিয় হয়ে গেলেন।

তিনি হজরত ওছমান যুন্নুরাইনের জামানায় খোরাসানে জেহাদ করেন। তারপর মদীনায় বসবাস করেন। পরে তিনি বসরায় চলে যান। সেখান থেকে আবার খোরাসানে পৌঁছেন এবং জেহাদ করেন। এযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার জামানায় সেখানেই তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

৩২. হুসায়ন ইবনে নুমায়র রা.

হজরত হুসায়ন ইবনে নুমায়র রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখক ছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এই নামে দুইজন সাহাবীর জীবনালেখ্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন, হজরত হুসায়ন ইবনে নুমায়র আনসারী। ইবনে ইসহাক 'গযওয়ায়ে তবুকে' তাঁর কথা বলেছেন। আরো বলেছেন, হুসায়ন ইবনে নুমায়র জাকাতের মালের কাফেলার উপর হামলা করেছিলেন এবং সেখান থেকে কিছু মাল তিনি সরিয়ে ফেলেছিলেন। এই ঘটনার পর রসুলেপাক স. তাঁকে বলেছিলেন, তোমার জন্য আক্ষেপ! তোমাকে এরকম মন্দ কাজে কে প্ররোচিত করলো? তিনি বলেছিলেন, আমি মনে করেছিলাম আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন না। আমার ধারণা ছিলো ভুল। এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র রসুল! ইতোপূর্বে আমি আপনার উপর পরিপূর্ণ ইমান ও একীন স্থাপন করিনি। রসুলেপাক স. তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং তাঁর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। ইমাম বায়হাকী ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন 'দালায়েল' ও 'সুনানে কবীর' নামক গ্রন্থদ্বয়ে। তিনি একথাও বলেছেন যে, হুসায়ন ইবনে নুমায়র নামে আরেকজনকে পাওয়া যায়। তবে বিষয়টি পরিষ্কার নয় যে, এই হুসায়ন ইবনে নুমায়র পূর্বোক্ত জন? নাকি অপর কেউ? ইবনে আসাকের 'তারিখ' গ্রন্থে তাঁর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, হজরত ওমরের পক্ষ থেকে তিনি উর্দুন শহরে আমেল (জাকাত

আদায়কারী) নিযুক্ত হয়েছিলেন। হজরত ওমর বিভিন্ন যুদ্ধে সাহাবীগণকেই সেনাপতি নিযুক্ত করতেন। ইবনে আসাকের হুসায়ন ইবনে নুমায়রকে অপর হুসায়ন ইবনে নুমায়রের সঙ্গে মিশ্রিত করে ফেলেছেন। অপর হুসায়ন ইবনে নুমায়রকে সকুনী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিলো। তিনি এযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে কুফাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

আবু আলী ইবনে মাসকুবা স্বীয় গ্রন্থ 'তাজারুবুল উমাম' এ হুসায়ন ইবনে নুমায়রকে ওই সাহাবীগণের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, যাঁরা রসুলেপাক স. এর লেখার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আব্বাস ইবনে মোহাম্মদ তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে বলেছেন, হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা এবং হজরত হুসায়ন ইবনে নুমায়র রসুলেপাক স. এর প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। তাছাড়া রসুলেপাক স.এর দরবারের লেখকদের বর্ণনা যারা করেছেন তাঁরা বলেছেন, ওই দু'জন সাহাবী রসুলেপাক স. এর দরবারে দেওয়ানী বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, তিনি হচ্ছেন হুসায়ন ইবনে নোমায়র ইবনে ফায়েক ইবনে বসীদ ইবনে জাফর ইবনুল হারেছ ইবনে সাকানা। তিনি হেমস অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হুসায়ন ইবনে নুমায়রের পুত্র এযীদ এবং তাঁর নাতি মুয়াবিয়া ইবনে এযীদ হেমসের গভর্নর ছিলেন।

৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ ইবনে আবু সারাহ্ রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখকগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ ইবনে আবু সারাহ। তিনি কুরাইশ ও বনু আমের গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি হজরত ওছমান ইবনে আফ্ফানের দুধভাই ছিলেন। তাঁর মাতা হজরত ওছমানকে দুধ পান করিয়েছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিলো সা'দিয়া। নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, আবদুল্লাহর পিতা সাআদ ছিলো একজন প্রথম সারির মুনাফিক। সে ছিলো ওই ব্যক্তি, মক্কাবিজয়ের দিন যার রক্তপ্রবাহিত করাকে রসুলেপাক স. বৈধ করে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে আরও মুনাফিক ছিলো, যেমন ইবনে খাতাল। ইতোপূর্বে তার কথা বলা হয়েছে। পরে তারা হজরত ওছমান যুন্নুরাইনের সুপারিশের আশ্রয় নিয়েছিলো। তাদেরকে রসুলেপাক স. এর সামনে পেশ করা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তাদেরকে কবুল করেননি।

মক্কাবিজয়ের পর একস্থানে রসুলেপাক স. লোকদের বায়াত গ্রহণ করছিলেন। হজরত ওছমান তাকে লোকদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আরয করলেন, এই আবদুল্লাহ আপনার কাছে বায়াত করতে ইচ্ছুক। আপনি অনুগ্রহ করে তাঁর বায়াত গ্রহণ করুন। রসুলেপাক স. সাহাবা কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনো প্রত্যয়ী ব্যক্তি ছিলো না, আমি যখন তার বায়াত গ্রহণ থেকে স্বীয় হস্ত টেনে নিচ্ছিলাম তখন তাকে কতল করে দিতে পারে। সাহাবা

কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আপনি যদি চোখের ইশারা করতেন, তাহলে আমরা তাকে কতল করে দিতাম। তিনি বললেন, চোখের খেয়ানত করা নবীর জন্য সমীচীন নয়। যা হোক, হজরত ওছমান খুব কাকুতি মিনতি করলেন। অবশেষে রসুলেপাক স. তাঁর তওবা কবুল করলেন। রক্ত প্রবাহিত করা থেকে তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। হজরত ইকরামা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ ইবনে আবু সারাহ রসুলেপাক স. এর দরবারে ওহী লেখার কাজ করতেন। শয়তান তাঁকে গোমরাহ বানিয়েছিলো। তিনি একসময় বলতে লাগলেন, মোহাম্মদের কোনো খবর নেই। তিনি কী যে বলেন, আর আমি কী যে লিখি। আমার যা মনে চায় তাই লিখে দেই। তারপর তিনি মুরতাদ হয়ে কাফেরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেলেন। মক্কাবিজয়ের দিন রসুলেপাক স. তাকে কতল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হজরত ওছমান সুপারিশ করেন এবং রসুলেপাক স. তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এই আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ হজরত ওছমান যুন্নুরাইনের খেলাফতকালে মিসরবিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হজরত আমর ইবনুল আসের সেনাপতিত্বে মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণভাগে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। পরে আমীরুল মুমিনীন তাঁকে মিশরের শাসক বানিয়েছিলেন। হজরত ওছমানের শাহাদতের ফেতনার কালে তিনি আসকালান অথবা রামলায় অবস্থান করেছিলেন। হজরত আলী বা হজরত মুয়াবিয়া কারও কাছেই বায়াত গ্রহণ করেননি। তিনি ৩৬ বা ৩৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ৭৫ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। একথা বর্ণনা করেছেন ইবনে মিন্দা।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত ওছমানের জামানায় তিনি আফ্রিকা জয় করেছিলেন। তারপর মিশরের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি পঁচিশ বছর পর্যন্ত মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন। পরে হজরত ওছমানের কাছে চলে এসেছিলেন। তাঁর পরে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিলো সায়েব ইবনে হেশামকে। তিনি তিনটি জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে তিনটি জেহাদ হচ্ছে আফ্রিকা, যাতুসসাওয়ারী এবং রোম ভূখণ্ডের আসাবের নামক স্থানে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হয়েছিলো আফ্রিকায়। তিনি পারস্যের অংশ থেকে তিন হাজর দিনার পেয়েছিলেন। তিনি শাসক হিসেবে একজন গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলেন।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ্ রামলার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ফজরের নামাজের সময় তিনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! আমার জীবনের শেষলগ্ন হোক ফজরের নামাজের সময়। তারপর তিনি ওজু করে নামাজ পড়লেন। ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে বাম দিকে সালাম ফিরাতে উদ্যত হলেন। তাঁর রূহ কবয করে নেয়া হলো। এ থেকে

প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর তওবা বিশুদ্ধ ছিলো এবং শেষ পরিণাম ভালোই হয়েছিলো। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ তওবা করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ কল্যাণময় হয়েছিলো। তারপর তাঁর পক্ষ থেকে ইসলামপরিপন্থী কোনো কিছু প্রকাশ পায়নি। তিনি কুরাইশ বংশের একজন সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী লোক ছিলেন।

৩৪. আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখক সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ কুরাশী। তাঁর নাম ছিলো আবদুল্লাহ। কিন্তু তিনি তাঁর কুনিয়াতী নামেই খ্যাত ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এবং হজরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের দুধভাই ছিলেন। তাঁদেরকে দুধ পান করিয়েছিলেন আবু লাহাবের বাঁদী হজরত ছুওয়ায়বা। তিনি তাঁদেরকে চার বছর অন্তর অন্তর দুধ পান করিয়েছিলেন। প্রথমে দুধ পান করিয়েছিলেন রসুলেপাক স.কে। অতঃপর হজরত হামযাকে এবং শেষে পান করিয়েছিলেন আবু সালামাকে। তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী দশজনের মধ্যে ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর ফুফু বাররা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন। তিনি মদীনা তাইয়্যেবায় বদর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ইনতেকাল করেন। ইবনে মিন্দা এরকম বর্ণনা করেছেন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, উহুদযুদ্ধের পর তাঁর ইনতেকাল হয়। এটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। উহুদযুদ্ধে জখম হয়ে পরে নিরাময় লাভ করেছিলেন। রসুলেপাক স. ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে তাঁকে সেনাপতি বানিয়ে বনী সাআদের দিকে প্রেরণ করেন। সেখানে পৌঁছার পর তাঁর পূর্বের জখম পুনরায় চাঙ্গা হয় এবং তিনি সেখানেই পরলোকগমন করেন। ইবনে আবদুল বার বলেছেন ৩য় হিজরীর জমাদিউস সানীর কথা। তবে প্রথমোক্ত মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। হাবশায় দু'টি হিজরত করার পর তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং সর্বপ্রথম মদীনায় তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামার সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর ইনতেকালের পর রসুলেপাক স. হজরত উম্মে সালামাকে বিবাহ করেন। আযওয়াজে মুতাহ্হারার অধ্যায়ে তাঁর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হজরত আবু সালামার ইনতেকালের সময় রসুলেপাক স. তাঁর জন্য এই দোয়া করেছিলেন– হে আল্লাহ্! আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও। হেদায়েতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদা সমুন্নত করে দাও। তার মৃত্যুর পর পরবর্তীদের মধ্যে তার স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে দান করো ক্ষমা। হে রব্বুল আলামীন! তার জন্য কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত করে দাও।

৩৫. হোওয়ায়তেব ইবনে আবদুল উয্যা রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখক সাহাবীগণের মধ্যে আরেকজন সাহাবী ছিলেন হজরত হোওয়ায়তেব ইবনে আবদুল উয্যা কুরাশী আমেরী। তাঁর কুনিয়াত

ছিলো আবু মোহাম্মদ অথবা আবুল এসবা। তিনি মক্কাবিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী মুওয়াল্লাফাতুল কুলুব ছিলেন। ইসলামপ্রাপ্তির পর তিনি প্রায় ষাট বছর জীবিত ছিলেন। তিনি হুনায়ন ও তায়েফে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হুনায়নের গনিমত থেকে তিনি একশ' উট পেয়েছিলেন। হজরত ওছমানের শাহাদতের পর তাঁকে দাফনকারীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি একশ' বিশ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। ইমাম বোখারী তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে ওয়াকেদী বলেছেন, আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে ৫৪ বছর বয়সে তিনি ইনতেকাল করেন। আমীর মুয়াবিয়ার এমারতের শেষে তার ইনতেকাল হয়েছিলো বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু নাজীহ মক্কী, সায়েব ইবনে এযীদ। তাঁর পুত্র আবু সুফিয়ান এবং আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা। ইবনে মুঈন বলেছেন, আমার জানা নেই, রসুলেপাক স.থেকে তিনি কোনো হাদিস বর্ণনা করেছেন কি না।

ওয়াকেদী আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে হাযাম থেকে উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন, হোওয়ায়তেব বলতেন, আমি হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলাম। আমি সাহল ইবনে আমরের সঙ্গে কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধি করার জন্য এসেছিলাম। তখন আমার প্রবল ধারণা হয়েছিলো যে, মোহাম্মদ বিজয়ী হবেন। তারপর তিনি এ সম্পর্কে দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছেন। তাঁর থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলতেন, আমি মুশরিকদের সঙ্গে বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। স্বচক্ষে ফেরেশতাদেরকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে এবং যুদ্ধ করতে দেখেছিলাম। একথা আমি কুরাইশদের কারও কাছে বলিনি।

একদিন মারওয়ান ইবনুল হাকাম হোওয়ায়তেবকে বললেন, তোমার সমবয়সীদের পরে তোমার ইসলাম গ্রহণের কারণ কী? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহুল মুস্তাআন, আল্লাহর কসম– আমি বার বার ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রত্যেক বারই আপনার পিতা আমাকে বাধা দিয়েছিলেন। তিনি সব সময় আমাকে বলতেন, তুমি আপন মর্যাদার আসন থেকে পতিত হবে কেনো? কেনোই বা হবে বাপ-দাদার ধর্ম থেকে বিমুখ? এক ব্যক্তির অধীন হয়ে কেনো থাকবে? একথা শোনার পর মারওয়ান লজ্জিত ও চুপ হয়ে গেলেন। হোওয়ায়তেবের একথা শোনার পর মাওয়ান তাঁর পিতার শেষ পরিণামের কথা ভেবে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, মক্কাবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশদের মধ্যে স্বধর্মে আস্থাশীল এবং ইসলামকে অপছন্দকারী আমার চেয়ে বেশী আর কেউ ছিলো না। তারপর মক্কা বিজয় হলো। আর ভাগ্যে যা ছিলো তাই হলো।

'তবকাতে ইবনে সাআদ' গ্রন্থে ইবনুল মুনযের হোওয়ায়তেব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন আমি

অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হলাম। আউফের ঘরে আশ্রয় নিলাম। পথিমধ্যে আবু যরের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলো। তাঁর সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিলো। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করলাম। হজরত আবু যর বললেন, তুমি তোমার পরিবারে ফিরে যাও এবং নির্ভয়ে অবস্থান করো। অতঃপর হজরত আবু যর রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়ে আমার ক্ষমার বিষয়ে আবেদন করলেন। তারপর তিনি আমার কাছে এসে বললেন, এসো, আল্লাহ্‌র রসুল সবচেয়ে বেশী কল্যাণ ও এহসানকারী। সকল মানুষের চেয়ে তিনি অধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাঁর সম্মান তোমারই সম্মান, তাঁর শরাফত তোমারই শরাফত। যখন তুমি রসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হবে, তখন বোলো– 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহ।' আমি সে রকমই করলাম। রসুলেপাক স. বললেন, 'ওয়া আলাইকাস্‌সালাম'। তারপর আমি দ্বীন ইসলামের সাক্ষ্য প্রদান করলাম। তিনি স. খুব খুশি হলেন। বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহি ওয়া হাদাকা'। তারপর আমার কাছে ফিদইয়া তলব করলেন। আমি চল্লিশ হাজার দেরহাম ফিদইয়া দিলাম। আমি রসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গে হুনায়ন ও তায়েফে হাজির ছিলাম এবং তিনি আমাকে সে সবের গনিমত প্রদান করেছিলেন।

পরে তিনি মদীনায় চলে আসেন। সেখানেই বসবাস করেন এবং সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। মক্কার বাড়িটি তিনি আমীর মুয়াবিয়ার কাছে চল্লিশ হাজার দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। লোকেরা বলেছিলো, এখন তো তুমি বিত্তপতি। তিনি বলেছিলেন, এ মাল ওই ব্যক্তির জন্য কী অর্থবহ হবে, কোনো বস্তু যার জন্য মর্যাদাকর নয়। তাঁর এ সকল কথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ওই মুআল্লাফাতুল কুলুব ছিলেন, যার ইসলাম গ্রহণ সুন্দর হয়েছিলো।

৩৬. হাতেব ইবনে আমর রা.

রসুলেপাক স.এর দরবারের আর একজন লেখক সাহাবী ছিলেন হজরত হাতেব ইবনে আমর। 'ইস্তিআব' ও 'ইসাবা' গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে, হাতেব ইবনে আমর ছাড়া আরেকজন ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বুলতাআ। হাতেব নামের দু'জন সাহাবী ছিলেন। লেখক সাহাবী যিনি ছিলেন, তাঁর বংশ পরিচয় হচ্ছে হাতেব ইবনে আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে বুদ। অতঃপর 'ইস্তিআব' প্রণেতা বলেছেন, ইবনে আকাবা তাঁকে ওই লোকদের মধ্যে গণ্য করেছেন, যিনি বনী আমের গোত্র থেকে বদরে হাজির হয়েছিলেন। তিনি দারে আরকামে প্রবেশ করার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হাবশায় দুই হিজরতই করেছিলেন। ইবনে ইসহাক এরকম বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম হিজরত হাবশার দিকে করেছিলেন। ওয়াকেদী বলেছেন, আমাদের নিকট শেষোক্ত মতটিই সাব্যস্ত। ইবনে ইসহাক ও ওয়াকেদী উভয়েই বলেছেন,

তিনি বদরযুদ্ধে হাজির ছিলেন। 'ইসাবা'য় বলা হয়েছে, হাতেব ইবনে আমর ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে কুরাশীও আমেরী সাহল ইবনে আমরের ভাই ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের অন্যতম ছিলেন। হাবশায় হিজরতকারীগণের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন। যুহরী একথা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। তিনি একথার সাথেও একমত পোষণ করেছেন যে, হাতেব ইবনে আমর বদরে অংশগ্রহণকারীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি ছাড়া আরেকজন হাতেব ছিলেন। তাঁর বংশধারা হচ্ছে হাতেব ইবনে আমর ইবনে আতীক ইবনে উমাইয়া ইবনে যায়েদ ইবনে মালেক ইবনে আউস। তিনিও বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে ইসহাক অবশ্য তাঁকে বদরী সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করেননি। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। 'ইসাবায়' বলা হয়েছে, হাতেব ইবনে আমর ইবনে আতীক আনসারী আউস গোত্রের লোক ছিলেন। আবু আমর বলেছেন, তিনি বদরে হাজির ছিলেন। ইবনে ইসহাক তাঁকে বদরী হিসেবে উল্লেখ করেননি। আবু আমর বলেছেন, ইবনে ইসহাক ছাড়া অন্যান্যগণ তাঁকে বদরী সাহাবী হিসেবেই দেখেছেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

হাতেব রসুলেপাক স্. এর সহবত লাভ করেছিলো। 'ইসাবা ও ইস্তিয়াবে' তাঁর নাম লেখা হয়েছে হাতেব ইবনে আমর। আর 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবের বিশুদ্ধ সংকলনে হাতেব ইবনে ওমর নাম এসেছে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

৩৭. ইবনে খাতাল মুরতাদ

লেখকগণের মধ্যে আরেকজন ছিলো ইবনে খাতাল। তার নাম ছিলো আবদুল উয্যা। মক্কাবিজয়ের বৎসরে তার জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সে মক্কাবিজয়ের পূর্বে মদীনায় এসে মুসলমান হয়েছিলো। রসুলেপাক স. তার নাম রেখেছিলেন আবদুল্লাহ। জাকাত সংগ্রহের কাজে তাকে তার জনপদে পাঠানো হয়েছিলো। তখন সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং জাকাতের পশুপাল নিয়ে মক্কায় পালিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে কুরাইশদেরকে বলে আমি তোমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম কোনো ধর্ম পাইনি। মক্কাবিজয়ের দিন সে কাবাগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং কাবাগৃহের গিলাফ দ্বারা নিজকে আবৃত করে ফেললো। পরে কোনো এক সাহাবী তাকে দেখে ফেলে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ইবনে খাতাল কাবা ঘরের গিলাফ দ্বারা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। রসুলেপাক স. বললেন, কতল করো। রসুলেপাক স. এর নির্দেশে সেখানেই তাকে কতল করা হলো। এই ইবনে খাতাল মুরতাদ হওয়ার পূর্বে যখন সে মুসলমান ছিলো, তখন সম্ভবতঃ সে লেখার কাজ করতো। কিন্তু বিষয়টি সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। মুরতাদ হওয়ার পর তার দ্বারা লেখার কাজ করানোর কথা অবান্তর। সে কারণেই হয়তো আসমাউর রেজালে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়নি।

৩৮. উবাই ইবনে কাআব রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখকগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হজরত উবাই ইবনে কাআব। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবুল মুনযির এবং আবু তুফায়েল। উবাই ইবনে কাআব ছিলেন ইবনুল মুনযির অর্থাৎ আল মুনযিরের পুত্র। এক বর্ণনা মতে উবাই ইবনে কাআব ইবনে কায়স আনসারী অর্থাৎ কায়সের পুত্র। খাযরাজ ও বনু নাজ্জার গোত্রের লোক ছিলেন তিনি। ছিলেন মদীনার বাসিন্দা। তিনি দ্বিতীয় আকাবায় এবং বদরে হাজির ছিলেন। পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারে ওহী লেখার কাজ করতেন। রসুলেপাক স. এর পৃথিবীবাসের সময় যে ছয়জন সাহাবী কোরআন হেফজ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর পৃথিবীর জীবনে যে চারজন সাহাবী কোরআন মজীদ সমন্বিত করেছিলেন হজরত উবাই ইবনে কাআব ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। সাহাবা কেরামের মধ্যে তিনি ফকীহ ও ক্বারী ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে আবুল মুনযির নামে ডাকতেন। আর হজরত ওমর ফারুক বলতেন, আবু তুফায়েল। রসুলেপাক স. তাঁর উপাধি দিয়েছিলেন সাইয়্যেদুল আনসার। আর সাইয়্যেদুল মুসলিমীন উপাধি দিয়েছিলেন হজরত ওমর ফারুক।

রসুলেপাক স. একদিন হজরত উবাই ইবনে কাআবকে বললেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে তোমার সঙ্গে কোরআন পাঠ করার জন্য এবং তোমাকে কোরআন শোনানোর জন্য নির্দেশ করেছেন। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্তায়ালা কি আপনার কাছে আমার নাম নিয়েছেন? তখন রসুলেপাক স. এই আয়াত আবৃত্তি করলেন– 'কুল বিফাদ্বলিল্লাহি ওয়াবি রহমাতি ফাবিযালিকা ফাল্ইয়াফরাহূ হুয়া খইরুম মিম্মা ইয়াজ্মাউন' (হে রসুল! স. আপনি বলুন, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমতপ্রাপ্তিতে তারা যেনো উৎফুল্ল হয়। এটি তারা যা জমা করে তার চেয়ে উত্তম)। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. তাঁকে বললেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আমি তোমার সামনে সুরা 'লামইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারু' পাঠ করি। হজরত উবাই ইবনে কাআব নিবেদন করলেন, হক তায়ালা কি আপনার কাছে আমার নাম বলেছেন? রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ। একথা শুনে হজরত উবাই ইবনে কাআব কেঁদে ফেললেন। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. এবং উবাই ইবনে কাআব উভয়েই আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। রসুলেপাক স. একবার উবাই ইবনে কাআবকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুল মুনযির! কিতাবে এলাহীর মধ্যে কোন আয়াতটি মহান। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সবচেয়ে বেশী জানেন। পুনরায় রসুলেপাক স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুল মুনযির! তুমি কি জানো আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে মহান? তিনি নিবেদন করলেন, আয়াতুল কুরসী। রসুলেপাক স. বললেন, তোমার এলেম উপযোগী হোক। অতঃপর তিনি তাঁর আরও তারীফ করলেন। তিনি এলহামে এলাহী দ্বারা উক্ত আয়াত সম্পর্কে জানতে

পেরেছিলেন। অথবা রসুলেপাক স. এর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র হাত হজরত উবাই ইবনে কাআবের বক্ষদেশে স্থাপন করেছিলেন। তখন তিনি এই আয়াতে কারীমা সম্পর্কে এলেম লাভ করেছিলেন।

ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, হজরত উবাই ইবনে কাআব প্রথম ব্যক্তি, যিনি রসুলেপাক স. এর খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তিনিই সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি রসুলেপাক স. এর সর্বশেষ চিঠিতে লিখেছিলেন– ওমুকের পুত্র ওমুক লিখেছেন। হজরত উবাই ইবনে কাআব ছিলেন মধ্যমাকৃতির শুভ্র শ্মশ্রুবিশিষ্ট। তাঁর মাথার চুলও ছিলো শাদা। তিনি তাঁর মাথা ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করতেন না। সাহাবা কেরামের এক বিশাল জামাত তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালে ১৯, ২০ অথবা ২২ হিজরীতে ইনতেকাল করেন। হজরত ওমর ফারুক তখন বলেছিলেন, 'মাতা সাইয়্যেদুল মুসলেমীন' (মুসলমানদের সরদার মৃত্যুবরণ করেছেন)। কেউ কেউ বলেছেন, হজরত ওছমানের খেলাফতকালে ৩০ হিজরীতে ইনতেকাল করেছিলেন তিনি। এই মতটি অধিকতর সুসাব্যস্ত। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, অধিকাংশের মত হচ্ছে, তিনি ওমর ফারুকের খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম বাগবী হজরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওছমানের শাহাদতের পূর্বে জুমার দিন তিনি ইনতেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার এক মুসলমান রসুলেপাক স.এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে বলুন, আমরা যে রোগাক্রান্ত হই, তাতে কি আমাদের কোনো উপকার হয়? তিনি বললেন হাঁ, তাতে গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হয়। লোকটি বললো, অসুস্থতা যদি অল্প হয়? তিনি বললেন, কাঁটা যদি বিদ্ধ হয়, তবুও। তখন হজরত উবাই ইবনে কাআব নিজের জন্য দোয়া করলেন, শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর যেনো জ্বর না কমে। অবশ্য হজ্ব, ওমরা, জেহাদ, নামাজ ও ফরজ জামাতের পথে তা যেনো অন্তরায় না হয়। তাই তিনি সব সময় অসুস্থ জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় থাকতেন। এই অবস্থা ছিলো তাঁর জীবনের শেষলগ্ন পর্যন্ত। আবু ইয়ালা এরকম বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হাস্‌সান এটাকে সহীহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের আর একজন লেখক ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম ইবনে ইয়াগুছ ইবনে ওহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যোহরা। তিনি কুরাইশ বংশের বনু যোহরা গোত্রের লোক ছিলেন। মক্কাবিজয়ের বৎসর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তিনি তুলাকা সাহাবী ছিলেন। রসুলেপাক

স. এর চিঠিপত্র রচনার কাজ করতেন তিনি। রসুলেপাক স. এর নিকট তিনি এতো বিশ্বস্ত ছিলেন যে, তিনি তাঁকে শুধু বলতেন 'ওমুকের প্রতি একটি চিঠি লিখে দাও'। তিনি বলতেনও না 'এ কথাটি লিখে দাও'। তিনি চিঠি লিখে রসুলেপাক স.এর সামনে উপস্থাপন করতেন। রসুলেপাক স. চিঠির পাঠ না শুনেই তাতে মোহর লাগিয়ে দিতেন। রসুলেপাক স. এর পর তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুকের লেখার কাজ করতেন। তিনি হজরত ওমর ও হজরত ওছমানের পক্ষ থেকে অবৈতনিক বাইতুল মাল প্রতিনিধি নির্ধারিত হয়েছিলেন। পরে তিনি সে দায়িত্বে ইস্তেফা দিয়েছিলেন এবং হজরত ওছমান তা মঞ্জুর করে নিয়েছিলেন। মালেক বলেছেন, আমার জানা আছে, হজরত ওছমান আবদুল্লাহ ইবনে আরকামকে ত্রিশ হাজার দেরহাম উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি। বলেছিলেন, আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে কাজ করেছি। তিনি হজরত ওমর ফারুকের নিকট বিশ্বস্ত ও পছন্দনীয় ছিলেন। হজরত হাফসা বর্ণনা করেছেন, খলিফা ওমর বলেছেন, তোমরা যদি উচ্চবাচ্চ না করতে, তাহলে আমি আবদুল্লাহ ইবনে আরকামকে আমার স্থলাভিষিক্ত বানাতাম। আমি কাউকে তার চেয়ে বেশী আল্লাহ্ভীরু দেখিনি। হজরত ওমর তাঁকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমার কাওম যদি পার্শ্বদেশের ন্যায় হতো, তাহলে আমি কাউকে তোমার উপর অগ্রগণ্য করতাম না। হজরত ওমরের আযাদকৃত গোলাম ওরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং আসলাম এ রকম বর্ণনা করেছেন। তিনি রসুলেপাক স. থেকে কাযায়ে হাজত সংক্রান্ত একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি মেশকাত গ্রন্থকার 'জামাত ও তার ফযীলত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি এই– 'ইযা আক্বিমাতিস সলাতু ওয়া ওয়া জাদা আহাদুকুমল খলা ফাল ইয়াবদা বিল্খলা' (নামাজ দাঁড়িয়ে গেলে ওই অবস্থায় কারও যদি কাযায়ে হাজত হয়, তাহলে প্রথমে হাজত পুরো করবে (মলমুত্র ত্যাগের প্রয়োজন সম্পন্ন করবে)। তিনি হজরত ওছমান যুন্নুরাইনের খেলাফতকালে ইনতেকাল করেন।

৪০. মুআইকিব ইবনে আবী ফাতেমা দাউসী রা.

মুআইকিব ইবনে আবী ফাতেমা দাউসী প্রথম দিকে ইসলামগ্রহণকারী সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি সকল গযওয়াতে অংশগ্রহণ করেছেন। হজরত ওছমান বা হজরত আলীর খেলাফতকালে তিনি ইনতেকাল করেন। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এইটুকুই বলা হয়েছে। 'ইস্তিআব' এ এসেছে, মুআইকিব ইবনে আবী ফাতেমা সাঈদ ইবনুল আসের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। মুসা ইবনে আকাবা ইবনে শেহাব থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। সেখানে আরও বলা হয়েছে, তিনি সাঈদ ইবনুল আসের মিত্র ছিলেন। মক্কার প্রবীণ মুসলমান ছিলেন। তিনি হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত করে সেখানেই অবস্থান করেছিলেন। রসুলেপাক স. যখন

মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি সেখানে চলে আসেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি খয়বরে এসেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, খয়বরের আগেই এসেছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর পবিত্র মহর হেফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে বায়তুল মালের কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর জুযাম (চর্ম) রোগে আক্রান্ত হলে তিনি এ কাজ থেকে বিরত থাকেন এবং হজরত ওছমানের খেলাফতকালে ইনতেকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, ৪০ হিজরীতে হজরত আলীর খেলাফতের শেষের দিকে ইনতেকাল করেন। তাঁর কাছ থেকে খুব অল্পসংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে রসুলেপাক স. এর 'ওয়ায়লুল্লিল আ'কাবে মিনান্নার' হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ। মোজার উপর মাসেহ সংক্রান্ত আরেকটি হাদিস তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। রসুলেপাক স. এর দরবারে যাঁরা লেখার দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানেই সমাপ্ত হলো।

ফায়দা ঃ 'ইস্তিআব' রচয়িতা বলেছেন, হজরত উবাই ইবনে কাআব হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেতের পূর্বে রসুলেপাক স. এর ওহী লেখার কাজ করতেন। পরে তিনিও তাঁর সঙ্গে একত্রে লেখার কাজ করেছেন। হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত ওহী লেখার কাজে সাহাবা কেরামের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অপরিহার্য ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে প্রেরিত অনেক চিঠিপত্র তিনি রচনা করেছিলেন। মোহাম্মদ ইবনে সাআদ ওয়াকেদীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, মদীনায় রসুলেপাক স.এর ওহী লেখার কাজ সর্বপ্রথম করেন হজরত উবাই ইবনে কাআব। তাঁর অনুপস্থিতিতে রসুলেপাক স. হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে ডাকতেন এবং তাঁর মাধ্যমে ওহী লেখার কাজ করিয়ে নিতেন। রসুলেপাক স. যখন কাউকে কোনো জমি দান করার মনস্থ করতেন, তখন তিনি হজরত উবাই ইবনে কাআবকে লোকদের সঙ্গে পাঠাতেন। তিনি তাঁর লেখা পড়ার কাজ সম্পাদন করে দিতেন। কুরাইশদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম লেখার কাজ করেছিলো, সে হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে আবী সাঈদ ইবনে আবী সারাহ। কিন্তু সে মুরতাদ হয়ে মক্কায় ফিরে গিয়েছিলো। তখন এই আয়াত নাযিল হয়– 'তাহার চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, আমার নিকট ওহী হয়, যদিও তাহার প্রতি নাযিল হয় না' (৬ঃ৯৩)।

সব সময় রসুলেপাক স. এর চিঠিপত্র রচনার কাজ করেছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম যুহরী। যখন রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে কোনো সন্ধি-চুক্তি লেখার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি হজরত আলীকে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি তা সম্পাদন করতেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীকও রসুলেপাক স. এর দরবারে লেখার কাজ করতেন। ইবনে আবী শায়বা তাঁকে লেখকগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাঁরপর বেশীর ভাগ লেখার কাজ করেছেন হজরত ওমর ইবনুল

খাত্তাব, হজরত ওছমান যুন্নুরাইন, হজরত আলী মুর্তযা ও হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম। হজরত খালেদ ও হজরত আবানও লেখার কাজ করেছেন। রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

দূত ও প্রতিনিধিগণ

এই অনুচ্ছেদে রসুলেপাক স. কর্তৃক প্রেরিত দূত ও প্রতিনিধিগণের বর্ণনা করা হবে, যাঁদেরকে তিনি স. বিভিন্ন বাদশাহ্ ও শাসকদের নিকট বিভিন্ন সময়ে প্রেরণ করেছিলেন। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে এ ধরনের এগারোজনের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

১. আমর ইবনে উমাইয়া যমরী রা.

দূতগণের মধ্যে একজন ছিলেন হজরত আমর ইবনে উমাইয়া যমরী। তিনি ছিলেন বনী যমরা ইবনে আবদে মানাফ গোত্রের। তিনি ছিলেন দূরদর্শী, নির্ভীক ও বীরপুরুষ। বদর ও উহুদযুদ্ধে তিনি মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। মুশরিকেরা যখন উহুদযুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছিলো, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম তিনি বীরে মাউনার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বীরে মাউনার যুদ্ধের দিন আমের ইবনে তুফায়েল তাঁকে বন্দী করে হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। নাজ্জাশী রসুলেপাক স. এর পত্রের প্রতি আদব-সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। তাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর রসুলেপাক স. বাদশাহ্র কাছে দ্বিতীয় চিঠি প্রেরণ করেন সাইয়্যেদা উম্মে হাবীবাকে বিবাহের প্রস্তাব জানিয়ে।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় বর্ণিত হয়েছে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীকে পত্র দিয়ে মুসায়লামা কায্যাবের কাছে পাঠানো হয়েছিলো। রোমক সম্রাটের গভর্নর ফারওয়াহ ইবনে আমর খুজামীর নিকটও পত্র দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিলো। তিনি তাঁর কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তিনি ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের পর মাসউদ ইবনে সাআদের মাধ্যমে রসুলেপাক স.এর নিকট একটি পত্রও প্রেরণ করেন। সঙ্গে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করেন ফেদ্দা নামক একটি খচ্চর, যেরাব নামক একটি ঘোড়া এবং কিছু সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ। রসুলেপাক স.তাঁর উপঢৌকনসমূহ গ্রহণ করেন এবং মাসউদ ইবনে সাআদকে বারো আউকিয়া দান করেন। তাঁর কাছ থেকে তাঁর দুই পুত্র জাফর ও আবদুল্লাহ, শা'বী এবং আবু কেলাবা হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁকে হেজাজবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আমীর মুয়াবিয়ার জামানায় মদীনায় ইনতেকাল করেন। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, ৬০ হিজরীতে তিনি ইনতেকাল করেন।

২. দাহিয়া ইবনে খলীফা কালবী রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের দূতগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হজরত দাহিয়া ইবনে খলীফা কালবী। কালব ইবনে ইবরা নামক কবীলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে তাঁকে কালবী বলা হতো। তিনি একজন খ্যাতনামা সাহাবী ছিলেন। ছিলেন সুদর্শন ও রূপবান। তিনি যখন বাইরে বের হতেন, তখন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যাঁর আকৃতি ধরে হজরত জিবরাইল আগমন করতেন। তিনি বদরযুদ্ধে হাজির ছিলেন না। তবে উহুদ ও তার পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, সর্বপ্রথম তিনি খন্দকযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বায়াতে রেদওয়ানে হাজির ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে রোম সাম্রাজ্যে প্রেরণ করেছিলেন। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। ইমাম আহমদ শা'বীর সূত্রে তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। একবার তিনি রসুলেপাক স.এর কাছে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি কি গাধাকে ঘোড়ীর উপর প্রজনন কাজে ব্যবহার করবো? সে ঘোড়ী যদি একটি খচ্চর বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে আপনি তাতে আরোহণ করবেন। রসুলেপাক স. বললেন, এমন কাজ সেই করতে পারে, যার এলেম নেই। হজরত দাহিয়া ইবনে খলীফা কালবী আমীর মুয়াবিয়ার জামানা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের দূতগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী। কুরাইশ বংশের একটি শাখা সাহাম ইবনে আমরের প্রতি সম্পর্কযুক্ত করে তাঁকে সাহমী বলা হয়। তাঁর উপনাম ছিলো আবু হুযাফা। তিনি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী ও হিজরতকারী অগ্রগণ্য সাহাবী ছিলেন। হাবশার দিকে তাঁর ভাই কায়স ইবনে হুযাফার সঙ্গে দ্বিতীয় হিজরত করেছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে পারস্যের বাদশাহ কিসরার কাছে দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। ইতোপূর্বে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, তিনি কৌতুকপ্রিয় ও সদাপ্রফুল্লচিত্ত ছিলেন।

একটি ঘটনাঃ তিনি রসুলেপাক স. এর ছওয়ারীর টংগাটি শিথিল করে বাঁধলেন। ফলে রসুলেপাক স. এর আসন নিচে নেমে আসার উপক্রম হলো। তিনি এরকম এজন্য করেছিলেন যাতে দ্বিতীয় বার তিনি টংগা বেঁধে দেয়ার খেদমতটি করতে পারেন। উদ্দেশ্য জেনে রসুলেপাক স. খুশি হয়েছিলেন। তাঁর রসিকতার আরেকটি দৃষ্টান্ত এরকম— একবার রসুলেপাক স. তাঁকে কোনো সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি বানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বাহিনীর লোকদেরকে লাকড়ি সংগ্রহ করে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন। পূর্ণমাত্রায় যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হলো, তখন

তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। লোকেরা অস্বীকার করলো। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রসুল কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? একথা কি বলেননি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করবে, সে আমারই আনুগত্য করবে। লোকেরা বললো, আমরা রসুলেপাক স. এর উপর ইমান এনেছি এবং আপনার আনুগত্য করছি অগ্নি থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য। রসুলেপাক স. যখন একথা জানতে পারলেন, তখন তাঁকে সংশোধন করে বললেন, 'লা তাআতা লিমাখলূকিন ফী মা'শিয়াতিল খালেক' (আল্লাহ্‌র নাফরমানির ক্ষেত্রে কোনো মাখলুকের আনুগত্য করা যাবে না)। 'ইস্তিআব' ও 'ইসাবা' গ্রন্থে এরকম বর্ণনা করা হয়েছে।

হজরত ওমর ফারুকের শাসনামলে রোমীয়রা তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যায়। তারা তাঁকে কাফের বানিয়ে ফেলতে চায়। তাঁর উপর অনেক নির্যাতন চালায়। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং হেফাযত করেন। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। পরে তারা অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়। 'ইসাবা' গ্রন্থে নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার মর্যাদা ছিলো এরকম– রোমীয়রা তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেলো। রোমের বাদশাহ তাঁকে বললো, তুমি নাসারা হয়ে যাও। তাহলে নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধায় এদেশে থাকতে পারবে। তিনি অস্বীকার করলেন। রোমের বাদশাহ হুকুম দিলো, তাঁকে শুলীতে চড়িয়ে তীর নিক্ষেপ করো। তীর নিক্ষেপ করা হলো, কিন্তু তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হলেন না। অতঃপর তাঁকে শুলী থেকে নামিয়ে ডেগের মধ্যে পানি গরম করে তাতে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হলো, যাতে তাঁর শরীরের হাড় পর্যন্ত ঝলসে যায়। কিন্তু তিনি তাতেও নিরাপদ রইলেন। পরে তাঁকে বাদশাহ্‌র সামনে হাজির করা হলো। বাদশাহ্ কেঁদে ফেললো এবং তাঁকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলো। জিজ্ঞেস করলো, তাঁর কোনো আরযু আছে কি না। তিনি বললেন, হাঁ। আমার একটি আরযু আছে। আর তা হচ্ছে, আমার যে একশত সাথী কয়েদখানায় বন্দী আছে, তাদেরকে এরকম শাস্তি দেয়া হোক। তাহলে তারা আল্লাহ্‌র পথে চললে যে শাস্তি ভোগ করতে হয়, তা অনুধাবন করতে পারবে এবং ইসলামের প্রতি তাদের মহব্বত আরও বৃদ্ধি পাবে। এ কথা শুনে বাদশাহ বিস্মিত হলো। বললো, আমার মস্তকে চুম্বন করো, তাহলে আমি তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আমার সাথী কয়েদীদেরকেও কি মুক্তি দিবেন? বাদশাহ বললো, হাঁ। তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বাদশাহর মস্তক চুম্বন করলেন। অতঃপর বাদশাহ সকল মুসলমান যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করে দিলো। তাঁরা সকলেই যখন হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি স্বয়ং দাঁড়িয়ে তাঁদের মস্তক চুম্বন করলেন। শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী বলেছেন, এ ঘটনার প্রমাণস্বরূপ ইবনে আসাকের হজরত ইবনে আব্বাস থেকে একটি মুরসাল হাদিস বর্ণনা করেছেন।

৪. হাতেব ইবনে আবী বুলতা রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের দূতগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হজরত হাতেব ইবনে আবী বুলতা রা.। তিনি একজন মশহুর সাহাবী ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু আবদুল্লাহ। আরেক বর্ণনামতে কুনিয়াত ছিলো আবু মোহাম্মদ। তিনি কুরাইশ বংশের হালীফ ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের হালীফ ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হুমায়দ নামক এক কুরাইশ ব্যক্তির মাকাতেব (চুক্তিবদ্ধ) গোলাম ছিলেন। ওই ব্যক্তি প্রথমে তাঁকে মাকাতেব হিসেবে ক্রয় করে এবং পরে আযাদ করে দেয়। হাতেব ইবনে আবী বুলতা ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন। তিনি উহুদ, খন্দক এবং তার পরবর্তী গযওয়া (যুদ্ধ)সমূহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ২৩০ হিজরীতে হজরত ওছমান যুন্নুরাইনের খেলাফতকালে মদীনায় ইনতেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৫ বছর। হজরত ওছমান তাঁর জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন।

রসুলেপাক স. তাঁকে ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ মাকুকাসের নিকট দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। 'ইসাবা' গ্রন্থে মরযেবানী থেকে বর্ণিত হয়েছে। মু'জামুশশুয়ারা থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুর্খতার যুগ থেকেই হজরত হাতেব কুরাইশেদের অশ্বারোহী এবং কবি ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. থেকে কয়েকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হাদিস এই– রসুলেপাক স. বলেছেন, আমার ওফাতের পর যে আমাকে (স্বপ্নে) দেখবে, সে যেনো আমার জীবদ্দশায়ই আমাকে দেখতে পেলো। আর যে দুই হেরেমের কোনো একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, নিরাপদ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাকে কিয়ামতের দিন ওঠানো হবে। 'ইস্তিআব' রচয়িতা বলেছেন, এই হাদিস ছাড়া তিনি আর কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি। তবে 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, উলামা কেরাম 'ইস্তিআব' গ্রন্থকারের এই অভিমতকে বিস্ময়কর বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা আরও কিছু হাদিস তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনুস সাকান মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাতেব, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি রসুলেপাক স.কে বলতে শুনেছি, বেহেশতে একজন মুসলমানের সত্তরজন এবং তিরিশজন স্ত্রী থাকবে। সত্তর জন হবে বেহেশতী হুর আর তিরিশজন হবে দুনিয়ার নারী। 'ইসাবা' রচয়িতা বলেছেন, আমি তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত আরও তিনটি হাদিস পেয়েছি। তন্মধ্যে একটি বর্ণনা করেছেন ইবনে শাহীন, ইয়াহইয়া ইবনে আবদুর রহমান সূত্রে। তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতা হাতেব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে। হজরত হাতেব বলেছেন, আমাকে রসুলেপাক স. ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ মাকুকাসের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আমি রসুলেপাক স. এর পত্র নিয়ে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় হাদিস ইবনে

মিন্দা উক্ত সনদের মাধ্যমে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির প্রসঙ্গ– জুমার দিনের গোসল। তৃতীয় হাদিস হাকেম সফওয়ান ইবনে সুলায়মের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন হাতেব ইবনে আবী বুলতা থেকে। হাদিসটি হচ্ছে– হজরত আলী মুর্তযা রসুলেপাক স. এর সামনে হাজির হলেন। তখন তাঁর হাতে ঢাল ছিলো। সেই ঢালের মধ্যে পানি ছিলো। সম্ভবতঃ এই পানি আনা হয়েছিলো ওই যুদ্ধে, যেখানে রসুলেপাক স. জখম হয়েছিলেন। হজরত আলী সেই জখম পরিষ্কার করার জন্য পানি এনেছিলেন। আর হজরত ফাতেমা যাহ্‌রা চাটাই পুড়ে ছাই করে তা জখমের উপর চেপে ধরেছিলেন। যথাস্থানে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৫. শুজা ইবনে ওহাব রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের দূতগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন শুজা ইবনে ওহাব। তাঁকে আবু ওহাব আল আসাদী বলা হতো। তিনি বনী আবদে শামসের হালীফ (মিত্র) ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু ওহাব। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিনি প্রথম দিকের হিজরতকারী ছিলেন। তিনি হাবশায়ও হিজরত করেছিলেন। বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, শুজা ইবনে ওহাব বদর এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'ইস্তিআব' প্রণেতা বলেছেন, তিনি কোনো হাদিস বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। রসুলেপাক স. তাঁকে হারেছ ইবনে আবী শামার গাস্‌সানী কবীলার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি হালকা পাতলা, লম্বা আকৃতির এবং কুঁজো দেহবিশিষ্ট ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো চল্লিশোর্ধ্ব।

৬. সালীত ইবনে আমর রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের দূতগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন সালীত ইবনে আমর আমেরী। রসুলেপাক স. তাঁর হাতে পত্র দিয়ে পাঠিয়েছিলেন হাওদা ইবনে আলী হানাফী নামক এক ব্যক্তির কাছে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে শাহাদত বরণ করেন। আবু মা'শার বলেছেন, তিনি শহীদ হননি। 'ইস্তিআব' প্রণেতা বলেছেন, ইনশাআল্লাহ শেষোক্ত কথাটিই সঠিক। তিনি আরও বলেছেন, হজরত যুবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব একবার রসুলেপাক স. এর সাহাবীগণকে হুল্লা দান করলেন। একটি হুল্লা বেঁচে গেলো। হজরত ওমর বললেন, এমন একজন যুবকের নাম বলো, যে তার পিতাসহ হিজরত করেছিলো। লোকেরা তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের নাম বললো। তিনি বললেন, না বরং সালীত ইবনে আমর। একথা বলে তিনি তাঁকে হুল্লাটি পরিধান করিয়ে দিলেন।

৭. আলা ইবনুল হাযরামী রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের দূতগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হজরত আলা ইবনুল হাযরামী। লেখক সাহাবীগণের অধ্যায়ে তাঁর জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি দরবারের অন্যতম লেখক ছিলেন। আবার দূতও ছিলেন। রসুলেপাক স. হজরত আলা ইবনুল হাযরামীকে পত্র সহকারে বাহরাইনের গভর্নর মুনযের ইবনে সাবীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা.

রসুলেপাক স. এর মহান দরবারের দূতগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী। রসুলেপাক স. তাঁকে তায়েফের জনৈক বাদশাহ্ যিলকেলার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি একজন সুদর্শন ও মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু আবদুল্লাহ। আরেক বর্ণনা অনুসারে আবু আমর। তিনি বুজায়লী কবীলার ইয়ামনের বাসিন্দা ছিলেন। বুজায়লা ওই কবীলার এক মহীয়সী রমণীর নাম। তাঁর নামানুসারেই কবীলার নামকরণ হয়। হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহর ইসলাম গ্রহণের সময়কাল নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, রসুলেপাক স. যে বছর দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, সেই বছর রমজান মাসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এক বর্ণনা মতে রসুলেপাক স. এর ওফাতের চল্লিশ দিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে আবদুল বার একথাটিকে দৃঢ়তা দিয়েছেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কথাটি ভুল। কেননা বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা এসেছে, রসুলেপাক স. বিদায় হজের দিন তাঁকে বলেছিলেন, তুমি লোকদেরকে চুপ করাও। ওয়াকেদী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, তিনি রসুলেপাক স. এর উপস্থিতিতে ১০ম হিজরীর রমজান মাসে ইনতেকাল করেন।

হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ যখন রসুলেপাক স. এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন, তখন তিনি স. তাঁকে সম্মান করে চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং সাহাবা কেরামকে বলেছিলেন, তোমাদের নিকট যখন কোনো কাওমের নেতৃস্থানীয় লোক আসবে, তখন তোমরা তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমার সুরত সুন্দর করেছেন, তোমার সীরতও উত্তম করে দিবেন।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. সাহাবা কেরামের মধ্যখানে উপবিষ্ট ছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ইয়ামনের লোক। এমন সময় রসুলেপাক স. বললেন, অতিসত্তর তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যে ইয়ামনবাসীদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। এমন সময় হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন

হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী। তিনি ছানিয়াতুলওয়াদা পাহাড়ের দিক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে রসুলেপাক স. এবং সকল সাহাবীর প্রতি সালাম পেশ করলেন। সকলেই সমস্বরে সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর রসুলেপাক স. নিজের পবিত্র চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, হে জারীর! এর উপর বসো। রসুলেপাক স. ও তিনি মুখোমুখি বসে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তিনি যখন সেখান থেকে উঠে গেলেন, তখন সাহাবা কেরাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আজ আমরা জারীরের জন্য এমন দৃশ্য দেখলাম, ইতোপূর্বে আপনাকে কারও প্রতি এমন করতে দেখিনি। তিনি বললেন হাঁ, সে তার কাওমের সরদার। তোমাদের কাছে যখন কোনো কাওমের সরদার আসবে, তখন তোমরা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

হজরত জারীর নিজে বর্ণনা করেছেন, মদীনার নিকটবর্তী হয়ে আমি আমার উটটিকে থামালাম। পোশাকের বাক্স থেকে জামা বের করে পোশাক পরিবর্তন করে নিলাম। তারপর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। আল্লাহ্র রসুল তখন ভাষণ দিচ্ছিলেন। উপস্থিত লোকেরা আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। আমি আমার পাশে উপবিষ্ট একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার ব্যাপারে কী আল্লাহ্র রসুল কিছু বলেছিলেন?' লোকটি বললো, হাঁ। তোমার ব্যাপারে তিনি ভালো মন্তব্য করেছেন। তিনি তাঁর ভাষণের মধ্যেই বললেন, দূর এলাকা ইয়ামন থেকে অচিরেই তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আগমন করবে, যার চেহারার উপর ফেরেশতা হাত বুলিয়ে দিয়েছে (অর্থাৎ সে একজন সুদর্শন পুরুষ)। হজরত জারীর বলেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন, সেজন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করলাম। হজরত জারীর ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় এবং সুন্দর। তাঁর মুখমণ্ডল ছিলো যেনো চাঁদের টুকরা। 'শামায়েলে তিরমিযী'তে হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হজরত ইউসুফের সেই সৌন্দর্যের বিষয়ে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সে হিসেবে তাঁর সৌন্দর্যের পর জারীরের সৌন্দর্যের চেয়ে অধিক সুন্দর আর কোনো ব্যক্তিকে দেখা যায়নি বলে মনে হয়। হজরত ওমর ফারুক আরও বলতেন, জারীর এই উম্মতের ইউসুফ।

হজরত জারীর বলেন, আল্লাহ্র রসুলের নিকট যখন আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল আসতো, তখন তিনি আমাকে ডেকে আনতেন। আমি উত্তম পোশাক পরিধান করে মজলিশে হাজির হতাম। তিনি স. আমার জন্য আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। বর্ণিত আছে, তাঁর দেহ ছয়হাত লম্বা ছিলো। সহীহ্ বোখারীতে হজরত জারীর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, সেদিন থেকে রসুলুল্লাহ্ এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে চোখের আড়াল হতে দেননি। যখনই তিনি আমার প্রতি মেহেরবানী করে দৃষ্টিপাত করতেন, তখনই মৃদু হাসতেন এবং সে হাসিকে অস্থায়ী হতে দিতেন না। হজরত আবু যুরআ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত জারীর বর্ণনা করেছেন, আমি সকল মুসলমানের কল্যাণকামিতার উপর

রসুলুল্লাহ্‌র কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলাম। তিনি কোনো কিছু ক্রয়কালে বিক্রেতাকে বলতেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ! এ জিনিসের মূল্য আমি যা দিয়ে কিনেছি, তার চেয়ে বেশী'। যেমন তিনি যদি কোনো ঘোড়া খরিদ করতে যেতেন, আর তার দাম যদি চাওয়া হতো একহাজার দেরহাম, তখন তিনি তার মূল্য এমনি বৃদ্ধি করতেন যে, চার হাজার পর্যন্ত উঠিয়ে দিতেন। একবার রসুলেপাক স. তাঁকে তিরিশজন সাথী সহকারে যুলহুযায়ফায় একটি মূর্তিশালা ভাঙার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি তো ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। তিনি বলেন, অতঃপর রসুলুল্লাহ্‌ তাঁর পবিত্র হস্ত আমার বুকের উপর রাখলেন। আমি তাঁর হাতের শীতলতা আমার বক্ষাভ্যন্তর পর্যন্ত অনুভব করলাম। তিনি স. বললেন 'আল্লাহুম্মা ছাব্বিতহু–ওয়াজআলহু হাদিয়াম্মাহদিয়া' (হে আল্লাহ! তুমি তাকে সুসাব্যস্ত বানিয়ে দাও এবং তাকে করো হেদায়েতকারী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত)। তারপর আমি যুলহুলাফায় গমন করলাম এবং সেখানকার মূর্তিশালা ভেঙ্গে খান খান করে জ্বালিয়ে দিলাম ।

হজরত ওমর ফারুক ইরাক যুদ্ধে সকল আহলে বাজালিয়ার উপর হজরত জারীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কাদেসিয়া বিজয়েও বিরাট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তিনি। ইরাকযুদ্ধের পর তিনি কুফায় বসবাস করেছিলেন। সেখানে তাঁর একটি গৃহ ছিলো। আমীর মুয়াবিয়া তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দেননি। অবশেষে তিনি হজরত মুয়াবিয়ার পক্ষ-বিপক্ষ কারও পক্ষই অবলম্বন না করে একাকীত্ববরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি ৫১ অথবা ৫৪ হিজরীতে ইনতেকাল করেন।

কথিত আছে, একবার তিনি হজরত ওমরের মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। ওই মজলিশে কারও বায়ু বের হয়েছিলো এবং তাতে গন্ধও ছড়িয়ে পড়েছিলো। হজরত ওমর বললেন, এ বায়ু যে বের করেছে, তার উচিত উঠে গিয়ে ওজু করে আসা। হজরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! মজলিশের সকলকেই ওজু করার হুকুম দিন, যাতে কারও গোপন ভেদ ও দোষ প্রকাশ না পায়। তখন হজরত ওমর সকলকেই ওজু করে আসার জন্য হুকুম দিলেন। তিনি হজরত জারীরের একথা খুবই পছন্দ করলেন। বললেন, হে জারীর! তুমি জাহেলিয়াতে ও ইসলামে সর্বদাই সঠিক পথে থেকেছো। 'ইস্তি আব' গ্রন্থে এঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আমীরুল মুমিনীন এরকম একটি হুকুম দিয়েছিলেন। এখন জানা গেলো যে, একথাটি হজরত জারীরই বলেছিলেন।

৯. মুহাজির ইবনে উমাইয়া রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের দূতগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হজরত মুহাজের ইবনে উমাইয়া ইবনুল মুগীরা কুরাশী মাখযুমী। তিনি রসুলেপাক স. এর জীবনসঙ্গিনী হজরত উম্মে সালামার সহোদর ভাই ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো

ওলীদ। রসুলেপাক স.তাঁর এই নামটি পছন্দ করেননি। সাইয়্যেদা উম্মে সালামা রা. একদিন বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার ভাইটি মুহাজির হয়ে চলে এসেছে। রসুলেপাক স. বললেন, হুয়াল মুহাজিরু (আজ থেকে তার নাম মুহাজির)। সাইয়্যেদা উম্মে সালামা রা. বুঝতে পারলেন, রসুলেপাক স. তাঁর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এখন থেকে তার নাম হলো মুহাজির।

তারপর রসুলেপাক স. হজরত মুহাজির ইবনে উমাইয়াকে ইয়ামনের বাদশাহ হারেছ ইবনে আবদে কেলাল হিমইয়ারীর কাছে প্রেরণ করেন। তাছাড়া রসুলেপাক স. তাঁকে কিন্দা ও সফদ অঞ্চলের জাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করেন। পরে আমীরুল মুমিনীন আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে ইয়ামনের শাসক বানিয়েছিলেন। হাযরা মাওতের বাহার নামক কিল্লা যা কাফেরদের দখলে ছিলো, তিনি তা জয় করেছিলেন। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি মুশরিকদের সঙ্গে বদরযুদ্ধে এসেছিলেন। সেখানে তাঁর দুই ভাই হেশাম ও মাসউদ নিহত হয়েছিলো। তিনি তবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তাই সাইয়্যেদা উম্মে সালামা সব সময় রসুলেপাক স. এর নিকট তাঁর জন্য সুপারিশ করতেন। এক পর্যায়ে রসুলেপাক স. তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

১০. আমর ইবনুল আস রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের দূতগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হজরত আমর ইবনুল আস। রসুলেপাক স. তাঁকে আম্মানের রাজা জলন্দের পুত্রদ্বয় জায়ফার এবং আবদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ষষ্ঠ হিজরীর হুদায়বিয়ার সন্ধি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। হজরত আমর ইবনুল আসের জীবন বৃত্তান্ত লেখকগণের অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে।

১১. উরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফী রা.

রসুলেপাক স. এর দূতগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হজরত উরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফী। তাঁর উপনাম ছিলো আবু মাসউদ বা আবু ইয়াফুর। তাঁর দাদার নাম ছিলো ছাকীফ। সে নামের দিকে লক্ষ্য করে তাঁকে ছাকাফী বলা হতো। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি কাফের অবস্থায় এসেছিলেন। নবম হিজরীতে রসুলেপাক স. যখন তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রীগণের সংখ্যা ছিলো অনেক। রসুলেপাক স. তাঁকে হুকুম দেন, চারজনকে রেখে অন্যান্যদেরকে তালাক দিয়ে দাও। তিনি যখন তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে যেতে অনুমতি চাইলেন, তখন রসুলেপাক স. বললেন, তুমি যদি তাদের কাছে ফিরে যাও, তাহলে তারা তোমাকে কতল করবে। হজরত উরওয়া আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তাদের এক নেতার সঙ্গে আমার মহব্বত

রয়েছে। আর সে তার কবীলার মধ্যে একজন প্রিয় ও মান্যবর ব্যক্তি। যা হোক তিনি আপন কাওমে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলো না। ফজরের নামাজের সময় হলে তিনি তাঁর বাড়িতে কামরার ভিতর দাঁড়িয়ে আজান দিলেন। শাহাদাতাইন উচ্চারণ করছিলেন, ঠিক এমন সময় ছাকীফ গোত্রের এক নরাধম তাঁকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলো। ওই তীরের আঘাতে তিনি শাহাদতবরণ করলেন। তাঁর শাহাদতের সংবাদ শুনে রসুলেপাক স. বললেন, উরওয়ার উপমা ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে তার কাওমের লোকদেরকে আল্লাহ্তায়ালার দিকে আহ্বান করলো, আর তারা তাকে শহীদ করে দিলো। আহত অবস্থায় লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার খুনের ব্যাপারে তুমি কি কিছু বলতে চাও? তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক বিরল সম্মান। এ হচ্ছে এমন এক শাহাদত, যা আল্লাহ্তায়ালা আমার দিকে প্রেরণ করেছেন। হজরত ওমর ফারুক তাঁর উপর আক্ষেপ প্রকাশ করেন। আল্লাহতায়ালার বাণী– 'ওয়াক্বালূ লাও লা নুয্খিলা হাযাল কুরআনু আ'লা রজুলিম মিনাল ক্বারইয়াতাইনি আযীম' (এবং ইহারা বলে, এই কুরআন কেন নাযিল করা হইল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?)(৪৩ঃ৩১) ইবনে আব্বাস, ইকরামা, মোহাম্মদ ইবনে কাআব, সুদ্দী ও কাতাদা প্রমুখ মুফাসসিরগণ বলেছেন, এখানে কারইয়াতাইন বা দুই গ্রাম বলতে মক্কা ও তায়েফকে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য এই গ্রামের ব্যক্তি বলে কাদের বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কাতাদা বলেছেন, দুই গ্রামের দুই ব্যক্তি বলতে উতবা ইবনে রবীআ এবং উরওয়া ইবনে মাসউদ ছা'কাফীকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা আর তায়েফের আবদে লায়ল। কাতাদা আবার বলেছেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, অথবা উরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফী। অধিকাংশের মত এরকমই।

একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আমার সামনে আম্বিয়া কেরামকে আনা হলো। দেখলাম, রসুল মুসা ছিপছিপে শরীরবিশিষ্ট। নবী ঈসাকে দেখলাম উরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফীর সঙ্গে তাঁর অনেক মিল। অতঃপর নবী ইব্রাহীমকে দেখলাম। তোমাদের এই সাথীর সঙ্গে তাঁর খুব বেশী সাদৃশ্য রয়েছে। একথা বলে রসুলেপাক স. তাঁর নিজের দৈহিক গঠন ও অবয়বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তারপর জিবরাইলকে দেখলাম। দাহিয়াতুল কালবীর সঙ্গে তাঁর দেহের অনেকটা মিল রয়েছে।

'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে বর্ণিত এগারো জন সাহাবীকে দূতগণের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ আরও চারজনের নাম যুক্ত করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন হজরত আবু মুসা আশআরী, হজরত মুআয ইবনে জাবাল, হজরত ওয়াতরা ইবনে মেহসান এবং হজরত খোবায়ব ইবনে

যায়েদ ইবনে আসেম। এভাবে রসুলেপাক স. এর দূতগণের সংখ্যা দাঁড়ায় পনেরো। 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' কিতাবের আলোকে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে যাঁদের নাম উল্লেখ হয়েছে তাঁরা হলেন সর্বহজরত আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী, আইনিয়া ইবনে হাসীন, বুরায়দা, উব্বাদ ইবনে বিশর, রাফে ইবনে মাকীছ, যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান, বশীর ইবনে সুফিয়ান এবং আবদুল্লাহ ইবনে নুসায়র– রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম।

১২. আবু মুসা আশআরী রা.

হজরত আবু মুসা আশআরীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে কায়স। তিনি কুনিয়াতি নামেই বিখ্যাত ছিলেন। আশআর তাঁর কোনো এক পূর্বপুরুষের নাম ছিলো। তিনি সে নামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। তিনি ছিলেন ইয়ামনের সাবা সম্প্রদায়ের সন্তান। তিনি একজন নেতৃস্থানীয় সাহাবী ছিলেন। তিনি ইয়ামন থেকে মক্কায় এসে বসবাস করেন এবং মিত্রতা স্থাপন করেন সাঈদ ইবনুল আস উমাইয়ার সঙ্গে। পরবর্তীতে তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হাবশায় হিজরতও করেছিলেন। পরে হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের সঙ্গে হাবশা থেকে খয়বরে ফিরে আসেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরে গিয়েছিলেন। এই মতানুসারে তিনি হাবশায় হিজরত করেননি। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, অধিকাংশের মত এরকমই। কেননা প্রখ্যাত নবীচরিতবিশেষজ্ঞ মুসা ইবনে আকাবা, ইবনে ইসহাক ও ওয়াকেদী তাঁকে হাবশায় হিজরতকারীগণের তালিকায় উল্লেখ করেননি। পরে তিনি পঞ্চাশজন আশআরী লোকের সঙ্গে খয়বর বিজয়ের পর মদীনা শরীফে আগমন করেন। কেউ কেউ বলেছেন, নৌকা তাঁকে হাবশায় পৌঁছিয়েছিলো। সেখান থেকে তিনি মদীনায় এসেছিলেন। পরে আবার তিনি হাবশা থেকে হজরত জাফরের সঙ্গে এসেছিলেন।

রসুলেপাক স. ইয়ামনের কোনো কোনো অঞ্চলে তাঁকে শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। যেমন যুবায়দ ও আওন অঞ্চল। হজরত ওমর ফারুক তাঁকে বসরার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তাঁকে অপসারণ করে বিশ হিজরীতে হজরত মুগীরা ইবনে শু'বাকে নিযুক্তি দেন। তিনি আহওয়াস ও ইস্পাহান জয় করেছিলেন। হজরত ওছমানের খেলাফতের প্রাথমিককাল পর্যন্ত তিনি বসরার শাসক ছিলেন। পরে হজরত ওছমান তাঁকে সেখান থেকে অপসারণ করে কুফার শাসক নিযুক্ত করেন। তারপর থেকে হজরত ওছমানের শাহাদতকাল পর্যন্ত সেখানকার প্রশাসক ছিলেন। হজরত আলী খলিফা হওয়ার পর তাঁকে সেখান থেকে অপসারণ করেন। তিনি মক্কায় চলে আসেন। শুরু করেন নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন। কোনো পক্ষের সাথেই তিনি সম্পর্ক রাখতেন না। এমনি অবস্থায় এক বর্ণনা মতে মক্কায়, অপর বর্ণনানুসারে কুফাতে ইনতেকাল করেন ৪৪ বা ৫০ অথবা ৫২ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৬ বছর।

তাঁর দৈহিক গঠন ইয়ামনী লোকদের স্বাভাবিক গঠনের ন্যায় হালকা পাতলা এবং খাটো ছিলো। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীন, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত উবাই ইবনে কাআব এবং হজরত আম্মার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন তাঁর সন্তানগণ মুসা, ইব্রাহীম, আবু বুরদা, তাঁর স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ। আর সাহাবীগণের মধ্য থেকে হজরত আবু সাঈদ, হজরত আনাস ইবনে মালেক এবং হজরত তারেক ইবনে শেহাব। তাবেয়ীগণের মধ্য থেকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, আবু ওছমান নাহদী ও আবুল আসাদ প্রমুখ। বসরাবাসীদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় ফকীহ্ ও বড় ক্বারী ছিলেন। শা'বী বলেছেন, ছয় ব্যক্তি পেয়েছিলেন এলেমের সীমানা। তন্মধ্যে একজন ছিলেন হজরত আবু মুসা আশআরী। ইমাম বোখারী শা'বীর সূত্রে বলেছেন, আলউলামাউ সিত্তাতুন। অর্থাৎ তৎকালে আলেম ছিলেন ছয় জন। মদীনী বলেছেন, তৎকালে কাযী ছিলেন চারজন– হজরত ওমর, হজরত আবু মুসা, হজরত যায়েদ ইবনে ছাবেত এবং হজরত আলী। হাসান বসরী বলেছেন, বসরাবাসীর জন্য হজরত আবু মুসার চেয়ে উত্তম কোনো ব্যক্তি বসরাতে আগমন করেননি। তিনি সুললিত কণ্ঠে কোরআন মজীদ পাঠ করতেন। সহীহ্ হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, তাঁকে (হজরত আবু মুসা আশআরীকে) নবী দাউদের বংশধরদের বাদ্যযন্ত্র থেকে একটি বাদ্যযন্ত্র দেয়া হয়েছিলো। অর্থাৎ দাউদ আ. এর মতো সুমিষ্ট কণ্ঠ দান করা হয়েছিলো। আবু ওছমান নাহ্দী বলেছেন, হজরত আবু মুসার সুললিত কণ্ঠে কোরআন পাঠের চেয়ে সুন্দর বরবত ও মেযমারের আওয়াজ আমি কখনও শুনিনি। হজরত ওমর হজরত আবু মুসা আশআরীকে দেখলে বলতেন, হে আবু মুসা! আমাদেরকে আপন রবের স্মরণ করিয়ে দাও। একথার অর্থ– তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো, যেনো আমাদের আল্লাহ্তায়ালার কথা স্মরণ হয়। এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলতেন, আমাদেরকে আল্লাহ্র দরবারে নিয়ে চলো।

বাস্তব কথা এই যে, কোরআনুল করীম শ্রবণ আল্লাহ্পাককে যেভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা জাগায়, অন্য কোনো কিছু দ্বারা সেরকম হয় না। আরববাসীরা সুললিত কণ্ঠে কোরআন পাঠ করে থাকে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এক রাতে হজরত আবু মুসা আশআরী কোরাআনুল করীম তেলাওয়াত করছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁর তেলাওয়াতের প্রতি মন ও কান লাগিয়ে রাখলেন। দিনের বেলা তিনি স. তাঁকে বললেন, হে আবু মুসা! তুমি কোরআনুল করীম খুব সুন্দরভাবে পাঠ করো। আমি তোমার তেলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হয়েছি। হজরত আবু মুসা বললেন, আফসোস! আমি যদি জানতে পারতাম আপনি আমার তেলাওয়াত শুনছেন, তাহলে আমি আরও উত্তম ও সুন্দর করে তেলাওয়াত করতাম। হাদিস শরীফে এসেছে– 'যায়্যিনুল কুরআনা বিআসওয়াতিকুম' (তোমরা সুন্দর আওয়াজের দ্বারা কোরআনকে সুসজ্জিত করো)। এক বর্ণনায় এসেছে– 'যায়্যিনুল কুরআনা বিলুহূনিল আরাব'

(তোমরা আরবদের সুরে কোরআনকে সুন্দর করো)। অপর এক বর্ণনায় এসেছে– আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নবীকে উচ্চস্বরে কোরআন পাঠ করার অনুমতি যেভাবে দিয়েছেন, অন্য কোনোকিছুকে সেভাবে করতে অনুমতি দেননি। আবার এমন বর্ণনাও এসেছে, কোরআনুল কারীমকে যে দিলের দরদ দিয়ে সুর করে পাঠ না করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

১৩. মুআয ইবনে জাবাল রা.

হজরত মুআয ইবনে জাবালের কুনিয়াত ছিলো আবু আবদুর রহমান। তিনি আনসারী ও খাযরাজী ছিলেন। হালাল-হারাম সংক্রান্ত এলেমে অগ্রগামী ইমাম ও আখইয়ারে সাহাবা ছিলেন। উঁচু হিম্মতওয়ালা বীর বাহাদুর ছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম বুযুর্গ ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ওই সকল লোকদের মধ্যে একজন ছিলেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাঁদের দ্বারা উচ্চ আওয়াজে জিকির ও তসবীহ উচ্চারিত হতো। যে সত্তুর জন আনসার আকাবার শপথে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন। রসুলেপাক স. এর পৃথিবীবাসের সময় যাঁরা কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি। সহীহ্ গ্রন্থে হজরত ওমর থেকে মারফু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'ইক্বরাউল কুরআনা মিন আরবাআতিন' (তোমরা চার জনের কাছ থেকে কোরআন পাঠ শিক্ষা করো)। ওই চার জনের মধ্যে তিনিও ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁর এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের সঙ্গেও তাঁর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এমনিতে সকল মুসলমানই পরস্পরের ভাই। তৎসত্ত্বেও রসুলেপাক স. মুসলমানদের মধ্যে একজন অপরজনের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে কী হেকমত নিহিত, তা রসুলেপাক স.ই ভালো জানেন।

হজরত মুআয বদর যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রসুলেপাক স. ২৮ বৎসর বয়সে তাঁকে ইয়ামনের বিচারক ও শিক্ষক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া ইয়ামনে জাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের পরিচালনার দায়িত্বও দিয়েছিলেন তাঁকে। তাঁরা বিত্তশালীদের কাছ থেকে জাকাত আদায় করে প্রাপ্যাধিকারীদের মধ্যে বিতরণ করতেন। তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রায়কে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সমপর্যায়ের আখ্যা দিয়েছেন। রসুলেপাক স. তাঁকে ইয়ামনে প্রেরণকালে বললেন, হে মুআয! তুমি কিসের মাধ্যমে বিচার কার্য পরিচালনা করবে? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ্‌য় যা আছে, তার মাধ্যমে। রসুলেপাক স. বললেন, কিতাবুল্লাহ্‌য় যদি না পাও, তাহলে কিসের মাধ্যমে ফয়সালা করবে? তিনি বললেন, রসুলুল্লাহ্‌র সুন্নতের মাধ্যমে। রসুলেপাক স. বললেন, রসুলের সুন্নতেও যদি সমাধান না পাও, তাহলে? তিনি বললেন, এজতেহাদ করে সঠিক

সমাধানে পৌঁছার চেষ্টা করবো এবং নিজের অভিমতের উপর আমল করবো। রসুলেপাক স. শুকরিয়া-স্বরূপ দুইহাত উত্তোলন করে বললেন, সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি তাঁর রসুলের প্রতিনিধিকে তাঁর ও তাঁর রসুলের পছন্দ অনুযায়ী আমল করার তওফীক প্রদান করেছেন। রসুলেপাক স. এর এই বাণী তাঁর উম্মতের সকল মুজতাহিদগণের এজতেহাদের দলীল। হজরত মুআয উম্মতের সকল মুজতাহিদগণের ইমাম ও পেশওয়া ছিলেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং রসুলেপাক স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন মুআয ইমামুল উলামা (জ্ঞানীগণের নেতা) হয়ে উঠবেন। তিনি স. আরও বলেছেন, যখন আলেমগণ আপন প্রভুপালকের সামনে উপস্থিত হবে, তখন ইবনে জাবাল থাকবে তাদের সকলের আগে। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেশতাদের সঙ্গে মুআযকে নিয়ে গৌরব করবেন। হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত মুআযের সবকিছুই ইমান গ্রহণ করেছিলো। এমনকি তাঁর আঙটিও। রসুলেপাক স. আরও বলেছেন, হালাল-হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত মুআয ইবনে জাবাল। হজরত মুআযকে ইয়ামনে প্রেরণকালে রসুলেপাক স. ইয়ামনবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, আমি তোমাদের নিকট উত্তম ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছি। মাসরুক বর্ণনা করেছেন, আমরা একবার হজরত ইবনে মাসউদের নিকট এসেছিলাম। তিনি পাঠ করলেন– 'ইন্না মুআযান কানা উম্মাতান ক্বানিতাল লিল্লাহ্' (নিশ্চয়ই মুআয আল্লাহ্‌র অনুগত উম্মত)। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ফারওয়া ইবনে নওফল। তিনি বললেন, হজরত ইবনে মাসউদ সম্ভবতঃ এই আয়াত ভুলে গিয়েছেন। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, আমি এই আয়াত ভুলে যাইনি। বরং উপমাস্বরূপ কথাটি বলেছি এবং ইব্রাহীমের জায়গায় মুআয পাঠ করেছি। কেননা আমরা মুআযকে নবী ইব্রাহীমের সাথে উপমা দিতাম। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে এভাবে– হজরত ইবনে মাসউদ এভাবে পাঠ করলেন– 'ইন্না মুআযান কানা উম্মাতান ক্বানিতান লিল্লাহি হানীফাঁও ওয়া লাম ইয়াকু মিনাল মুশরিকীন'। ফারওয়া আশজায়ী বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী তো এরকম– 'ইন্না ইবরাহীমা কানা উম্মাতান কানিতাল লিল্লাহি হানীফা' (১৬ঃ১২০)। হজরত ইবনে মাসউদ আবার পূর্বের মতো পাঠ করলেন 'ইন্না মুআযান কানা উম্মাতান ক্বানিতান .....'। ফারওয়া আশজায়ী বলেন, আমি যখন দেখলাম, তিনি পূর্বের মতোই পাঠ করছেন, তখন বুঝলাম তিনি ইচ্ছা করেই এরকম পাঠ করছেন। ভুলবশতঃ নয়। আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, তোমরা কী জানো উম্মত কে? আর কানেত কাকে বলে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সাহাবী ভালো জানেন। তিনি বললেন, উম্মত হলো সেই ব্যক্তি, যে মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয়। আর লোকেরা তার অনুসরণ করে। আর কানেত ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র অনুগত। মুআয ইবনে জাবালের অবস্থাও ওই রকম। তিনি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দিতেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করতেন।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. তাঁকে ইয়ামনে প্রেরণকালে বলেছিলেন, তোমার জন্য হাদিয়া হালাল। কেউ তোমার কাছে হাদিয়া পাঠালে তুমি তা গ্রহণ কোরো। এর পর তিনি স. দোয়া করলেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমার অগ্র-পশ্চাৎ ও ডান-বাম দিক হেফাযত করুন। তিনি আরও বলেছিলেন, হে মুআয! আমি তোমার জন্য পছন্দ করি, তুমি নামাজের পর এই দোয়াটি পাঠ করবে– ইয়া রব্বি আ'ইন্নী আ'লা যিক্‌রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা'। আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' গ্রন্থে হজরত মুআযের প্রশংসায় বলেছেন, তিনি ইমামুল ফুকাহা (ফকীহগণের ইমাম) এবং মাখযানুল উলামা (আলেমগণের খনি) ছিলেন। তিনি আকাবা, বদর এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দৈহিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের অধিকারী এবং পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি গৌরবর্ণের ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিলো দীপ্তিময়, দন্তসমূহ ছিলো ঝকঝকে। আর চক্ষুদ্বয় ছিলো ঘনকালো। কাআব ইবনে মালেক বলেছেন, হজরত মুআয সুন্দর যুবক, দানশীল এবং তাঁর কাওমের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আল্লাহ্তায়ালার কাছে যা চেয়েছেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে তা দান করেছেন। আল্লামা ওয়াকেদী বলেছেন, তিনি খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন। সকল গযওয়ায় (যুদ্ধাভিযানে) তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আমর ইবনুল আস, ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস, আবদুল্লাহ ইবনে আওফা, আনাস ইবনে মালেক, আবু কাতাদা আনসারী, জাবের ইবনে ছামুরা প্রমুখ প্রখ্যাত সাহাবী ও তাবেয়ীগণ। তিনি ছিলেন দানশীল। কিছুই সংরক্ষণ করতেন না। সে কারণে সব সময় তিনি ঋণগ্রস্ত থাকতেন। এমনকি তাঁর সকল কিছু ঋণে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিলো। অবশেষে তিনি রসুলেপাক স. এর কাছে এসেছিলেন এবং ঋণদাতাদের ঋণ মাফ করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করেছিলো। ঋণদাতারা যদি কারও কারণে কোনো ঋণ মাফ করতো, তাহলে রসুলেপাক স. এর জন্য হজরত মুআযের ঋণ মাফ করতো।

হজরত মুআয হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতকালে ইয়ামন থেকে ফিরে আসেন এবং পরে শাম দেশে চলে যান। তিনি যখন শামদেশে চলে যাচ্ছিলেন তখন হজরত ওমর ফারুক হজরত আবু বকর সিদ্দীককে বলেছিলেন, মুআযকে শামদেশে গমন থেকে বিরত রাখুন। কেননা মদীনাবাসীরা তাঁর ফেকাহ্ ও ফতওয়ার প্রয়োজন বোধ করে। তিনি চলে গেলে এ বিষয়ে সমস্যার সৃষ্টি হবে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বললেন, আমি এমন ব্যক্তির গতি কীভাবে প্রতিরোধ করবো, যে শাহাদতের মর্যাদাভিলাষী। হজরত ওমর বললেন, আল্লাহ্র শপথ! এমতাবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ্তায়ালা তাকে শাহাদতের ছওয়াব প্রদান করতে পারেন। হজরত ওমর ফারুক আবু উবায়দা

ইবনুল জাররাহ'র মৃত্যুর পর হজরত মুআযকে শামদেশের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর তিনি সে বৎসরই তাউন (প্লেগ) রোগে আক্রান্ত হয়ে উর্দুনের আমওয়াস গ্রামে ১৭ বা ১৮ হিজরীতে ইনতেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৩৩ বা ৩৪ অথবা ৪৮ বৎসর। হজরত আমর ইবনুল আস তখন সেখানেই অবস্থান করছিলেন। উর্দুন শহরে যখন প্লেগরোগ বিস্তার লাভ করলো, তখন আমর ইবনুল আস লোকদেরকে বললেন, তোমরা এইস্থান ছেড়ে চলে যাও। কেননা এই প্লেগরোগ হচ্ছে আগুন। তখন হজরত মুআয ইবনে জাবাল তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আশ্চর্যরকমের নির্বোধ। তুমি এবং তোমার লোকেরা নিতান্ত মূর্খ। আমি রসুলেপাক স.কে বলতে শুনেছি, প্লেগরোগ এই উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ। হে আল্লাহ্! তুমি মুআয ও তার পরিবারকে ওই লোকদের মধ্যে স্মরণ করো, যাদেরকে তুমি এই রহমতের (প্লেগরোগ) মধ্যে স্মরণ করেছো। বর্ণিত আছে, প্লেগরোগ তীব্র ও বিস্তৃত হলো। তিনি আল্লাহ্তায়ালার কাছে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্! এ হচ্ছে তোমার পক্ষ থেকে তোমার বান্দাদের প্রতি রহমতস্বরূপ। হে খোদাওয়ান্দ করীম! মুআয ও তার পরিবার পরিজনকে এই রহমত থেকে বঞ্চিত কোরো না। হজরত মুআয রোগাক্রান্ত হলেন। সমুপস্থিত হলো তাঁর অন্তিম যাত্রার সময়। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমার গলা শক্ত করে চেপে ধরো। তোমার সম্মান ও পরাক্রমের শপথ! অবশ্যই তুমি জানো যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বর্ণিত আছে, এক মহিলার স্বামী দুই বৎসর পর্যন্ত অনুপস্থিত ছিলো। দুই বৎসর পর তার স্বামী বাড়িতে ফিরে এসে দেখলো, তার স্ত্রী গর্ভবতী। লোকটি হজরত ওমর ফারুকের আদালতে মোকদ্দমা পেশ করলো। তিনি মহিলাটিকে সঙ্গেছার করার হুকুম দিলেন। হজরত মুআয ইবনে জাবাল হজরত ওমর ফারুককে বললেন, আপনার কর্তৃত্ব আছে মহিলার উপর। তার পেটে যে সন্তান রয়েছে, তার উপর আপনার কোনো কর্তৃত্ব নেই। তখন হজরত ওমর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তাকে আটক রাখার হুকুম দিলেন। অতঃপর মহিলা একটি দুই বছরের বাচ্চা প্রসব করলো। পিতা দেখলো, সন্তানটি হুবহু তারই মতো। তখন সে বলতে লাগলো, কাবার রবের শপথ! এ আমারই পুত্র। এই সংবাদ যখন হজরত ওমর ফারুকের কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, মেয়েটি যদি তার স্বামীর আকৃতির সন্তান প্রসব না করতো, তাহলে তো ওমর অক্ষম হয়ে যেতো। আর মুআয যদি না থাকতো, তাহলে ওমর হালাক হয়ে যেতো। হজরত মুআয ইবনে জাবাল রসুলেপাক স. এর পবিত্র পার্থিব জীবনের সময় এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীক এর খেলাফতকালে ফতওয়া প্রদানের কাজ করতেন।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, হজরত মুআয ইবনে জাবালের ওফাতের সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন তাঁর পাশে উপবিষ্ট লোকগণ ক্রন্দন

করতে লাগলেন। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন বস্তু তোমাদেরকে কাঁদাচ্ছে? লোকেরা বললো, আপনার এলেম, যা আপনার ইনতেকালের পর বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি বললেন, এলেম ও ইমান স্বস্থানেই থাকে। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকবে। যে ব্যক্তি এলেম ও ইমানের অনুসরণ করতে চাইবে, সে যেনো কিতাব ও সুন্নতের মধ্যে তা তালাশ করে। নিজের সকল মতকে যেনো কিতাবের উপর রাখে। কিতাবকে যেনো কারও মতের উপর পেশ না করে। তোমরা ওমর, ওছমান ও আলীর কাছ থেকে এলেম অর্জন করবে। তাদেরকে না পেলে তোমরা এলেম শিখবে ওয়ায়সের, ইবনে মাসউদ, সালমান এবং আবদুল্লাহ ইবনে সালামের কাছ থেকে। হজরত মুআয ইবনে জাবাল বলেছেন, আমি রসুলেপাক স.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বেহেশতে প্রবেশকারী দশজনের মধ্যে দশম ব্যক্তি। তিনি আরও বলেছেন, আলেমকে অপদস্থ করা থেকে বিরত থেকো। আর হকের হেফাযত কোরো। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেনো একথার উপর আমল করে এবং বাতেলকে দূরীভূত করে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে যা হওয়ার তাই হবে।

হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব থেকে বর্ণিত আছে, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব হজরত মুআয ইবনে জাবালকে বনী কেলাব গোত্রের নিকট পাঠালেন। তাঁকে এই দায়িত্ব দিলেন যে, তিনি যেনো তাদের মধ্যে সমস্ত মাল বণ্টন করে দেন। কিছুই যেনো অবশিষ্ট না রাখেন। তিনি সেখানে সমস্ত মাল বণ্টন করে সেই কম্বলটি কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে এলেন, যা তিনি গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, তুমি এমন জায়গা থেকে আসছো, যেখান থেকে প্রত্যেক কর্মচারী তার বিবি-বাচ্চার জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসে। তুমি কী এনেছো? হজরত মুআয বললেন, ওমর আমার উপর এক পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, তুমি রসুলের আস্থাভাজন। আর এখন আবু বকর ও ওমর তোমার উপর পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেন! তাঁর স্ত্রী মেয়েমহলে এ বিষয়ে অভিযোগ করলেন। হজরত ওমর ফারুকের কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি হজরত মুআযকে ডেকে আনালেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমার উপর কী ধরনের পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেছি? হজরত মুআয বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার স্ত্রীর কাছে এছাড়া আর অন্য কোনো ওজর পেশ করার মতো ছিলো না। কথাটি আমি কেনায়া হিসেবে বলেছি। একথা শোনার পর হজরত ওমর হাসলেন এবং কিছু মাল তাঁকে দিয়ে বললেন, যাও এগুলো দিয়ে তুমি তোমার স্ত্রীকে খুশি করো। ইবনে জারীর বলেছেন, হজরত মুআযের 'পর্যবেক্ষক' কথার অর্থ আল্লাহ্তায়ালার এলেম। হজরত মুআয ইবনে জাবালের মানমর্যাদা সম্পর্কে অনেক কিছুই বর্ণনা করা যায়। মোট কথা তিনি ছিলেন আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যভাজন একজন বিশেষ বান্দা।

১৪. ওয়াবরা ইবনে মেহসান রা.

তাঁর নাম ওয়াবরা ইবনে মেহসান। লোকেরা তাঁকে ইবনে মেহসান বলে ডাকতো। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ওয়াবরাকে বারা ইবনে মুসহের হানাফী বলা হতো। তিনি রসুলেপাক স. এর সাহচর্য পেয়েছিলেন। মুসায়লামা কায্যাব তাঁকে ওই দলের সঙ্গে নবী করীম স. এর কাছে পাঠিয়েছিলো, যে দলে ছিলেন ইবনে নাওয়াহা। রসুলেপাক স. এর সঙ্গে দেখা করার পর যিনি ইমান এনেছিলেন, তিনি হচ্ছেন ওয়াবরা ইবনে মেহসান। রসুলেপাক স. তাঁকে ইয়ামনে ফিরোজ দায়লামী এবং হাশীম দায়লামীর নিকট পাঠিয়েছিলেন ভণ্ডনবী আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করার জন্য। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. আসওয়াদ আনসী, মুসায়লামা কায্যাব এবং তুলায়হাকে দূতগণের দ্বারা হত্যা করিয়েছিলেন। আল্লাহ্র রাস্তায় দ্বীনকে উজ্জ্বল করার পথে কোনো কিছুই তাঁদেরকে বিরত রাখতে পারেনি। 'ইস্তিআব' গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী ওয়াবরা ইবনে মেহসান বা ইবনে মেহসান রসুলেপাক স. এর দূতগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। আর একথাও জানা যায় যে, ওয়াবরা ইবনে মুসহেব হানাফীও একজন ছিলেন, যিনি রসুলেপাক স. এর সোহবত হাসেল করেছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে প্রথমে ওয়াবরা ইবনে মুসহের হানাফী এবং পরে ওয়াবরা ইবনে মেহসান কালাবীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং উভয়েরই রসুলেপাক স. এর সোহবত পাওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। সেখানে ওয়াবরা ইবনে মেহসান থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. আমাকে বললেন, তুমি যখন সানআয় পৌঁছবে, তখন দেখতে পাবে, পাহাড়ের বরাবর সানআয় একটি মসজিদ আছে। সেখানে নামাজ পড়বে। আসওয়াদকে হত্যা করার পর ওয়াবরা বলেছিলেন, এটি ওই জায়গা, যেখানে নামাজ পড়ার জন্য রসুলেপাক স. আমাকে হুকুম দিয়েছেন। ওয়াবরা ইবনে মুসহের সম্পর্কে এরকম বর্ণনা এসেছে যে, মুসায়লামা কায্যাব তাঁকে ইবনে নাওয়াহা এবং ইবনে মাআন হানাফীর সঙ্গে প্রেরণ করেছিলো। রসুলেপাক স. এর নিকট আগমন, তাঁর রেসালতের সাক্ষ্য প্রদান এবং মুসায়লামা কায্যাব প্রসংগ ইত্যাদি বিষয়েও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানে।

১৫. খোবায়ব ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম রা.

হজরত খোবায়ব ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আনসারী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের ভাই। তিনি বদর, উহুদ ও খন্দকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিনি আকাবার শপথের সময়ও হাজির ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে ইয়ামামায় মুসায়লামা কায্যাবের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর মুসায়লামা কায্যাব যখন তাঁকে বলেছিলো, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে

মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল? তখন তিনি বলেছিলেন, হাঁ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল। সে বললো, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্র রসুল? তখন তিনি বলেছিলেন, আমি বধির কিছুই শুনতে পাই না। এভাবে সে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছিলো এবং অবশেষে মুসায়লামা তাঁকে কতল করে দিয়েছিলো। টুকরো টুকরো করেছিলো তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এভাবে তিনি শাহাদতের মাধ্যমে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধের দিন তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ তাঁর মায়ের কাছে এইমর্মে শপথ করে যুদ্ধের ময়দানে এসেছিলেন যে, যতোক্ষণ তিনি মুসায়লামাকে হত্যা না করতে পারবেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত গোসল করবেন না।

'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে এই কয়েকজনের বর্ণনা রয়েছে। আরও কতিপয় সাহাবীর আলোচনা করা হবে, যাদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য়। তাঁদের আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো।

১৬. আব্বাদ ইবনে বিশর রা.

আব্বাদ ইবনে বিশর আনসারী বনু আশহাল গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি মুসআব ইবনে ওমায়েরের হাতে হজরত সাআদ ইবনে মুআযের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বদর, উহুদ ও অন্যান্য গযওয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর অনেক খেদমত করেছিলেন। তাছাড়া তিনি তাঁকে পাহারা দেওয়ার কাজও করতেন। যে কারণে তাঁর নাম রসুলেপাক স. এর দরবারের পাহারাদারগণের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭. বুরায়দা রা.

দূতগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হজরত বুরায়দা। তাঁকে হজরত কাআব ইবনে মালেকের সঙ্গে গেফার ও আসলাম গোত্রের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো। ইতোপূর্বে রসুলেপাক স. এর দরবারের লেখকগণের সাথে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮. রাফে ইবনে মাকীছ রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের দূতগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন হজরত রাফে ইবনে মাকীছ জোহানী। তিনি বায়াতে রেদওয়ানে হাজির ছিলেন। তিনি মক্কাবিজয়ের দিন জোহানিয়া কবীলার পক্ষ থেকে পতাকা বহন করেছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে জোহানীয়া কবীলার জাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করেছিলেন। হজরত ওমরের সঙ্গে তিনি হাবিয়াতে উপস্থিত ছিলেন। আবু দাউদ শরীফে তাঁর কাছ থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যা তাঁর পুত্র হারেছ ইবনে রাফে'র সূত্রসম্পৃক্ত। 'ইসাবা' গ্রন্থেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। 'ইস্তিআবে' এসেছে, রাফে

ইবনে মাকীছ জোহানী, যিনি ছিলেন জুন্দুব ইবনে মাকীছের ভ্রাতা, তিনি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন– একটি আগুন বের হবে, যা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে ঘিরে ফেলবে। তার কাছ থেকে তাঁর পুত্র বিশর ইবনে রাফে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

১৯. যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান রা.

আরেকজন দূত ছিলেন হজরত যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান ইবনে উরফ ইবনে আবু বকর ইবনে কেলাব। তিনি বনু কেলাব গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু সাঈদ। ইবনে হেববান ও ইবনুস সাকান বলেছেন, তিনি রসুলেপাক স. এর সোহবত পেয়েছিলেন। তাঁর জন্য রসুলেপাক স. পতাকা তৈরী করিয়েছিলেন। ওয়াকেদী বলেছেন, তিনি তাঁর কাওম বনু কেলাবের জাকাত আদায়কারী ছিলেন। কুরাইশদের উপর তাঁকে বিচারক বানানো হয়েছিলো। তাঁকে মদীনাবাসী হিসেবে গণ্য করা হতো এবং তাঁকে সেখানকার নামজাদা বাহাদুর হিসেবে গণ্য করা হতো। তিনি এমন বীরপুরুষ ছিলেন যে, একাই একশ’ জনের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারতেন। একবার রসুলেপাক স. তাঁকে এক বাহিনীর নিকট প্রেরণ করলেন। লিখে পাঠালেন, তাঁকে যেনো আশীম যাবাবীর স্ত্রীর ওয়ারিশ বানানো হয়। কেননা রসুলেপাক স. এর পবিত্র পার্থিব জীবনে ভুলবশতঃ তাকে হত্যা করা হয়েছিলো। যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান উক্ত মহিলার স্বামীহত্যার রক্তপণ আদায় করেছিলেন এবং তিনি এ বিষয়ে হজরত ওমর ফারুকের কাছে সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। এই হাদিস সুনান রচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন। মেশকাত শরীফেও এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাসান বসরী বর্ণনা করেছেন তিনি একজন বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি তরবারী ধারণ করে রসুলেপাক স. এর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যে কারণে তাঁকে পাহারাদারগণের তালিকায় উল্লেখ করলেও অসঙ্গত হবে না।

২০. বিশর ইবনে সুফিয়ান রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের দূতগণের মধ্যে আরেকজন ছিলেন বিশর ইবনে সুফিয়ান আদাবী। রসুলেপাক স. তাঁকে বনু কাআব কবীলার নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

২১. আবদুল্লাহ ইবনে লুব্বিয়া রা.

তাঁর নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে লুব্বিয়া অথবা লুতাবিয়া। আবু হুমায়দ সাঈদী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইযদ কবীলার লোক ছিলেন। তাঁকে ইবনে লুতাবিয়া বলা হতো। রসুলেপাক স. তাঁকে বনু দাতইয়ান কবীলায় জাকাত সংগ্রহকারী নিযুক্ত করেছিলেন। সেখানে যাওয়ার পর লোকেরা তাঁর জন্য হাদিয়া

পাঠিয়েছিলো। সেখানে থেকে ফিরে আসার পর তিনি লোকদেরকে বললেন, এই যে জাকাতের মাল, যা সংগ্রহ করেছি, তা হচ্ছে তোমাদের জন্য। আর এই সব হাদিয়া তোহফা মানুষ যা আমাকে দিয়েছিলো, এ সব আমার জন্য। কিন্তু তিনি বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করলেন। এসব মাল তিনি নিজের ঘরে নিয়ে যাননি। সাহাবীগণকে বললেন, এ বিষয়ে রসুলেপাক স.কে খবর দেওয়া হবে। তিনি যা সিদ্ধান্ত দিবেন, সে অনুযায়ীই কাজ করা হবে। রসুলেপাক স.কে যখন এ কথা জানানো হলো, তখন তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন। হামদ ও ছানার পর এরশাদ করলেন, আমি তোমাদেরকে ওই ধরনের কাজে প্রেরণ করে থাকি, যার দায়িত্ব আল্লাহ্তায়ালা আমাকে প্রদান করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এসে এরকম বললো যে, এ সমস্ত (জাকাতের) মাল তোমাদের জন্য আর এ সব মাল (হাদিয়া) আমার জন্য। সে যদি তার পিতা বা মাতার ঘরে বসে থাকতো, তাহলে তাকে কি এ সব (হাদিয়া) দেওয়া হতো? তাকে একাজে নিয়োজিত করা হয়েছিলো বিধায়, এ সব হাদিয়া তাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ সব হাদিয়াও ওই জাকাতের মালের বিধানভুক্ত। অতঃপর রসুলেপাক স. বললেন, শপথ ওই সত্তার, যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন, কোনো ব্যক্তি যেনো এ জাকাতের মাল থেকে কিছু গ্রহণ না করে। তাহলে কিয়ামতের দিন সে মাল তার স্কন্ধে বহন করবে এবং ওই মাল উচ্চ আওয়াজে ফরিয়াদ করতে থাকবে। সে মাল উট, গাভী বা বকরী যাই হোকনা কেনো। অতঃপর রসুলেপাক স. তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় এতোটুকু সম্প্রসারিত করলেন যে, তাঁর পবিত্র বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হলো। শেষে তিনি স. বললেন, আল্লাহুম্মা হাল বাল্লাগতু (হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি)? হাদিসটি বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

২২. উয়ায়নিয়া ইবনে হাসীন ফাযারী রা.

উয়ায়নিয়া ইবনে হাসীন ফাযারী ছিলেন রসুলেপাক স. এর দরবারের একজন দূত। রসুলেপাক স. তাঁকে বনু তামীম কবীলার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এই উয়ায়নিয়া ইবনে হাসীন ছিলেন রুক্ষমেজাজী ও কর্কশভাষী। তিনি ছিলেন মুআল্লাফাতুল কুলুব শ্রেণীভূত। তবে তাঁর ইসলাম গ্রহণ সুন্দর হয়েছিলো। তাঁর জীবনচরিত সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সে সকল বর্ণনায় তাঁর চারিত্রিক দিক যথা– রুক্ষতা, কঠোরতা, দ্বীন সম্পর্কে উদাসীনতা ইত্যাদি বিষয় প্রতিভাত হয়েছে। বস্তুতঃ বনু তামীম গোত্রের অধিকাংশ লোকের অবস্থাই এরকম ছিলো।

বিশর ইবনে সুফিয়ান কা'বীকে বনু কাআবের জাকাত সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হলো। তিনি লোকদেরকে হুকুম দিলেন, তোমাদের জাকাতের চতুষ্পদ প্রাণীগুলো একত্রিত করো। তারা পশু এবং জাকাতের অন্যান্য মাল নিয়ে এলো।

স্বভাবগত মানসিক নিচতা এবং কৃপণতার কারণে মনে করলো, জাকাত বাবদ অনেক মাল তারা দিয়ে ফেলেছে। বনু কাআবের লোকদেরকে বনু তামীমের লোকেরা বললো, এতো বেশী পরিমাণ মাল তোমরা আপন আপন মাল থেকে পৃথক করছো কেনো? বনু কাআবের লোকেরা বললো, আমরা দ্বীন ইসলামের অনুসারী। আর ইসলাম ধর্মে জাকাত প্রদান করা একটি অপরিহার্য বিধান। বনু তামীমের লোকেরা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা একটি উটও এখান থেকে নিয়ে যেতে দেবো না। তারপর তারা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। বিশর ইবনে সুফিয়ান তখন সেখান থেকে পলায়ন করা উত্তম মনে করলেন। তিনি মদীনায় ফিরে এলেন। এই ঘটনা যখন রসুলেপাক স. অবগত হলেন, তখন তিনি বনু তামীমের উপর আক্রমণ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করতে মনস্থ করলেন। ঘোষণা দিলেন, কে আছে এমন, যে তাদের ওখানে গিয়ে তাদের ধৃষ্টতার বদলা নিতে পারে? উয়ায়নিয়া ইবনে হাসীন, যিনি বনু তামীমের সঙ্গে দুশমনী রাখতেন, তিনি বললেন, আমি। রসুলেপাক স. আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন আশ্বারোহীকে তাঁর সঙ্গে দিয়ে বনু তামীমের কাছে প্রেরণ করলেন। তাঁরা তাদের উপর হামলা করে তাদের সবকিছু ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসা হলো। বনু তামীমের লোকেরা কান্নাকাটি করে রসুলেপাক স. এর নিকট নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি আমাদের উপর কেনো এরকম আচরণ করছেন? আমাদের নারী-শিশুদেরকে বন্দী করে এনেছেন? এটি একটি সুদীর্ঘ ঘটনা, যা ইতোপূর্বে নবুওয়াতের নবম সালের ঘটনাবলীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'য় উপরে বর্ণিত কয়েকজনকে দূতগণের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। তবে তাঁদেরকে দূতগণের মধ্যে গণ্য না করে দরবারের কর্মচারীগণের মধ্যে গণ্য করলে অধিকতর সঙ্গত হতো বলে মনে হয়।

রসুলেপাক স. এর দরবারের কর্মচারীগণ

বিভিন্ন কবীলা থেকে জাকাত উসুল করতেন রসুলেপাক স. এর দরবারের কতিপয় সাহাবী। নিম্নে তাঁদের আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

১. আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.

তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আউফ আবু মোহাম্মদ কুরাশী যুহরী। তিনি ছিলেন বনু কেলাব গোত্রের জাকাত সংগ্রাহক। তাঁর জন্ম হয়েছিলো আমুল ফীলের দশ বছর পর। জাহেলী যুগে তাঁর নাম ছিলো আবদুল কাবা বা আবদে আমর। রসুলেপাক স. তাঁর নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন আবদুর রহমান। তাঁর মাতার নাম ছিলো শেফা বিনতে আবদে আউফ ইবনে

হারেছ ইবনে যোহরা। তিনি এবং তাঁর মাতা হজরত আবু বকর সিদ্দীকের হাতে প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হাবশায় দু'টি হিজরতই করেছিলেন। রসুলেপাক স. এর সঙ্গে সকল গযওয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উহুদযুদ্ধের দিন তিনি দৃঢ়পদে অবিচল ছিলেন। তবুকযুদ্ধের সময় রসুলেপাক স. তাঁর পশ্চাতে নামাজ পাঠ করেছিলেন। ঘটনাটি হাদিস শরীফে এভাবে বিবৃত হয়েছে– রসুলেপাক স. মরুভূমিতে তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। নামাজ শুরু হওয়ার পর নামাজের স্থলে উপস্থিত হলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ নামাজ পড়াচ্ছিলেন। রসুলেপাক স. এর আগমনের বিষয়ে টের পেয়ে তিনি পিছনে চলে আসতে চাইলেন। তিনি স. তাঁকে স্বস্থানে থাকার জন্য ইশারা করলেন। রসুলেপাক স. তাঁর সাথে এক রাকাত নামাজ আদায় করলেন। পরে মাসবুকের মতো বাকী নামাজ সম্পন্ন করলেন।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ একজন ধনী সাহাবী ছিলেন। তিনি মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর সম্পদশালী হওয়া এবং সকল খায়ের বরকত হাসেল হওয়া মদীনায় ব্যবসাবাণিজ্যের সুবাদেই হয়েছিলো। নবীচরিত বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, যে আনসারী ভাইয়ের সঙ্গে রসুলেপাক স. তাঁর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে বললেন, আমার দুইজন স্ত্রী রয়েছে। বহু ধন-সম্পদ ও বাগ-বাগিচাও আছে। আমি আমার একজনকে তালাক দিয়ে তোমাকে দান করবো। আর আমার বাগ-বাগিচাগুলো দু'জনের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিবো। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার স্ত্রীগণের মধ্যে বরকত দান করুন এবং তোমার সম্পদ বৃদ্ধি করে দিন। তুমি আমাকে শুধু বাজারের পথটি দেখিয়ে দাও। এ সবের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি বাজারে গিয়ে কেনা বেচা শুরু করলেন। এভাবে তাঁর জীবনধারায় এমন স্বচ্ছলতা এসে গেলো যে, তার শুমার করা মুশকিল হয়ে পড়লো। নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আউফের ওফাত কালে তাঁর স্ত্রী ছিলেন চার জন। তাঁদের জন্য তিনি তাঁর সম্পদের এক চতুর্থাংশ ধার্য করে যান। মীরাছ হিসেবে তাদের ভাগে এক চতুথাংশ মালই পড়েছিলো। সেই হিসেবে প্রত্যেকে পেয়েছিলেন আশি হাজার দেরহাম। কেউ কেউ বলেছেন, আশি হাজার দীনার। বদরী সাহাবীগণের মধ্যে একশ'জনের জন্য ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে পেয়েছিলেন চারশ' দীনার করে। তাছাড়া একবার এককালীন দান করেছিলেন চার হাজার দীনার। দ্বিতীয় বার চল্লিশ হাজার, তৃতীয়বারও দান করেছিলেন চল্লিশ হাজার। একবার তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাঁচশ' অশ্বারোহীকে পাঁচশ' ঘোড়া ও অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী দিয়ে সুসজ্জিত করেছিলেন। রসুলেপাক স. এর ওফাতের পর উম্মুল মুমিনীনগণের দেখা শোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি। রসুলেপাক স. এর পৃথিবীর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে

এধরনের ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছিলো। উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা আবদুর রহমান ইবনে আউফের ফরযন্দকে বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমার পিতাকে বেহেশতের ঝর্ণাধারা দ্বারা পরিতৃপ্তি দান করুন। সে রসুলুল্লাহ্র স্ত্রীগণের দেখা শোনার দায়িত্ব পালন করে। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বর্ণনা করেছেন, আমি রসুলেপাক স. থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে আউফকে বেহেশতে হাঁটুর উপর ভর করে চলাচল করতে দেখছি। একথা শুনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ শোকরানাস্বরূপ শামদেশ থেকে আগত তেজারতী কাফেলা সবই আল্লাহ্র রাস্তায় সদ্কা করে দিয়েছিলেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, হজরত আয়েশা সিদ্দীকা তাঁর ঘরে ছিলেন। হঠাৎ মদীনায় হৈচৈ পড়ে গেলো। আওয়াজ শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসের হট্টগোল হচ্ছে ? লোকেরা বললো, আবদুর রহমান ইবনে আউফের একটি তেজারতী কাফেলা শামদেশ থেকে এসেছে। ওই কাফেলায় সাতশ' উট ছিলো। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বললেন, তোমরা শুনে রাখো, আমি আল্লাহ্র রসুলকে বলতে শুনেছি, আমি আবদুর রহমানকে বেহেশতের মধ্যে বাচ্চাদের ন্যায় হাঁটুর উপর ভর করে চলতে দেখেছি। একথা আবদুর রহমান ইবনে আউফের কর্ণগোচর হলো। তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দীকার নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন– আমি তো এরকম কথা শুনতে পেলাম। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা তাঁর কাছে হাদিসটি পুনরায় বর্ণনা করলেন। হজরত আবদুর রহমান বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার এই কাফেলার সকল উট, সকল মাল ছামান, গদী ও চাদর সবই আল্লাহ্র রাস্তায় দান করলাম। আহমদ ও আবু নাঈম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত আছে, একবার রসুলেপাক স. তাঁকে বললেন, হে আউফের পুত্র! তুমি তো বিত্তপতি। বাচ্চারা যেভাবে হাঁটুর উপর ভর করে হাঁটে, তুমিও সেভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তুমি যদি মানুষকে কর্জ দাও, তবে আল্লাহ্তায়ালা তোমার দুই পা সম্প্রসারিত করে দিবেন। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি মানুষকে কী কর্জ দিবো? রসুলেপাক স. বললেন, যে মাল উপার্জন করছো, তা থেকে তুমি পৃথক হয়ে যাও। তিনি বললেন, সমস্ত মাল থেকে? রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ। সমস্ত মাল থেকে। অতঃপর হজরত আবদুর রহমান রসুলেপাক স. এর নির্দেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। পিছন দিক দিয়ে রসুলেপাক স. তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, আবদুর রহমানকে গিয়ে বলো, জিবরাইল এসে বলে গেলেন, সে যেনো মেহমানদারী করে, মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ায় এবং যাচ্ঞাকারীকে দান করে। আর এ সব কাজ শুরু করতে হবে পরিবার-পরিজন ও আপন লোকদের থেকে। সে যখন এ সবের উপর আমল করবে, তখন যে বিষয় তার জন্য দেখা দিয়েছিলো, তা দূরীভূত হয়ে যাবে। ইবনে আদী ও ইবনে আসাকের হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। রসুলেপাক স. আবদুর

রহমানের স্ত্রী উতবার কন্যা উম্মে কুলছুমকে বলেছিলেন, তুমি সাইয়্যেদুল মুসলেমীন (মুসলমানদের সরদার) আবদুর রহমানকে বিয়ে করো। আবু নাঈম ও ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফকে হাওয়ারীউন্নবী বলা হতো। তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারাগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি দীর্ঘদেহী, সরু চেহারা, লোহিতাভ শুভ্র বর্ণের এবং পুরো পাঞ্জাবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। উহুদযুদ্ধে তাঁর শরীরে বিশটি জখম হয়েছিলো। পায়েও কিছু জখম লেগেছিলো। যার কারণে তিনি কিছুটা খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন। উহুদযুদ্ধের দিন তাঁকে সাহায্য করার জন্য ফেরেশতারাও তাঁর সহযোদ্ধা হয়েছিলেন। তিনি রসুলেপাক স., হজরত আবু বকর সিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারুকের জামানায় রসুলেপাক স. থেকে যা কিছু শুনেছেন, সেই মোতাবেক ফতওয়া প্রদান করতেন। একবার হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের সঙ্গে মানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বিষয়ে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিলো। রসুলেপাক স. হজরত খালেদকে ডেকে বললেন, খালেদ! তোমার নিকট যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ থাকে আর সে স্বর্ণ থেকে এক এক কিরাত করে যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করো, তবে তা হবে আবদুর রহমানের একদিন এক রাতের ছওয়াবের সমান। ইবনে আসাকের এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রসুলেপাক স. ও হজরত ওমর ফারুক থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস এবং তাঁর ফরযন্দ ইব্রাহীম, হামীদ, মুসআব ও আবু সালামা। আর আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ ছিলেন ধর্মীয় নেতা এবং শ্রেষ্ঠ আলেম। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মেসওয়ার ইবনে মাখরামাও তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ৩৩ হিজরীতে তিনি ইনতেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭২, ৭৫ অথবা ৭৮ বৎসর।

বর্ণিত আছে, হজরত ওছমান যুন্নুরাইন যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তাঁর পর খেলাফত পরিচালনার জন্য হজরত আবদুর রহমানের নাম লিখেছিলেন, একথা শুনে তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ্! ওছমানের পূর্বে আমাকে মৃত্যুদান করো'। উল্লেখ্য, হজরত ওছমানের ছয়মাস পূর্বে হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের ইনতেকাল হয়েছিলো। তাঁর তিরোধানকালে হজরত আলী বলেছিলেন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ রুখসত নিয়ে গেলেন। তিনি নিঃসন্দেহে পাক-সাফ ছিলেন। আর তিনি রেখে গেলেন তলানী যুক্ত লোকগুলোকে। তাঁর পুত্র ইব্রাহীম বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুকালীন রোগ তাঁকে বেহুঁশ করে দিলো। হুঁশ ফিরে এলে তিনি বললেন, আমার কাছে কঠিন ও রুক্ষ দুইজন ফেরেশতা এসেছে। তারা আমাকে বললো, এসো আযীয ও আমীনের কাছে তোমার বিষয়ে ফয়সালা করা হবে। অতঃপর আরেকজন ফেরেশতা এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বললো, তাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাবে? তারা বললো, আমরা তার ফয়সালা করবো। তখন শেষোক্ত ফেরেশতা পূর্বোক্ত দুই

ফেরেশতাকে বললো, তোমরা তোমাদের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করো। তোমরা জানো না, এই ব্যক্তি ওই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত, যাদের সৌভাগ্যশালীতার বিষয় তার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়ই লিখে দেওয়া হয়েছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু নাঈম।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা হামীদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি রসুলেপাক স. এর আবির্ভাবের এক বৎসর পূর্বে ইয়ামনের দিকে সফর করছিলাম। ছিলাম উকান ইবনে আওয়ামের হিময়ারীর নিকটে। তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। এমন কি ছোটো শিশুর মতো তাঁর কোমর কুঁজো হয়ে গিয়েছিলো। ইয়ামনে অবস্থানের সময় সারাক্ষণ আমি তাঁর কাছেই ছিলাম। তিনি সর্বদাই আমার কাছে মক্কার অবস্থা জানতে চাইতেন এবং পরিষ্কার করে জানতে চাইতেন, তোমাদের মধ্যে সেই সুমহান ব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ কি ঘটেছে? তোমাদের মধ্যে তাঁর চর্চা কি শুরু হয়ে গিয়েছে? তোমাদের মধ্যে কেউ কি তোমাদের ধর্মের বিরোধিতা করে তাঁর ধর্মকে সত্য বলে জাহির করছে? আমি তাঁকে শুধু বলতাম, এখন পর্যন্ত তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। রসুলেপাক স. যখন আবির্ভূত হলেন, তখন আমি লোকটির কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি সুসংবাদ প্রদান করবো, যা তোমার ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়ে উত্তম হবে? আল্লাহ্তায়ালা তোমার কাওমে একজন নবী প্রেরণ করেছেন। তাঁর উপর আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তাতে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। সেই সম্মানিত নবী সত্যের হুকুম দেন এবং তা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মিথ্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তা খণ্ডন করেন। তিনি বনু হাশেম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আর তুমি তাঁর ভ্রাতৃশ্রেণীর লোক। হে আবদুর রহমান! তুমি একথাগুলো মনে গেঁথে নাও এবং অতিশীঘ্র তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করো। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আর আমার এই কবিতাটি তাঁর কাছে আবৃত্তি করো।

اشهد بالله ذي العالي + وفالق الليل و الصباح
انك في اليسر من القريش + يا ابن المسعدي من الذباح
ارسلت مدعوا اني يقين + ترشد للحق والفلاح
يذكر والسنن ركبي + عن بكرة السير و الرواح
نصرت جلساء الارض بيت + قد قص من فوقي جناحي
اذ نادي بالديار بعد + فانت حرزي ومستراحي
اشهد بالله رب موسي + انك ارسلت بالبطاح
فكن شفيعي الي مليك + يدعو البرايا الي الفلاح

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ওই আল্লাহর, যিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, যিনি রাত ও সকাল সৃষ্টিকারী। হে রসুল! নিশ্চয়ই আপনি কুরাইশদের রক্তপাতময় জীবনপ্রবাহে প্রশান্তি আনয়নকারী। হে ভাগ্যবানের সন্তান! আমি আমার অভিব্যক্তি প্রেরণ করলাম, নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস করি, আপনি সত্য ও কৃতকার্যতার জন্য পথপ্রদর্শন করেন। একথা আমার উটগুলোর রসনাসমূহ উচ্চারণ করবে তাদের সকাল-সন্ধ্যার পরিভ্রমণে। আমার বাড়ি পৃথিবীবাসীদেরকে সাহায্য করেছে। উপর থেকে আমার ডানাসমূহ কেটে দেওয়া হয়েছে। যখন পরবর্তীতে কেউ এ অঞ্চলে দ্বীনের ডাক দিবে, তখন আপনি হবেন আমার আত্মরক্ষা এবং শান্তির আধার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ওই আল্লাহ্র নামে, যিনি মুসার প্রভুপালক। সাক্ষ্য দিচ্ছি এই মর্মে যে, নিশ্চয়ই আপনি প্রেরিত হয়েছেন মক্কার মৃত্তিকায়। আপনি মহান মালিকের কাছে আমার শাফাআতকারী হবেন। আপনি মানুষকে কৃতকার্যতার দিকে আহ্বান করছেন।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বলেন, অতঃপর আমি সেই কবিতাটি মুখস্থ করে মক্কায় ফিরে এলাম। সর্বপ্রথম হজরত আবু বকর সিদ্দীকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তার কাছে সবকিছু খুলে বললাম। তিনি বললেন, তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সমগ্র সৃষ্টির নিকট প্রেরণ করেছেন। এসো তাঁর দরবারে হাজির হও। অতঃপর আমি রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হলাম। তিনি তখন সাইয়্যেদা খাদীজাতুল কুবরার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। আমি উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি স. আমাকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, তোমার চেহারা হাস্যোজ্জ্বল দেখছি। এর দ্বারা মঙ্গলেরই আশা করছি। বলো, হে আবু মোহাম্মদ! কী খবর এনেছো? আমি বললাম, কোন্ বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন? তিনি বললেন, তুমি একটি আমানত নিয়ে এসেছো, যা দিয়ে তোমাকে আমার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। তুমি আমার কাছে সেই আমানতটি পৌঁছে দাও। বলো। আর একটি কথা ভালোভাবে জেনে নাও যে, হিময়ারের পুত্র একজন খাস মুমিন বান্দা। হজরত আবদুর রহমান বলেন, তারপর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। সাক্ষ্য দিলাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'। তারপর হিময়ারীর কবিতাটি তাঁকে পাঠ করে শোনালাম। সবশুনে রসুলেপাক স. বললেন, তার জন্য কতোইনা সৌভাগ্য, যে না দেখেই আমার উপর ইমান এনেছে, আমার অনুপস্থিতিতেই আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সেতো আমার ভাই। ইবনে আসাকের এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইমাম সুয়ূতীও 'জমউল জাওয়াম' কিতাবে বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন।

২. আদী ইবনে হাতেম রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের আরেকজন কর্মচারী ছিলেন আদী ইবনে হাতেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ তায়ী। তিনি ছিলেন বনী তায় গোত্রভূত। তাঁকে তাঁর

গোত্রজনপদের কর্মচারী নিযুক্ত করে পাঠানো হয়েছিলো। তিনি দানশীলের পুত্র দানশীল ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিলো আবু যরীফ। প্রথমে তিনি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের একজন প্রিয়, অভিজাত ও মর্যাদাশালী ব্যক্তি। ছিলেন বক্তা। আরও ছিলেন উপস্থিত বুদ্ধিধারী। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকেই আমি প্রতি ওয়াক্তের নামাজের জন্য ছিলাম সদা উন্মুখ। এক বর্ণনায় আছে, আমি সব সময় ওজু অবস্থায় থাকতাম। রসুলেপাক স. এর পরে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের শাসনামলে যখন ধর্মত্যাগ প্রবণতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে জাকাত সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। ওই সময় তিনি নিজেও ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর কাওমের লোকদেরকেও ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ইরাকের বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বসবাস করতে থাকেন কুফায়। জামালযুদ্ধে তিনি হজরত আলীর সঙ্গে ছিলেন। ওই যুদ্ধে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তিনি সিফ্ফীন ও নাহরাওয়ান যুদ্ধেও উপস্থিত ছিলেন। আদী ইবনে হাতেম নিজে বর্ণনা করেছেন, আমি যখন রসুলুল্লাহ্র দরবারে হাজির হই, তখন তিনি আমার জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন, আমার জন্য নড়েচড়ে বসেছিলেন। একদিন রসুলুল্লাহ্ তাঁর পবিত্র প্রকোষ্ঠে উপস্থিত ছিলেন। অনেক সাহাবীও সমবেত হয়েছিলেন সেখানে। তখন তিনি আমার জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিয়ে আমাকে তাঁর পাশে বসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। শা'বী বর্ণনা করেছেন, হজরত আদী ইবনে হাতেম বলেছেন, একবার আমি আমার সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে হজরত ওমর ফারুকের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে অন্য এক ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিচ্ছিলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বললাম, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তুমিতো ওই সময় ইমান এনেছিলে, যখন লোকেরা ছিলো কাফের। তুমি ওই সময় সত্য চিনেছিলে, যখন মানুষ সত্য সম্পর্কে ছিলো অজ্ঞ। তুমি ওই সময় বিশ্বস্ততা প্রকাশ করেছিলে, যখন মানুষ করেছিলো বিশ্বাসঘাতকতা। রসুলেপাক স. এর পর সর্বপ্রথম জাকাত, যা সাহাবা কেরামের নিকটে পৌঁছেছিলো, তা ছিলো বনী তায়ীর জাকাত। আদী ইবনে হাতেম রসুলেপাক স. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন বসরা ও কুফার অনেক বর্ণনাকারী হাম্মাম ইবনুল হারেছ, আমের শা'বী, আবু ইসহাক হামাদানী ও খায়ছামা ইবনে আবদুর রহমান। তাঁর অধিকাংশ বর্ণনা ছিলো শিকারসংক্রান্ত। কেননা তিনি ছিলেন শিকারপ্রিয়। রসুলেপাক স. তাঁকে শিকারের জন্য এগিয়ে দিতে ওয়াদীয়ে আকীক পর্যন্ত তশরীফ নিতেন।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক তাঁর কাছে একশ' দেরহাম যাচ্ঞা করলো? তিনি বললেন, আমি হাতেম তায়ীর পুত্র। আমার কাছে মাত্র একশ' দেরহাম যাচ্ঞা করছো? আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাকে দিবো না। কথিত

আছে, একবার কোনো এক কবি তাঁর প্রশংসা করতে চাইলেন। তিনি বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। আমি প্রথমে দেখে নেই আমার গৃহে কী আছে (সেই অনুপাতে যেনো প্রশংসা করতে পারেন)। একথা বলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করে নগদ মুদ্রা, গোলাম ও ঘোড়া যা কিছু ছিলো সব নিয়ে এলেন এবং সবকিছুই তাঁকে দান করলেন।

৩. উয়ায়নিয়া ইবনে হাসীন রা.

উয়ায়নিয়া ইবনে হাসীন ইবনে ফারাযা ছিলেন রসুলেপাক স. এর পবিত্র দরবারের একজন কর্মচারী। নবম হিজরীর মহররম মাসের প্রথম দিকে ওই সকল গোত্র জনপদের দিকে কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন, যাঁরা ছিলেন নও মুসলিম। তিনি তাদের কাছ থেকে জাকাতের মাল সংগ্রহ করতেন। আরেকজন জাকাত আদায়কারী বিশর ইবনে সুফিয়ান কাবীকে প্রেরণ করা হয়েছিলো বনী কাআবের শাখাগোত্র যাযাআর নিকট। বিশর ইবনে কাআব জাকাত ও সদকার মাল সংগ্রহ করে একত্রিত করে নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন বনী তামীমের লোকজন অশালীনতা প্রদর্শন করে মাল আনতে বাধা প্রদান করলো। আশ্চর্যের বিষয় 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে হজরত বিশর ইবনে সুফিয়ানকে কর্মচারীদের তালিকায় উল্লেখ করা হয়নি। তার কারণ অবশ্য এমন হতে পারে যে, তিনি ওই কাজ সম্পাদন করতে ব্যর্থ হন এবং পালিয়ে আসেন। অবশ্য এটিও যুক্তিসঙ্গত যে, তিনি সেখানে গিয়েছিলেন একা একা। তাঁর সাথে কোনো সৈন্যবাহিনী ছিলো না। সৈন্যবাহিনী ছিলো হজরত উয়ায়নিয়া ইবনে হাসীনের সঙ্গে। এ জন্যই ওই অভিযানের নামকরণ হয়েছিলো সারিয়ায়ে উয়ায়নিয়া ইবনে হাসীন। তা'ছাড়া 'রওজাতুল আহবাব' পুস্তকে এমন কতিপয় ব্যক্তির নাম কর্মচারীদের তালিকায় উল্লেখ করা হয়নি যাঁরা মূলতঃ কর্মচারী ছিলেন। আমি তাঁদের জীবনী তালাশ করে এখানে উল্লেখ করছি।

৪. আয়াস ইবনে কায়স আসাদী রা.

মহাপবিত্র দরবারের আরেকজন কর্মচারী ছিলেন আয়াস ইবনে কায়স আসাদী। তাঁকে বনী আসাদ কবীলার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো। এ নাম অবশ্য উল্লিখিত জীবনীগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়নি। ওয়াল্লহু আ'লাম।

৫. ওলীদ ইবনে আকাবা রা.

দরবারে পাকের আরেকজন কর্মচারী ছিলেন ওলীদ ইবনে আকাবা ইবনে আবু মুঈত। তাঁকে বনী মুস্তালিক জনপদে প্রেরণ করা হয়েছিলো। তিনি হজরত ওছমান ইবনে আফ্‌ফানের মাতার ভাই ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিলো আবু যাহাব। তিনি এবং তাঁর ভাই খালেদ ইবনে আকাবা একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। 'ইস্তি আব' গ্রন্থে এতোটুকুই উল্লেখ করা হয়েছে। 'ইসাবা' গ্রন্থে তাঁর নাম বলা হয়েছে আম্মারা ইবনে আকাবা। তাঁকে বনী মুস্তালিক জনপদে পাঠানো হয়েছিলো। ইতোপূর্বে একথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, বনী মুস্তালিক জনপদে যখন তাঁকে জাকাত সংগ্রহ করার জন্য পাঠানো হলো, তখন তিনি ছিলেন অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত। কেননা তাঁর অন্তরে ওই জনপদবাসীদের প্রতি এক প্রকারের ভীতি কাজ করছিলো। তিনি সেখান থেকে জাকাত সংগ্রহ না করেই ফিরে এলেন। বললেন, সেখানকার লোকেরা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছে। তারা জাকাত দিতে চায় না। রসুলেপাক স. প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য সেখানে প্রেরণ করলেন হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে। তিনি জানালেন, এখানকার লোক পরিপূর্ণরূপে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন এই পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হলো– 'ইয়াআইয়্যুহাল লাযীনা আমানূ ইন জাআকুম ফাসিকুম বিনাবাইন ফাতবায়্যানূ' (হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে)(৪৯ঃ৬)। কেননা তিনি মূলতঃ হজরত ওছমানকে সাহায্য করার জন্য চলে এসেছিলেন। খলিফা হওয়ার পর হজরত ওছমান তাঁকে কুফার শাসক নিযুক্ত করেন এবং সেখানকার প্রশাসক হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। উল্লেখ্য, তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন পূর্ববর্তী খলিফা হজরত ওমর কর্তৃক। সাহাবা কেরামের নিকট বিষয়টি কঠিন মনে হলো। ওলীদ ইবনে আকাবা যখন কুফায় পৌঁছলেন, তখন হজরত সাআদ তাঁকে বললেন, আমি বুঝতে পারছিনা, আমার পরে তুমি এখানে কেমন করে শাসক ও আমেল হিসেবে কাজ করবে। অথবা আমি তোমার পর আহমক ও নাদান হিসেবে কেমন করে থাকবো। ওলীদ ইবনে আকাবা বললেন, হে আবু ইসহাক! নিজের সম্পর্কে এমন করে বোলো না। নিজেকে এভাবে চিহ্নিত কোরো না।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের কুনিয়াত ছিলো আবু ইসহাক। প্রকৃতপক্ষে দৌলত ও রাজত্ব সকাল বেলা একজনের হাতে থাকে, আবার সন্ধ্যায় হাত মিলায় অপরের হাতে। তখন হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ওলীদ ইবনে আকাবাকে আরও বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা অতি সত্বর খেলাফতকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করবে। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, ওলীদ ইবনে আকাবা যখন কুফায় আসেন, তখন হজরত সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাঁকে বলেছিলেন, আমি জানি না আমার পরে তুমি সৎকর্মশীল থাকতে পারবে কিনা? নাকি লোকেরা তোমাকে মন্দ বানিয়ে ফেলবে।

'ইস্তিআব' ও 'ইসাবা' গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে, ওলীদ ইবনে আকাবা কবি, ভাষালংকারবিদ, দানশীল, মহানুভব, সহিষ্ণু এবং কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি কুরাইশদের সৈন্যবাহিনীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। তবে তাঁর বদঅভ্যাস ও অপকর্মের খবরসমূহ ছিলো বহুলবিবৃত ও বিখ্যাত। তাঁর মদ্যপানের বিষয়টি তো সুসাব্যস্তের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। সহীহ্ বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওছমান তাঁর উপর শরাব পানের হদ বাস্তবায়ন করেছিলেন এবং তাঁকে পদচ্যুত করেছিলেন। সহীহ্ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে, হজরত

আলীকে হজরত ওছমান বলেছিলেন, তুমি এর উপর শরীয়তের হদ জারী করো। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে ইবনে শুযাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, ওলীদ একদিন লোকদের ফজরের নামাজ পড়ালেন চার রাকাত। অতঃপর জনতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আরও বেশী পড়াবো কি? হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন, আমরা আজ থেকে সব সময়ের জন্যই তোমার পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির উপর রয়েছি। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কোনো কোনো কুফাবাসী ওলীদের নাহক হওয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, হজরত ওলীদ ইবনে আকাবা সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সবগুলোই মুনকার (পরিত্যজ্য)। ওয়াল্লহু আ'লাম।

৬. হারেছ ইবনে আউফ মাযানী রা.

দরবারে পাকের আরেকজন কর্মচারী ছিলেন হারেছ ইবনে আউফ মাযানী। মুর্খতার যুগে অশ্বারোহীদের মধ্য থেকে তাঁকে বনী মুররাতে পাঠানো হয়েছিলো। রসুলেপাক স.যখন আবির্ভূত হলেন, তখন তাঁর উপর তাঁর কওমের রক্তপণের দায় বিদ্যমান ছিলো। ইসলাম ধর্ম তাঁকে ওই দায় থেকে মুক্তি দিয়েছিলো। বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. তাঁর কন্যার জন্য পয়গাম দিয়েছিলেন। তখন তিনি রসুলেপাক স.কে বলেছিলেন, আমার কন্যাকে আপনার বিবাহবন্ধনে দিতে আমি রাজী নই। কেননা সে শ্বেতী রোগে আক্রান্ত। অথচ তাঁর কন্যার কোনো শ্বেতী রোগ ছিলো না। একথা বলে তিনি যখন রসুলেপাক স. এর কাছ থেকে ঘরে ফিরলেন তখন দেখতে পেলেন, সত্যিই তাঁর কন্যা শ্বেতী রোগে আক্রান্ত হয়েছে। পরে তাকে তাঁর চাচাতো ভাই যায়েদ ইবনে হামযার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। তাদের ঔরস থেকে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি ইবনুল বুরসা নামে খ্যাত হয়েছিলেন। বনী মুররা থেকে একটি প্রতিনিধি দল এসেছিলো। ওই দলে তেরোজন লোক ছিলেন। হারেছ ইবনে আউফ ছিলেন তাদের দলপতি। বনী মুররার ওই দলটি এসেছিলো রসুলেপাক স. এর তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর। তারা এখানে এসে বাইতুল হারেছে অবস্থান করেছিলো। পরে সেখান থেকে তারা রসুলেপাক স. এর দরবারে উপস্থিত হয়। তিনি তখন মসজিদে অবস্থান করছিলেন। হারেছ ইবনে আউফ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা আপনার খান্দানেরই লোক (আমরা রুওয়াই ইবনে গালেবের আওলাদ)। রসুলেপাক স. তাদেরকে বনী মুররা গোত্রের কাছেই প্রেরণ করেন। হারেছ তখন নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের সঙ্গে এমন কাউকে পাঠান, যিনি আমাদের জনপদবাসীদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাবেন। আমরা তাঁর হেফাজত করবো। রসুলেপাক স. এক আনসারী ব্যক্তিকে তাঁদের সঙ্গে দিলেন। কিন্তু হারেছের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে কতল করে ফেললো। হারেছ তাদেরকে

বিরত রাখতে পারলেন না। তিনি বিষণ্ন বদনে দরবারে রেসালতে উপস্থিত হলেন। কবি হাস্‌সান ইবনে ছাবেতের একটি কবিতা আবৃত্তি করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি হাসসান ইবনে ছাবেতের জবানীতে আপনার কাছে আশ্রয় যাচনা করি। রসুলেপাক স. তাঁর কৈফিয়ত কবুল করলেন। হত্যাকারী হত্যাকৃত ব্যক্তির জন্য দিয়ত হিসেবে বেশ কিছু উট প্রেরণ করলো। রসুলেপাক স. উটগুলো গ্রহণ করলেন এবং নিহত আনসারী ব্যক্তির নিকটজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

৭. মাসউদ ইবনে রোজায়েল রা.

মহাপবিত্র দরবারের আরেকজন কর্মচারী ছিলেন মাসউদ ইবনে রোজায়েল আশজায়ী। তাঁকে আশজা সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো। তিনি বনী আবদুল্লাহ ইবনে গাতফানের লোক ছিলেন। বনী আবাসের জাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারী ছিলেন। তিনি আহযাবের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আশজা সম্প্রদায়ের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সুন্দর হয়েছিলো। আবু জাফর তাবারী এরকম বলেছেন। 'ইস্তিআব' গ্রন্থেও এরকম উল্লেখ এসেছে।

৮. আ'জাম ইবনে সুফিয়ান রা.

আরেকজন কর্মচারী ছিলেন আ'জাম ইবনে সুফিয়ান। তিনি উযরা, সালামান দায়লী, জুহানিয়া ও উবনা প্রভৃতি কবীলার জাকাত সংগ্রহকারী ছিলেন। এই নামটিও আমি সীরাত গ্রন্থসমূহে (নবীচরিতগ্রন্থাবলীতে) পাইনি। তবে উল্লিখিত সম্প্রদায়সমূহ এবং সেগুলোর প্রতি কর্মচারী প্রেরণ এবং সৈন্য মোতায়েন সংক্রান্ত আলোচনায় এ সকল তথ্যের সন্ধান মিলেছে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

৯. আব্বাস ইবনে মুরদাস

পাক দরবারের আরেকজন কর্মচারী ছিলেন আব্বাস ইবনে মুরদাস। তাঁকে বনী সুলায়ম কবীলায় প্রেরণ করা হয়েছিলো। এ নামটিও আমি সীরাতগ্রন্থে পাইনি। তবে আব্বাস ইবনে মুরদাস নামের যে আলোচনা পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মুআল্লাফাতুল কুলুব এবং কবি। সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তিনি জাহেলী যুগেও মদ্যপান করতেন না। তবে তিনি কর্মচারী ছিলেন কি না– তা সুস্পষ্ট নয়। 'রওজাতুল আহবাবে' তাঁর নাম লেখা হয়েছে আব্বাস ইবনে মুদরাস। ওয়াল্লহু আ'লাম।

১০. লাবীদ ইবনে হাতেব

আরেকজন কর্মচারী ছিলেন লাবীদ ইবনে হাতেব। দারেম কবীলায় তাঁকে কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিলো। তাঁর নামও সীরাত গ্রন্থাবলীতে নেই।

১১. আমের ইবনে মালেক

দরবারে পাকের অন্যতম কর্মচারী ছিলেন আমের ইবনে মালেক ইবনে জা'ফর ইবনে কেলাব ইবনে রাবীআ আমেরী কেলাবী। তিনি বনী আমের ইবনে সা'সাআর জাকাত সংগ্রহকারী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সুলায়মান তায়মী আবু ওছমান নাহদী সূত্রে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ও পানিতে ডুবে মৃত্যু– শাহাদতের মৃত্যু। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে এতোটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, ইবনে কানে তাঁকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করেছেন। 'ইসাবা'য় তাঁর জীবনী সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। দারাকুতনী, ইবনুস সাকান, ইবনে শাহীন প্রমুখ রাবীগণ (বর্ণনাকারীগণ) তাঁকে সাহাবীর মধ্যে গণ্য করেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, একবার মালায়েবুল আসেন্না (আমের ইবনে মালেককে বলা হতো) কোনো এক ব্যক্তিকে রসুলেপাক স. এর নিকট পাঠিয়ে তাঁর কাছে আপন ভাতিজার পেট ব্যাথার ঔষধ চাইলেন। রসুলেপাক স. তার জন্য মধু পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাকে মধু পান করালেন। সে সুস্থ হয়ে গেলো। অন্য একটি সনদেও এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। আমের ইবনে মালেক কাউকে রসুলেপাক স. এর নিকট পাঠিয়ে মধু চেয়েছিলেন। তিনি স. তাঁর জন্য এক কৌটা মধু পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মালায়েবুল আসেন্না (আমের ইবনে মালেক) তাবুক যুদ্ধের পর রসুলেপাক স. এর কাছে হাজির হলেন। তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তিনি দাওয়াত কবুল করলেন না। পরে তিনি রসুলেপাক স. এর জন্য হাদিয়া প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনি স. সে হাদিয়া গ্রহণ করলেন না। বললেন, আমি কোনো মুশরিকের হাদিয়া গ্রহণ করি না। কোনো কোনো সনদে তাবুকের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কেবল এতোটুকু বর্ণনা করা হয়েছে– আমের ইবনে মালেক এলেন। তাঁকে মালায়েবুল আসেন্না বলা হতো। রসুলেপাক স. তাঁকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। তিনি অস্বীকার করলেন। পরে তিনি হাদিয়া প্রেরণ করলেন। রসুলেপাক স. বললেন, আমি মুশরিকের হাদিয়া গ্রহণ করি না। আমের ইবনে মালেক বললেন, আপনি আপনার পছন্দমতো একজন দূত আমার সঙ্গে দিন। তিনি আমার আশ্রয়েই থাকবেন। রসুলেপাক স. রাহবতী নামক একজনকে প্রেরণ করলেন। অতঃপর বীরে মাউনার দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করা হয়।

'ইসাবা' রচয়িত বলেছেন, যারা যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তাঁকে সাহাবী হিসেবে গণ্য করেছেন, সে বিষয় তাঁর ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়। 'ইসাবা' প্রণেতা বিষয়টি বিবৃত করেছেন এভাবে– রসুলেপাক স. এর নিকট বনী জাফর এবং বনী আবু বকরের পঁচিশজন লোক এসেছিলো। তাদের মধ্যে আমের ইবনে মালেক ইবনে জাফরও ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁর প্রতি সুদৃষ্টি দিলেন। বললেন, আমি তোমাদের উপর এই ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত করছি। একথা বলে

তিনি স. যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কালাবীর প্রতি ইশারা করলেন। আর আমের ইবনে মালেককে বলেন, তুমি বনী জাফর কবীলার কর্মচারী। যাহ্হাক বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার জন্য কল্যাণের দোয়া করুন। এই হাদিস এই বিষয়টিকেই প্রমাণ করে যে, আমের ইবনে মালেক প্রথমে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন পরে। বীরে মাউনার ঘটনায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ৬ষ্ঠ হিজরীর ঘটনাবলীতে। তেমনি আমের ইবনে মালেকের ঘটনাও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণিত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে তিনি ইসলামী বাহিনীর সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন। সেখানে তাঁকে রসুলেপাক স. এর কর্মচারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে আমেল (কর্মচারী) হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

১২. সাআদ, আউফ ও যাহ্হাক

পাক দরবারের কর্মচারীগণের মধ্যে ছিলেন সাআদ ইবনে মালেক, আউফ ইবনে মালেক নযরী এবং যাহহাক কালাবী। তাঁদেরকে বনী কেলাব গোত্রের কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিলো। উল্লিখিত বাক্য থেকে বুঝা যায়, এই তিন জনকেই বনী কেলাবে প্রেরণ করা হয়েছিলো। আর এ কথাটিও জানা যায় যে, বনী আমের আর বনী কেলাব একই ব্যক্তি। তন্মধ্যে একজন হলেন সাআদ ইবনে মালেক ইবনে সেনান– যিনি হচ্ছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী। তিনি কুনিয়াতী নামেই সর্বাধিক খ্যাত ছিলেন এবং তিনি একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তাছাড়া আর এক ব্যক্তি ছিলেন সাআদ ইবনে মালেক ইবনে খালেদ আনসারী সাঈদী। তিনি বদরযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম হন। রসুলেপাক স. তাঁকেও গনিমতের অংশ দান করেছিলেন। তৃতীয় আরেকজন সাআদ ইবনে মালেক ছিলেন, যিনি সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি আশারা মুবাশ্শারার অন্যতম সাহাবী ছিলেন। চতুর্থ, সাআদ ইবনে মালেক উযরী ছিলেন বনী ইযরা গোত্রের। ওই গোত্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন। 'ইসাবা'য় আবু আমর ইবনে হুরায়দ আলউযরী থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি আমার পিতা–পিতামহগণের কিতাবে পেয়েছি, তাঁরা বলেছেন, আমরা নবম হিজরীতে বারো ব্যক্তির এক প্রতিনিধি দল রসুলেপাক স. এর নিকট হাজির হলাম। হামযা ইবনে নোমান, সাআদ ও সুলায়ম– মালেকের সন্তানগণ ওই দলে ছিলেন। সম্ভবতঃ এখানে সাআদ ইবনে মালেককেই বুঝানো হয়েছে।

আউফ ইবনে মালেক সম্পর্কে 'ইসাবা'য় বলা হয়েছে, খলীফা আউফ ইবনে মালেককে রসুলেপাক স. এর কর্মচারীগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যাঁকে হাওয়াযেন,

নযর ও ছাকীফ জনপদে প্রেরণ করা হয়েছিলো। তিনি আরও বলেছেন, সম্ভবতঃ তাঁর নাম পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে মালেক ইবনে আউফ। কিন্তু মূলতঃ তাঁর নাম আউফ ইবনে মালেক ইবনে সাঈদ ইবনে ইয়ারবো আবু আলী আন নাযরী। তিনি হুনায়নযুদ্ধের দিন মুশরিকদের দলপতি ছিলেন। মুশরিকেরা পরাজিত হলে মালেক ইবনে আউফ তায়েফে পৌঁছলেন। রসুলেপাক স. ঘোষণা দিলেন, সে যদি মুসলমান হয়ে আসে, তাহলে তার পরিবার-পরিজনকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। একশ' উট পুরস্কার দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, অন্যান্য মুআল্লাফাতুল কুলুবকে এরকম দেওয়া হয়েছিলো। অতঃপর মালেক ইবনে আউফ রসুলেপাক স. এর প্রশংসায় কবিতা পাঠ করেন। পরে রসুলেপাক স. তাঁকে তাঁর কবীলার যারা মুসলমান হয়েছিলেন, তাঁদের উপর আমেল (জাকাত সংগ্রহকারী) নিযুক্ত করেছিলেন। 'ইসাবা' রচয়িতা এরকমই বর্ণনা করেছেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান ইবনে আউফ ইবনে আবু বকর কেলাবীর উপনাম ছিলো আবু সাঈদ। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের জাকাত সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি একজন বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি একশত অশ্বারোহীর সমান বলে গণ্য হতেন। রসুলেপাক স. তাঁকে এক বাহিনীর সেনাপতি বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। ইমাম হাসান বসরী তাঁর কাছ থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। বাগবী আরও বর্ণনা করেছেন, ইবনে কানে ছিলেন ক্ষিপ্রহস্তে তরবারী চালনাকারী সাহসী যোদ্ধা। রসুলেপাক স. এর শিয়রের কাছে তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি। সে জন্য তাঁকে রসুলেপাক স. এর পাহারাদারও বলা যায়।

রসুলেপাক স. এর দরবারের মুয়াজ্জিনগণ

১. হজরত বেলাল রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের একজন মুয়াজ্জিন ছিলেন হজরত বেলাল ইবনে রেবাহ হাবশী। তাঁর মাতার নাম ছিলো হামামা। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু আবদুল্লাহ, বা আবু হাযেন। তিনি সুরাতের অধিবাসী ছিলেন। সুরাত মক্কা ও ইয়ামনের মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল। তিনি ছিলেন প্রবীণ ইসলাম গ্রহণকারী এবং পবিত্র অন্তরবিশিষ্ট। মক্কায় যারা সর্বপ্রথম ইসলাম প্রকাশ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, প্রথম ইসলাম প্রকাশকারী ব্যক্তি ছিলেন সাতজন– ১. রসুলেপাক স. ২. আবু বকর সিদ্দীক ৩. আম্মার ইবনে ইয়াসার ৪. তাঁর মাতা সুমাইয়া ৫. সুহায়ব ৬. বেলাল ও ৭. মেকদাদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। কিন্তু রসুলেপাক স.কে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর চাচা আবু তালেবের দুশ্চিন্তার কারণে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। আর আবু বকরকে নিষেধ করেছিলেন তার কাওমের কারণে। বাকী সাহাবীগণ ইসলাম প্রকাশ করেন এবং মুশরিকেরা তাঁদেরকে বন্দী করে নানা রকম কষ্ট দিতে থাকে। তাঁদেরকে

লোহার বর্ম পরিয়ে রোদের মধ্যে বসিয়ে রাখা হতো। প্রহার নির্যাতন তো চলতোই। মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যাদেরকে মুশরিকেরা ধরে নিয়ে যেতো না। তারপর তাদের সঙ্গে যথেচ্ছ দুর্ব্যবহার করতো। ফলে তাঁরা রোখসতের (সহজসাধ্যতার) উপর আমল করতেন। কিন্তু হজরত বেলাল ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি নিজেকে খুব অযোগ্য মনে করতেন। কিন্তু সত্য দ্বীনের উপরে দৃঢ়তার সাথে কায়েম থাকতেন। আল্লাহ্‌র পথে দুঃখ-যন্ত্রণাকে তিনি খুব সহজ মনে করতেন। উমাইয়া ইবনে খালফ জামহী ছিলো হজরত বেলালের মনীব। সে তাঁকে দুপুর বেলা মক্কার বালুকাময় স্থানে নিয়ে যেতো এবং তাঁর গলায় রশি বেঁধে ধরাশায়ী করতো। তারপর বিশাল বিশাল পাথর এনে তাঁর বুকে চাপিয়ে দিতো। বলতো এভাবে মরো অথবা মোহাম্মদের ধর্ম ছেড়ে দাও। কখনও এমন হতো যে, গলায় রশি বেঁধে মক্কার অলি-গলিতে ঘোরাতো। আর তিনি তখন বলতে থাকতেন 'আহাদ' 'আহাদ'। এক বর্ণনায় এসেছে, বলতেন 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্'। কিন্তু তকদীরে এলাহীর কী সুন্দর বিধান। বদরযুদ্ধে ওই নরাধম হজরত বেলালের হাতেই নিহত হলো। একদিন ওই নরাধম হজরত বেলালের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলো, হজরত আবু বকর সিদ্দীক ওই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। তিনি এক হাবশী গোলামের বদলায় হজরত বেলালকে কিনে নিলেন। বর্ণিত আছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক হজরত বেলালকে ক্রয় করলেন তখন, যখন তিনি একটি প্রকাণ্ড পাথরের নিচে চাপা পড়ে ছিলেন। বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. তখন হজরত আবু বকরের নিকটে গিয়ে বললেন, আমার অর্থ কড়ি থাকলে বেলালকে খরীদ করতাম। অতঃপর হজরত আবু বকর সিদ্দীক হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নিকট দেখা করে বলেন, আমার জন্য বেলালকে খরীদ করুন। হজরত আব্বাস উমাইয়া ইবনে খালফের স্ত্রীর কাছে গেলেন। কেননা ওই মহিলাই তাঁর মালিক ছিলো। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, তুমি তোমার ওই গোলাম, যার নাম বেলাল– তোমার হাত থেকে চলে যাওয়ার এবং তার মূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার পূর্বে তাকে কি তুমি আমাদের কাছে বিক্রি করবে? সে বললো, তোমরা তাকে দিয়ে কী করবে? সে তো একটা অপদার্থ। কোনো কাজেই আসে না। দ্বিতীয়বার তিনি এলেন এবং সেই একই কথা বললেন। অবশেষে সে রাজী হলো এবং হজরত আব্বাস তাঁকে খরীদ করে এনে হজরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকটে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে আযাদ করে দিলেন। হজরত ওমর বলেছিলেন, আবু বকর আমাদের সরদার, তিনি আমাদের আর এক সরদার বেলালকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছেন।

হজরত বেলালের পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলী এরকম– রসুলেপাক স. এর ওফাতের পর তিনি শাম দেশে চলে যান। হজরত আবু বকর সিদ্দীক বার বার তাঁকে মদীনায় অবস্থানের জন্য এবং মসজিদে নববীতে আজান দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। হজরত বেলাল বলেছিলেন, হে আবু বকর! আপনি যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির

জন্য আমাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়ে থাকেন, তাহলে এখনও আমাকে ছেড়ে দিন এবং আমাকে মুক্ত থাকতে দিন। একথা বলে তিনি শামদেশে চলে যান। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, তিনি তখন মদীনায় রয়ে গেলেন এবং হজরত আবু বকরের কথা মান্য করে আজানও দিতে লাগলেন।

বর্ণিত আছে, আবু জাহেল মালাউন একদিন হজরত বেলালকে দেখে বললো, তুমিও কি ওই কথা বলো, মোহাম্মদ যা বলে? একথা বলে সে তাঁকে ভূপাতিত করলো এবং তাঁর বুকের উপর স্থাপন করলো একটি বড় প্রস্তরখণ্ড। হজরত বেলাল 'আহাদ' ' আহাদ' উচ্চারণ করতে লাগলেন। তারপর হজরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁর জনৈক বন্ধুকে তাঁকে খরীদ করার জন্য পাঠালেন। পরবর্তীতে হজরত ওমর ফারুকের খেলাফতকালে হজরত বেলাল তাঁর কাছে বিদায়ের এজাযত চাইলেন। ওমর ফারুক বললেন, কোন জিনিস তোমাকে আমার কাছে থাকতে এবং আজান দিতে বাধা দিচ্ছে? হজরত বেলাল বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রসুল এবং হজরত আবু বকর সিদ্দীকের জন্য আজান দিয়েছি। কেননা তাঁরা ছিলেন আমার জন্য উলিন্নিয়ামত। নিশ্চয়ই আমি স্বকর্ণে শুনেছি রসুলেপাক স. বলতেন, হে বেলাল! আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করার চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই (সম্ভবতঃ তাই তিনি মদীনায় স্থির থাকেননি)। সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, হজরত ওমর ফারুক তাঁর খেলাফতকালে যখন শামদেশে গিয়েছিলেন, তখন হজরত বেলাল সেখানেই ছিলেন। তখন তিনি তাঁর খাতিরে আজান দিয়েছিলেন। আজান শুনে হজরত ওমর ও তাঁর সকল সফর সঙ্গী ক্রন্দন শুরু করে দিয়েছিলেন। বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওই দিনের চেয়ে এতো অধিক ক্রন্দন করতে আর কাউকে কখনও দেখা যায়নি। আর একবার হজরত বেলাল মদীনায় এসেছিলেন। তিনি মসজিদে নববীতে আজান দেওয়া শুরু করলেন। কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। বিস্তারিত ঘটনা এরকম– হজরত বেলাল শামদেশে চলে গেলেন। ৬ মাস পর তিনি রসুলেপাক স.কে স্বপ্নে দেখলেন। দেখলেন, তিনি তাঁকে বলছেন, বেলাল! তুমি তো জালেম। আমাকে দেখতেও আসো না। ঘুম ভাঙার পর হজরত বেলাল মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। মদীনা তাইয়্যেবার নিকটবর্তী হয়ে তিনি হজরত ফাতেমাতুয্ যাহরা এবং ইমাম হাসান-হুসাইনের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বললো, সাইয়্যেদা ফাতেমাতুয্ যাহরা জান্নাতগমন করেছেন। হাসান-হুসাইন আছেন। হজরত বেলালকে দেখে মদীনাবাসীরা তাঁর কণ্ঠের আজান শুনতে চাইলো। কিন্তু কেউ তাঁর কাছে একথা বলার সাহস পেলো না। অবশেষে সকলে হজরত ইমাম হুসাইনের শরণাপন্ন হলো। তিনি হজরত বেলালকে আজান দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। অবশেষে হজরত ইমাম হুসাইন হুকুম দিলেন এবং হজরত বেলাল ওই জায়গায় আরোহণ করতে চাইলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি রসুলেপাক স. এর উপস্থিতিতে আজান দিতেন। তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলেন। রসুলেপাক স. এর চিত্রসমূহ তাঁর মানসপটে প্রতিবিম্বিত হতে

লাগলো। মানুষের মধ্যে শুরু হলো কান্নার রোল। যখন 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেন, মানুষের মধ্যে শুরু হলো শোকের মাতম। যখন উচ্চারণ করলেন আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ' তখন মদীনায় যেনো ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেলো। চতুর্দিকে শুধু উচ্চকণ্ঠের কান্না আর কান্না। মনে হলো, মোহাম্মদ স. দুনিয়া থেকে সদ্য বিদায় গ্রহণ করলেন। তার পরের দৃশ্য বড়ই মর্মান্তিক। বড়ই হৃদয় বিদারক। হজরত বেলালের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেলো। তাঁর আর আজান দেওয়ার শক্তি রইলো না। লোকেরাও সেই আজানের সুর আর সহ্য করতে পারলো না।

রসুলেপাক স. হজরত বেলাল এবং তাঁর চাচাতো ভাই উবায়দা ইবনুল হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। 'ইস্তিআব' এ এরকম বলা হয়েছে। 'ইসাবা'য় বলা হয়েছে, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্র সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। ইমাম মালেক তাঁর 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আমার কাছে রসুলেপাক স. এর এই হাদিসটি পৌঁছেছে– রসুলেপাক স. হজরত বেলাল রা.কে বললেন, হে বেলাল! ব্যাপার কী? বেহেশতের মধ্যে আমি তোমার জুতার আওয়াজ শুনলাম। বলোতো দেখি, তুমি কী আমল করো? তিনি নিবেদন করলেন, আমার উপর যে নামাজ ফরজ করা হয়েছে, তা আমি অতি পবিত্রতার সাথে আদায় করে থাকি। হজরত বেলাল যখন এই হাদিস বর্ণনা করতেন, তখন লোকেরা ক্রন্দন শুরু করে দিতো। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'জমউল জাওয়ামে' বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, অগ্রগামী চারজন– আমি আরবদের মধ্যে অগ্রগামী আর বেলাল হাবশীদের মধ্যে।

হজরত বেলালের মর্যাদা ও গুণাবলী অসংখ্য। তাঁর গায়ের রঙ ছিলো ঘনকৃষ্ণ। শরীর ছিলো হালকা-পাতলা ও লম্বা। আর বাহুদ্বয় ছিলো সরু। তিনি দামেশকে ইনতেকাল করেন এবং বাবে সগীরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর ওফাত হয়েছিলো ১৮ বা ২০ হিজরীতে। এক বর্ণনামতে তিনি হলবে ইনতেকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। তবে প্রথমোক্ত মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। তাঁর বয়স হয়েছিলো ষাটের অধিক, অথবা তেষট্টি বৎসর। এক বর্ণনা মতে সত্তর বৎসর। তাঁর কাছ থেকে অনেক রাবী (বর্ণনাকারী) হাদিস রেওয়ায়েত (বর্ণনা) করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সর্বহজরত আবু বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক, উসামা ইবনে যায়েদ, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, কাআব ইবনে উজরা ও বারা ইবনে আযেব প্রমুখ সাহাবীগণ। তাছাড়া মদীনা, শাম ও কুফার প্রখ্যাত তাবেয়ীগণের জামাতও তাঁর কাছ থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন।

২. ইবনে উম্মে মাকতুম রা.

দ্বিতীয় মুয়াজ্জিন ছিলেন হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম। তাঁর নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে ওমর। অপর এক বর্ণনা মতে আমর ইবনে কায়স ইবনে

যায়েদা। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে সুরায়হ ইবনে কায়স। যাঁরা তাঁর নাম বলেছেন আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদা, তাঁরা তাঁর দাদার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি কুরাশী ও আমেরী ছিলেন। ছিলেন বনী আমের ইবনে লোওয়ায়ের বংশধর। তাঁর মাতার নাম ছিলো আতেকা বিনতে আবদুল্লাহ ইবনে মাখযুমী। মক্কার প্রবীণ ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন তিনি। তিনি রসুলেপাক স. এর পূর্বে হজরত মুসআব ইবনে ওমায়রের সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। রসুলেপাক স. অধিকাংশ গযওয়ায় গমনকালে মদীনায় তাঁকে খলীফা বানিয়ে যেতেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে, ১৩ বার তাঁকে খলীফা বানানো হয়েছিলো। তাবুকযুদ্ধের সময়ও তাঁকে খলীফা বানানো হয়েছিলো। আর হজরত আলী মুর্তযাকে দেওয়া হয়েছিলো আহলে বাইতকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব।

হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম হজরত বেলালের সঙ্গেই আজান দিতেন। তাঁর সম্পর্কেই সুরা আবাসা নাযিল হয়েছিলো। তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, কাদেসিয়ার যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছিলেন।

৩. আবু মাহযুরা রা.

পাক দরবারের তৃতীয় মুয়াজ্জিন ছিলেন হজরত আবু মাহযুরা। তাঁর নাম ছিলো আউস ইবনে মুগীরা জামহী কুরাশী। তাঁর কুনিয়াতটি তাঁর নামাপেক্ষা অধিক প্রবল। রসুলেপাক স. এর জন্য মক্কায় আজান দিতেন তিনি। মক্কায় আবু মাহযুরার আজানের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর ভাইদের মধ্যে বনী সালামান ইবনে রবীআ ইবনে সাআদ ইবনে জামাহ। ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, আমি আবু মাহযুরাকে দেখলাম। তাঁর মাথায় বাবরি চুল ছিলো। বললাম, আপনি আপনার মাথার চুল কাটেন না কেনো? তিনি বললেন, রসুলেপাক স. যে চুল স্পর্শ করেছেন সে চুল আমি কেটে ফেলবো, আমি এমন লোক নই। তিনি আমার এই চুলে বরকতের দোয়া করেছিলেন। তিনি ৫৯ হিজরীতে মক্কায় ইনতেকাল করেন। এক বর্ণনামতে ৫৯ হিজরীর পর তাঁর ইনতেকাল হয়। তিনি হিজরত করেননি। সর্বদা মক্কাতেই ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন তাঁর পুত্র আবদুল মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে মুহায়রিয এবং ইবনে আবু মুলায়কা। মুসলিম এবং আরও চারজন হাদিসবেত্তা তাঁর কাছ থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন। আবু মাহযুরা আজানের মধ্যে তারজী (লম্বা সুরে আজান) করতেন। আর একামতে করতেন তাছনিয়া (দুই দুই বাক্য একসঙ্গে উচ্চারণ করতেন)। আর হজরত বেলাল আজানে তারজী করতেন না। একামতে করতেন এফরাদ (এক এক করে বাক্য বলতেন) কোনো কোনো মুয়াজ্জিন আজানে তারজী করতেন না এবং একামতে তাছনিয়া করতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন তরীকা গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের মাযহাবে আজানে তরজী না করা এবং একামতে তাছনিয়া করার বিধান রয়েছে।

৪. সাআদ কুরয রা.

মহাপবিত্র দরবারের চতুর্থ মুয়াজ্জিন ছিলেন সাআদ কুরয। তাঁকে সাআদ কুরযীও বলা হতো। তাঁর আসল নাম ছিলো সাআদ ইবনে আয়েয। তিনি হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসারের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর সোহবত পেয়েছিলেন। সাআদ কুরযের নামকরণের কারণ এরকম– তিনি কুরযের ব্যবসা করতেন। কুরয হচ্ছে একপ্রকার গাছের পাতা, যা কাঁচা চামড়াকে পাকা করার কাজে ব্যবহার করা হয়। ইতোপূর্বে তিনি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করতেন। কিন্তু কোনোটিতেই লাভবান হতে পারেননি। অবশেষে পাতার ব্যবসা করে তিনি সাফল্যের পথ পেয়েছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁকে মসজিদে কুবায় মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেছিলেন। রসুলেপাক স. এর ইনতেকালের পর হজরত বেলাল যখন আজান দেওয়া ছেড়ে দিলেন, তখন হজরত সাআদ কুরযীকে মসজিদে নববীতে স্থানান্তরিত করা হয়। বাকী জিন্দেগীতে তিনি সেখানেই আজান দিয়েছেন। অতঃপর তাঁর আওলাদগণ পর্যায়ক্রমে আজান দিতেন। ইমাম মালেকের জামানা পর্যন্ত তাঁরা আজান দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, মসজিদে নববীতে আজান দেওয়ার জন্য তাঁকে স্থানান্তরিত করেছিলেন হজরত ওমর ফারুক। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি মসজিদে নববীতে আজান দিতেন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের জন্য এবং পরে হজরত ওমর ফারুকের জন্য। হজরত সাআদ কুরযী হাজ্জাজের শাসনামল ৯৪ হিজরী পর্যন্ত হেজাযে জীবিত ছিলেন। ওয়াল্লহু আ'লাম।

রসুলেপাক স. এর দরবারের কবিগণ

মহাপবিত্র দরবারের কবিগণ যাঁরা বাকযুদ্ধের মাধ্যমে কাফেরদের ক্ষতি থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করতেন, কাফেরদের আক্রমণাত্মক সাহিত্যকে প্রতিহত করতেন, রসুলেপাক স. এর প্রশংসা করতেন এবং কাফেরদের নিন্দাবাদ প্রকাশ করতেন– তাঁরা ছিলেন তিনজন। ১. হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত ২. হজরত কাআব ইবনে মালেক এবং ৩. আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুলেপাক স. এর খাদেম কবিগণের সংখ্যা পুরুষদের মধ্যে ছিলো ১৬০ জন, আর মহিলাদের মধ্যে ছিলো ১২ জন। অবশ্য বিখ্যাত কবি উপরোক্ত তিনজন ছাড়া আরও ছিলেন। যেমন– জাহেলী যুগে ছিলেন নাবেগা। তিনি সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী ছিলেন। ১৮০ অথবা ২০০ বৎসর বয়স হয়েছিলো তাঁর। দ্বিতীয় ছিলেন লাবীদ ইবনে রবীআ। তিনি জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগই পেয়েছিলেন এবং দুই যুগেই তিনি ছিলেন অভিজাত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তাঁর বয়স হয়েছিলো ১৪০ অথবা ১৫৬ বৎসর। তৃতীয়– সুহবান ওয়ায়েল। তাঁর প্রজ্ঞাবাণী ও উপমামূলক ছন্দ ফাসাহাত ও বালাগাতে পূর্ণ ছিলো। যেমন মাকাল

নামক গ্রন্থকার তাঁর 'শাহামাত' গ্রন্থে এবং শায়েখ ইবনে হাজার তাঁর 'ইসাবা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আসাকেরও একথা তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, সুহবান ওয়ায়েল মুখাদরামী কবিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি জাহেলী ও ইসলামী দুই যুগই পেয়েছিলেন। তবে তিনি রসুলেপাক স.কে দেখেননি এবং এমন কোনো প্রমাণও নেই যে, তিনি রসুলেপাক স. এর মজলিশে হাজির হয়েছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর পৃথিবীবাসের সময় ইসলাম গ্রহণ করে থাকলেও তিনি সর্বসম্মতভাবে মোহাদ্দেছ ছিলেন একথা ঠিক, কিন্তু সর্বসম্মতভাবে সাহাবী ছিলেন না। যদিও কোনো কোনো আলেম তাঁর নাম সাহাবীগণের পরিচিতিমূলক গ্রন্থসমূহে অনেকবার উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁরা এর ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বলেছেন, 'তবকায়ে সাহাবার' সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা তিনি সাহাবীগণের স্তরে পড়েন না। ইবনে আবদুল বার এ কথাগুলো উল্লেখ করেছেন তাঁর 'কিতাবে মুকাদ্দমা'য়। শায়েখ ইবনে হাজার তাঁর 'ইসাবা' গ্রন্থে সাহাবীগণের পরিচিতি দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, সাহাবী তিন প্রকারঃ প্রথম প্রকার ওই সকল সাহাবী যাঁদের সাহাবিয়াত সুসাব্যস্ত। চাই তাঁরা রসুলেপাক স. থেকে বর্ণনা করে থাকুন অথবা অন্যেরা বর্ণনা করে থাকুন তাঁদের কাছ থেকে। চাই তাঁদের সনদ সহীহ্ হোক অথবা হোক যয়ীফ। চাই তাঁরা এমন কোনো পদ্ধতি বর্ণনা করে থাকুন, যা দ্বারা তাঁদের সাহাবিয়াত সাব্যস্ত হয়। সর্বতোভাবে তাঁরা সাহাবী। দ্বিতীয় প্রকার ওই সকল লোক, যাঁদেরকে ছোটো অবস্থায় সাহাবা কেরাম রসুলেপাক স. এর সামনে হাজির করেছিলেন। রসুলেপাক স. এর ওফাতের সময় যাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না। যেমন সাহাবা কেরাম তাঁদের শিশুসন্তানদেরকে রসুলেপাক স. এর দরবারে নিয়ে যেতেন তাহনিক বা তাসমিয়ার উদ্দেশ্যে। বরকতের দোয়ার উদ্দেশ্যে। তাঁরা সাহাবী নন। সুতরাং শায়েখ ইবনে হাজার বলেছেন, ইবনে আসাকের সুহবান ওয়ায়েল সম্পর্কে যা বলেছেন, তা এই দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়তে পারে। তাঁর সাহাবী হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ততার স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। আর তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কথা এই যে, তিনি একজন অশিক্ষিত লোক ছিলেন। আবু নাঈম তাঁর কিতাব 'খুতবাত' এ বলেছেন, সুহবান আরবের অপ্রতিরোধ্য বক্তা ছিলেন। তিনি যখন খোতবা দিতেন তখন একই শব্দ পুনরায় উল্লেখ করতেন না। বক্তৃতাকালে তিনি থামতেন না এবং চিন্তাভাবনাও করতেন না। অনর্গল তাঁর বক্তৃতা চলতো। এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, সুহবান রসুলেপাক স.এর কবিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি রসুলেপাক স.কে দেখেননি। চার খলীফাগণকেও পাননি। তবে তাঁর মুসলমান হওয়ার বিষয়টি সুসাব্যস্ত। চাই তিনি রসুলেপাক স. এর জমানায় ইসলাম গ্রহণ করে থাকুন, অথবা ইসলাম গ্রহণ করে থাকুন তার পর। তাঁর বয়স ও মৃত্যুকাল সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ওয়াল্লহু আ'লাম।

১. হাস্‌সান ইবনে ছাবেত রা.

রসুলেপাক স. এর এক কবি ছিলেন হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবুল ওলীদ বা আবদুর রহমান অথবা আবুল হুস্‌সাম। তাঁর নাম হাস্‌সান ইবনে ছাবেত ইবনুল মুনযির আনসারী। তিনি রসুলেপাক স. এর সভা কবি ছিলেন। আরববাসীরা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বদর ও ইয়াসরিবে তিনি একজন প্রথম স্তরের কবি ছিলেন। তাঁর পরে আবদুল কায়েস এবং ছাকীফ গোত্রের কবিগণ। আর তাঁরা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, মদীনায় প্রথম স্তরের কবি ছিলেন হাস্‌সান ইবনে ছাবেত। তাঁর পিতার নাম ছাবেত এবং দাদার নাম মুনযির। তাঁর পূর্ব পুরুষ হারাম এর বয়স হয়েছিলো ১২০ বৎসর। আবু নাঈম বলেছেন, আরবে হাস্‌সান ইবনে ছাবেত ছাড়া আর কারও বংশ সম্পর্কে এরূপ জানা যায়নি যে, চার পুরুষ পর্যন্ত সকলের বয়স ধারাবাহিকভাবে একরকম ছিলো। তাঁর পুত্র আবদুর রহমান ইবনে হাস্‌সান ইবনে ছাবেত যখন একথা বর্ণনা করতো, তখন নিজে সটান হয়ে পড়ে যেতো এবং খুব হাসা-হাসি করতো। নিজের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতো। মনে করতো সেও এরকম বয়সই পাবে। কিন্তু ৪৮ বৎসর বয়সেই তার মৃত্যু হয়েছিলো। আসমায়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হাস্‌সান ইবনে ছাবেত একজন কৌতুকপ্রিয় রসিক কবি ছিলেন। আবু হাতেম বলেছেন, তিনি তরল মেজাজের কবিতা রচনা করতেন। এ সম্পর্কে আসমায়ী বলেছেন, হাস্‌সান ইবনে ছাবেত সম্পর্কে যে কথা বলা হয়, তা ঠিক নয়। আবু হাতেম আবু উবায়দা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হজরত হাস্‌সানকে কল্যাণের কবি হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। জাহেলী যুগে তিনি আনসারদের কবি এবং নবুওয়াতের যুগে তিনি রসুলেপাক স. এর কবি ছিলেন। ইসলামের জামানায় তাঁর রচিত সকল কবিতা বরকতময় ছিলো।

সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, হাস্‌সান ইবনে ছাবেতের জাহেলী যুগের কাব্যসমূহ ইসলামী কাব্য থেকে অধিকতর সম্ভ্রান্ত ও উৎকৃষ্ট ছিলো। তার কারণ হচ্ছে, ইসলাম সব সময় মিথ্যার আশ্রয় ও অবাস্তবতাকে পরিহার করে। আর কবিগণ সব সময় হয় কল্পনাবিলাসী। মিথ্যা ও অযথার্থ বিষয়ের আশ্রয় নিয়ে কাব্যকে করে শিল্পসুষমামণ্ডিত। আর এরূপ সৌন্দর্যদান মূলতঃ অন্যায়। হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত ষাট বছর জাহেলী ও ষাট বছর ইসলামী যুগে জীবিত ছিলেন। তিনি নাবেগা ও ওয়ারআশীকে পেয়েছিলেন। তাঁদের সামনে তিনি কবিতা পাঠ করেছেন এবং তাঁরা দু'জনেই তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁরা মন্তব্য করেছিলেন, সত্যিই তুমি একজন কবি। হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত তাঁর কবিতায় কুরাইশ মুশরিকদের নিন্দা করতেন। রসুলেপাক স. এর উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে যারা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতো, তিনি তাদের নিন্দা করে কাব্য রচনা করতেন।

সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, একবার কোনো এক মুসলমান হজরত আলীর নিকট নিবেদন করলো, আপনি মুসলমানদের পক্ষ থেকে ওই লোকদের নিন্দাবাদ করুন, যারা মুসলমানদের দোষচর্চা করে। তিনি বলেছিলেন, রসুলেপাক স. যদি আমাকে অনুমতি দেন, তাহলে আমি তা করবো। একথা রসুলেপাক স. শুনতে পেয়ে বললেন, আলী এ কাজের উপযুক্ত নয়। সে যা চাইবে, তা করতে পারবে না। আর তোমরা যা চাও, আলী তা চাইবেও না। তারপর রসুলেপাক স. বললেন, এমন কে আছে, যে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এর সমুচিত জবাব দিতে পারবে? হাতিয়ার দ্বারা তারা যেমন কাফেরদেরকে প্রতিহত করে– এ ময়দানে যবান দ্বারা প্রতিহত করতে পারবে– এমন কে আছে? হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি এ কাজের জন্য হাজির। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি তাদের নিন্দা কীভাবে করবে, যেহেতু তোমার বংশ তাদের সঙ্গে, আবার আমার নসবও তাদের সঙ্গে মিলিত। বরং আমার ভিতরেও তাঁদের বংশ কুনিয়াত প্রতিষ্ঠিত। আবু সুফিয়ানের নিন্দাবাদই বা করবে কীভাবে? তিনি তো আমার চাচা। হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আপনাকে তাদের মধ্য থেকে এমনভাবে বের করে আনবো, যেমন আটা থেকে চুল বের করে আনা হয়। রসুলেপাক স. বললেন, তুমি আবু বকর সিদ্দীকের কাছে যাও। কেননা নসবসংক্রান্ত এলেমে সে তোমার চেয়ে অভিজ্ঞ। তিনি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের নিকট গেলেন। হজরত আবু বকর তাঁকে নসবনামা সম্পর্কে অবহিত করলেন। বললেন, ওমুক ওমুককে আক্রমণ করা থেকে বিরত থেকো, আর ওমুক ওমুককে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানাও। তারপরই তিনি মুশরিকদের প্রতি নিন্দাবাদের তীর নিক্ষেপ শুরু করে দিলেন। কুরাইশরা যখন হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেতের কবিতা শুনলো তখন তারা বুঝতে পারলো, এই কবিতা হাস্‌সান ইবনে ছাবেতের পক্ষ থেকে আসেনি, এসেছে ইবনে আবু কুহাফার পক্ষ থেকে। হজরত হাস্‌সান আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছের নিন্দা করলেন। আবু সুফিয়ান এই কবিতা শুনে বললেন, এ এমন বাক্য, যা থেকে ইবনে আবু কুহাফা অনুপস্থিত নয়। রসুলেপাক স. হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেতের জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর রেখেছিলেন, যাতে তিনি তাতে আরোহণ করে রসুলেপাক স. এর প্রশংসা এবং তাঁর দুশমনের নিন্দাবাদ প্রচার করতে পারেন। রসুলেপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা হাস্‌সানকে জিবরাইলের দ্বারা সাহায্য করেন, যতোক্ষণ সে রসুলেপাক স. এর তরফ থেকে তাঁর দুশমনদের নিন্দাবাদ করে। এক বর্ণনায় 'ইউফাখিরু' শব্দ এসেছে। অর্থাৎ যতোক্ষণ পর্যন্ত সে রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে ফখর প্রকাশ করে। রসুলেপাক স. বলেছেন, হাস্‌সানের বাক্য মুশরিকদের উপর তীরের আঘাতের চেয়েও শক্ত। তিনি স. আরও বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যাকে বাকশক্তি দান করেছেন, তার উচিত রসুলেপাক স. এর প্রশংসা এবং তাঁর

দুশমনের নিন্দাবাদ করার ক্ষেত্রে ত্রুটি না করা। কেননা এটা সবচেয়ে উত্তম আমল। সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেতের একমাত্র কাজ ছিলো– তিনি মুশরিকদের ঘটনাবলী, অতীত কাহিনী ও কীর্তিকলাপ নিয়ে প্রতিবন্ধকতামূলক বক্তব্য দিতেন এবং তাদের নিন্দাবাদ প্রকাশ করতেন। তাদের মন্দ বিষয়গুলো কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করতেন।

একবার হজরত ওমর ফারুক হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেতের কাছ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি তখন মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। হজরত ওমর ফারুক থামলেন। হজরত হাস্‌সানের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, মসজিদের ভিতর কবিতা আবৃত্তি করছো? তিনি জবাব দিলেন, আমি ওই মহান ব্যক্তিত্বের শানে কবিতা পাঠ করছি যিনি আপনার চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। একথা শুনে হজরত ওমর ফারুক চুপ হয়ে গেলেন।

হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেতের নির্বাচিত কাব্যটি তিনি রসুলেপাক স. এর উপস্থিতিতে রচনা করে পাঠ করেছিলেন তখন, যখন রসুলেপাক স. এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো বনী তামীমের প্রতিনিধিদল। তাঁর কাব্যপাঠের বক্তৃতা দিয়েছিলেন হজরত ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস। বনী তামীমের লোকেরা তখন তাদের অক্ষমতা ও মুর্খতার স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিলো, মোহাম্মদের কবি আমাদের বক্তা ও কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বর্ণিত আছে রসুলেপাক স. বলেছিলেন, হাস্‌সান মুসলমান ও মুনাফিকদের মধ্যে একটি নির্দশন। মুনাফিকরা তাঁকে ভালোবাসে না। আর মুসলমানরা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে না। তিনি স. আরও বলেছেন, হাস্‌সানকে তোমরা মন্দ বোলো না। কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে তাঁর দুশমনদের প্রতি বাক্যের প্রতিরোধ নির্মাণ করে। তাদের সম্পর্কে এমন কথা বলে, যার ফলে তারা যুদ্ধের মনোবল হারিয়ে ফেলে।

ইবনে কালবী বলেছেন, হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত একজন বাকপটু ও বীরপুরুষ ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর একটি রোগ হয়েছিলো, যার ফলে তিনি ভীরু হয়ে গিয়েছিলেন। আর তাঁর এ রোগটি হয়েছিলো তখন, যখন সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল তাঁর উপর তলোয়ারের আঘাত করেছিলো। কোনো কোনো আলেম তাঁর সঙ্গে ভীরুতার সম্পর্ক হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা অন্য সকল খবরের বিষয়েও অস্বীকার করেছেন, যা তাঁর দোষারোপের দিকে চলে যায়। তাঁরা তাঁদের মতের সপক্ষে দলিল হিসেবে বলেন, তাঁর মধ্যে যদি ভীরুতা এসেই থাকতো, তাহলে দ্বীনের দুশমনেরা তাঁর নিন্দাবাদ প্রচার করতো। অবশ্য তাঁর জীবনে ভুলত্রুটি হয়েছিলো। আর তাঁর অন্যতম ত্রুটি ছিলো সাইয়্যেদা আয়েশা সিদ্দীকার ইফকের ঘটনায় তিনি শামিল ছিলেন। আল্লাহ্তায়ালাই ভালো জানেন, তিনি কেমন করে যেনো এরকম কলুষতায় জড়িয়েছিলেন। অবশ্য হজরত আয়েশা সিদ্দীকার সামনে তাঁর সম্বন্ধে কেউ মন্দ কথা বললে তিনি বলতেন, হাস্‌সানকে

গালি দিও না। কেননা সে রসুল স. এর সম্পর্কে গৌরবগাঁথা প্রকাশ করতো। ইবনুল কারীআহ বলেছেন, আমি আশা রাখি, রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে ভাষার দক্ষতার মাধ্যমে যে প্রতিরোধ তিনি গড়ে তুলেছিলেন, তার ভিত্তিতে আল্লাহ্তায়ালা হয়তো তাঁকে (বিনা হিসাবে) বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। কারীআহ ছিলেন হজরত হাস্সানের মাতা। হজরত খালেদের কন্যা ছিলেন তিনি। ছিলেন খাযরাজ গোত্রভূতা। তিনি ইসলাম পেয়েছিলেন। আর তিনিই হজরত হাস্সানকে রসুলেপাক স. এর দরবারে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর কাছে পুনরায় তওবা করে বায়াত গ্রহণ করেন। তওবা করার পর হজরত হাস্সান ইবনে ছাবেতের অপবাদের হদ কায়েম করা হয়েছিলো। তারপর থেকে তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রশংসাবাণী প্রচার করতেন। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হজরত আলীর খেলাফতকালে চল্লিশ হিজরীতে তিনি ইনতেকাল করেন। অপর বর্ণনামতে ৫০ বা ৫৪ হিজরীতে তাঁর ইনতেকাল হয়। তাঁর বয়স হয়েছিলো ১২০ বছর।

২. কাআব ইবনে মালেক রা.

পাক দরবারের দ্বিতীয় কবি ছিলেন হজরত কাআব ইবনে মালেক। তাঁর কুনিয়াত ছিলো আবু আবদুর রহমান বা আবু আবদুল্লাহ। তিনি মদীনার আনসার, খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। দ্বিতীয় আকাবার শপথকালে উপস্থিত ছিলেন। যে সত্তর জন সাহাবী দ্বিতীয় আকাবায় হাজির ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর বদরযুদ্ধে হাজির হওয়া নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাবুকযুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি বদরযুদ্ধেও হাজির ছিলেন। উহুদযুদ্ধে তাঁর শরীরের এগারোটি স্থানে জখম হয়েছিলো। তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে যে তিনজন সাহাবী বিরত ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। পরে তিনি তওবা করেছেন এবং আল্লাহ্তায়ালার রহমতের প্রত্যাশী হয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর তওবা কবুল করেন। তিনিও রসুলেপাক স. এর কবিগণের একজন ছিলেন। তিনি উন্নতমানের কবি এবং অনুগত সাহাবী ছিলেন। জাহেলী যুগেই তাঁর কাব্যচর্চা শুরু হয়েছিলো এবং কাব্যিক প্রতিভায় তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হাস্সান ইবনে ছাবেত যেরকম কাফেরদের দোষ বর্ণনা এবং নিন্দাবাদ করতেন, তেমনি তাঁর কাজ ছিলো কবিতা রচনার মাধ্যমে কাফেরদের অন্তরে ভয়-ভীতির উদ্রেক করে দেওয়া। তিনি রসুলেপাক স. থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন তাঁর পুত্রগণ আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ও মোহাম্মদ। তাছাড়া আরও বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আবু জাফর মোহাম্মদ বাকের এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ। ৫০ অথবা ৫৩ হিজরীতে তাঁর ইনতেকাল হয়। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৭ বছর।

৩। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা.

রসুলেপাক স. এর পবিত্র দরবারের তৃতীয় কবি ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা। তিনি আনসার ও খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। ছিলেন আনসারদের নেতৃস্থানীয়। তৃতীয় আকাবা, উহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। মক্কাবিজয় ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। কেননা তিনি মুতাযুদ্ধে শাহাদতবরণ করেছিলেন। তাঁর কাজ ছিলো মুশরিকদের কুফুরী ও মূর্তিপূজার বিষয়ে তিরস্কার করা।

অন্যান্য কবি সাহাবীগণ

উপরোল্লিখিত তিনজন কবি সাহাবী ছাড়াও সাহাবীগণের মধ্যে আরও কয়েকজন কবি ছিলেন। যেমন– আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব, আব্বাস ইবনে মুরদাস সুলামী, আদী ইবনে হাতেমতায়ী। তাঁদের সম্পর্কে ইতোপূর্বে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আরেকজন কবি ছিলেন হুমায়দ ইবনে নূর আল হেলালী। তিনি একজন উন্নতমানের কবি ছিলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারে এসে একটি কাসীদা প্রস্তুত করেছিলেন যার শেষাংশ এরকম–

حتي اتانا ربنا بحمد + نتلوا من الله كتابا مرشدا

(এমনকি আমি এলাম আমার রবের কাছে তাঁর প্রশংসা সহকারে। আমি পাঠ করবো আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত কিতাব যা পথপ্রদর্শনকারী)।

সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, তিনি রসুলেপাক স. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন সুহায়র ইবনে বুকা। তিনি আরও বলেছেন, হুমায়দ ইবনে নূর আল হেলালী রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়েছিলেন। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, মোহাম্মদ সাল্লাম জাহমী তাঁকে মুসলিম কবিগণের চতুর্থ স্তরের অন্তর্ভূত বলেছেন। মুরযবানী বলেছেন, তিনি ছিলেন সাবলীল ভাষার কবি। তাঁর অবস্থা এরকম ছিলো, কেউ তাঁর নিন্দাবাদ করলে তিনি তার উপর বিজয়ী হয়ে যেতেন। তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারে এসেছিলেন প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়ে। তিনি আমীরুল মুমিনীন হজরত ওছমান যুন্নুরাইনের খেলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

আরেকজন কবি ছিলেন আবুত্ তুফায়ল ইবনে আমের ইবনে ওয়াছেলো লাইছী। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো ওমর ইবনে ওয়াছেলা। তবে প্রথমোক্তটি অধিকতর প্রসিদ্ধ। তাঁর জন্ম হয়েছিলো উহুদযুদ্ধের দিন। রসুলেপাক স. এর হিজরতের আট বছর তিনি পেয়েছিলেন। পরে তিনি কুফায় বসবাস করেন এবং হজরত আলীর সোহবতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। হজরত আলী মুর্তযা যখন শহীদ হন, তখন তিনি মক্কায় ফিরে আসেন

এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। এক বর্ণনামতে তিনি ইনতেকাল করেন ১০৭ হিজরীতে। মতান্তরে ১১০ হিজরীতে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি শেষ পর্যন্ত কুফাতেই ছিলেন। তবে প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ। রসুলেপাক স.কে স্বচক্ষে দেখেছেন, এমন ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি। আবুত্ তুফায়ল বলতেন, এখন আমি ছাড়া পৃথিবীতে এমন আর কেউ নেই, যে রসুলেপাক স.কে দেখেছে। তিনি একজন উন্নত মানের কবি, আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। ছিলেন প্রচণ্ড উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন। আবু কানে তাঁর 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি হজরত আলী সম্পর্কে শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং অন্যান্যদের তুলনায় তাঁকে বেশী মর্যাদা প্রদান করতেন। শায়খাইন (হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর) সম্পর্কে এস্তেছনা করতেন। অর্থাৎ দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকতেন। আর হজরত ওছমানের উপর রহম প্রকাশ করতেন।

সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, একদা তিনি আমীর মুয়াবিয়ার নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনার বন্ধু আবুল হাসানের (হজরত আলীর) জন্য আপনার দুঃখ-দুশ্চিন্তা কী প্রকারের? তিনি জবাব দিলেন, নবী মুসার জন্য তাঁর মায়ের যেরকম দুশ্চিন্তা ছিলো, সেই প্রকারের। তাঁর প্রতি কসুর করা হয়েছে, সে ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে শেকায়েত করি। আমীর মুয়াবিয়া তাঁকে আরও বললেন, তুমি তো ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা খলিফা ওছমানের উপর চড়াও হয়েছিলো। তিনি বললেন, না। বরং আমি ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা ছিলো তাঁর সাহায্যকারী। হজরত মুয়াবিয়া বললেন, তাহলে কোন্ জিনিস তোমাকে বিরত রেখেছিলো যে, তুমি তাঁর সাহায্য করলে না? তিনি জবাব দিলেন, আপনাকে কোন জিনিস বিরত রেখেছিলো যে, আপনি তাঁকে কোনোরূপ সাহায্য করলেন না? ওই হৃদয়বিদারক ঘটনা যখন ঘটলো তখন তো আপনি ছিলেন সিরিয়ার শাসক। সকলেই আপনার অনুগত ছিলো। হজরত আমীর মুয়াবিয়া বললেন, তুমি কি দেখোনি যে, আমি খলিফা ওছমানের হত্যার কেসাস দাবী করেছিলাম। তিনি বললেন, হাঁ, আমি দেখেছি, তবে আপনার অবস্থা ছিলো ওই রকম, ওমুক কবীলার এক ব্যক্তি বলেছিলো–

لام تفتيك بعد الموت تندي + و في حياتي ماذوتني زادي

(মায়ের কসম! মৃত্যুর পরে তোমাকে ফতওয়া প্রদান করবে সমাজ। আর জীবদ্দশায় করবে যে সম্পদ আমি জমিয়েছি)।

আয়মান ইবনে খোযায়মা আসাদী রা.

রসুলেপাক স. এর দরবারের আরেকজন কবি ছিলেন আয়মান ইবনে খোযায়মা আসাদী। তিনি ছিলেন বনী আসাদ গোত্রের। মক্কাবিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে তিনি কাওয়ালা নামক এক ব্যক্তির গোলাম ছিলেন।

তিনি তাঁর পিতা ও চাচা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই বদরী সাহাবী ছিলেন। শা'বী তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি শামদেশের বাসিন্দা এবং উত্তম কবি ছিলেন। শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, একবার মারওয়ান আয়মান ইবনে খোযায়মার কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, তুমি তো আমাদের নিকটে আসো না এবং আমাদের সঙ্গে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো না। তিনি বললেন, আমার পিতা এবং চাচা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা আমার কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি যেনো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' বলে এমন কোনো মুসলমানকে হত্যা না করি। এখন আপনি যদি এর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গী হতে পারি। মারওয়ান বললো, তোমার সাহায্যের কোনো প্রয়োজন আমার নেই। দারা কুতনী বলেছেন, আয়মান ইবনে খোযায়মা রসুলেপাক স.থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে আবদুল বার 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বলেছেন, আমি রসুলেপাক স. থেকে সরাসরি তাঁর কোনো রেওয়ায়েত পাইনি। তবে হাঁ তাঁর পিতা ও চাচা থেকে বর্ণিত তাঁর হাদিস পেয়েছি। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম তিরমিযী আয়মান ইবনে খোযায়মা থেকে রসুলেপাক স. এর একটি হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন এবং তিনি সেটিকে গরীব (দুর্লভ) হাদিস বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, আয়মান ইবনে খোযায়মা রসুলেপাক স. থেকে সরাসরি হাদিস শুনেছেন বলে আমার জানা নেই। ইবনে আবদুল বারও এই হাদিস সম্পর্কে অবগত নন। মারদুবিয়া 'কামেল' গ্রন্থে এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তাঁর সোহবত হাসিল হয়েছিলো। হজরত ওছমানের শাহাদতের বিষয়ে তাঁর একটি কবিতাও উদ্ধৃত করেছেন তিনি। 'সওয়াবী' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, আয়মন ইবনে খোযায়মাকে খলীলুল খোলাফা বলা হতো। কারণ খোলাফায়ে রাশেদীনের সকলেই তাঁকে তাঁর বিশুদ্ধ ভাষার জন্য নৈকট্য দান করেছিলেন। তিনি শ্বেতী রোগাক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর উপর তিনি জাফরানের খেযাব ব্যবহার করতেন। আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান, যিনি হজরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের পিতা ছিলেন এবং ছিলেন মিশরের শাসক, তিনি তাঁর সঙ্গে একসাথে আহার করতেন, শ্বেতী রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও।

আ'ছা ইবনে মাযেন রা.

আরেকজন কবি ছিলেন আ'ছা ইবনে মাযেন ইবনে আমর ইবনে তামীম। তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন। একবার তিনি রসুলেপাক স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর একটি কবিতা পাঠ করলেন। ওই কবিতায় ছিলো নারী জাতির প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুযোগ। রসুলেপাক স. তাঁর কবিতার চরণের মন্দ দিকগুলো পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো আ'ছা ইবনে মাযেন আবদুল্লাহ।

আসওয়াদ ইবনে সুরায় রা.

আরেকজন কবি ছিলেন আবু আবদুল্লাহ আসওয়াদ ইবনে সুরায় সাঈদা তামিমী। তিনি বসরায় বসবাস করেছিলেন। তিনি একজন সুবক্তা এবং কবি ছিলেন। বসরার মসজিদে প্রথম বক্তৃতাদাতা ছিলেন। হজরত হাসান বসরী তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, তিনি একবার রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি কি আপনার প্রশংসায় একটি হামদ রচনা করবো, যাতে আপনার রবের প্রশংসা করা হবে? রসুলেপাক স. বললেন, নিশ্চয়ই। তোমার রবেরই প্রশংসা করা হয়। একথার তাৎপর্য এমন হতে পারে যে– তুমি তাঁর কী আর প্রশংসা করবে? সারাজাহানই তো হক তায়ালার প্রশংসায় সতত নিয়োজিত। 'ওয়া ইন্না মিন শায়্যিন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহী' (এমন কোনো বস্তুই নেই, যা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসায় তসবীহ পাঠ না করে)। রসুলেপাক স. এর চেয়ে আর কিছু বলেননি। 'ইস্তিআব' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। 'ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হাসান বসরী আসওয়াদ ইবনে সুরায় থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি নিজে বলেছেন, আমি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে চারটি জেহাদে অংশগ্রহণ করেছি। এ সম্পর্কে রসুলেপাক স. থেকে একটি হাদিসও তিনি রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে ৪২ হিজরীতে ইনতেকাল করেন। হজরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যখন হজরত ওছমান শহীদ হলেন, তখন আসওয়াদ ইবনে সুরায় নৌকায় আরোহণ করে সপরিবারে কোথায় যেনো নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তারপর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায়নি।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামের অনেক কবি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই রসুলেপাক স.কে দেখেছেন। চাই তাঁদের ওই দেখা সাব্যস্তের স্তর পর্যন্ত পৌঁছুক, আর নাই পৌঁছুক। এখন দু'জন প্রসিদ্ধ কবি লাবীদ ও নাবেগা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

লাবীদ ইবনে রবীআ রা.

আরেকজন কবি ছিলেন লাবীদ ইবনে রাবীআ আমেরী। তাঁর উপনাম ছিলো আবু আকীল। তিনি রসুলেপাক স. এর দরবারে এসে তাঁর কবীলা জাফর ইবনে কেলাব ইবনে রবীআ ইবনে আমের ইবনে সা'সাআকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সুন্দর হয়েছিলো। তিনি পারস্যের বীর পুরুষ, উন্নতমানের কবি এবং শরীফ ব্যক্তি ছিলেন। জাহেলিয়াতে ও ইসলামে তিনি কাব্য চর্চা করেছেন। জাহেলীযুগে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি কাব্যচর্চা ছেড়ে দেন। তবে সম্ভবতঃ এর অর্থ– কাব্যচর্চা তিনি অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে প্রশংসা ও নিন্দাবাদের কবিতা রচনা

ছেড়ে দিয়েছিলেন। হজরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. একবার মিম্বরের উপর আরোহণ করে বললেন, সবচেয়ে সত্যবাণী সেটাই যা লাবীদ বলেছে। 'আলাকুল্লু শাইয়ীন মা খলাল্লাহু বাতিলুন' (ওহে সে কি সত্য কথাই না বলেছে– আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছুই আছে, সবই বাতিল)। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া যতোকিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। ইবনে আবদুল বার বলেছেন, লাবীদ ইবনে রাবীআর উক্ত বাণী প্রমাণ করে যে, এ কবিতা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর রচনা করেছিলেন। তবে অধিকাংশগণ মনে করেন, লাবীদ ইসলাম গ্রহণ করার পর কাব্য চর্চা করেননি। কেউ কেউ বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কেবলমাত্র একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আরও দু'একটি কবিতা রচনা করেছিলেন।

নবীজীবনীবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, একদিন হজরত ওমর ফারুক লাবীদকে বললেন, হে আবু আকীল! তোমার কিছু কবিতা আমাকে শোনাও। তিনি বললেন, যেদিন আমি আল্লাহ্তায়ালার বাণী সুরা বাকারা এবং আল ইমরান পড়েছি, সেদিন থেকে আমি কাব্যচর্চা ছেড়ে দিয়েছি। তিনি এই দুই সুরার কথা বিশেষ করে বলেছিলেন, সম্ভবতঃ সুরা দুইখানির ফযিলত ও সওয়াবের দিকে লক্ষ্য করে। অথবা তখন ওই দুই সুরাই তিনি জানতেন। হজরত ওমর ফারুক তাঁর কথা শুনে তাঁর মাসিক ভাতা আরও পাঁচশ' বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। পূর্বে দেয়া হতো দু'হাজার। 'ইস্তিআব' গ্রন্থকার বলেছেন, আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামল এলো। তিনি বললেন, দুই হাজারই তো যথেষ্ট ছিলো। অতিরিক্ত পাঁচশ'র দরকার কী? তিনি পাঁচশ' কমিয়ে দিতে চাইলেন। লাবীদ ইবনে রাবীআ বললেন, অচীরেই আমি মৃত্যুবরণ করবো। এই দুই হাজারও বেঁচে যাবে। এর কিছুদিন পরেই হজরত লাবীদ ইবনে রাবীআ ইনতেকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, লাবীদ ইবনে রবীআ ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কাওমের নিকট ফিরে গিয়েছিলেন। হজরত ওছমানের খেলাফতকালে ওলীদ ইবনে আকাবা যখন কুফার শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি কুফায় চলে গিয়েছিলেন। এই উক্তিটি অধিকতর বিশুদ্ধ। তখন ওলীদ তাঁর কাছে বিশটি উট পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেগুলো তাঁর পক্ষ থেকে জবেহ্ করেছিলেন। মুবাররাদ প্রমুখ রাবীগণ বর্ণনা করেছেন, কবি লাবীদ ইবনে রবীআ মান্নত করেছিলেন, যদি হিমেল হাওয়া প্রবাহিত হয়, তাহলে তিনি পশু জবেহ করে লোকদেরকে খানা খাওয়াবেন। তারপর তিনি কুফায় আসেন। হজরত মুগীরা ইবনে শু'বা যখন দেখলেন, হিমেল হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে, তখন তিনি বললেন, তোমরা আবু আকীলকে সাহায্য করো। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি কোনো মান্নত করেননি। একদিন তিনি দেখলেন, হিমেল হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। তখন লোকদেরকে জিয়াফত করে আহার করালেন। তখন তিনি ছিলেন কুফায়। একথা ওলীদ ইবনে আকাবার কর্ণগোচর হলো। তিনি ছিলেন হজরত ওছমান কর্তৃক

নিযুক্ত কুফার শাসনকর্তা। তিনি একটি ভাষণ দিলেন। লোকদেরকে বললেন, তোমাদের জানা আছে যে, আবু আকীল তাঁর নিজের উপর একটি মান্নত লাজেম করেছিলেন। সুতরাং যাও, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের সহযোগিতা করো। ভাষণের পর তিনি মিম্বর থেকে নেমে লোকদেরকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি তাঁর মান্নত পুরো করলেন। মুবাররাদ ব্যতীত অন্যান্য রাবী বলেছেন, সে সময় তাঁর কাছে বারো হাজার ছওয়ারী জমা ছিলো।

উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা লাবীদের উপর রহম করুন। সে কী সাংঘাতিক কথাই না বলেছে 'যাহাবাদ দ্বীনু ইয়াআ'শা ফী আকনাফিহিম ওয়া বাক্বিয়াত মিন খালফি কাহামালাতিল আহযাব' (দ্বীনদারী তো চলে গিয়েছে এখন মানুষকে জীবনযাপন করানো হচ্ছে পায়খানার (বায়তুল খালা) মধ্যে আর পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে আমি বেঁচে আছি মৃত্যুর পতাকা বহনকারী হিসেবে)। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, লাবীদ একথা বলেছিলো তার কালে। সে যদি আমাদের সময় দেখতো তাহলে কী অবস্থা যে হতো? হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, আমার নিকট লাবীদের বারো হাজার কবিতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 'ইস্তিআব' গ্রন্থকার বলেছেন, ওলীদ ইবনে রবীআ আমেরী এবং আলকামা ইবনে আল্লামা আমেরী এই দু'জন মুআল্লাফাতুল কুলুব ছিলেন। তাঁরাও উত্তম কবি ছিলেন। বর্ণিত আছে, লাবীদ যখন এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেন– 'আলা কুল্লা শায়্ইন মা খাল্লাহু বাতিল + ওয়া কুল্লা নাঈমু লা মাহালাতা যাইল'। (ওহে! আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত সমস্ত বস্তুই ধ্বংসশীল। আর সমস্ত নেয়ামত অবশ্যই দূরীভূত হয়ে যাবে)। হজরত ওছমান ইবনে মাযউন বললেন, মিথ্যা কথা। জান্নাতের নেয়ামত দূরীভূত হওয়ার নয়। লাবীদ রাগান্বিত হয়ে বললেন– 'সিওয়া জান্নাতুল ফিরদওসি আইনা নাইমতাহা + সাইফী ওয়া ইন্নাল মাওতা লাবুদ্দা নাযিল' (তবে জান্নাতুল ফেরদাউস ব্যতীত কোথায় তার নেয়ামত পরিপূর্ণ হবে? এ অবস্থায় যে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী)।

লাবীদ ইবনে রবীআর বয়স নিয়ে মতভেদ করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, তাঁর বয়স হয়েছিলো ১৪০ বছর। কেউ বলেছেন, ১৫৭ বছর। আবার কেউ বলেছেন ১৬০ বছর। ওয়াল্লহু আ'লাম।

নাবেগা জা'দী

নাবেগা জা'দীর নাম নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, তাঁর নাম কায়স ইবনে আবদুল্লাহ। আবার কেউ বলেছেন, সাহেবান ইবনে কায়স ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসাদ ইবনে রবীআ ইবনে জা'দা। তবে নাবেগা নামেই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। 'নবুগ' শব্দের অর্থ প্রকাশিত হওয়া। মুর্খতার যুগে তিনি কাব্যচর্চা করতেন। পরে তিরিশ বছর পর্যন্ত তিনি কোনো কবিতা রচনা করেননি।

তারপর আবার কাব্যচর্চা শুরু করেন। কবিতার অঙ্গনে নতুন করে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেই হিসেবে তাঁর নামকরণ হয় নাবেগা। অথবা নাবেগ অর্থ অগ্রগামী। তিনি অগ্রগামী কবিদের অন্যতম ছিলেন বিধায় তাঁর নাম হয়েছে নাবেগা। নাবেগা জা'দী একজন পুণ্যবান কবি ছিলেন। জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেই দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন তিনি। তিনি নাবেগা যুবইয়ানীর চেয়েও দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো ১৮০ বছর। কেউ বলেছেন ২০০ বছর। আবার কেউ বলেছেন দু'শ বিশ বছর। আসমায়ী বলেছেন, দু'শ তিরিশ বছর। তবে প্রথম উক্তিটি অধিকতর বিশুদ্ধ। তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের জামানা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। জাহেলী যুগে তিনি মিল্লাতে ইব্রাহিমী সম্পর্কে আলোচনা করতেন। নামাজ, রোজা ও এস্তেগফার করতেন। সে সময় তিনি এমন কবিতা রচনা করতেন, যার মধ্যে বর্ণনা থাকতো তৌহিদ, আখেরাত, প্রতিদান, বেহেশত ও দোযখ ইত্যাদির। পরবর্তী কবিগণ তাঁর নীতিই অবলম্বন করতেন। যেমন উমাইয়া ইবনে সালত প্রমুখ। বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি একবার রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হয়ে কাসীদা পাঠ করলাম– 'আতাইতু রসূলল্লাহি ইযা যাআ বিলহুদা + ওয়া ইয়াত্‌লূ কিতাবান কাল মুখবিরি সির্‌রান' (আমি আল্লাহ্‌র রসুলের নিকটে এলাম, যখন তিনি হেদায়েত নিয়ে আগমন করলেন এবং একটি কিতাব পাঠ করে শোনালেন, যে কিতাবটি গোপনে সংবাদ প্রদানকারীর ন্যায়)। উক্ত কাব্য মুসলমানদের জন্য অহংবোধসম্বলিত ছিলো। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'বাগাআ সামাআ ইয়াজ্বিদুনা ওয়া আদুনা উলূনা ত্বারীকাহা আনাল মারজূফূনা যালিকা মাজহিরা'। (আকাশের বর্ষণ আমাদেরকে পেয়েছে। আর আমরা তার রাস্তাসমূহ অতিক্রম করেছি। নিশ্চয়ই আমরা পৌঁছে যাবো ওই নেয়ামতের প্রকাশস্থলে)। রসুলেপাক স. বললেন, হে আবু লায়লা! সেই প্রকাশস্থলটি কোথায়? তিনি বললেন, বেহেশতে। রসুলেপাক স. বললেন, ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ। তিনি স. আরও বললেন, 'লা ইয়াকীদুল্লহু ফামুকা' (আল্লাহতায়ালা তোমার মুখের মৃত্যু না দিন)। তিনি বলেছেন, তারপর ১২০ বছর পর আমি দেখি যে, আমার সকল দাঁত উত্তম ও অধিকতর শক্ত অবস্থায় আছে। কোনো দাঁত পড়ে গেলে সেখানে নতুন দাঁত গজিয়ে যেতো। সারা জীবন তাঁর সকল দাঁত ছিলো ঝকঝকে চকচকে। রসুলেপাক স. তাঁর মুখের জন্য দোয়া করেছিলেন। কবি নাবেগা জা'দী পুরো কবিতাটি রসুলেপাক স. এর সামনে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। এটি একটি দীর্ঘ কাব্য। তার বয়াতের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ছিলো তিনশ'। পুরো কবিতাটি ছিলো রসুলেপাক স. এর গুণগান ও প্রশংসায় ভরা।

কবি নাবেগা জা'দী খোলাফায়ে রাশেদীনের নিকট আসতেন। তাঁদের সঙ্গে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতেন এবং অনেক কবিতা আবৃত্তি করতেন। একদিন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাঁর কবিতা শুনে বললেন, হে নাবেগা! তোমার

কবিতা তোমার ওসিলা এবং সাহায্যকারী। আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তোমার সঞ্চিত সম্পদ। তুমি অবশ্যই এ সবের পুরস্কার পাবে। তোমার জন্য একটি মহাসত্য রসুলেপাক স. এর দর্শন, আর অপরটি হচ্ছে ইসলামে শামিল হওয়া। একথা বলে তিনি তাঁকে উটের আস্তাবলে নিয়ে গেলেন এবং একটি জোয়ান উটনী, কয়েকটি ঘোড়া, গম, খেজুর ও কাপড়ের স্তুপ দান করলেন। নাবেগা খেজুরগুলো তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, হে আবু লায়লা! আফসোস! তোমাকে দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হতে হয়। নাবেগা কুরায়েশদের প্রশস্তিমূলক একটি হাদিস রেওয়ায়েত করলেন। হাদিসটিতে বলা হয়েছে, তিনি (মোহাম্মদ স.) নবীগণের কলিজার টুকরা। খুব কম লোকই বেহেশতে এই মর্যাদা পাবেন। শায়েখ আজাল ইমাম আলী মুত্তাকী তাঁর 'জামে কবীর' পুস্তকে বর্ণনা করেছেন, আমি একবার কবি নাবেগা ইবনে জা'দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রসুলেপাক স. এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন? তিনি বললেন, হাঁ, আমি ওই কাসিদা রসুলেপাক স. এর সামনে পাঠ করেছি এবং তাঁর নুরানী চেহারা দর্শন করেছি। চেহারা মোবারকের উপর জালালের নমুনা উদ্ভাসিত হচ্ছিলো। তিনি তখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নেয়ামতের প্রকাশস্থল কোথায়? আমি বলেছিলাম, বেহেশতে, হে আল্লাহ্র রসুল! রসুলেপাক স. বলেছিলেন, বেহেশতে ইনশাআল্লাহ।

আবু নাঈম তাঁর 'তারিখে ইস্পাহান' গ্রন্থে বলেছেন, নাবেগা কায়েস ইবনে আবদুল্লাহ ইস্পাহানের কবি ছিলেন। তিনি হজরত আলীর পক্ষ থেকে ইস্পাহানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রসুলেপাক স. এর দরবারের খতীবগণ

রসুলেপাক স. এর দরবারের কবিগণ, মুয়াজ্জিনগণ, আমীর ওমরাগণ, লেখকগণ ইত্যাদি বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানেও তেমনি 'খতীবগণ' বহুবচনের শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে সীরাত গ্রন্থসমূহে যা পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে রসুলেপাক স. এর দরবারের খতীব বলতে একজনই ছিলেন। আর তিনি হচ্ছেন ছাবেত ইবনে কায়স। রসুলেপাক স. এর দরবারের খতীব বলতে ওই খতীবকে বুঝানো হচ্ছে না, যিনি জুমা ও দুই ঈদের নামাজে খোতবা দিয়ে থাকেন। কেননা রসুলেপাক স. নিজেই জুমা ও ঈদের নামাজের খোতবা প্রদান করতেন। এখানে খতীব বলে এক প্রকারের বক্তাকে বুঝানো হয়েছে। কোনো কাওম রসুলেপাক স. এর দরবারে এসে যদি তাদের আত্মগৌরব ও হঠকারিতা প্রদর্শন করতো, তখন দরবারের খতীব (বক্তা) তাদের মোকাবেলা করার জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। বাকপটুতা ও বাগ্মিতার মাধ্যমে তাদের অহংকার চূর্ণ করা হতো। আল্লাহ্র সাহায্যে মুসলমানগণই প্রবল হয়ে যেতেন। যেমন বনী

তামীমের মুর্খরা এসেছিলো তাদের খতীব ও কবিদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে তাদের গৌরব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। তখন রসুলেপাক স. হজরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মোকাবেলা করার জন্য। তিনি তাদের সামনে কাসীদা পাঠ করে বিজয়ী হয়েছিলেন। এভাবে রসুলেপাক স. হজরত ছাবেত ইবনে কায়সকে হুকুম দিয়েছিলেন, ওই সব বক্তাদের বাক্যবান প্রতিহত করতে। তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এমন এক ভাষণ দিলেন, যা ছিলো তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার পরিসীমার ঊর্ধ্বে। হতবাক হয়ে গিয়েছিলো তারা। এ সবই সম্ভব হয়েছিলো রসুলেপাক স. এর সহযোগিতা ও শক্তি জোগানোর ফলে। বনী তামীমের বুযুর্গ ব্যক্তি আকরা ইবনে হারেস তখন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! মোহাম্মদকে গায়েব থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়। একথা স্বীকার না করে আমাদের কোনো উপায় নেই যে, তাঁর খতীব ও কবিগণ আমাদের খতীব ও কবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অতঃপর বনী তামীমের সকল লোক হক ও ইনসাফের পথ অনুসরণ করলো এবং সকলেই ইসলামের অনুগত হয়ে গেলো।

হজরত ছাবেত ইবনে কায়স

হজরত ছাবেত ইবনে কায়স ইবনে শামাস ইবনে মালেকের উপনাম ছিলো আবু মোহাম্মদ অথবা আবু আবদুর রহমান। তিনি আনসার গোত্রের খতীব ছিলেন। তাঁকে খতীবে রসুলুল্লাহও বলা হতো। যেমন হাস্‌সান ইবনে ছাবেতকে বলা হতো শায়েরে রসুল। তিনি উহুদ ও তৎপরবর্তী সকল গযওয়াতে উপস্থিত ছিলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দীকের খেলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন তিনি। 'ইসাবা' রচয়িতা বলেছেন, সীরাতবিশেষজ্ঞগণ তাঁকে আসহাবে বদরের মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে তাঁরা একথাও বলেছেন যে, সর্বপ্রথম তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেন উহুদ প্রান্তরে। তারপর সকল গযওয়াতেই অংশগ্রহণ করেন তিনি। রসুলেপাক স. তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ওই ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিলো এই আয়াত– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজকে উচ্চ কোরো না'। হজরত ছাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর ছিলো উচ্চ। তাই তিনি রসুলে পাক স. এর মজলিশে হাজির হতেন না। নিজের ঘরের কোণে বসে থাকতেন। এ বিষয়ে জানতে পেয়ে রসুলেপাক স. তাঁকে ডেকে এনে বেহেশতের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ছাবেত ইবনে কায়েস কতোই না উত্তম ব্যক্তি। সে প্রশংসিত জীবন যাপন করবে এবং শহীদী মৃত্যু বরণ করবে।

হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. মদীনায় আগমন করে ছাবেত ইবনে কায়সকে ডেকে আনলেন। তিনি রসুলেপাক স. এর কাছে আরয

করলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসুলকে সেই বিষয় থেকে বিরত রাখতে চাই, যে বিষয় থেকে আমি বিরত রাখতে চাই নিজেকে ও আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে– এর প্রতিদান কী হবে? রসুলেপাক স. বললেন, এর প্রতিদান জান্নাত। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলো। লোকেরা যুদ্ধের ময়দান থেকে বিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। আমি ছাবেত ইবনে কায়সকে বললাম, চাচা! মানুষতো কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। দেখলাম, তিনি তাঁর রানের উপর থেকে তাঁর লুঙ্গি ওঠালেন। এদিক সেদিক হাত পা ছুঁড়ে বলতে শুরু করলেন, আমরা রসুলেপাক স. এর সঙ্গে এভাবে যুদ্ধ করিনি। এখানে তো দেখা যাচ্ছে সবাই আপন আপন জান বাঁচানোর চেষ্টায় তৎপর। কিন্তু হে আল্লাহ্! এ রকম অবস্থার প্রতি আমি অসন্তুষ্ট। তারপর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শাহাদতবরণ করলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন হজরত ছাবেত ইবনে কায়স হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের সঙ্গে থেকে মুসায়লামা কায্যাবের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে যুদ্ধ বিস্তৃতি লাভ করলো। লোকেরা তখন এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। তখন ছাবেত ইবনে কায়স এবং আবু হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালেম বললেন, লোকেরা এসব কী শুরু করেছে? আমরা তো রসুলেপাক স. এর সঙ্গে থেকে এভাবে যুদ্ধ করিনি। তারপর তাঁরা মাটিতে গর্ত খনন করে সেখানে পা ঠেকিয়ে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে শাহাদতবরণ করলেন।

হজরত ছাবেত ইবনে কায়সের শাহাদত সংক্রান্ত একটি বিস্ময়কর ঘটনা আছে। আল্লামা তাবারী হজরত আনাস থেকে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ইয়ামামার যুদ্ধের দিন হজরত ছাবেত ইবনে কায়সের শরীরে একটি উন্নতমানের বর্ম ছিলো। শাহাদতের পর এক মুসলমান তাঁর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বর্মটি শরীর থেকে খুলে নিয়ে গেলো। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এক ব্যক্তির কাছে হজরত ছাবেত ইবনে কায়স স্বপ্নে দেখা দিলেন। স্বপ্নযোগে তিনি তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে একটি ওসিয়ত করছি। আর এই স্বপ্নটিকে তুমি একটি পুণ্য স্বপ্ন মনে করো। আমার এই ওসিয়ত নষ্ট কোরো না। তুমি জেনে রেখো, ওমুক ব্যক্তি আমার বর্মটি আমার শরীর থেকে খুলে নিয়ে গিয়েছে। তার বাড়ি ওমুক স্থানে ওমুক মহল্লায়। তার কাছে এমন একটি ঘোড়া আছে। লম্বা একটি রশি দিয়ে ঘোড়াটিকে বাঁধা হয়। কিন্তু সে ঘোড়াটিকে না বেঁধে ছেড়ে দিয়ে রাখে, যাতে সেটি যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারে। আমার বর্মটির উপর একটি ডেগ উল্টা করে রাখা হয়েছে। সেই ডেগটির উপর আরেকটি ডেগ রাখা হয়েছে। আর লোকটির চেহারা সুরত এরকম এরকম। আমার বর্মটি এ ধরনের। তুমি খালেদ ইবনে ওলীদের নিকটে গিয়ে বলবে, আমার বর্মটি যেনো উদ্ধার করা হয়। আর আবু বকর সিদ্দীকের নিকটে বলবে, তিনি যেনো এটি বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ করে দেন। এক বর্ণনায় আছে, এর মূল্য ফকীর মিসকীনদের মধ্যে যেনো

বিলিয়ে দেওয়া হয়। আর আমার ওমুক ওমুক গোলামকে যেনো আযাদ করে দেওয়া হয়। ঘুম ভাঙার পর লোকটি হজরত খালেদ ইবনে ওলীদের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিলো। হজরত খালেদ কাউকে পাঠিয়ে বর্মটি নিয়ে এলেন। অতঃপর হজরত আবু বকর সিদ্দীকের কাছে স্বপ্নের ঘটনা জানানো হলো। তিনি হজরত ছাবেত ইবনে কায়সের স্বপ্নের ওসিয়ত মোতাবেক আমল করার অনুমতি দিলেন।

রসুলেপাক স. এর দরবারের হুদী গায়কগণ

উট চালনার সময় সুর করে ছন্দবদ্ধ কবিতা পাঠ করাকে বলা হয় হুদী। রসুলেপাক স. এর দরবারে হুদী গায়ক সাহাবী বেশ কয়েকজন ছিলেন। সে বিষয়ে সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলীতে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। রসুলেপাক স. যখন খয়বর অভিযানে যাচ্ছিলেন, তখন এক রাতে হজরত আমের ইবনুল আকওয়া হজরত ইবনে রওয়াহা রচিত রাজাস কবিতাগুলো হুদীর সুরে গাইছিলেন। হুদীর সুর শুনে সাহাবীগণ ঝিমাতে লাগলেন। উটগুলোর চলার গতি দ্রুততর হলো। সাইয়্যেদে আলম স. বললেন, হুদী গাইছে কে? সাহাবীগণ বললেন, ইবনুল আকওয়া। তিনি বললেন, রহমুল্লহ্। এক বর্ণনায় আছে, 'গফারা লাকা রব্বুকা' (তোমার রব তোমাকে ক্ষমা করুন)। আমের ইবনুল আকওয়া হুদী গাওয়া ক্ষান্ত করলেন। রসুলেপাক স. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহাকে বললেন, তুমি কি আমাদের জন্য হুদী গাইবে না? অতঃপর তিনিও হুদী গাইলেন এবং রসুলেপাক স. তাঁর জান্নাতপ্রাপ্তির জন্যও দোয়া করলেন।

আঞ্জাশা নামক এক হাবশী ক্রীতদাসী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো অতি মধুর। হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, হজরত বারা ইবনে মালেক হজরত আঞ্জাশার ভাই ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই হুদী গাইতেন। বারা ইবনে মালেক পুরুষদের মধ্যে। আর আঞ্জাশা মহিলাদের মধ্যে। রসুলেপাক স. বলতেন, আঞ্জাশা! উটগুলোকে আস্তে আস্তে চালাও যেনো কাঁচপাত্র তুল্য নারীদের মাথায় ঠোকাঠোকি না লাগে। হাওদার ভিতরের রমণীগণ তো কমজোর। দ্রুতগতিতে উট চালালে তাদের কষ্ট হয়।

রসুলেপাক স. এর ব্যবহৃত সমরসামগ্রী

তরবারীসমূহ

রসুলেপাক স. এর দশটি তরবারী ছিলো– এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে আমার জানা নেই, এই দশটি তরবারী একই সময়ে তাঁর কাছে ছিলো, না ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি স. সেগুলো ব্যবহার করেছিলেন।

১. তরবারীসমূহের মধ্যে একটি তরবারীর নাম ছিলো যুলফিকার। নবীজীবনী-বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, বদরযুদ্ধের দিন রসুলেপাক স. এর হাতে এসেছিলো এই

তরবারীটি। অন্যান্য যুদ্ধেও তিনি স. জুলফিকার ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি স. তরবারীটি আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদুনা আলীকে দান করেছিলেন।

২. দ্বিতীয় তরবারীর নাম ছিলো মাছুর। 'মাওয়াহেব' রচয়িতা বলেছেন, এটি প্রথম তলোয়ার, যা রসুলেপাক স. এর হস্তগত হয়েছিলো। সীরাতবিদগণ বলেছেন রসুলেপাক স. এই তলোয়ার সঙ্গে নিয়ে হিজরত করেছিলেন।

৩. তৃতীয় তরবারীর নাম আযব। এই তলোয়ারটি হজরত সাআদ ইবনে উবাদা রসুলেপাক স.কে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছিলেন, যখন তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন বদরের দিকে।

৪. চতুর্থ তলোয়ারের নাম ছিলো মিখযাম।

৫. পঞ্চম তলোয়ারের নাম ছিলো রাসুব। রাসুব শব্দের অর্থ পানির স্তরবিশিষ্ট বস্তু বা এমন তরবারী, যা স্তরান্তরে অদৃশ্য হয়ে যায়। 'কামুস' গ্রন্থে বলা হয়েছে, রাসুব রসুলেপাক স. এর তলোয়ারের নাম ছিলো। অথবা ওই সাতটি তরবারীর নাম ছিলো রাসুব, যা বিলকিস রাণী হজরত সুলায়মানের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। হারেছ ইবনে আবু শামরের তলোয়ারের নাম ছিলো রাসুব। হজরত আলী এই তলোয়ার বনী তায়ীর মূর্তিশালা ভাঙার অভিযানে ব্যবহার করেছিলেন। অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিলো নবম হিজরীতে। কেউ কেউ বলেছেন, যায়দুল খায়ল তায়ী তরবারীটি রসুলেপাক স. এর জন্য পাঠিয়েছিলেন।

৬. ষষ্ঠ তলোয়ারের নাম ছিলো কুলায়ী। মরুভূমির একটি জায়গার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এর। সম্ভবতঃ সেখানে তলোয়ারটি নির্মিত হয়েছিলো। তাই এর নাম হয়েছে সাইফে কুলায়ী।

৭. সপ্তম তলোয়ারের নাম ছিলো কাযেব। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে এটিই প্রথম তরবারী, যা রসুলেপাক স. কটিদেশে বেঁধেছিলেন। 'কামুস' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কাযেব ওই গাছকে বলা হয়, যার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে এবং যার শাখাসমূহ তীর ও ধনুকের জন্য কাটা হয়। 'সাররাহ' গ্রন্থে এর অর্থ করা হয়েছে– ধারালো তরবারী।

৮. অষ্টম তলোয়ারের নাম ছিলো যুলফিকার। তলোয়ারটি ছিলো মুনাব্বেহ ইবনুল হাজ্জাজ সাহমীর। বদর যুদ্ধের দিন তলোয়ারটি ধারণ করেছিলো তার পুত্র আস ইবনে মুনাব্বেহ। তলোয়ারটির মধ্যখানে পৃষ্ঠমোহর লাগানো ছিলো। রসুলেপাক স. কখনও তলোয়ারটি হাতছাড়া করতেন না। সকল যুদ্ধেই এটি তাঁর সঙ্গে ছিলো। এর সমস্ত অঙ্গসজ্জা ছিলো চান্দির। হজরত আলী মুর্তযা আস ইবনে মুনাব্বেহকে কতল করার পর এই তলোয়ারটি রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিয়ে হাজির হন। তিনি এই তলোয়ারটি নিজের জন্য পছন্দ করেন। পরবর্তীতে তিনি আহযাবের যুদ্ধে তা হজরত আলীকে দান করেন। এই তলোয়ার এবং এর বাহক সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'নেই কোনো নওজোয়ান আলী

ছাড়া, আর নেই কোনো তলোয়ার যুলফিকার ছাড়া'। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবে বলা হয়েছে, 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে যে তলোয়ারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এটি সেই তলোয়ার নয়। 'রওজাতুল আহবাবে' আরও বলা হয়েছে, এই তলোয়ার ভিন্ন একটি তলোয়ার, যা তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, এই ফকীরের ধারণা, ওই তলোয়ার ছিলো কাযিব। কোনো কোনো সীরাত বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, কাযিব আর যুলফিকার একই তরবারী।

বর্ম

১. রসুলেপাক স. এর একটি বর্ম ছিলো। তার নাম ছিলো সু'দিয়া বা সা'দিয়া– সীন বর্ণ দ্বারা। আবার তাকে সু'দিয়া– সোয়াদ বর্ণ দ্বারাও পড়া হতো। ২. আরেকটির নাম ছিলো ফিদ্দা। দু'টি বর্মই কায়নুকার ইহুদীদের অস্ত্রপাতি থেকে রসুলেপাক স. এর হস্তগত হয়েছিলো। 'মাওয়াহেব' প্রণেতা বলেছেন, সা'দিয়া নামক বর্মটি ছিলো নবী দাউদের, যা তিনি জালুত বাদশাহকে কতল করার সময় পরিধান করেছিলেন। ৩. তৃতীয় আরেকটি বর্ম ছিলো যার নাম যাতুল ফযুল। লম্বা এবং প্রশস্ত হওয়ার কারণে এর নামকরণ হয়েছিলো যাতুল ফযুল। রসুলেপাক স. যখন মদীনায় তশরীফ আনয়ন করেন, তখন হজরত সাআদ ইবনে উবাদা তা তাঁকে হাদিয়া হিসেবে দেন। এতে চারটি রৌপ্যের আংটা ছিলো। দু'টি ছিলো সীনা বরাবর আর দু'টি ছিলো কাঁধ বরাবর। এটি ওই বর্ম, যা রসুলেপাক স. আবু শাহাম ইহুদীর নিকট তিরিশ সা যবের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলেন। রসুলেপাক স. এর ওফাতের সময়ও বর্মটি উক্ত ইহুদীর কাছে বন্ধককৃত ছিলো। যাতুল ফযুল এবং ফিদ্দা দু'টি বর্মই উহুদযুদ্ধের দিন রসুলেপাক স. পরিধান করেছিলেন। ৪. আরেকটি বর্মের নাম ছিলো– যাতুল হাওয়াশী ওয়াতবান। বর্মটির এই নামকরণের কারণ হচ্ছে– অন্যান্য বর্ম থেকে এটি ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। ৫. আরেকটি বর্মের নাম ছিলো হারীফ। হারীফ নামকরণের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. এর পর হজরত আলী যাতুল ফযুল নামক বর্মটি বরকতের উদ্দেশ্যে যত্ন করে রেখেছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তা পরিধান করতেন। জীবনচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, জঙ্গেজামালের সময় হজরত আলী বর্মটি পরিধান করেছিলেন। কোনো কোনো জীবনচরিতবিশেষজ্ঞ মনে করেন, নবী দাউদ জালুতকে হত্যা করার সময় যে বর্ম পরিধান করেছিলেন, সেটি রসুলেপাক স. এর নিকট ছিলো। তার নাম ছিলো রওহা। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে এরকম বলা হয়েছে। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সা'দিয়া বর্মকেই নবী দাউদের বর্ম বলা হতো। ওয়াল্লহু আ'লাম।

মিগফার

বুনন করা যুদ্ধের পোশাক, ইউনিফরম বা হেলমেট জাতীয় বস্তুকে মিগফার বলা হয়। যা টুপির নিচে পরিধান করা হতো। অথবা সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করা হতো। রসুলেপাক স. এর দু'টি মিগফার ছিলো। একটিকে বলা হতো মুওয়াশশাহ আর অপরটিকে বলা হতো যুলবু। কোনো কোনো জীবনচরিতবিশেষজ্ঞ বলেছেন, তাছাড়া রসুলেপাক স. এর একটি লৌহনির্মিত শিরস্ত্রাণ বা হেলমেটও ছিলো। আরববাসীরা তাকে বায়দা বলতো। উহুদযুদ্ধের দিন রসুলেপাক স. তা মাথার উপর স্থাপন করেছিলেন। শিরোস্ত্রাণটির লৌহকীলক রসুলেপাক স. এর গণ্ডদেশে ঢুকে গিয়েছিলো। তাঁর চেহারা মোবারক হয়ে গিয়েছিলো রক্তাক্ত। জীবনচরিতবিশারদগণ মিগফার ও বায়দার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। মিগফার খিলানের মতো হয়ে থাকে। আর বায়দা হলো উপরের দিকে উঁচু, মুরগীর অর্ধ ডিম্বাকৃতির, যার মধ্যে অনেক জিঞ্জির ঝুলন্ত থাকে ঘাড়, চেহারা, কাঁধ ও সীনা বরাবর।

ঢাল

রসুলেপাক স. এর তিনটি ঢাল ছিলো। একটির নাম ছিলো আযলাক। দ্বিতীয়টির নাম ফাতাক। আর তৃতীয়টি দুফর। বর্ণিত আছে, উপরোক্ত তিনটি ঢাল ছাড়াও রসুলেপাক স. এর আরেকটি ঢাল ছিলো, যার মধ্যে দুম্বার ছবি ছিলো। এটি তাঁকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি ছবি থাকাটা অপছন্দ করেন এবং তার উপর হাত রাখেন। তখন ছবিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক বর্ণনায় এসেছে, একবার সকাল বেলা তিনি জাগ্রত হলেন। দেখলেন, আল্লাহ্তায়ালা ঢালের উপর থেকে সে ছবিটি মুছে দিয়েছেন। 'রওজাতুল আহবাব' রচয়িতা বলেছেন, ঢালটি উপরোল্লিখিত তিনটি ঢালের অন্যতম ছিলো কিনা, তা জানা যায় না। হতে পারে এটি ছিলো অন্য আরেকটি ঢাল। ওয়াল্লহু আ'লাম।

তীর

রসুলেপাক স. এর চারটি তীর ছিলো। তিনি বনী কায়নুকার ইহুদীদের অস্ত্রপাতি থেকে তিনটি তীর পছন্দ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর আরও একটি তীর ছিলো, যার নাম ছিলো মাছওয়া। এর অর্থ দুই ধার বিশিষ্ট বা আশ্রয়স্থল। কেউ কেউ বলেছেন, দুই প্রকারের তীরেরই এই নাম ছিলো। আবার কেউ কেউ বলেছেন, না, একটির নাম ছিলো মাছওয়া।

হেরবা

রসুলেপাক স. এর কয়েকটি হেরবা ছিলো। 'সাররাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হেরবা কাষ্ঠখণ্ডকে বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, ছোটো তীরকে হেরবা বলা হয়। একটি হেরবার নাম ছিলো নাবগা, দ্বিতীয়টি বায়দা। আর তৃতীয়টির নাম ছিলো আনাযা।

হাদিস শরীফে এসেছে– 'হাবশীরা হেরবা নিয়ে খেলা করছিলো'। রসুলেপাক স. এর আরেকটি হেরবার নাম ছিলো নাবআ। নাবা এক প্রকারের গাছ, যার দ্বারা ধনুক বানানো হয়। আর তার ডাল দ্বারা বানানো হয় তীর। সে হেরবার নাম ছিলো বায়দা যা শাদা কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা নির্মিত ছিলো। আনাযা নামক হেরবাটি ছিলো অনেকটা তীরের মতো দেখতে। রসুলেপাক স. এর খাদেমগণ তা সুতরা হিসেবে ব্যবহার করতেন। এস্তেঞ্জার জন্য তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে ঢিলা বের করা হতো। ঈদের নামাজের সময় রসুলেপাক স. এর সামনে সুতরা হিসেবে গেড়ে দেওয়া হতো।

ধনুক

রসুলেপাক স. এর ধনুক ছিলো দু'টি। ধনুক দু'টো বনী কায়নুকাদের অস্ত্রপাতি থেকে পাওয়া গিয়েছিলো। তন্মধ্যে একটির নাম ছিলো রওহা। দ্বিতীয়টির নাম ছিলো বায়দা। আরও দু'টি ধনুক ছিলো শাওত বৃক্ষের। আরেকটি ছিলো নাবা বৃক্ষের। ওগুলোর নাম ছিলো শফরা, কুত্তুম এবং পাঞ্জকাশত। এগুলো আবু কাতাদা এনেছিলেন। এগুলোকে আবার মুত্তাসেলা বলা হতো। এগুলোর বন্ধনী ছিলো চামড়ার, যার মধ্যে তিনটি করে রৌপ্যের আংটা ছিলো।

তাঁবু

রসুলেপাক স. এর একটি তাঁবু ছিলো– যার নাম ছিলো কিন। কিন আসলে একটি কাওমের নাম। এর শাব্দিক অর্থ ঢাকনা। তার বহুবচন আকনান এবং আকিন্না। যেমন আল্লাহ্তায়ালা মানুষের উপর এহসান প্রকাশ করে কোরআনে করীমে বলেছেন– 'আর আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের জন্য পাহাড় দিয়ে ঢাকনা বানিয়ে দিয়েছেন'। আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেছেন 'আমি কাফেরদের অন্তরসমূহের উপর ঢাকনা বানিয়ে দিয়েছি'। রসুলেপাক স. এর তাঁবু ছিলো পুরু, চামড়া নির্মিত। এক হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. একবার তাঁবুর ভিতর অবস্থান করছিলেন। তাঁবুটি ছিলো অত্যন্ত ছোটো। একজন সাহাবী এসে তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। রসুলেপাক স. অনুমতি দিলেন। সাহাবী ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, আমি কি আমার পুরো শরীর নিয়ে প্রবেশ করবো? একথার অর্থ, তাঁবুটি এতো সংকীর্ণ যে, তা দু'জনের জন্য যথেষ্ট নয়। রসুলেপাক স.ও রসিকতা করে জবাব দিলেন, হাঁ তোমার পুরো শরীর নিয়েই প্রবেশ করো।

পতাকা

রসুলেপাক স. এর কয়েকটি পতাকা ছিলো। তন্মধ্যে একটি পতাকা ছিলো কালো রঙের। তার নাম ছিলো একাব। আরেকটি পতাকা ছিলো শাদা রঙের। রসুলেপাক স. কখনও কখনও তাঁর বিবিগণের চাদর দিয়ে পতাকা বানিয়ে ব্যবহার করতেন।

চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ

রসুলেপাক স. এর চতুষ্পদ প্রাণী– যেমন ঘোড়া, উট, খচ্চর, গাধা এবং বকরী এ সব অনেক ছিলো। তবে তিনি গরু বা মহিষ পালতেন কি না, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। রসুলেপাক স. এর ঘোড়া ছিলো দশটি। ১. সাকাব বা সাকীব নামের একটি ঘোড়া ছিলো। সাকাব বা সাকীব শব্দের অর্থ পানি প্রবাহিত করা। তাঁর ঘোড়ার নাম সাকাব বা সাকীব রাখা হয়েছিলো এজন্য যে, ঘোড়াটি দৌড়ের সময় পানির প্রবাহের মতো দ্রুতগামী হতো। 'কামুস' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সাকাব ওই ঘোড়া, যা দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং দৃঢ়পদী। এই ঘোড়াটিই ছিলো রসুলেপাক স. এর সর্বপ্রথম ঘোড়া। ঘোড়াটি তিনি ক্রয় করেছিলেন দশ আওকিয়া দ্বারা। এর উপর আরোহণ করে তিনি জেহাদে গমন করতেন। পূর্বে এর মালিকের নিকট এর নাম ছিলো দরমিন। রসুলেপাক স. এর নাম পরিবর্তন করে রাখেন সাকাব। তিনি এই ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে ঘোড়াটিকে দ্রুত চালনা করতেন এবং অগ্রগামী হয়ে যেতেন। এভাবে আনন্দিত হতেন খুব। ঘোড়াটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিলো। যেমন– ১. কাসিয়াত ২. আগার ৩. মেহজাল ও ৪. তুলুকুল ইয়ামীন। কামিয়াত বলা হয় এমন ঘোড়াকে যার রঙ কালো ও লালের মাঝামাঝি। দু'টির মধ্যে কোনো একটি রঙ যেনো খালেসভাবে না থাকে। আগার ওই ঘোড়াকে বলা হয়, যার কপালে থাকে শাদা রঙ। মেহজাল ওই ঘোড়াকে বলা হয়, যার চার পা-ই শাদা। 'তুলুকুল ইয়ামীন' ওই ঘোড়াকে বলা হয়, যার পিছনের পা এবং সামনের পা শাদা। আর এক পা শাদা নয়। ইবনুল আছীর বলেছেন, রসুলেপাক স. এর সাকীব নামের ঘোড়াটি ছিলো কালো। হাদিস শরীফে এসেছে– খইরুল খাইলি আদহাম। অর্থাৎ বরকতময় ঘোড়া হলো কালো ঘোড়া।

২. দ্বিতীয় ঘোড়ার নাম ছিলো মুযতাজির। মুযতাজির শব্দের উৎপত্তি 'যিজর' থেকে। 'যিজর' কবিতার এক প্রকার ছন্দের নাম। ঘোড়াটি ছন্দময় গতিতে দৌড়াতো। এজন্য এর নামকরণ হয়েছিলো মুযতাজির। ঘোড়াটি ক্রয় করা হয়েছিলো সাওয়াদ ইবনুল হারেছ ইবনে যালেম নামের এক বেদুঈনের কাছ থেকে। ওই বেদুঈন বনী মুররা বা বনী তামীম গোত্রের লোক ছিলো। সে ঘোড়াটি বিক্রি করার পর আবার অস্বীকার করে বসেছিলো। তখন হজরত খোযায়মা ইবনে ছাবেত আনসারী এ বিষয়ে সাক্ষী দিয়েছিলেন। তাঁর একার সাক্ষ্যই দু'জনের সাক্ষ্যের সমান সাব্যস্ত হয়েছিলো। এ জন্য তাঁকে যুশ্শাহাদাতাইন বলা হতো।

৩. রসুলেপাক স. এর তৃতীয় ঘোড়ার নাম ছিলো লেযায। ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ মাকুকাশ ঘোড়াটি রসুলেপাক স.কে হাদিয়া দিয়েছিলেন। সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. ঘোড়াটিকে খুব পছন্দ করতেন এবং অধিকাংশ সময় তার উপর আরোহণ করে সফর করতেন। 'কামুস' গ্রন্থে এসেছে, লেযায শব্দের অর্থ কঠোরতা এবং মিলে থাকা। এর আরেকটি নাম ছিলো মেযায।

এটি মাকুকাশ বাদশাহ হজরত মারিয়া কিবতিয়ার সঙ্গে হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ঘোড়াটির নাম লেযায রাখার কারণ হচ্ছে, ঘোড়াটি দুশমনের প্রতি কঠোর ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিলো। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থের পাদটীকায় বলা হয়েছে, লেযায শব্দের অর্থ কোনো জিনিস সোজা করে বাঁধা। বলা হয়ে থাকে 'রজুলুন আলায্যু' (শক্ত দুশমন)। সুতরাং ঘোড়াটির নাম রাখা হয়েছিলো লেযায এ কারণে যে, ঘোড়াটি ছিলো অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন।

৪. রসুলেপাক স. এর চতুর্থ ঘোড়াটির নাম ছিলো লাহীফ। এটি রসুলেপাক স.কে হাদিয়া দিয়েছিলেন রবীআ ইবনে আবুল বারা। তিনি বিনিময়স্বরূপ তাঁকে দিয়েছিলেন কয়েকটি উট। লাহাফ শব্দের অর্থ চাদরের মধ্যে আচ্ছাদিত হওয়া। আর 'এনাতেহাফ' শব্দের অর্থ শরীরের উপর কাপড় পেঁচানো। আর লেহাফ শব্দের অর্থ যা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। ঘোড়াটির নাম লাহীফ রাখার কারণ হলো ঘোড়াটি ছিলো বিশাল আকৃতির। মাটির উপরে শুয়ে পড়লে মাটির অনেকাংশ আচ্ছাদিত করে ফেলতো। তার লেজটিও এতো লম্বা ছিলো যে, যমীনের উপর বিছিয়ে পড়তো। কোনো কোনো নোসখায় এসেছে, লুহায়ক। তবে লাহীফ শব্দটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। এরকম বর্ণনা করা হয়েছে 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থের পাদটীকায়। এর নাম আবার 'জীম' বর্ণ দ্বারা লাজীফ এবং 'খ' বর্ণ দ্বারা লাখীফও বর্ণিত হয়েছে। 'নেহায়া' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, বোখারী এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে আমি তার তাহকীক (সত্যাসত্য নিরূপণ) করিনি। মশহুর হলো 'হা' বর্ণ দ্বারা। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এরকমই এসেছে। 'কামুস' (অভিধান) গ্রন্থে 'হা' এবং 'খ' দুই বর্ণ দ্বারাই উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. রসুলেপাক স. এর পঞ্চম ঘোড়াটির নাম ছিলো ওয়ারদ। ওয়ারদ শব্দের অর্থ গোলাপী। কাসিয়াত (লাল ও কালোর মিশ্রণ) ও আশকার– (শাদা ও লাল বর্ণের মিশ্রণ) এর মাঝামাঝি বর্ণের ঘোড়াকে বলা হয় ওয়ারদ। উটেরও এরকম রঙ হয়ে থাকে। সে কারণে উটের বিশেষণেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঘোড়াটি রসুলেপাক স.কে হাদিয়া দিয়েছিলেন হজরত তামীম দারী। পরে তিনি তা হজরত ওমর ফারুককে দান করে দিয়েছিলেন। হজরত ওমর ফারুকও একজন গাযীকে তা দান করে দেন। পরবর্তীতে সেই লোক ঘোড়াটিকে অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল বানিয়ে বিক্রি করে ফেলতে চাইলো। হজরত ওমর ফারুক তখন সেটি পুনরায় তাঁর কাছ থেকে ক্রয় করে নিতে চাইলেন। রসুলেপাক স. বললেন, যে জিনিস আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদকা করে দেওয়া হয়, তা পুনরায় ফিরিয়ে আনা উচিত নয়।

৬. রসুলেপাক স. এর ষষ্ঠ ঘোড়ার নাম ছিলো দরীস। আসলে দরীস বলা হয় কূপকে, যার পাড় পাথর দিয়ে চওড়া করে মজবুত করা হয়। শক্ত ও মজবুত হওয়ার কারণে এই ঘোড়ার নামকরণ করা হয়েছিলো দরীস। 'রওজাতুল আহবাব'

কিতাবে এরকম বলা হয়েছে। 'কামুস' অভিধান গ্রন্থে আছে, দরস ওই পাথরকে বলা হয়, কূপকে চওড়া করার কাজে যা ব্যবহৃত হয়। রসুলেপাক স. এক ব্যক্তির কাছ থেকে ঘোড়াটি ক্রয় করেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন সাকাব।

৭. রসুলেপাক স. এর সপ্তম ঘোড়ার নাম ছিলো যারেব। ফারওয়া ইবনে আমর হুযামী তা হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যারেব শব্দের অর্থ মজবুত হওয়া। যেমন বলা হয় 'যারুবাত হাওয়াফিরুদ দাব্বাতান' অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণীর ক্ষুর মজবুত হয়েছে। সুদৃঢ় ও মজবুত হওয়ার কারণে তার নাম রাখা হয়েছিলো যারেব।

৮. রসুলেপাক স. এর অষ্টম ঘোড়ার নাম ছিলো মুলাবেহ। প্রথমে এই ঘোড়ার মালিক ছিলেন হজরত আবু বুরদা। 'রওজাতুল আহবাব' কিতাবের পাদটীকায় আছে, 'মালওয়াহ' বা 'মালাবেহ' ওই ঘোড়াকে বলা হয়, যার কোমর হালকা পাতলা।

৯. রসুলেপাক স. এর নবম ঘোড়ার নাম ছিলো সাবহা। 'সাবহা' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে 'সাবাহাতুন' থেকে। এর অর্থ সন্তরণ করা। সন্তরণতুল্য গতি থাকার কারণে এর নামকরণ হয়েছিলো সাবহা। ইবনুল যাতীন বলেছেন, ঘোড়াটি ছিলো আশকার বর্ণের। রসুলেপাক স. ঘোড়াটিকে এক বেদুঈনের কাছ থেকে দশ উটের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন।

১০. রসুলেপাক স. এর দশম ঘোড়ার নাম ছিলো বাহর। প্রশস্ত ঘোড়াকে বাহর বলা হয়। 'কামুস' গ্রন্থে এসেছে, 'বাহর' শব্দের অর্থ জাওয়াদ (উন্নতমানের ঘোড়া) তিনি ঘোড়াটিকে ইয়ামন থেকে আগত ব্যবসায়ীদের থেকে ক্রয় করেছিলেন। রসুলেপাক স. এই ঘোড়ায় আরোহণ করে তিন তিন বার প্রতিযোগিতা করেছিলেন এবং তিনবারই অগ্রগামী হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর পবিত্র হাত ঘোড়াটির কপালের উপর রেখে বলেছিলেন, তুমি বাহর (দরিয়া)। আমি তোমার নাম রাখলাম বাহর। বোখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এই ঘোড়াটি ছিলো শাদা রঙের। ইবনে আছীর বলেছেন, কাসিয়াত রঙের।

এই ছিলো রসুলেপাক স. এর দশটি ঘোড়া, বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে যার বর্ণনা পাওয়া যায়। উপর্যুক্ত নামসমূহ ছাড়াও কেউ কেউ আরও নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন– আবলাক, যুলএকাল, যুললিম্মা, মুবতাজিল, তারাদেহ, সেরহান, ইয়াসুব, নাহীব, আদহাম, সাজা, তিরফ, মন্দুব ইত্যাদি। প্রকাশ থাকে যে, রসুলেপাক স. এর ঘোড়া সম্পর্কে সীরাতবিশেষজ্ঞগণ অধিক আলোচনা করেছেন। তবে একথাটি প্রকাশ পায়নি যে, ঘোড়াগুলো কোনটি কোন প্রজাতির ছিলো। কেননা ঘোড়ার অনেক প্রজাতি আছে। যেমন, ইরাকী ঘোড়া, তুর্কী ঘোড়া ইত্যাদি। তবে এতোটুকু অনুমেয় যে, ওগুলো সম্ভবতঃ আরবী ঘোড়া ছিলো। ওয়াল্লহু আ'লাম।

হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. এর নিকট বিবিগণের পর ঘোড়া সবচেয়ে প্রিয় ছিলো। রসুলেপাক স. বলেছেন, তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার কাছে প্রিয়। সম্ভবতঃ তন্মধ্যে তৃতীয়টি ছিলো ঘোড়া। ঘোড়াসমূহের মধ্যে রসুলেপাক স. এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিলো আশকার, আরছাম, আকরাহ্, মিহজাল ও মুতলাকুল ইয়ামীন। আশকার, মিহজাল ও মুতলাকুল ইয়ামীনের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে। আর আরছাম এমন ঘোড়াকে বলা হয়, যার নাক ও নিচের ঠোঁট শাদা। আকরাহ ওই ঘোড়াকে বলা হয়, যা হয় উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ। রসুলেপাক স. ঘোড়ার কপালে ধরে বলতেন, ঘোড়া কিয়ামত পর্যন্ত তার কপালের মধ্যে কল্যাণ বাঁধা অবস্থায় আছে এবং পুরস্কার ও গনিমত তার সঙ্গে জড়িত। কপাল বলতে এখানে কপাল থেকে ঝুলে থাকা চুলকে বুঝানো হয়েছে। ঘোড়ার মর্যাদা বুঝাতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর পবিত্র কালামে ঘোড়ার কসম করে বলেছেন– 'ধাবমান গতিতে এগিয়ে আসা অশ্বের শপথ'। হাদিস শরীফে ঘোড়াকে অপদস্থ করা, তার উপর বোঝা বহন করা এবং অন্য কাজে ঘোড়াকে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। 'হায়াতুল হায়ওয়ান' গ্রন্থে প্রখ্যাত মোহাদ্দেছ হাকিম নিশাপুরী আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা যখন ঘোড়া সৃষ্টি করতে চাইলেন, তখন দক্ষিণা হাওয়াকে বললেন, আমি তোমা থেকে এমন একটি মাখলুক সৃষ্টি করবো, যা দ্বারা বন্ধুদের ইজ্জত, দ্বীনের দুশমনদের অপদস্থতা, আনুগত্যকারীদের ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি করবো। দক্ষিণা হাওয়া আরয করলো, হে প্রভুপালক! আপনি আমা থেকে এমন মাখলুক সৃষ্টি করুন। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কুদরতী হাত দ্বারা এক মুষ্টি হাওয়া নিলেন এবং তা দ্বারা ঘোড়া সৃষ্টি করলেন। এক বর্ণনায় এসেছে, কামিয়াত ঘোড়া সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্তায়ালা ঘোড়াকে সম্বোধন করে বললেন, আমি তোমাকে সৃষ্টি করলাম এবং তোমার কপালে কল্যাণ রেখে দিলাম। যে তোমার পিঠে আরোহণ করবে, সে গনিমত লাভ করবে। আমি তোমাকে এমনভাবে সৃষ্টি করলাম যে, তুমি পাখা ছাড়াই উড়তে পারবে। আমি তোমার পৃষ্ঠদেশ তৈরী করেছি সকল বীর পুরুষদের জন্য, যারা তসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তকবীর বলবে। ফেরেশতারা যখন শুনতে পেলো যে আল্লাহ্তায়ালা ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন, তখন তারা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলো, হে আমাদের প্রভুপালক! আমরাও তোমার বান্দা। আমরাও তোমার তসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তকবীর পাঠ করে থাকি। তুমি আমাদের জন্য কী সৃষ্টি করেছো? তখন আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাদের জন্য এক ধরনের ঘোড়া সৃষ্টি করলেন, যেগুলোর গর্দান বুখতী উটের মতো। আল্লাহ্তায়ালা এই ঘোড়া সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে, ফেরেশতারা তার উপর আরোহণ করে নবী রসুলগণকে সাহায্য করবে। ঘোড়ার পা ও অন্যান্য অঙ্গসমূহ যখন তৈরী করা হয়ে

গেলো, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি তোমার হ্রেষাধ্বনি দ্বারা মুশরিকদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করবে। তাদের কানে তোমার আওয়াজ পৌঁছে দিয়ে তাদের গর্দানকে লাঞ্ছিত করে দিবে।

হজরত আদমকে যখন পয়দা করা হলো এবং তাঁর সামনে সমস্ত মখলুক উপস্থিত করা হলো, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে বললেন, আমার এ সব সৃষ্টি থেকে যাকে তুমি চাও এবং যেটি তোমার পছন্দ হয় নিজের জন্য গ্রহণ করো। তিনি ঘোড়া পছন্দ করলেন। তখন আদমকে বলা হলো, তুমি তোমার এবং তোমার বংশধরদের সম্মানকে চিরদিনের জন্য গ্রহণ করলে। এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্তায়ালা জিবরাইলকে বললেন, দক্ষিণা হাওয়া থেকে এক মুষ্টি হাওয়া গ্রহণ করো। তিনি এক মুষ্টি হাওয়া গ্রহণ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা তা দ্বারা কাসিয়াত ঘোড়া সৃষ্টি করলেন। এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহ্তায়ালা ঘোড়া সৃষ্টি করার জন্য দক্ষিণা হাওয়া থেকে এক মুষ্টি গ্রহণ করতে জিবরাইলকে নির্ধারণ করলেন। আর আদমকে সৃষ্টি করতে এক মুষ্টি মাটি সংগ্রহ করার জন্য আজরাইলকে নির্ধারণ করলেন কেনো? উত্তরে বলা যায়, মাটির স্বভাব হচ্ছে বখিলী বা কৃপণতা করা। আজরাইলের মধ্যে কঠোরতা ও জবরদস্তি করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই তাঁকে হুকুম দেওয়া হয়েছিলো মাটি সংগ্রহ করার জন্য। আর হাওয়ার মধ্যে মাটির তুলনায় সাখাওয়াত বা বদান্যতা বেশী। তাই এক্ষেত্রে হুকুম দেওয়া হয়েছিলো জিবরাইলকে, তিনি যেনো নম্রতার সাথে তা গ্রহণ করেন। যেমন রসুলেপাক স. এর গুণাবলীর ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে, রমজান মাসে তিনি প্রবহমান বাতাসের মতো হয়ে যেতেন। তাছাড়া জিবরাইলের ঘোড়ার সঙ্গে এক প্রকারের সম্পর্ক ছিলো। তিনি ঘোড়ায় চড়ে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে জেহাদ করেছেন। তাঁর ঘোড়ার নাম ছিলো হায়যুম। ওয়াল্লহু আ'লাম।

'হায়াতুল হায়ওয়ান' পুস্তকের লেখক বলেছেন, সর্বপ্রথম যিনি ঘোড়ায় আরোহণ করেছেন, তিনি হচ্ছেন হজরত ইসমাঈল। ইতোপূর্বে ঘোড়া অন্যান্য বন্য পশুদের মতো ছিলো। আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহীম ও হজরত ইসমাঈলকে কাবাগৃহের দেয়াল উঁচু করার হুকুম দিলেন। আরও বললেন, আমি তোমাকে একটি খাযানা প্রদান করবো, যা আমি তোমার জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি। তারপর হজরত ইসমাঈলকে ওহী করা হলো, তুমি বের হও এবং সে খাযানা তালাশ করো। অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহীমকে হুকুম দিলেন লোকদেরকে আহ্বান করার জন্য। আরব ভূখণ্ডের এমন কোনো অংশ ছিলো না যেখান থেকে লোকজন এসে হাজির হয়নি। এরপর আল্লাহ্তায়ালা ঘোড়ার কপালের উপর তাঁকে সক্ষম বানালেন এবং ঘোড়াকে তাঁর জন্য অনুগত বানিয়ে দিলেন। এজন্যই রসুলেপাক স. বলেছেন, তোমরা ঘোড়ায় আরোহণ করো, কেননা এ হচ্ছে তোমাদের পিতা ইসমাঈলের মীরাছ। হাদিসটি নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

খচ্চর

১. রসুলেপাক স. এর কয়েকটি খচ্চর ছিলো। তন্মধ্যে একটির নাম ছিলো দুলদুল। এটি শাদা-কালো রঙের ছিলো। এটি মাকুকাশ বাদশাহ হজরত ইব্রাহীমের মাতা হজরত মারিয়া কিবতিয়ার সঙ্গে হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। রসুলেপাক স. এর পর হজরত আলী মুর্তযা তার উপর আরোহণ করতেন। অতঃপর তা পেয়েছিলেন হজরত ইমাম হাসান। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দুলদুলকে যখন রসুলেপাক স. এর দরবারে আনা হলো, তখন রসুলেপাক স. আমাকে হজরত উম্মে সালামার নিকট পাঠালেন তাঁর কাছ থেকে কিছু পশম আনার জন্য। তারপর রসুলেপাক স. পশম দ্বারা রশি পাকালেন তাকে বাঁধার জন্য। অতঃপর হুজরা শরীফে গিয়ে একটি কম্বল আনলেন। কম্বলটি চার প্রস্থ ভাঁজ করে খচ্চরের পিঠে স্থাপন করলেন। অতঃপর 'বিসমিল্লাহ' বলে তার উপর আরোহণ করলেন এবং আমাকে তাঁর পিছনে বসালেন। এটি ছিলো প্রথম খচ্চর, যা ইসলামী যুগে বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো। 'হায়াতুল হায়ওয়ান' রচয়িতা বলেছেন, মোহাদ্দেছীনে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, রসুলেপাক স. এর খচ্চরটি নরও ছিলো না, মাদীও ছিলো না। ওয়াল্লহু আ'লাম।

তাবারানী 'মু'জামে আওসাত' গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, মুসলমানগণ যখন হুনায়ন যুদ্ধের দিন বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো, তখন রসুলেপাক স. দুলদুল নামক খচ্চরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, হে দুলদুল! তুমি মৃত্তিকার নিকটবর্তী হও। দুলদুল তার বুক মাটিতে স্থাপন করলো। রসুলেপাক স. এক মুষ্টি মাটি তুলে নিয়ে দুশমনদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। বললেন, হুম লা ইউনসারূন (তাদেরকে সাহায্য করা হবে না)। দুশমনেরা পরাজয় বরণ করলো।

২. রসুলেপাক স. এর অন্য একটি খচ্চরের নাম ছিলো ফিদ্দা। সেটি ফারওয়া ইবনে আমর হুযামী রসুলেপাক স. এর জন্য হাদিয়াস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, দুলদুল আর ফিদ্দা একটিরই নাম। এই খচ্চরটি রসুলেপাক স. হজরত আবু বকর সিদ্দীককে দান করেছিলেন।

৩. রসুলেপাক স. এর আরেকটি খচ্চর আয়লার অধিবাসী ইবনুল আলা রসুলেপাক স.কে হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিলেন। এ জন্য তাকে আয়লিয়া বলা হতো।

৪. রসুলেপাক স. এর আরেকটি খচ্চর ছিলো, যা এসেছিলো দওমাতুল জন্দল থেকে।

৫. রসুলেপাক স. এর আরেকটি খচ্চর ছিলো, যা হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছ থেকে এসেছিলো।

৬. কেউ কেউ বলেছেন, আরেকটি খচ্চর ছিলো, যা ইরানের বাদশাহ কেসরা পাঠিয়েছিলো। কথাটি ঠিক নয়। কেননা ওই হতভাগাটিতো রসুলেপাক স. এর

পত্র টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিলো। সুতরাং তার পক্ষ থেকে হাদিয়া আসার বিষয়টি অবাস্তব বলেই মনে হয়।

জেনে রাখা ভালো যে, ঘোড়া এবং গাধার যৌথ প্রজননের মাধ্যমে খচ্চরের জন্ম হয়। সে কারণে তার সঙ্গে গাধার অঙ্গের দৃঢ়তা আর ঘোড়ার অঙ্গের দীর্ঘতা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া সে কারণে খচ্চরের আওয়াজের মধ্যে ঘোড়ার আওয়াজের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আবার গাধার আওয়াজেরও উপস্থিতি তার মধ্যে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ খচ্চর বন্ধ্যা হয়ে থাকে। তার কোনো বাচ্চা হয় না। একটি কথা মশহুর আছে যে, খচ্চর ঘোড়া ও গাধার মিশ্র প্রজনন থেকে জন্ম। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. এর খেদমতে একটি খচ্চর আনা হলো। তিনি তা খুব পছন্দ করলেন। সাহাবা কেরাম বললেন, আমরা ঘোড়ার কাছে গাধাকে ছেড়ে দেই, তাহলে তা থেকে খচ্চর জন্ম নিবে, কিন্তু রসুলেপাক স. তাতে রাজী হলেন না। বললেন, এ কাজ ওই ব্যক্তি করতে পারে যার এলেম নেই।

উপরোক্ত কাজ করার নিষিদ্ধতার কারণ সম্পর্কে উলামা কেরাম বলেছেন, রসুলেপাক স. কোনো পশুকে ভিন্ন জাতের পশুর মধ্যে ছেড়ে দেয়াটা অপছন্দ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এরূপ কাজ করলে ঘোড়ার যে প্রজাতি রয়েছে তার মধ্যে স্বল্পতার সংকট সৃষ্টি হবে। ফলে ঘোড়া দ্বারা যে উপকারিতা লাভ করা যায়, যেমন তার উপর নির্ভর করা, বাহন বানানো, দৌড় দেওয়া, কোনো কিছু অন্বেষণ করা, যুদ্ধ করা এবং ইজ্জত সম্মান ও গনিমত লাভ করা ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

'হায়াতুল হায়ওয়ান' গ্রন্থের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, খচ্চরের জন্ম দুই পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। গ্রন্থকার আল্লামা নিশাপুরী বলেছেন, যদি নর গাধা হয়, তাহলে ঘোড়ার চেয়ে খচ্চর অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে। আর যদি নর ঘোড়া হয় তাহলে গাধী থেকে জন্ম নেয়া খচ্চর গাধা সদৃশ হয়ে থাকে এবং এর প্রত্যেক অঙ্গ ঘোড়া ও গাধার মাঝামাঝি ধরনের হয়ে থাকে। তেমনিভাবে তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলীর অবস্থাও। ঘোড়ার মধ্যে যেমন বুদ্ধিমত্তা থাকে, তা তার মধ্যে থাকে না এবং গাধার মধ্যে যে নির্বুদ্ধিতা থাকে, তাও তার মধ্যে থাকে না। এতদসত্ত্বেও খচ্চরের প্রশংসায় বলা হয়েছে, খচ্চর যে রাস্তা দিয়ে একবার অতিক্রম করে, তাকে সে খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখতে পারে। সে বাহনসমূহের বাদশাহ। বোঝাবহন ও দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করার কাজে সে অগ্রগামী। ইবনে আসাকের স্বীয় গ্রন্থ 'তারিখে দমেশকে' হজরত আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পূর্বে খচ্চরের প্রজনন ধারা চালু ছিলো। খচ্চর হজরত ইব্রাহীমের জন্য লাকড়ি বহন করতো এবং দ্রুতগামী বাহন হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছিলো। সেজন্য তিনি তার জন্য আল্লাহ্তায়ালার কাছে দোয়া করেছিলেন, যাতে প্রজনন বন্ধ হয়ে যায়। কেননা প্রজননের কারণে সে দুর্বল হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্তায়ালা তার বংশধারা বন্ধ করে দেন।

'হায়াতুল হায়ওয়ান' গ্রন্থে ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে ইমাম আবু হানীফা থেকে খচ্চর সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমাদের মহল্লায় এক চাক্কিওয়ালা রাফেযী লোক ছিলো। তার দু'টি খচ্চর ছিলো। সে একটির নাম রেখেছিলো আবু বকর, আর অপরটির নাম রেখেছিলো ওমর। সে তাঁদের দু'জনকে খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো। অকস্মাৎ একদিন ওই দু'টি খচ্চরের মধ্য থেকে কোনো একটি তাদের মনিব চাক্কিওয়ালার উপর হামলা করলো এবং তাকে মেরে ফেললো। যখন আমার দাদা হজরত ইমাম আবু হানীফা এই খবর পেলেন এবং সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা যাও এবং তথ্য নিয়ে দেখো দু'টির মধ্যে কোন খচ্চরটি তাকে খতম করেছে। আমার ধারণা, ওই খচ্চরটি তাকে খতম করেছে, সে যেটার নাম রেখেছিলো ওমর। পরে যাচাই করে দেখা গেলো ঠিক ওই রকমই ঘটেছে, যে রকম বলেছেন ইমাম আবু হানীফা।

গাধা

রসুলেপাক স. এর তিনটি গাধা ছিলো। তন্মধ্যে একটির নাম ছিলো উফায়র। এটি প্রেরণ করেছিলেন বাদশাহ মাকুকাশ। দ্বিতীয়টি ফারওয়া ইবনে আমর হুযামী প্রেরণ করেছিলেন। তবে বলা হয়ে থাকে উফায়র এবং ইয়াফুর একই গাধার দুই নাম ছিলো। আফরা মেটে রঙকে বলা হয়। ওই বর্ণের হওয়ার কারণেই হয়তো বা তার ওই নাম রাখা হয়েছিলো। তৃতীয় আরেকটি গাধা ছিলো। ওই গাধাটি রসুলেপাক স. এর জন্য নিয়ে এসেছিলেন হজরত সাআদ ইবনে উবাদা।

'হায়াতুল হায়ওয়ান' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, ভালোবাসা, উদ্দেশ্য সাধন এবং উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে গাধার প্রশংসা ও নিন্দা সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কথা আছে। কোনো কোনো সলফে সালেহীন বলেছেন, মানুষ ছোটো গাধার উপর ছওয়ার হওয়াকে বারাযীনের উপর ছওয়ার হওয়া থেকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তুর্কী জাতের ঘোড়াকে বারাযীন বলা হয়। তারা বলে যে, গাধা বোঝা বহন করতে পারে এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে পারে। গাধা রোগাক্রান্ত কম হয়। তার খাদ্য হয়ে থাকে হালকা। তার প্রতিপালন সামগ্রী কম, সহযোগিতা পাওয়া যায় বেশী। তার উপর থেকে নীচে নামা সহজ এবং উপরে আরোহণ করা যায় দ্রুত। মোটকথা, ঘোড়া, খচ্চর ও উটের পর মানুষের জন্য এর মর্যাদার বিষয়ে এতোটুকুই যথেষ্ট যে, রসুলেপাক স. এর উপর আরোহণ করেছিলেন। কোনো কোনো হাদিসের বর্ণনাধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিনয় প্রদর্শন ও অহংকার বর্জন এ সদগুণ দু'টি গাধার সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ঈমানে' হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবীগণ গাধার উপর আরোহণ করতেন। পশমের তৈরী পোশাক

পরিধান করতেন এবং বকরীর দুধ দোহন করতেন। রসুলেপাক স. এর একটি গাধা ছিলো উফায়র। কাযী আয়ায তাকে 'গইন' বর্ণ দ্বারা গুফায়র বলেছেন, তবে হাদিসের ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই কাযী আয়াযের ভুলের বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। কাযী আয়ায আরও বলেছেন, যখন খয়বর বিজয় হলো, তখন রসুলেপাক স. সেখানে একটি গাধা পেলেন। গাধাটি ছিলো কালো বর্ণের। গাধাটি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে কথা বলেছিলো (এটি রসুলেপাক স. এর মোজেযা ছিলো)। তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, আমার নাম ইযীদ ইবনে শেহাব। আল্লাহ্তায়ালা আমার দাদার বংশ থেকে ষাটটি গাধা পয়দা করেছেন। সেগুলোর উপর নবীগণ ব্যতীত অন্য কেউ আরোহণ করেননি। আমি আশা রাখি, রসুলুল্লাহ্ আমার উপর আরোহণ করবেন। আমার দাদার বংশধর থেকে আমি ছাড়া আর কোনো গাধা বেঁচে নেই। আর আম্বিয়া কেরামের মধ্য থেকে আপনি ব্যতীত আর কোনো নবী দুনিয়ায় নেই। আমি আপনার আগে এক ইহুদীর অধীন ছিলাম। আমি জেনে বুঝে ইচ্ছে করে আরোহণকারীকে ঠোকর লাগাতাম। সে আমাকে কষ্ট দিতো। আমার কোমরের উপর বেত মারতো। রসুলেপাক স. তাকে বললেন, তোমার নাম ইয়া'ফুর। তুমি কি মাদা (বিপরীত লিঙ্গের) খাহেশ রাখো? সে বললো, আমার কোনো খাহেশ নেই। রসুলেপাক স. নিজের প্রয়োজনে তার উপর আরোহণ করতেন। প্রয়োজন সেরে তার উপর থেকে অবতরণ করতেন, কখনও কারও বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিতেন তাকে ডেকে আনার জন্য। সে উক্ত ব্যক্তির ঘরের দরজায় উপস্থিত হয়ে মাথা দিয়ে দরজার উপর টোঁকা দিতে থাকতো। ওই ব্যক্তি বের হয়ে এলে ইয়াফুর তাকে মাথা দ্বারা ইশারা করতো। ওই ব্যক্তি বুঝে নিতো যে, রসুলেপাক স. তাকে ডেকে নেওয়ার জন্য ইয়াফুরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। লোকটি তখন রসুলেপাক স. এর দরবারে উপস্থিত হতো। রসুলেপাক স. এর যখন ওফাত হলো. তখন ইয়াফুর মনের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলো। তারপর সে কূপই তার সমাধিতে পরিণত হয়েছিলো। অবশ্য কোনো কোনো হাদিসবেত্তা এই হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়ে কথা তুলেছেন। সুহায়লী 'আত্তারিফ ওয়াল আ'লাম' কিতাবে ওই হাদিস বর্ণনা করেছেন। আসলে এটি ছিলো রসুলে পাক স. এর মোজেযা।

'রেসালায়ে কুশায়রী' নামক পুস্তিকাতে 'কারামাতুল আউলিয়া' অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আমি আবু হাতেম সিজিসতানীকে বলতে শুনেছি, তিনি আবু নসর সিরাজ থেকে, তিনি হুসায়ন ইবনে আহমদ রাযী থেকে, তিনি বলেছেন, আমি আবু সুলায়মান খাওয়াসকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি একদিন গাধার উপর আরোহণ করেছিলাম। মাছি গাধাটিকে পেরেশান করছিলো। গাধাটি বার বার তার মাথা নাড়াচ্ছিলো। আর আমি আমার হাতের লাঠি দ্বারা তাকে প্রহার করছিলাম। গাধাটি তখন মাথা উঠিয়ে বললো, তুমি তোমার মাথায় আঘাত করো। তোমাকেও

এভাবে প্রহার করা হবে। অর্থাৎ আমাকে এভাবে প্রহার করার বদলায় তোমাকেও প্রহার করা হবে। 'হায়াতুল হায়ওয়ান' গ্রন্থকার আল্লামা নিশাপুরী একটি বিস্ময়কর ঘটনা হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এরকম– এক ব্যক্তি কোনো এক খানকায় এবাদত করছিলো। যখন বৃষ্টিপাত হলো এবং যমীনে ঘাস জন্মালো, তখন সে খানকা থেকে বাইরে এলো। দেখলো একটি গাধা সবুজ ঘাস খাচ্ছে। সে বললো, হে আমার রব! তোমার যদি কোনো গাধা থাকে, তাহলে আমি তাকে ঘাস খাওয়াবো এবং সেই গাধার খেদমত করবো। একথা যখন ওই যুগের নবীর কানে পৌঁছলো, তখন তিনি এ রকম দোয়া করতে তাকে মানা করলেন এবং তার জন্য বদদোয়া করলেন। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কাছে ওহী নাযিল করে বললেন, আমি আমার বান্দাকে তার আকল ও খাঁটি মনযোগ অনুসারে প্রতিদান দিয়ে থাকি। ওই হাদিসটি আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' কিতাবে যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হাকীকাত এলেমের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাব্যস্ত হলো যে, লোকটি মুর্খ ছিলো। সে আল্লাহ্তায়ালার সাথে এমন কিছু সেফাত যুক্ত করেছিলো, যা থেকে আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র। তিনি আরও বলেছেন, মূল ইমান অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যতঃ ওরকম এলেম শর্ত নয়। যেমন রসুলেপাক স. জনৈক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আল্লাহ্ কোথায়? তিনি উত্তরে বলেছিলেন আকাশে। রসুলেপাক স. তাঁকে ঈমানদার বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কেননা সে যমীনের বাতেল মাবুদসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার স্বীকৃতি দিয়েছিলো। আর উপরোক্ত লোকটিও এমন লোক ছিলো, যে উক্তরূপ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হক তায়ালার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের এশক মহব্বতও খাঁটি বিশ্বাস পোষণ করেছিলো। জযবার হালতে উক্তরূপ উক্তি তার থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো। কাজেই তাকে মাযুর ধরা হয়েছে এবং সে মকবুল হয়েছে। যেমন বলা হয়– **كلام المجانين يطوي ولا يروي** (উন্মাদদের যে বাক্য হাল হয়, তা বর্ণনা করা যায় না)।

উট

রসুলেপাক স. এর পনেরোটির বেশী উট ছিলো। তন্মধ্যে একটির নাম ছিলো কাসওয়া। কাসওয়া শব্দের অর্থ কানের এক পার্শ্ব কাটা। পুরুষ উটকে মাকসু আর মাদদা উটকে বলা হয় কাসওয়া ও শাতে কাসওয়া। জামাল (উট)কে কাসওয়া বলা হয় না। বরং মাকসু এবং মুকসা বলা হয়। তবে 'কামুস' অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে, নাকা (উটনী)কে কাসওয়া ও মাকসু বলা হয়। আর জামাল (উট)কে আকসা বলা হয়। সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, রসুলেপাক স. এর উটনীর কান কাটা হয়নি। বরং জন্মগতভাবেই তার কান কর্তিত ছিলো। মনে হতো, যেনো তার এক পাশের কান কাটা। রসুলেপাক স. উটনীটি হিজরতের সময় হজরত আবু বকর সিদ্দীকের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন এবং তার উপর ছওয়ার হয়েই তিনি

হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, সে রসুলেপাক স.কে কোথায় নিয়ে যাবে এবং সে কোথায় যেয়ে বসে পড়বে। হুদায়বিয়াতেও রসুলেপাক স. এই উটনীটির উপর আরোহণ করতেন। সফর ও মুকিমী উভয় অবস্থাতেই তিনি স. উটনীর উপর আরোহণ করতেন এবং এই উটনীর উপর ছওয়ার থাকা অবস্থায় তাঁর উপর ওহীও অবতীর্ণ হতো। সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, কাসওয়া ছাড়া অন্য কোনো উট রসুলেপাক স. এর উপর নাযিলকৃত ওহীর ভার বরদাশত করতে পারতো না। রসুলেপাক স. এর উটের নামসমূহে আযবা ও জাযআ আরও দু'টি নাম এসেছে। তবে সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এই দু'টির নাম মূলতঃ কাসওয়া নামক উটনীরই ভিন্ন দু'টি নাম। উটনীর নামসমূহে সরমা ও সলমা এ দু'টি নামও এসেছে। এ দু'টি নাম সম্বন্ধেও সীরাতবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন যে, এ গুলোও কাসওয়ার অপর নাম। তবে বর্ণিত আছে, তাঁর আযবা নামের একটি উটনী ছিলো। অন্য কোনো উট তাকে অতিক্রম করতে পারতো না। একদিন এক বেদুঈন হঠাৎ করে এক যুবক উটের উপর বোঝা বহন করে নিয়ে এসে আযবাকে অতিক্রম করে চলে গেলো। সাহাবা কেরামের নিকট বিষয়টি খারাপ লাগলো। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্তায়ালার উপর হক কোনো দুনিয়াবী জিনিসকে উচ্চ না করে বরং অপদস্থ করে দেওয়া। রসুলেপাক স. এর একটি উট ছিলো– যার মালিক ছিলো আবু জাহেল। বদরযুদ্ধের গনিমতের মাল হিসেবে তা হস্তগত হয়েছিলো। তার নাকে রৌপ্যের আংটি লাগানো ছিলো। রসুলেপাক স. ওই উটকে হুদায়বিয়ার সময় মুশরিকদেরকে রাগান্বিত করার জন্য হুদী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া রসুলেপাক স. এর বিশটি দুগ্ধবতী উটনী ছিলো। সেগুলো মদীনা তাইয়্যেবার আশ পাশের চারণভূমিতে বিচরণ করতো। ওগুলো দোহন করে দুই মশক দুগ্ধ আনা হতো এবং তা রসুলেপাক স. এর পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করা হতো। রসুলেপাক স. এর দুগ্ধবতী উটনীর মোট সংখ্যা ছিলো পঁয়তাল্লিশ। এগুলো হজরত সাআদ ইবনে উবাদা রসুলেপাক স. এর খেদমতে পেশ করেছিলেন।

বকরী

রসুলেপাক স. এর সাতটি দুগ্ধবতী বকরী ছিলো। বকরীগুলো চরাতেন হজরত আয়মান। যে ঘরে রসুলেপাক স. রাত্রিযাপন করতেন, সেখানে তিনি ওই সকল বকরীর দুধ দিয়ে যেতেন।

মিহজান বা ছড়ি

রসুলেপাক স. এর একটি মিহজান ছিলো। মিহজান শব্দের অর্থ বাঁকা মাথাবিশিষ্ট ছড়ি। রসুলেপাক স. এর এই ছড়ি ছিলো এক গজের চেয়ে সামান্য

লম্বা। রসুলেপাক স. এই ছড়ি সাথে নিয়ে চলতেন। তার উপর ভর দিয়ে ছওয়ারীর উপর আরোহণ করতেন এবং আরোহণের পর নিজের সামনে উটের উপর ঝুলিয়ে রাখতেন। বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. অধিকাংশ সময় তা নিজের হাতে রাখতেন।

মিখসারা বা হেলান দেওয়ার লাঠি

রসুলেপাক স. এর একটি মিখসারা বা হেলান দেওয়ার লাঠি ছিলো– যার নাম ছিলো উরজুন। 'মিখসারা' 'খসরুন' শব্দ থেকে। এর অর্থ দেহের অর্ধাংশ বা কোমর। এখতেসার অর্থ কোমরে হাত রাখা বা কোমরে হেলান দেওয়া। মিখসারা বলা হয় মানুষ যার উপর হেলান দেয় এবং সে জিনিসটি তাকে হেফাযত করে। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. যখন বাইরে তশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন তার হাতে থাকতো 'মিখসারা'। সীরাত বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, মিখসারা হচ্ছে রাজকীয় ছড়ি। রাজা বাদশাহদের আলামত।

আসা মোবারক

রসুলেপাক স. আসা মোবারক সাথে রাখতেন এবং তার উপর হেলান দিতেন। তিনি স. বলেছেন, আসাতে (ছড়ি) হেলান দেওয়া আম্বিয়া কেরামের স্বভাব। রসুলেপাক স. এর আসা মোবারক ছিলো উরজুন খেজুরের ডাল, যা শুকিয়ে বাঁকা হয়ে গিয়েছিলো। মিখসারা যে ছড়িটি ছিলো, তা উরজুন খেজুরের ডালের মতো ছিলো। অথবা রসুলেপাক স. এর আসা খোরমা খেজুরের ডাল ছিলো। কাযীব নামক যে ছড়িটি ছিলো তা শোখত লাকড়ির ছিলো। পূর্বেই বলা হয়েছে, কাযীব গাছের ডালকে বলা হয় শোখত। রসুলেপাক স. এর তলোয়ারেরও এই নাম ছিলো। তিনি কখনও গাছের ডালও হাতে রাখতেন। আর সে গাছের নাম ছিলো শোখত।

পেয়ালা

রসুলেপাক স. এর একটি পেয়ালা ছিলো। পেয়ালাটির নাম ছিলো রইয়ান। 'রইয়ান' শব্দের অর্থ– পরিতৃপ্তি। রসুলেপাক স. পেয়ালার মধ্যে পানি, দুধ ও শরবত পান করতেন। কাজেই এই পেয়ালার রইয়ান নাম ছিলো যথার্থ। আরেকটি পেয়ালার নাম ছিলো 'মুগীছ'। 'মুগীছ' 'গায়ছ' শব্দ থেকে এসেছে– যার অর্থ বৃষ্টি। আরেকটি পেয়ালা ছিলো মুদীব। যার তিন জায়গায় রৌপ্য দিয়ে রেখা করা ছিলো। এই পেয়ালার একটি গোলাকার হাতল ছিলো, যার দ্বারা তাকে ঝুলিয়ে রাখা হতো। আরেকটি পেয়ালা ছিলো ইদান বা কাঠের। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. এর কাঠের একটি পেয়ালা ছিলো, যা তাঁর শিয়রের কাছে রাখা হতো। তিনি তার মধ্যে পেশাব করতেন। ঈদান শব্দটির আইন বর্ণে যদি যের

দিয়ে পড়া হয়, তাহলে তা হয় আওদ শব্দের বহুবচন, অর্থ কাঠ। আর যদি আইন বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়, তাহলে এটি হয় গাছের নাম। 'মাজমাউল বাহার' গ্রন্থে আছে, ঈদান এক প্রজাতির গাছ, যা অনেক লম্বা হয়। তার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কোথাও পাতা হয় না। তাছাড়া রসুলেপাক স. এর একটি কাঁচের পেয়ালাও ছিলো, যা কোনো এক বাদশাহ্ তাঁকে হাদিয়া দিয়েছিলেন। আরেকটি পেয়ালা ছিলো পাথরের, যাকে মেখযাব বলা হতো। মেখযারের বর্ণনা হাদিস শরীফে অনেক এসেছে। আরেকটি ছিলো মেরকান। আরেকটি ছিলো মেফতাল– যা চামড়া দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিলো। তিনি পেয়ালাটি গোসলের কাজে ব্যবহার করতেন।

গৃহস্থালী জিনিসপত্র

গৃহস্থালী জিনিসপত্রের মধ্যে একটি ছিলো মেদহান– তেল রাখার পাত্র। একটি রেবআ ইসকান্দারিয়া আয়না রাখার পাত্র। রসুলেপাক স. এর একটি আয়নাও ছিলো, যার মাধ্যমে তিনি নিজের সৌন্দর্য অবলোকন করতেন। এটা সত্য কথা যে, আয়না দেখা তাঁর জন্যই শোভা পায়। কেননা তিনি ছিলেন আল্লাহ্তায়ালার জালাল ও জামালের প্রকাশস্থল। রেবআ হচ্ছে আয়না রাখার পাত্র। 'কামুস' গ্রন্থে এসেছে, রেবআ হচ্ছে আতর দান ও পাণ্ডুলিপি রাখার বাক্সের মতো। রেবআর সঙ্গে ইস্কান্দারিয়া বিশেষণ যুক্ত করা হয়েছে। তার কারণ এটি ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ মাকুকাশ নবীপুত্র ইব্রাহীমের মাতা হজরত মারিয়া কিবতিয়ার সঙ্গে হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, ওটি ছিলো আসলে একটি ঢোল সদৃশ পাত্র– যার মধ্যে রাখা হতো চিরুনী, মেসওয়াক, কাঁচি, সুরমাদানী ও আয়না। কোনো কোনো সীরাতবিশেষজ্ঞ বলেছেন, ক্ষুর ও চকমকি পাথরও রাখা হতো। রসুলেপাক স. আয়নার নাম রেখেছিলেন মুদাল্লিয়াহ। মুদাল্লিয়াহ তাদলিয়া থেকে এসেছে। তাদলিয়া অর্থ এশকে নিমজ্জিত হয়ে আকল রহিত হয়ে যাওয়া, আত্মহারা হয়ে যাওয়া। আয়না দেখার ফলে তিনি নিজের উপর আশেক হয়ে যেতেন। অথবা অন্য লোক আয়নার মধ্যে তাঁর রূপ-সৌন্দর্য দেখে তাঁর প্রতি আত্মহারা ও আকৃষ্ট হয়ে যেতো। রসুলেপাক স. এর একটি চিরুনি ছিলো। চিরুনিটি ছিলো আদ এর তৈরী। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. এর চিরুনি ছিলো আদ এর। সাধারণের ধারণা– হাতির দাঁত বা হাড়কে আদ বলা হয়। ইমাম আবু হানিফার নিকট এই অর্থটি সুস্পষ্ট। কেননা হাড়ের মধ্যে মৃত্যু সঞ্চারিত হয় না। তার মধ্যে প্রাণ নেই। এই হাদিস দ্বারা হাতির দাঁত বা হাড়ের ব্যবসা করা বৈধ সাব্যস্ত হয়েছে। কোনো কোনো সলফে সালেহীন তা দ্বারা চিরুনি প্রস্তুত করতেন। তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে হাতির দাঁত বা হাড় নাপাক। তাঁর মতে আদ এর অর্থ সামুদ্রিক এক প্রকারের কচ্ছপের পীঠের হাড়। অথবা গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর কোমরের হাড়। সে হাড় সংগ্রহ করে তা দ্বারা চুড়ি এবং

চিরুনি প্রস্তুত করা হয়। আর এ জাতীয় চুড়িকে যায়ল বলা হয়। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. সাইয়্যেদা ফাতেমা যাহরার জন্য আদ এর কেলবা খরীদ করেছিলেন। কেলবা দ্বারা যায়লকেই (চুড়ি) বুঝানো হয়েছে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

গৃহউপকরণের মধ্যে রসুলেপাক স. এর একটি সুকহালা অর্থাৎ সুরমাদানী ছিলো, যা দ্বারা তিনি প্রতি রাত্রে শয়নকালে দু'চোখে তিন তিন বার করে সুরমা লাগাতেন। এক বর্ণনায় আছে, প্রথমে দু'বার ডান চোখে, অতঃপর তিনবার বাম চোখে এবং শেষে একবার পুনরায় ডান চোখে সুরামাদানির শলাকা ঘুরাতেন। যাতে ডান চোখ থেকে আরম্ভ এবং ডান চোখেই সমাপ্ত হয়। তবে প্রথমোক্তটিই বিশুদ্ধ এবং মশহুর তরীকা।

রসুলেপাক স. এর ব্যবহারের জিনিসপত্রের মধ্যে একটি ছিলো কাসআ। তার নাম ছিলো গাযা। তার মধ্যে চারটি বেড়ি ছিলো। কাসআ অর্থ– বড় পাত্র (গামলা জাতীয় পাত্র)। এই অর্থে ব্যবহৃত হয় জাফনা এবং সাহফা শব্দও। কেউ কেউ বলেছেন, সাহফা এমন বড় বরতন, যার মধ্যে পাঁচজন লোক পেট পুরে আহার করতে পারে। আর কাসআ হচ্ছে এমন বড় বরতন, যার মধ্যে দশজন লোক পেটপুরে আহার করতে পারে। সিহাহ্ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, বরতনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় বরতন হচ্ছে জাফনা। অতঃপর কাসআ, যাতে আহার করে দশজন লোক পরিতৃপ্ত হতে পারে। অতঃপর সাফহা, যার মধ্যে আহার করে সাতজন লোক পরিতৃপ্ত হতে পারে। তারপর মুলায়কা, যাতে দুই তিনজন লোক পরিতৃপ্তির সাথে আহার করতে পারে। তাছাড়া রসুলেপাক স. এক সা (পৌনে চার সের) ও মুদ (এক সেরের কম) দু'টি পাত্র ছিলো, যা দ্বারা মেপে ফেতরা প্রদান করতেন। খানাও সম্ভবতঃ এভাবে মেপে পাকানো হতো। কেননা রসুলেপাক স. বলেছেন, খাদ্যবস্তু মেপে মেপে খরচ কোরো। সা এবং মুদ দু'টি ওযনের পরিমাণের নাম। চার মুদে হয় এক সা বা পৌঁনে চার সের (দশমিক পদ্ধতির মাপ অনুযায়ী হবে চার কিলোগ্রাম)। মুদ হচ্ছে এক রেতেল ও এক তৃতীয়াংশ রেতেল। এক সেরের চেয়ে কম (দশমিক পদ্ধতির মাপে এক কিলোগ্রাম) হেজাযবাসীর নিকট; আর দুই রেতেল ইরাকীদের নিকট।

রসুলেপাক স. এর আসবাবপত্রের মধ্যে পায়াবিশিষ্ট একটি খাট ছিলো। তার উপর বিছানা ছিলো চামড়ার। যার ভিতর খেজুরের বাকল ভরা ছিলো এবং তার উপর দুইস্তর করে চট বিছানো হতো, যার উপর তিনি স. রাতে শয়ন করতেন।

আঙটি মোবারক

রসুলেপাক স. এর আঙটি ছিলো রৌপ্যের এবং তার নাগিনাও ছিলো রৌপ্যের। 'মাওয়াহেব' গ্রন্থে এসেছে, তাঁর আরেকটি আঙটি ছিলো লোহার। তবে

হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স. লোহার আঙটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সম্ভবতঃ তা জায়েয বুঝাবার জন্য রেখেছিলেন, অথবা প্রাথমিক অবস্থায় তা জায়েয ছিলো। পরে নিষেধ করে দেওয়া হয়। ওয়াল্লহু আ'লাম।

মুজা ও জুব্বা মোবারক

রসুলেপাক স. এর দু'টি শাদা মুজা ছিলো। বাদশাহ নাজ্জাশী তা তাঁকে হাদিয়া দিয়েছিলেন। তিনি তা সফরকালে পরিধান করতেন।

রসুলেপাক স. এর তিনটি জুব্বা ছিলো। যুদ্ধকালে তিনি তা পরিধান করতেন। একটি জুব্বা ছিলো সুন্দুস (মিশ্রিত রেশম) এর। আরেকটি ছিলো আতলাসের (তিলসান নামক স্থানের তৈরী পোশাক)। তৃতীয় জুব্বা সম্পর্কে একথা জানা যায় না যে, তা কাপড়ের ছিলো কি না। কাপড় কেটে সেলাই করে যে জামা প্রস্তুত করা হয়, তাকে জুব্বা বলা হয়। সে জামার যদি পকেট থাকে তাহলে তাকে কামীস বলে। আর যদি পকেট না থাকে তাহলে তাকে কাবা বলে। আর সবগুলোকেই সাধারণভাবে জুব্বা বলা হয়। চাদর ও পাগড়িকে জুব্বা বলা হয় না। দ্বিতীয় প্রকারের জুব্বাকে আতলাস বা তায়ালিসা বলা হতো। তিলসান নামক স্থানের প্রস্তুত বলে তার এমতো নামকরণ হয়েছিলো। এটি একটি আজমী পোশাক ছিলো, যা ছিলো কালো রঙের এবং গোলাকৃতির। তার তানা এবং বানা উভয়টিই ছিলো পশমের। হজরত বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসুলেপাক স. এর এই জুব্বা মোবারক হজরত আয়েশা সিদ্দীকার নিকটে ছিলো। রসুলেপাক স. এর ওফাতের পর সেই জুব্বাখানা হজরত আয়েশা সিদ্দীকার কাছ থেকে আমি নিয়েছিলাম। রোগের শেফার জন্য আমি তা ধৌত করে লোকদেরকে পানি প্রদান করতাম। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

পাগড়ি মোবারক

রসুলেপাক স. এর একটি পাগড়ি মোবারক ছিলো যাকে সাহাব বলা হতো। তাছাড়া আরেকটি কালো পাগড়ি ছিলো। 'রওজাতুল আহবাব' গ্রন্থকার বলেছেন, নবীচরিতবিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. যখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁর কাছে ছিলো বোরদ (চাদর), হেবরা (এক প্রকারের কাপড়), সাহারী জামা, উমানী লুঙ্গি, একটি ধোলাই করা কামীস, ইয়ামনী জুব্বা, খমীসা, কাতীফা, শাদা চাদর এবং একটি লেপ, যা ওয়ারস দ্বারা রাঙানো ছিলো। উপরে বলা হয়েছে সাহারী জামা। সাহার ইয়ামনের একটি গ্রামের নাম। সেখানকার তৈরী জামা ছিলো বলে তাকে সাহারী জামা বলা হতো। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলেপাক স.কে দু'টি সাহারী কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিলো। আবার সাহার হালকা লালকেও বলা হয়। পূর্বে বলা হয়েছে, উমানী লুঙ্গি। উমান

ইয়ামনের একটি শহরের নাম। শামদেশে আছে এক শহর তার নাম আম্মান। 'কামুস' গ্রন্থে আছে, 'গুরাব' এর ওজনে উমান ইয়ামনের শহরের নাম। আর 'শাদ্দাদ' এর ওজনে 'আসনান' শাম এর শহরের নাম।

হাদিস শরীফে এসেছে, তিনটি সহুলী (ধোলাইকৃত) কাপড় দ্বারা রসুলেপাক স. এর কাফন দেওয়া হয়েছিলো। সহুল শব্দটি দুইভাবে পড়া যায়– 'সীন' বর্ণে যবর দিয়ে সাহুল অথবা 'সীন' বর্ণে পেশ দিয়ে 'সুহুল'। সাহুল পড়লে তার অর্থ হবে ধোলাইকৃত কাপড়। আর সুহুল পড়লে অর্থ হবে শাদা ধবধবে সুতির কাপড়। খামীসা এক প্রকারের মশহুর গাছ থেকে প্রস্তুতকৃত কাপড়, অথবা নকশাদার পশমী কাপড়। 'সাররাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, খামীসা হচ্ছে কালো কম্বল। কাতীফা রেশমী কাপড়কে বলা হয়। ওয়ারস এক প্রকারের গাছ, যার দ্বারা কাপড় রাঙানো হয়।

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা বলেছেন, রসুলেপাক স. কোনো দীনার বা দেরহাম রেখে যাননি, রেখে যাননি কোনো বকরী বা উট। তবে বর্ণনাকারিণী বলেছেন, গোলাম ছিলো কিনা, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ হচ্ছে। রসুলেপাক স. এর ঘোড়া, উট, খাদেম ও গোলাম থাকার বিষয়টি হজরত আয়েশা সিদ্দীকার বর্ণনার পরিপন্থী নয়। কেননা রসুলেপাক স. সব কিছু খরচ করে এবং বণ্টন করে দিয়েছিলেন। সকল গোলামকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। বনী নযীর এবং ফদকের যে সম্পত্তি ছিলো, তা মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। ওই সম্পত্তি থেকে আহলে বাইতের জন্য খরচ যোগানো হতো।

বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. এর কিছু তাবাররুকাত (রেখে যাওয়া বরকতের জিনিস) হজরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে রক্ষিত ছিলো। তিনি তা ঘরের মধ্যে খুব হেফাযতের সাথে রাখতেন। তিনি সেখানে প্রত্যহ একবার যেতেন এবং ওগুলোর যিয়ারত করতেন। কোনো সম্মানিত লোক এলে তিনি তাঁদেরকে সেই ঘরে নিয়ে যেতেন এবং ওই সকল তাবাররুকাত যিয়ারত করাতেন। বলতেন এগুলো রসুলেপাক স. এর রেখে যাওয়া জিনিস। আল্লাহ্তায়ালা এগুলোর মাধ্যমে আপনাদেরকে ইজ্জত-সম্মান দান করুন।

নবীজীবনালেক্ষ্যবিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, ওই ঘরে একটি খাট ছিলো, যার উপর চামড়ার একটি গদি ছিলো, ভিতরে ভরা ছিলো খেজুর গাছের বাকল। এক জোড়া মুজা, একটি কাতীফা (শাদা চাদর), চাক্কি এবং একটি তীরাধার ছিলো, যার মধ্যে কয়েকটি তীরও ছিলো। তাঁরা আরও বর্ণনা করেন, ওই কাতীফা (চাদর) এর মধ্যে রসুলেপাক স. এর পবিত্র মস্তকের চিহ্ন বিদ্যমান ছিলো।

এক ব্যক্তি খুবই অসুস্থ ছিলো। কোনো প্রকারেই সে সুস্থ হচ্ছিলো না। সে হজরত ওমর ইবনে আবদুল আযিযের শরনাপন্ন হলো। তিনি উক্ত কাতীফার সামান্য স্থান ধৌত করে তার পানি তার নাকে ফোটা ফোটা করে দিলেন। লোকটি সুস্থ হয়ে গেলো।

পরিশিষ্ট

এই পরিশিষ্ট রসুলেপাক স. এর ওই সকল গুণাবলী সম্পর্কিত, যা আহলে মারেফতগণ তাঁদের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁরা রসুলেপাক স. এর দরবারে তাওয়াজ্জুহ এর তরীকা কী রকম হওয়া উচিত এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, রসুলেপাক স. এর পবিত্র হাল ও সম্মানিত গুণাবলী দু'প্রকার। এক প্রকার যার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস ও খবর থেকে প্রাপ্ত। সীরাতগ্রন্থসমূহে তাঁর আখলাক ও গুণাবলী সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তাতে প্রমাণিত হয়, সকল নবী ও রসুলের উপর তাঁর আখলাক ও গুণাবলী আফযল (উত্তম) ও আকমাল (পূর্ণ) ছিলো। দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা যা আসরারে হাকীকতের কাশফ (প্রকৃত রহস্যের আত্মিক অবগতি) প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এবং আনওয়ারে ওয়াহদাতের মোশাহাদা (একক সত্তার নুরের আত্মিক দর্শন) লাভকারী ব্যক্তিগণ দিব্যদর্শনের দ্বারা লাভ করেছেন এবং তাঁরা সেগুলো প্রকাশও করে গিয়েছেন। প্রথম প্রকারের বর্ণনা আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যে পূর্বোল্লেখিত অধ্যায় সমূহে পেশ করা হয়েছে। এখন দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা এখানে পরিশিষ্ট আকারে পেশ করছি। তওফীক আল্লাহ্তায়ালার হাতে।

আম্বিয়া কেরামকে আল্লাহ্তায়ালার ইসমে যাত (সত্তাগত নাম) থেকে পয়দা করা হয়েছে। আর আউলিয়া কেরামকে আসমায়ে সেফাতিয়া (গুণগত নামসমূহ) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যান্য সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেফাতে ফেলিয়া (ক্রিয়াগত গুণসমূহ) থেকে। সাইয়্যেদুল মুরসালীনকে হক তায়ালার যাত (সত্তা) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর হকতায়ালার বহিঃপ্রকাশ বা বিকাশ ঘটেছে তাঁর মধ্যে সত্তাগতভাবে। যেহেতু আসমা ও সেফাতের (নাম ও গুণাবলীর) মধ্যে বিকশিত হওয়ার চেয়ে অধিক ও প্রকাশ্য বিষয় হচ্ছে প্রতিটি গুণের মধ্যে হক তায়ালার গুণাবলী প্রকাশিত হওয়া। আল্লাহ্তায়ালার জামাল ও জালাল গুণের সাথে যা বিশেষিত ছিলো, তা প্রকাশ পেলো। আসমায়ে হুসনার মধ্য থেকে প্রতিটি ইসিম, যা মানবী কামাল (অর্থগত পূর্ণতা)কে চায়, তা প্রকাশিত হলো। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার যাতের (সত্তাগত) রহস্য গোপনভাবে রয়ে গেলো হাকীকতে সেররিয়ার (গোপনীয় বাস্তবতার) অভ্যন্ত রভাগে। অতঃপর ওই সকল আসমায়ি সেফাত (গুণগত নাম) সমূহের হাকীকত (বাস্ত বতা) অর্থগত দৃশ্যের মধ্যে একত্রিত হলো। তারপর– 'যাতুন হাইছু লা কাইফা ওয়া লা আইনা' অর্থাৎ তিনি এমন সত্তা, যেখানে কীভাবে এবং কোথায় বলতে কিছু নেই, এ অবস্থায় রয়ে গেলেন। তারপর বিজ্ঞপ্তি ঘোষিত হলো, আমি যদি ওই সকল গুণাবলীর পূর্ণতাকে প্রকাশ করি এবং জামাল ও জালাল এর মাকামসমূহ সৃষ্টি করি, যা নির্ধারণ ও গণনা সীমার বাইরে, তবে সে সব হবে আমার ওয়াহদাতের (এককত্বের) সাগরের এক বিন্দুতুল্য এবং আনুরূপ্যবিহীন শুভ্র সত্তার এক অণুতুল্য।

আফসোস! আফসোস! আমাদের একিভূতী কোথায়? আর যাতের সত্তার হাকীকত (বাস্তবতা) কোথায়? হক তায়ালার শুয়ুনে যাতিয়া (সত্তাগত অবস্থা) কোথায়? আল্লাহ্তায়ালার ইসিম ও সেফাত (নাম ও গুণাবলী) এর হাকীকতের প্রকাশ কোথায়? নিষিদ্ধ বাক্যের রহস্য থেকে ইশারা হলো যে, আমি আমার যাত (সত্তা) থেকে বের হচ্ছি এবং এমন এক হাকীকত সৃষ্টি করছি, যিনি যাতের শুয়ুনাত (অবস্থাসমূহ) এর আসমা ও সেফাতের কামালত (পূর্ণতা)সমূহ ধারণকারী। আমি এমন একজনের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবো, যিনি সমস্ত মাকুনাতের (সৃষ্টির) মূল সত্তা হবেন। এমন এক সত্তাকে প্রকাশ করবো, যিনি সমস্ত বাতেনী উপকরণের মূল সত্তা হবেন। যিনি সৃষ্টিগত সুরতে সুরতবান হবেন এবং উচ্চস্তরের দৃশ্যের অবতরণস্থল হবেন। হবেন তোমাদের জন্য উচ্চস্তরের সৃজন, সৃজনায়ন ও নবসৃষ্টির সমন্বয়ক। বিশেষিত হবেন আপন অস্তিত্বের সীমানায়। তিনি কামালিয়াতের রহস্যে আবৃত হবেন। তাঁর হাকীকতের যথাযথ পরিচয় লাভ করা যাবে না এবং তিনি জিজ্ঞাসার গণ্ডিতেও আসবেন না। সুনির্দিষ্ট করা যাবে না তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীকে। তাঁর সন্নিধান হবে সর্বাধিক পূর্ণতার প্রকাশস্থল। তিনি হবেন সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের আধার। তোমাদের মহান মহান প্রকাশস্থলের তুলনায় হবেন সততশ্রেষ্ঠ। যেমন যাতের নেসবত হয় সেফাতের সঙ্গে। তাঁকে আমি এ জন্য সৃষ্টি করবো, যেনো আমার শ্রেষ্ঠত্বের উপর আমার প্রকাশময় ভিত্তি পরিপূর্ণ হয়। 'হামদ' থেকে নির্গত করে আমি তাঁর নাম রাখলাম মোহাম্মদ, আহমাদ ও মাহমুদ। আমি তাঁকে আমার আবেদ (বান্দা) বানালাম এবং লেওয়ায়ে হামদ (প্রশংসার পতাকা) তাঁর হাতে অর্পণ করলাম। তাঁর মাকাম নির্ধারণ করলাম ওসিলায়ে উযমা (মহান ওসিলা)। সুতরাং আম্বিয়া কেরাম প্রকাশস্থল হলেন আসমা ও সেফাত (আল্লাহতায়ালার নাম ও গুণাবলী) এর, আর মোহাম্মদ স. প্রকাশস্থল হলেন আল্লাহ্তায়ালার যাত এর। রসুলেপাক স. আল্লাহ্পাকের যাতের জালাল (মাহাত্ম্য) ও করম (মহানুভবতা) এর সরাসরি সীলমোহর হলেন। আর অন্যান্য আম্বিয়া ও আওলিয়া কেরাম হলেন অনুষঙ্গের মাধ্যমে। সাইয়্যেদুল মুরসালীন যখন যাতে হক থেকে সৃষ্টি এবং হকের প্রকাশ তাঁর মধ্যে সরাসরি হয়েছে, সুতরাং তিনি ছাড়া যা কিছু আছে সবকিছু থেকে তিনি সমস্ত সেফাত ও কামালাতের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রগণ্য ও অনন্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে রসুলেপাক স. এর দ্বীন অন্যান্য সকল দ্বীনকে মনসুখ (রহিত)কারী। কেননা যাতের বহিঃপ্রকাশের পর সেফাত দৃশ্যমান থাকে না। সে কারণেই রসুলেপাক স. এর উরুজ (উর্ধ্বারোহণ) আরশের উপর পর্যন্ত হয়েছে। কেননা যাত সমস্ত ইসিমের উপর অগ্রগামী। রসুলেপাক স. হক তায়ালার রহমানিয়াতের মহল বা পাত্র, যা আরশের উর্ধ্বে এবং আরশ থেকে প্রশস্ত। আরশ হচ্ছে আজসাম (দেহগত বস্তু)কে বেষ্টনকারী, আর রহমত সমস্ত বস্তুর চেয়ে প্রশস্ত। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন– 'রহমাতী

ওয়াসাআ'ত কুল্লা শায়্যিন' (আমার রহমত সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রশস্ত হয়েছে)। সুতরাং হাকীকতে মোহাম্মদী সমস্ত মওজুদাত (অস্তিত্ববান বস্তু) এর উৎস ও উৎপত্তি স্থল এবং সমস্ত ফয়েয ও বরকতের মাধ্যম।

'আহাদিয়াত' (এককত্ব) এর মাকাম থেকে রসুলেপাক স. এর নুযুলের পর যখন ওয়াহেদিয়াত (একজন হওয়া) এর মাকামে প্রকাশিত হলেন– যা আসমা ও সেফাতের আধার, তখন সমস্ত কামালিয়াত (পূর্ণতা) রসুলেপাক স. এর উপর আশেক হলো। যেমন ইসিম তার মুসাম্মা (ব্যক্তি বা বস্তু) এর প্রতি এবং সেফাত (গুণ) তার মওসুফ (গুণধারী ব্যক্তি বা বস্তু) এর প্রতি আশেক হয়। আধ্যাত্মিক পূর্ণতাসমূহের কোনোটিই তার হাকীকতের দিকে ইশারা করে না এবং তার নিজস্বতার পরিচয় প্রদান করে না, বরং তাঁর স. দিকেই ইশারা করে এবং তাঁর পরিচয়ই প্রদান করে। আর কামালতসমূহ সাব্যস্ত হলেও তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং তাঁর অনুগামী হয়েই হবে। নূরিয়াত সেফাতের হাকীকত তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং নূর তাঁর ইসিমসমূহের মধ্যে নিহিত। যদিও নবী ও ওলীগণ নূর সেফাতে ভূষিত হয়েছেন, সে নূর সেফাতের হাকীকত কিন্তু সাইয়্যেদুল মুরসালীন স.। কোনো বস্তুর হাকীকত এবং বস্তুর সাথে যা সাব্যস্ত হয়– এই দুয়ের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। সকল বস্তু ওই নূরের প্রকাশস্থল এবং সমস্ত বস্তু প্রকাশ পাওয়ার আধার ওই নূর। রসুলেপাক স. বলেছেন– **اَنَا مِنْ نُوْرِ اللهِ وَالْمُوْمِنُوْنَ مِنْ نُوْرِيْ** (আমি আল্লাহ্‌র নূর থেকে আর মুমিনরা আমার নূর থেকে)। এক হাদিসে এসেছে– 'আনা মিনাল্লাহি ওয়াল মু'মিনূনা মিন্নী' (আমি আল্লাহ্ থেকে, আর সকল মুমিন আমা থেকে)। এখানে মুমিনদেরকে খাস করে বলা হয়েছে স্থানের সামঞ্জস্যতার কারণে।

উক্ত নূর যখন ওজুদে কওনী (সৃষ্টি হওয়া) এর সাথে নুযুল (অবতরণ) করেন, তখন রসুলেপাক স. এর ওয়াসেতায় (মাধ্যমে) আকল, প্রাণ, লওহ, কলম, আরশ, কুরসী, আফলাক (আকাশ), নক্ষত্র, খনি, গাছ-পালা, প্রাণী ও মানবকুল যা সৃষ্টির হাকীকতের সমন্বিত রূপ– তা সৃষ্টি করেন এবং উক্ত ওয়াসেতার দ্বারা সৃষ্টির কারখানাকে আরেফ ও হাকীকগণ যেরকম বর্ণনা করেছেন, সে রকমভাবে সাজিয়ে দিলেন। কেননা এই সৃষ্ট জগতের অস্তিত্বের বিধানটি অংকশাস্ত্রের বিধানের মতো। যেমন এক থেকে দুই হয়। 'দুই' সংখ্যাটি ওই সময় পর্যন্ত সাব্যস্ত হবে না, যতোক্ষণ তার মধ্যে 'এক' না থাকবে। এমনিভাবে 'তিন' ওই সময় পর্যন্ত সাব্যস্ত হবে না , যতোক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে 'দুই' পাওয়া না যাবে। উপরের সমস্ত সংখ্যাগুলোর বিধানই উক্তরূপ। কোনো সংখ্যা ওই সময় পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করবে না, যতোক্ষণ ক্রমানুসারে তার পূর্বেরটির অস্তিত্ব না পাওয়া যাবে। এমনিভাবে সব সংখ্যাই ওই 'এক' থেকেই অস্তিত্ববান হয়েছে। আর 'এক' কোনো সংখ্যা নয় বরং সংখ্যার ভিত্তি। কেননা সকল সংখ্যাকে অপর কোনো সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে একটা অন্য সংখ্যা বের হয়। কিন্তু 'এক' দ্বারা যে কোনো সংখ্যাকে গুণ করলে কোনো নতুন সংখ্যা বের হয় না।

সুতরাং প্রথম আকল, যাকে রূহে মোহাম্মদী হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেই প্রথম আকলই সমস্ত আলমের অস্তিত্বের মূল, চাই তা আলমে আমর হোক অথবা হোক আলমে খালক। আর তিনিই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ইল্লতের (কারণের) ইল্লত। আল্লাহতায়ালা কোনো বস্তুর ওজুদ (অস্তিত্ববান হওয়া) এর ইল্লত (কারণ) হওয়া থেকে পবিত্র। সুতরাং যা কিছু আলোচনা করা হলো, তার দ্বারা ওজুদে মোহাম্মদী (মোহাম্মদ স. এর অস্তিত্ববান হওয়া) এর হাকীকত জানা গেলো। সে কারণেই রসুলেপাক স. ওজুদ (অস্তিত্ব) এর প্রথম এবং শেষ। উপরোক্তভাবে এই বিষয়টিই রসুলেপাক স. তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, জামানা এই অবস্থায়ই আবর্তিত হচ্ছে, যে অবস্থা আকাশসমূহ সৃষ্টিকালে বিরাজমান ছিলো। অতঃপর দায়রায়ে ওজুদের (সৃষ্টজগতের বৃত্তের) সর্বোচ্চ স্তরে সেই সুরত ও আত্মার প্রকাশ ঘটলো। রসুলেপাক স. যেরকম যাতের গোপন অবস্থায় হক তায়ালার সঙ্গে নিকটতম মাখলুক ছিলেন, তেমনিভাবে শেষেও হায়াত অবস্থায় উন্নততম এবং পূর্ণতম মাখলুক হলেন। এই স্তরটির নাম রাখা হলো ওসীলা এবং সে ওসীলার ওয়াদাও দেওয়া হলো। উম্মতকে এই ওসীলা প্রদানের জন্য দোয়া করার হুকুম দেওয়া হলো। 'ওসিলার' অর্থ কারণ বা মাধ্যম। রসুলেপাক স. প্রথমাবস্থায় ওজুদে খালক (মাখলুকের অস্তিত্ব) এর কারণ। আর শেষে আল্লাহতায়ালার সঙ্গে নৈকট্য লাভের কারণ বা মাধ্যম। সুতরাং রসুলেপাক স. এর জন্য সুরতী নৈকট্য ও আত্মিক নৈকট্য উভয়ই হাসিল হলো।

সুরত ও আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে রসুলেপাক স. এর সৃষ্টি পূর্ণতা, ভারসাম্যতা এবং তাঁর জামাল ও জালাল (সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য) এমন সীমায় পৌঁছেছে, যা গণনা ও সীমানার বাইরে। তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করা হলো, তা সাগরের তুলনায় বিন্দুতুল্য।

জেনে রাখা উচিত, স্তর ও স্বতন্ত্র সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে ওজুদ দুই প্রকারে বিভক্ত। এক প্রকার হচ্ছে – সূক্ষ্ম, যা আত্মা ও আত্মাগত বিষয়। আর অপর প্রকার স্থূল, যা সুরত, শেকেল, দেহ ইত্যাদি। প্রতিটি প্রকারের আবার দু'টি করে শ্রেণী রয়েছে। ১. উচ্চ শ্রেণী ২. নিম্ন শ্রেণী। মানুষের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর আত্মা সৃষ্টি ও বাস্তবতার দিক দিয়ে আল্লাহ্র সেফাত ও মোহাম্মদ স. এর আখলাক। উচ্চ শ্রেণীর আত্মার এই শ্রেণীটিকে সমস্ত আত্মিক পূর্ণতার স্তর সমূহের মাধ্যমে ভূষিত করা হয়। এ উচ্চতাকে উলুব্বে মাকানাত (মর্যাদার উচ্চতা) বলা হয়। আর এই উচ্চতার স্তরের শেষ সীমা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য। আল্লাহ্তায়ালা আত্মার এহেন সৌন্দর্যসমূহ ওই ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত করেন এবং দান করেন, যাকে তিনি সম্মান দান করার ইচ্ছা করেন এবং স্বীয় দরবারে যাকে মহিমময় করার ইচ্ছা করেন। আর তিনি উচ্চস্তরের শেকেল-সুরত-সৎকর্ম, আমলে সালেহ, সুন্দর দৈহিক আকৃতি এবং মর্যাদা– এ সব প্রাপ্ত হন। এহেন উচ্চ সুরতের নাম মাকান।

আর সর্বোচ্চ মাকান হচ্ছে জান্নাত। আবার এ মাকানের মর্যাদার তারতম্য অনুসারে সর্বোচ্চ স্তরের নাম ওসীলা, যার সম্পর্কে রসুলেপাক স. এভাবে সংবাদ দিয়েছেন– আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাগণের মধ্য থেকে একজনকে তা দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আমি আশা করি যে, সেই বান্দা আমিই হবো। সুতরাং রসুলেপাক স. উলুব্বে মাকানের জন্য খাস হয়ে গেলেন, যেমন উলুব্বে মাকানাতের জন্য খাস হয়েছেন। কেননা আল্লাহ্তায়ালার নিকট সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে রসুলেপাক স. এর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। হাদিস শরীফে এসেছে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, হে আমার হাবীব! আমি আপনার জন্য শাফাআত বিষয়টি গোপন করে রেখেছি। আর আপনি ছাড়া অন্য কারও জন্যই তা আমি এভাবে গোপন করে রাখিনি।

হজরত আবু জাফর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (সালামুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) বলেছেন, হকতায়ালা রসুলেপাক স. এর জন্য আসমানসমূহে এবং যমীনে মর্যাদা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। হজরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত আছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি আরশের ডান দিকে দণ্ডায়মান হবো। আমি ছাড়া আর কেউ সেখানে দাঁড়াতে পারবে না। তিনি আরও বলেছেন, কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানকালে আমাকেই সকলের পূর্বে কবর থেকে বের করা হবে। মানুষ যখন আল্লাহ্তায়ালার দরবারে হাজির হবে, তখন আমি তাদের পক্ষ থেকে কথা বলবো। তারা যখন নিরাশ হয়ে যাবে, তখন আমিই তাদেরকে শুভবাণী শোনাবো। প্রশংসার পতাকা সেদিন আমার হাতে থাকবে। আওলাদে আদমের মধ্য হতে আল্লাহ্তায়ালার নিকট আমিই সবচেয়ে সম্মানিত হবো। এতে গৌরবের কিছুই নেই। এক বর্ণনায় আছে, তিনি স. বলেছেন, আমি তাদের নেতা হবো, তারা যখন আল্লাহ্র দরবারে আসবে। তারা যখন চুপ হয়ে শুধু শুনতে থাকবে, আমি তখন তাদের পক্ষ থেকে কথা বলবো। তাদের সকল দরজা যখন বন্ধ হয়ে যাবে, আমি তখন তাদের জন্য শাফাআতকারী হবো। সেই দিন লেওয়ায়ে করম (মহানুভবতার পতাকা) আমার হাতে থাকবে এবং আমি আমার রবের নিকট সকল আওলাদে আদমের মধ্যে অধিকতর সম্মানিত হবো। হজরত আবু সাঈদ খুদরীর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের নেতা হবো এবং আমার হাতে থাকবে প্রশংসার পতাকা। এতে কোনো অহংকার নেই। আর সকল বনী আদম আমার পতাকাতলে অবস্থান করবে। হজরত ইবনে আব্বাসের হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, তোমরা ভালো করে শুনে রাখো, আমি আল্লাহ্র হাবীব। তাঁর কাছ থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে অধিক সম্মানিত। এতে অহমিকার কিছু নেই। উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার জিবরাইল

হাজির হয়ে আরজ করলেন, আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত দেখে নিয়েছি। কিন্তু মোহাম্মদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে আমি দেখিনি। রসুলেপাক স. এর পূর্ণতা এবং যাবতীয় আত্মিক ও বাহ্যিক পরিপূর্ণতার সমাহার তাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে– এ মর্মে এতো অধিক সংখ্যক হাদিস রয়েছে, যা আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। কেউ তাঁর আকমালিয়াতের (পূর্ণত্বের) বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি করতে পারে না এবং তাঁর আফযালিয়াতকে (শ্রেষ্ঠত্বকে) প্রতিহতও করতে পারে না।

রসুলেপাক স. এর উলুব্বে মাকানাতকে আসমা ও সেফাত (নাম ও গুণাবলী) হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। আর উলুব্বে মাকানকে ওসীলা ও মাকামে মাহমুদ নামে ব্যাখ্যা করা হয়। সুতরাং তিনি মাকান ও মাকানাত হিসেবে মওজুদাতের (অস্তিত্বপ্রাপ্তদের) মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। আর সুরত ও মানা (আকৃতি ও আত্মা)গতভাবে অস্তিত্বের চূড়ান্ত উচ্চতা (এন্তেহায়ী উলুব্বে ওজুদী) এর সাথে বিশেষায়িত। এই বর্ণনা নুয়ে আলার (সর্বোচ্চ শ্রেণীর) যাকে মাকান ও মাকানাত হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এভাবে উভয় প্রকারের উভয় শ্রেণীর বর্ণনাই পেশ করা হলো। এখন বাকী রইলো উভয় প্রকারের নিম্নশ্রেণী দু'টির আলোচনা। নিম্ন শ্রেণী দু'টিকে সুকুতে মাকান ও সুকুতে মাকানাত বলা হয়। এই দু'টি স্থানই ইবলীসের ভাগ্যে পড়েছে। আর উক্ত দু'টি স্থানের সীমা ও অবস্থান শয়তানের অনুসারী বদবখতদের জন্য। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

কামালাতে মানবী (আত্মিক পূর্ণতা)

এই অনুচ্ছেদটি রসুলেপাক স. এর কামালাতে মানবী (আত্মিক পূর্ণতা) প্রসঙ্গে যা আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে রসুলেপাক স. এর জন্য উচ্চ মর্যাদায় অর্জিত হয়েছে। এই কামালাতে মানবী দু'প্রকারের। এক প্রকার কামালে হাক্কী। কামেলীনে এযাম যাঁরা, তাঁরা উক্ত গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকেন এবং উক্ত কামালী সেফাতটি তাঁদের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়। যেমন রসুলেপাক স. বলেছেন– তাখাল্‌লাক্ব বিআখলাক্বিল্লাহ্ (তোমরা আল্লাহ্‌র আখলাক গ্রহণ করো)। দ্বিতীয় প্রকার কামালে কওনী– যা দ্বারা কামেলীনে এযাম ভূষিত হয়ে থাকেন। আর তা হচ্ছে ওই সমস্ত প্রশংসনীয় গুণাবলীর সমন্বয়, যাকে বলা হয়েছে মাকারেমে আখলাক।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কোনো মাখলুকের মধ্যে ওই পরিমাণ মাকারেমে আখলাক জমা করেননি, যে পরিমাণ মাকারেমে আখলাক রসুলেপাক স. এর মধ্যে জমা করেছেন। কেননা এ মাকারেমে আখলাকগুলো তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। তিনিই তাঁর প্রতিপালন করেছেন এবং তাঁর মধ্যেই শেষ হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ জন্যই তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন– 'ওয়া ইন্নাকা লাআ'লা খুলুক্বিন আযীম' (তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত)(৬৮ঃ৪)। নবীজীবনালেখ্য ও হাদিস গ্রন্থসমূহে তাঁর আখলাকে হামীদা সম্পর্কে এতো বর্ণনা এসেছে, যা গণনার গণ্ডি বহির্ভূত।

‘কামুসে আযম ও কাবুসে আকদাম’ গ্রন্থকার আরেফে কামেল শায়েখ আবদুল করীম হাম্বলী বলেছেন, রসুলেপাক স. এর মাকারেমে আখলাক সম্বন্ধে কিতাবসমূহে যা আলোচনা করা হয়েছে, তা সাগরের তুলনায় একবিন্দু তুল্য। তাঁর সম্পর্কে বর্ণনার বাইরে যা রয়ে গেছে, তা তাঁর সঙ্গেই বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, যার বর্ণনা পেশ করা সম্ভব নয়। তিনি সে সবের জামে (নির্যাস) অর্থাৎ সেসব গুণাবলী তাঁর মধ্যে সমন্বিত। এই বর্ণনা দ্বারা রসুলেপাক স. এর খালকে মানবী (আত্মিক সৃষ্টি) এর পূর্ণতার প্রকাশ ঘটেছে।

এখন রসুলেপাক স. এর কামালে হাক্কীর বিষয়ে আলোচনায় আসা যাক। এই কামালে হাক্কী আল্লাহ্তায়ালাই তাঁকে দান করেছেন এবং এই গুণের সাথে তাঁকেই বিশিষ্ট করেছেন। এ বিষয়ে যা অনুভব করা যায়, তিনি তার চেয়ে বেশী। চিন্তা-ভাবনা করার পর যা জিজ্ঞেস করা যায় এবং যা জানা যায়, তিনি তার চেয়েও অধিক। তার কোনো সীমা নেই। কেননা রসুলেপাক স. সমস্ত আখলাকে এলাহিয়া এবং সেফাতে রবুবিয়ার সাথে বাস্তবায়িত। শায়েখ আবদুল করীম স্বীয় গ্রন্থ ‘কামালাতে এলাহিয়া দর সেফাতে মোহাম্মদিয়া’তে সেফাত সেফাত, ইসিম ইসিম করে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে তিনি ওই সকল বিষয়ের বর্ণনা করেছেন, যা কালামুল্লাহ্ শরীফে কোথাও সুস্পষ্টভাবে, কোথাও ইশারা ইঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ‘আল্লাহ’ ইসিম, তার ফেলের বিকাশস্থল রসুলেপাক স.। কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে– ‘ওয়ামা রমাইতা ইয্রমাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রমা’ (এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন)(৮ঃ১৭)। আল্লাহ্তায়ালা আরও এরশাদ করেছেন– ‘ইন্নাল লাযীনা ইউবাইঊ’নাকা ইন্নামা ইউবাইঊ’নাল্লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাউক্বা আইদীহিম’ (যাহারা তোমার হাতে বায়আত করে তাহারা তো আল্লাহ্র হাতেই বায়আত করে। আল্লাহ্র হাত তাহাদের হাতের উপর)(৪৮ঃ১০)।

শায়েখ বলেছেন, রসুলেপাক স. এর বাণী ‘আনা আবদুল্লাহ’ (আমি আল্লাহ্র বান্দা) এর তাৎপর্য তাই, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। ‘আব্দ’ শব্দটি ‘আল্লাহ্’ ইসিমের সঙ্গে মিলিত। এই উবুদিয়াত তার রবের নামের সাথে জড়িত এবং রসুলেপাক স. এর ইসিম গোলামীর সাথে সম্পৃক্ত একটি বিশেষ শব্দ। কেননা তিনি আখলাকে এলাহিয়ার মাধ্যমে আখলাকবান হয়েছিলেন। শায়েখ বলেছেন, রসুলেপাক স. এর তাযীমের উদ্দেশ্যে যে কথা আমি বলেছি, তাকে তোমরা দূরবর্তী ও অসম্ভব মনে কোরো না। কেননা একথা আল্লাহ্তায়ালার নাযাহাতের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি করে না এবং তাঁর কামালের (পূর্ণতার) মধ্যেও কোনো কমতি আনয়ন করে না।

বান্দা মিসকীন (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) বলেন, হজরত শায়েখ এর উপর বিস্ময়! তিনি একথা বলতে ওযরখাহী পেশ করেছেন যে, রসুলেপাক স.

এর বড়ত্বের শান বর্ণনা করতে যেয়ে কামালে এলাহীর খর্বতার সন্দেহ হয়ে যায় কিনা। এখানে এরূপ সন্দেহ করার কী কথা থাকতে পারে? অথচ রসুলেপাক স. এর আপাদমস্তক আইনে কামালে এলাহী (আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণতার হুবহু প্রতিফলন)। আল্লাহ্তায়ালাই এই সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। সুতরাং হাকীকতে মোহাম্মদী হচ্ছে শুয়ুনাতে এলাহীর পরিণত বহিঃপ্রকাশ।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অনেক নাম দ্বারা তাঁর হাবীবের নামকরণ করেছেন। এটি একটি প্রসিদ্ধ কথা যে, আল্লাহ্তায়ালার সমস্ত আসমায়ে হুসনাতে রসুলেপাক স. এর সম্পর্ক রয়েছে এবং তাঁর মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। অন্যথায় ইসমে জলীলের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই হাসিল হয়নি। শায়েখের কালামটি এদিকে দৃষ্টিপাত করছে যে, আল্লাহ্তায়ালার ওই সমস্ত ইসমে জলীলের মাধ্যমে রসুলেপাক স. এর আখলাক সৃষ্টি হয়েছে। ওই সমস্ত ইসমে জলীলের অর্থের মধ্যে সেফাতে কামাল (পরিপূর্ণ গুণাবলী) একত্রিত হয়েছে। আর তা থেকে হাকিকতে মোহাম্মদীর মধ্যে সমস্ত কামালাত অর্জিত হয়েছে। যা কিছু বলা হলো তা অতি সুস্পষ্ট। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উলুহিয়াতের মর্তবা আল্লাহ্তায়ালার সত্তার জন্যই বিশিষ্ট। আল্লাহ্ই আল্লাহ্। আর আল্লাহ্র বান্দা হচ্ছেন মোহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

শায়েখ বলেছেন, খাস বন্দেগী, রসুলেপাক স. এর সত্তার জন্য খাস। এই বন্দেগীই চায় পূর্ণ গুণাবলী দ্বারা তাঁকে ভূষিত করতে এবং আল্লাহ্তায়ালার সেফাতী নামসমূহের দ্বারা নামকরণ করতে। বিষয়টি ফানা ও বাকার উপর নির্ভরশীল। যেহেতু রসুলেপাক স. আল্লাহ্তায়ালার যাত ও সেফাতের মধ্যে ফানা হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর মধ্যে বাকা (স্থিতি) গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান হয়েছেন।

শায়েখ হাকীকতে মোহাম্মদীর দরিয়ায় যাকে 'ওয়াহ্দাত' বলে ব্যক্ত করা হয়, তার মধ্যে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়েছিলেন যে, তাঁর দিব্য দৃষ্টি থেকে দ্বৈততার নকশা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। ওয়াল্লহু আ'লাম।

হজরত শায়েখ বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার নামসমূহের অন্যতম নাম 'নূর'। আল্লাহ্তায়ালা এই নাম দ্বারা তাঁর হাবীব স. এর নামকরণ করেছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন– 'ক্বাদ জ্বাআকুম মিনাল্লহি নূরুওঁ ওয়া কিতাবুম মুবীন' (আল্লাহ্র নিকট হইতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে)(৫ঃ১৫)। তোমাদের কাছে আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে 'নূর' (মোহাম্মদ) এবং 'কিতাবে মুবীন' কোরআন মজীদ এসেছে। আল্লাহ্তায়ালার এক নাম 'হক'। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন– 'আল হাক্বকু মির্‌রব্বিকা'(সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত)(২ঃ১৪৭)। আবার রসুলেপাক স. এর শানে এই 'হক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন– 'হাল কায্যাবূ বিল

হাক্বক্বি লাম্মা জ্বাআহুম’ (কাফেররা কি ‘হক’ কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যখন তিনি তাদের কাছে তশরীফ এনেছেন)? এখানে ‘হক’ দ্বারা মোহাম্মদ স.কে বুঝানো হয়েছে। রসুলেপাক স. এর নামকরণ করা হয়েছে ‘রউফ’ এবং ‘রহীম’ শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে। যেমন বলা হয়েছে– ‘বিল মু’মিনীনা রউফুর রহীম’ (মোহাম্মদ মুমিনদের সাথে বিনম্র এবং দয়ালু)। তাঁর নামকরণ করা হয়েছে ‘কারীম’ শব্দ দ্বারা। যেমন কালামে পাকে বলা হয়েছে– ‘ইন্নাহূ লাক্বাওলু রসূলিন কারীম’ (নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী)(৮১ঃ১৯)। একজন করীম (সম্মানিত) রসুলের কথা। তাঁর নাম রেখেছেন ‘আযীম’। যেমন, কালামে পাকে বলা হয়েছে– ‘ওয়া ইন্নাকা লাআ’লা খুলুক্বিন আযীম’ (তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত)(৬৮ঃ৪)। আল্লাহ্তায়ালার নাম শাহীদ। যেমন হজরত মুসার কথা কোরআনে করীমের ভাষায় এসেছে এভাবে– ‘ওয়া আংতা আ’লা কুল্লি শায়্যিন শাহীদ’। এদিকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব স.কে বলেছেন শাহীদ। যেমন কোরআনে পাকে এসেছে– ‘ওয়া ইয়াকূনার রসূলু আলাইকুম শাহীদা’ (এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে)(২ঃ১৪৩)।

হজরত শায়েখ বলেছেন, কাজী আয়ায বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় নামে তাঁর হাবীবের অনেক নামকরণ করেছেন। যেমন, আল্লাহ্তায়ালার নাম আল খাবীর, আল ফাত্তাহ, আশ শাকুর, আল আমীন, আল আল্লাম, আল আওয়াল, আল আখের, আল কাবী, আল ওলী, আল গফুর, আল হাদী, আল মু’মিন, আল মুহাইমেন, আদ্দায়ী, আল আযীয ইত্যাদি নামসমূহ যা আল্লাহ্তায়ালার জন্য খাস, এ সকল নামে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর হাবীব স. এরও নামকরণ করেছেন। কাজী আয়ায প্রত্যেকটি নামের দলিল কোরআনে করীম থেকে গ্রহণ করেছেন, যাতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনকারী কোনোরূপ প্রশ্নের অবতারণা করতে না পারে। কোনো ঝগড়াকারীও যেনো কোনোরূপ ঝগড়া সৃষ্টি করতে না পারে।

রসুলেপাক স. আল্লাহ্তায়ালার সমস্ত আসমায়ে হুসনা বা সেফাতসমূহের দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন। ফলে তাঁকে এমন কামালাত দান করা হয়েছিলো, যা তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য সমীচীন ও সম্ভব নয়। ‘কানা খুলুক্বাহুল কুরআনু’ (তাঁর চরিত্র হলো আল কোরআন)। আর কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার কালাম এবং তাঁর সেফাত। হজরত আয়েশা সিদ্দীকা আল্লাহ্র সেফাতসমূহকে মোহাম্মদ স. এর চরিত্র সাব্যস্ত করেছেন। তিনি এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কারণে মারেফতের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। আল্লাহ্তায়ালা কোরআনে পাকে স্বয়ং বলেছেন ‘ইন্নাহূ লাক্বাওলু রসূলিন কারীম’ (নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী)(৮১ঃ১৯) অথচ বাস্তবে তা আল্লাহ্তায়ালারই বাণী। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার মহান সেফাতসমূহের দ্বারা তিনি যে ভূষিত হয়েছিলেন– এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা উচিত। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর ইসিম ও

সেফাতসমূহে তাঁর রসুলকে স্বীয় খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত বানালেন। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। কেননা এরই অধীনে সম্মানিত আসরার (রহস্য) নিহিত আছে। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে ও আপনাকে এই হাকীকত সম্পর্কে অবগতি দান করুন। আমীন। আর আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত হেদায়েতদানকারী।

কামালাতে সূরী (বাহ্যিক পূর্ণতা)

রসুলেপাক স. এর কামালাতে সূরী বা বাহ্যিক পূর্ণতা যার কারণে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তাঁর উচ্চস্থান সাব্যস্ত হয়েছে, তাঁর এই কামালাত ছিলো তিন প্রকার। প্রথম প্রকার যাতি কামালাত বা সত্তাগত পূর্ণতা। দ্বিতীয় প্রকার ফেলী কামালাত বা ক্রিয়াগত পূর্ণতা যেমন নামাজ, রোজা, দান-সদকা ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকার কওলী কামালাত বা বাকগত পূর্ণতা।

প্রথম প্রকার ঃ সত্তাগত পূর্ণতা। রসুলেপাক স. এর পবিত্র সত্তা এবং তাঁর সুরত শেকেল ছিলো সুন্দর। তাঁর সত্তা ছিলো সুন্দরতম। সর্বাধিক পরিপূর্ণ। সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ, পবিত্রতম এবং সর্বাধিক জ্যোতির্ময়। তাঁর শেকেল সুরত ছিলো সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে আলোকিত ও তোজোদ্দীপ্ত। উলামা কেরাম তাঁর হুলিয়া মোবারক সম্পর্কে যা জেনেছেন এবং যা তাঁদের বোধগম্য হয়েছে, তা তাঁরা একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর সৌন্দর্যের খেয়াল করা, তাঁর পূর্ণতার বিষয়ে অনুশীলন করা এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁকে স্মরণে রাখা। তাঁর আমলসমূহের চর্চা করা ও তাঁর মোরাকাবা বা গভীর নিরীক্ষণ করা এবং তাঁকে নিজের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তু বানানো, যাতে করে উক্ত জামাল বা সৌন্দর্যকে দৃষ্টির সামনে রেখে স্থায়ী মহব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় এবং এই মহব্বত থেকে কখনও পৃথক না হতে হয়।

এই পদ্ধতিটি পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে অধিক নিকটবর্তী এবং এর মাধ্যমে সোহবতের দরজা লাভ করা যায়। আর এই পদ্ধতি সোহবতে মানবী (আত্মিক সাহচর্য), মহান সৌভাগ্য এবং মহা নেয়ামত অর্জনের কারণ হতে পারে। এই তরীকা বা পদ্ধতির উপর যদি সর্বদাই লেগে থাকা সম্ভব নাও হয়, তবুও অন্ততঃ সালাত ও সালামের সময়, যা পথের আলো এবং রসুলেপাক স. এর নৈকট্য লাভের নিকটতম পন্থা, সে সময় অন্ততঃ তাঁর দিকে মনোনিবদ্ধ করা উচিত। ওয়াবিল্লাহিত্তাওফীক।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ ফেলী কামালাত বা ক্রিয়াগত পূর্ণতা। এই পূর্ণতা হচ্ছে রসুলেপাক স. এর পবিত্র কার্যাবলী এবং পছন্দনীয় অবস্থাবলী, যা হাদিস শরীফ ও বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা দ্বারা জানা গিয়েছে। এ সম্পর্কিত বর্ণনা দ্বারা কিতাবসমূহ ভরপুর। এই পরিপ্রেক্ষিতে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সমস্ত জাহান এবং তার আমল ও সেফাতসমূহ রসুলেপাক স. এর পাল্লায় জমাকৃত। কেননা তিনিই

হেদায়েতের তরীকাসমূহের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তিনিই মানুষকে গোমরাহী থেকে বের করে এনেছেন এবং শরীয়তের আহকাম সৃষ্টি করে সুন্নত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নামাজ-রোজা ও হালাল-হারামের পথনির্দেশনা দিয়েছেন। আর কল্যাণ যা জগতবাসীর জন্য এসেছে, তা কদমে কদমে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেহেতু তিনি বলেছেন, 'মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান ফালাহূ আজ্বরুহা ওয়া আজ্বরু মান আমিলা ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি' (কোনো ব্যক্তি যদি একটি সুন্দর সুন্নত (রীতি) চালু করে, তবে তার প্রতিদান সে পেতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত, যতো লোক এর উপর আমল করবে তার সমান)। সুতরাং উম্মতের সমস্ত আমলের ছওয়াব তিনি পাবেন। তিনি তাদের আমলের মীযান হবেন। সকলের আমলের ছওয়াব তাঁর পাল্লাতেই উঠানো হবে। আর সমস্ত মাখলুকের ছওয়াব তাঁর ফযলের দরিয়ার এক বিন্দুতুল্য হবে। তিনিই সকলের মূল, আর অন্যান্যরা সকলেই তাঁর অংশ ও শাখাতুল্য। কেননা রসুলেপাক স. এর আমল যে কতো শক্ত ছিলো এবং তার হাল যে কতো শক্তিশালী ছিলো, তা কেউ বর্ণনা করতে পারে না।

তবে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যেমন বর্ণিত হয়েছে– দীর্ঘ সময় ব্যাপী নামাজ পড়ার কারণে তাঁর পবিত্র পদযুগল ফুলে যেতো। অথচ তাঁর পূর্বাপর খাতা কসুরী ক্ষমাকৃত ছিলো। পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের কুঞ্জিসমূহ তাঁর হাতে থাকা সত্ত্বেও পেটের উপর পাথর বেঁধেছিলেন বলে বর্ণনা এসেছে। অথচ জিবরাইল আ. রসুলেপাক স. এর কাছে নিবেদন করেছিলেন, আমাকে আল্লাহ্তায়ালা হুকুম দিয়েছেন, আমি যেনো আপনার জন্য এই পৃথিবীর পাহাড়সমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। রসুলেপাক স. তা অস্বীকার করে দারিদ্রকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর সামনে একবার বাহরাইন থেকে অর্থ সম্পদ আনা হলো। তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। ওগুলো থেকে নিজের ঘরে কিছুই নিলেন না। অথচ সে সময় তাঁর ঘরে কোনো খাবারও বিদ্যমান ছিলো না, কালো দু'টি বস্তু ব্যতীত– খেজুর ও পানি। রসুলেপাক স. এর জাহেরী সেফাত, বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনার গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না। যা কিছু বলা হলো, তা কেবল নমুনা মাত্র।

তৃতীয় প্রকার ঃ কওলী কামালাত বা বাণীগত পূর্ণতা। রসুলেপাক স. এর ফাসাহাতপূর্ণ বাণী ও আকর্ষণীয় বাক্য দ্বারা ইসলামের কিতাবসমূহ পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তবে এ সবই সিন্ধুর তুলনায় বিন্দু মাত্র। আর আলোর মাহাসাগরের এক কণা মাত্র। রসুলেপাক স. এর বাণীর মর্যাদার বিশালতার ক্ষেত্রে কোরআনে করীমের ওই আয়াতই যথেষ্ট– আল্লাহ্তায়ালা যেমন বলেছেন– 'ইন্নাহূ লাকৃওলু রসূলিন কারীম' (নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী)(৮১ঃ১৯)। হাকীকতে তা আল্লাহ্তায়ালারই বাণী। কিন্তু বাহ্যিকভাবে রসুলেপাক স. এর পবিত্র রসনা থেকেই বের হয়েছে। এই মর্মে আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেছেন 'ওয়ামা ইয়ান্ত্বিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহ্য়ুইঁ ইউহা' (এবং সে মন গড়া কথাও বলে না। ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়)(৫৩ঃ৩-৪)।

রসুলেপাক স. এর হাদিস শরীফের যে কোনো শব্দ সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে তার মধ্যে সব দিক দিয়েই যাবতীয় হাকীকতের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। তিনি এমন কোনো জিনিস বাকী রাখেননি, যে বিষয়ে মাখলুককে আল্লাহ্তায়ালার দিকে পথ প্রদর্শন করেননি। এমন কোনো ফযীলতের কথা বাকী রাখেননি যে বিষয়ে মানুষকে অবহিত করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে খাতামুন নাবিয়্যিন বানিয়েছেন– এই কারণে যে, খবরদারীর প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর আয়ত্ত এবং প্রতিটি তরীকাকে হাকীকত দ্বারা গতিময় করেছেন। সুতরাং তাঁর পর আর কোনো পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন নেই। তিনি প্রথমে যেমন 'সাবেকুন নাবিয়্যিন' ছিলেন, পরিশেষে সে রকম 'খাতামুন নাবিয়্যিন' হয়েছেন। যখন আদম আ. পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন, তিনি নবী ছিলেন তখনও। এই হচ্ছে রসুলেপাক স. এর মহান বুযুর্গী ও সুমহান মর্যাদা।

উপরোক্ত তিন প্রকারের কামালাতে সুরীর ক্ষেত্রে রসুলেপাক স. এর কাবেলিয়াতের (যোগ্যতার) বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। সমস্ত মওযুদাতের কাবেলিয়াতের তুলনায় রসুলেপাক স. এর কাবেলিয়াত ছিলো যেমন এক ফোঁটার সামনে মহা সমুদ্র। জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ্তায়ালার ফয়েযের তারতম্য হয় কবুলকারীদের কাবেলিয়াত বা যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে। তোমরা কি দেখ না যে সূর্যের কিরণ আয়নার মধ্যে কীভাবে প্রতিভাত হয়? সে কিরণ আয়নাকে এমনভাবে আলোকিত করে যে, সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয় অসম্ভব। চক্ষু ঝলসে যায়। এর বিপরীত আমরা দেখতে পাই, সূর্যের কিরণ অন্য কোনো জড় পদার্থের মধ্যে এভাবে প্রতিফলিত হয় না। এমনিতর অবস্থা ওই আয়নার যে আয়না দিয়ে আমরা মুখ দেখি। আয়নাটি যদি স্বাভাবিক হয়, তাহলে তার দ্বারা স্বাভাবিক চেহারাই দৃষ্টিগোচর হয়। আয়নাটি লম্বা হলে চেহারা লম্বা দেখা যায়। চওড়া হলে চেহারাও চওড়া হয়ে যায়। ছোট হলে চেহারা ছোটো হয়ে যায়, আর বড় হলে চেহারা দেখা যায় বড়। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, ফয়েযপ্রাপ্তি কাবেলিয়াত (যোগ্যতা) অনুসারে হয়ে থাকে। আল্লাহ্তায়ালা হাকীম (মহাবিজ্ঞানময়)। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে যার যার অবস্থানেই রাখেন। কাবেলিয়াত যখন বিভিন্ন হয়, তখন মাখলুকের মধ্যে ফয়েযের বহিঃপ্রকাশ কাবেলিয়াতের পরিমাণ অনুসারেই হয়ে থাকে। আসমা ও সেফাত (নাম ও গুণাবলী) এর মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার বহিঃপ্রকাশ তাঁর শান (অবস্থা) এর উপযোগী। যেভাবে তিনি চান তাঁর কাবেলিয়াতের শান সেভাবেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালার 'মুনয়িম' (নেয়ামত দানকারী) ইসিম এর মধ্যে শান ওই রকম প্রকাশিত হয় না, যে রকম প্রকাশিত হয় 'মুন্তাকিম' (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) ইসিমের মধ্যে। 'মুনতাকিম' ইসিমের শান নেয়ামতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। সুতরাং প্রকাশ হওয়া ক্রিয়াটি এক, কিন্তু প্রকাশস্থলের বিভিন্নতার কারণে তার স্বরূপ বিভিন্ন রকমের হয়। আর

প্রকাশস্থলে হকের প্রকাশটি হয়ে থাকে তার কাবেলিয়াত অনুসারে। আবার বস্তুসমূহের কাবেলিয়াত তার মহল (পাত্র) এর সাথে সম্পৃক্ত, যে পাত্রের মধ্যে কাবেলিয়াতের প্রকাশ ঘটে। নেয়ামত গুণটির মহল 'মুনয়িম' ইসিমের প্রকাশস্থল। এরকমভাবে নেকমত (অসন্তুষ্টি বা প্রতিশোধ গ্রহণ) এর মহল 'মুনতাকিম' ইসিমের প্রকাশস্থল। 'মুনয়িম' ও 'মুনতাকিম' উভয়ই কাদীম (চিরন্তন) দু'টি ইসমে এলাহী। কেননা আল্লাহ্তায়ালার কাদীম সেফাতসমূহ তাঁর সাথেই কায়েম (বিদ্যমান)। আলমের (মহাবিশ্বের) সকল বস্তু আল্লাহ্তায়ালার ইসিম ও সেফাতের প্রতিক্রিয়া। তেমনি আলমের সকল ব্যক্তি বা বস্তু আল্লাহ্তায়ালার ইসিম ও সেফাত প্রকাশের সীমানাস্থল এবং প্রতিফলন।

প্রকাশ থাকে যে, আম্বিয়া কেরাম আল্লাহ্তায়ালার যাতী ইসিম থেকে সৃষ্ট। সুতরাং সেই ইসমে যাত তাঁদের প্রশংসনীয় কাজের ওসিলা। আর আউলিয়া কেরাম তাঁর সেফাতী নামসমূহ থেকে সৃষ্ট। আর সেই নামসমূহ তাদের প্রশংসনীয় কাজের ওসিলা। বাকী সমস্ত সৃষ্টি তাঁর সেফাতে ফেলিয়া (ক্রিয়াগুণ বাচক) ইসিম থেকে সৃষ্ট। সে সব সেফাত তাদের প্রশংসনীয় কাজের ওসিলা। রসুলেপাক স. যাতে পাক থেকে সৃষ্ট। সুতরাং তাঁর সীমা ও মাকাম যাতে হক এবং যাতে হকের যহুর (বিকাশ) তাঁর মধ্যে হয়েছে। সে কারণে রসুলেপাক স. এর মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার সেফাতসমূহ বিন্যস্ত হয়ে আছে। কেননা সেফাতসমূহ তাদের যাতের (মূল সত্তার) দিকে ধাবিত হয়। রসুলেপাক স. এর দ্বীন বা শরীয়ত সকল দ্বীন বা শরীয়তকে মনসুখকারী (রহিতকারী) এ জন্য যে, যাত (মূল সত্তা) প্রকাশিত হওয়ার পর সেফাত দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য উক্ত সেফাতের এলেম বিদ্যমান থাকে। সে পরিপ্রেক্ষিতেই অন্যান্য আম্বিয়া কেরামের নবুওয়াতসমূহ আপন আপন অবস্থায় অবশিষ্ট আছে। মনসুখ হয়নি। শুধু তাঁদের দ্বীনসমূহ মনসুখ হয়ে গিয়েছে। মোহাম্মদ স. এর কাবেলিয়াতের নেসবত সমুদ্রতুল্য। আর অন্যান্য আম্বিয়া ও আওলিয়া কেরামের কাবেলিয়াতের নেসবত নদী এবং ঝর্ণাতুল্য। অবশিষ্ট সৃষ্টির কাবেলিয়াতের নেসবত বিন্দুতুল্য। উদ্ধৃত বাক্যগুলো শায়েখ আবদুল করীম হাম্বলীর। এই হাকীর (শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী) এর জবানে এসেছে, আকরাব (অধিকতর নৈকট্য), কানজ (খনি), আকদাহ (পেয়ালাসমূহ), গোলাফ (অঞ্জলিসমূহ), কাতরাত (বিন্দুসমূহ) এবং বাহর (সমুদ্র)– এ সকল শব্দ যা মিছাল স্বরূপ এসেছে, তার কারণ এই– মোহাম্মদ স. সমস্ত আলমের সমষ্টি। কেননা তাঁর পবিত্র রূহ হচ্ছে আকলে আউয়াল। আর সেই আকল থেকেই সমস্ত আলম সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণেই কেবল রসুলেপাক স. এর কাবেলিয়াত সমস্ত সৃষ্টি জগতের কাবেলিয়াতের সমান। তিনি প্রথমতঃ ফয়েযপ্রাপ্ত এবং দ্বিতীয়তঃ ফয়েয দাতা। তিনি স্বয়ং পবিত্র ফয়েয। সর্বপ্রথম ফয়েয তাঁর দিকেই ধাবিত হয়। অতঃপর সমস্ত মওজুদ ও মাখলুকাতের

কাবেলিয়াত অনুসারে ফয়েয তাদের দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং তিনি সমস্ত মওজুদাতের কুল (সমগ্র)। তাঁর থেকেই কুল্লু শাই (সমস্ত বস্তু)। সুতরাং তিনি হচ্ছেন কুল (সমগ্র)। আর হক তায়ালা হচ্ছেন কুল্লুল কুল (সমগ্রের সমগ্র)। ইমাম আবদুল্লাহ ইয়াফেয়ী রসুলেপাক স. এর শানে কী সুন্দর প্রশংসাই না করেছেন। বলেছেন–

يا واحد الدهر و يا عين الوجودي + ويا غيث الانام هادي كل حيران

অর্থঃ হে যুগের একক সত্তা! হে সৃষ্টি জগতের স্বয়ংসত্তা! হে সৃষ্টির সাহায্যদানকারী, হে সমস্ত প্রাণীর হেদায়েতকারী!

রসুলেপাক স. এর কাবেলিয়াত (যোগ্যতা) হচ্ছে কুল্লী (মৌলিক)। আর অন্য সকল অর্থাৎ আম্বিয়া মুরসালীন, ফেরেশতাবৃন্দ, মুকাররাবীন, সকল আউলিয়া, সিদ্দীকীন এবং মুমিনীনের কাবেলিয়াত হচ্ছে জুযী (আংশিক)। সুতরাং তাঁরা সকলেই রসুলেপাক স. এর উচ্চতার মাকামের শিখর সম্পর্কে জানতে এবং বুঝতে অক্ষম এবং তাঁর উচ্চ শানের তওক্ব পরিধান করতে অপারগ।

যখন একথা জানা এবং বুঝা গেলো যে, আম্বিয়া-মুরসালীন আপন আপন মস্তকসমূহ রসুলেপাক স. এর উচ্চ মর্যাদার সামনে অবনত করেছেন এবং তাঁদের গর্দানসমূহ নমিত করেছেন, সুতরাং তাঁদের সেই ওয়াদা-অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হলো, যে ওয়াদা আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কোরআনে করীমে তার বর্ণনা এসেছে এভাবে– 'ওয়া ইয আখাযাল্লাহু মীছাক্বান নাবিয়্যিনা লামা আতাইতুকুম মিন কিতাবিওঁ ওয়া হিকমাতিন ছুম্মা জ্বাআকুম রসূলুম মুসদ্দিক্বুল লিমা মাআ'কুম লাতু'মিনুন্না বিহী ওয়ালাতান্সুরুন্নাহূ' (স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার লইয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি অতঃপর তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রসূল আসিবে তখন তোমরা অবশ্যই তাহার প্রতি ইমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে)(৩ঃ৮১)।

এতো গেলো নবীগণের কথা। এখন আসা যাক আউলিয়া-মুকাররবীনের বিষয়ে। তাঁরা তাঁদের উচ্চ শানের সঙ্গে রসুলেপাক স. এর ওরওয়ায়ে উছকা (সুদৃঢ় মাধ্যম) এবং তা শক্তভাবে ধারণ করার ফলেই আপন আপন ক্ষেত্রে উরুজ ও উন্নতি করে থাকেন। জুনায়েদ বাগদাদী বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার নিকটে যাওয়ার সকল দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, রয়েছে কেবল সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ স. এর দরজাটি। এখন আল্লাহ্তায়ালার দরবারে প্রবেশ করতে রসুলেপাক স. এর দরজা ব্যতীত আর কোনো দরজা খোলা নেই। আল্লাহ্তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছতে হলে রসুলেপাক স. এর দরজায় পৌঁছতে হবে এবং জাহেরী ও বাতেনীভাবে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। মধ্যখানে তিনি যদি বন্ধন না হতেন,

তাহলে তাঁর পরবর্তী আউলিয়া কেরাম ওই দাবী করতেন, যা পূর্ববর্তী নবীগণ করেছিলেন। যেহেতু উম্মতের অগ্রভাগে বাঁধন হয়ে আছেন মোহাম্মদ স. সেই হেতু উম্মতে মোহাম্মদীর ওলিগণ বাতেনীভাবে আল্লাহ্তায়ালার কাছ থেকে ওই জিনিস পেয়ে থাকেন, যা পূর্ববর্তী নবীগণ জাহেরীভাবে পেয়েছিলেন। তাঁরা নবুওয়াত পাবেন না, কেননা রসুলেপাক স. এর মাধ্যমে নবুওয়াত খতম হয়ে গিয়েছে। নবুওয়াতের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যে হেকমত হচ্ছে আম্বিয়া কেরাম যা কিছু পেয়েছিলেন, তা নবুওয়াতের মাধ্যমেই পেয়েছিলেন। অন্যান্য দ্বীনসমূহে যা কিছু বিধান জারী করা হয়েছিলো, তা আল্লাহ্তায়ালার হুকুম ও অনুমতিতেই হয়েছিলো। দ্বীনে মোহাম্মদীর প্রকাশ যখন ঘটলো, তখন অন্যান্য দ্বীনকে মনসুখ (রহিত) করে দেয়া হলো। কেননা তাঁদের দ্বীন ছিলো জুযী (আংশিক) আর দ্বীনে মোহাম্মদী হচ্ছে কুল্লী (পূর্ণাঙ্গ বা সার্বিক)। জুযী কুল্লীর উপর গালেব (প্রবল) হতে পারে না (কুল্লী দ্বীনের আবির্ভাব যখন হয়, তখন আর কোনো জুযী দ্বীন বিদ্যমান থাকার যৌক্তিকতা থাকে না)। রসুলেপাক স. এর দ্বীন কুল্লী হওয়ার কারণ এই যে, তিনি সমস্ত মাখলুকের দিকে প্রেরিত হয়েছিলেন। অন্যান্য আম্বিয়া মুরসালীন প্রেরিত হয়েছিলেন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের দিকে।

সে কারণেই রসুলেপাক স. এর দ্বীনের শক্তির মধ্যে সমগ্র আলমের শক্তি নিহিত রয়েছে। চাই তা হোক আরশ-কুরসী, লওহ্-কলম, আফলাক (আসমানী জগতসমূহ), আমলাক (রাজ্যসমূহ)। নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল হোক বা নক্ষত্ররাজি, সূর্য-চন্দ্র, আগুন, বাতাস, পানি, মাটি, বৃক্ষরাজি হোক অথবা প্রাণীসমূহ, জিন-ইনসান যা পয়দা হয়েছে এবং হবে, সব কিছুই তাঁর দ্বীনে হকের অধীনস্থ শক্তি। অতঃপর এ সব কিছুর উপর জমইয়তে কুবরা (বৃহত্তম সমষ্টিভূতি)কে অধিক করা হয়েছে– যা রসুলেপাক স. এর খাস হাকীকত। আর এই হাকীকতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'কাবা কাওসাইন' এর মর্তবা দ্বারা, যা রসুলেপাক স.কে দান করা হয়েছিলো। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এই মর্তবার কোনো অংশ লাভ করতে পারেননি। তবে যার যে পরিমাণ প্রশস্ততা এবং কাবেলিয়াত (যোগ্যতা) ছিলো, তিনি সেই আনুপাতে (এই নেয়ামতের) অংশ পেয়েছেন। সুতরাং বিষয়টিতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করো, বুঝতে চেষ্টা করো এবং তার মধ্যে হারিয়ে যাও। তার মধ্যে নিজকে এভাবে যুক্ত করে দাও, যেমন বিন্দু সিন্ধুর মধ্যে হারিয়ে গিয়ে নিজকে ফানা করে দেয়– যাতে করে সাআদতে কুবরা (বৃহত্তম সৌভাগ্য) ও মাকানে যুলফা (নিকটতম স্থান) এর ফয়েয লাভে ধন্য হতে পারো। এর মধ্যে মর্যাদাময় রহস্য এবং সম্মানিত বিষয়ের সূক্ষ্মতা নিহিত আছে। আল্লাহ্ তাবারক তায়ালা যদি এই সূক্ষ্ম বিষয়টি বুঝবার তৌফিক দান করেন তবে তা বুঝা সম্ভব হবে। এহেন বাহরে মোহাম্মদীর (মোহাম্মদী সমুদ্রের) মধ্যে হারিয়ে যাওয়া এবং

ফানা হওয়ার দিকে আরেফ শায়েখ আবুল গয়ছ ইবনে জামীল এভাবে ইঙ্গিত করেছেন– 'খদ্বাইনা বাহরাওঁ ওক্বাফাল আম্বিয়াউ আ'লা সাহিলাহূ' (আমি বাহরে মোহাম্মদীর মধ্যে সন্তরণ করেছি এমতাবস্থায় যে, নবীগণ তার কিনারায় দাঁড়িয়ে)। উক্ত শায়েখের এই বাহরে মোহাম্মদীর মধ্যে প্রবেশ করা, আর অন্যান্য নবীগণের তার কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা এ কারণে যে, এই বাহরটি কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য তৈরী নয়। তবে হাঁ, যিনি তাঁর পরে আসবেন এবং সুরতে তাঁর অনুসারী হবেন, তাঁর পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং যাঁরা কামেলীনে আউলিয়ায়ে মোহাম্মদী, তাঁরা বাহ্যিক ও আত্মিকভাবে মোহাম্মদ স. এর সঙ্গে লাহেক (যে পরে এসে শামিল হয়) এবং বাহরে মোহাম্মদীতে প্রবেশকারী। কিন্তু পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরাম এর ব্যতিক্রম। কেননা তাঁরা বিধানগতভাবে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে লাহেক এবং অর্থগতভাবে তাঁরা লাহেক ও তাবে (অনুগামী)। তবে তাঁরা সুরতের (বাহ্যিকতার) দিক থেকে লাহেক ও তাবে নন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আম্বিয়া কেরাম শেকলে মোহাম্মদী (মোহাম্মদ স. এর আকার আকৃতি) এবং বাহরে মোহাম্মদী স. এর উপকুলে দাঁড়িয়ে আছেন। কেননা তাঁরা সত্তাগত পরিসীমায় অনুসরণীয় ব্যক্তি এবং সুরতে অন্য কারও অনুসরণকারী নন। তবে আত্মিকভাবে মোহাম্মদ স. এর অনুসরণকারী।

অপর পক্ষে আউলিয়ায়ে মোহাম্মদী যাঁরা, তাঁরা সত্তাগত, বিধানগত, বাহ্যিক এবং আত্মিক সব দিক দিয়েই রসুলেপাক স. এর অনুগামী। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা যাঁকে তৌফিক প্রদান করেছেন বিন্দুতুল্য স্বীয় সত্তাকে বাহরে মোহাম্মদীর মধ্যে নিমজ্জিত ও ফানা হওয়ার– সে ব্যক্তির বৃহত্তম সৌভাগ্য ও নৈকট্যগত মর্যাদা হাসিল হয়ে গিয়েছে এবং তার পক্ষেই এরকম বলা সম্ভব, যে রকম বলেছিলেন কুতুবে ওয়াক্ত গউছে আজম শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী রহ.। তিনি বলেছিলেন, রসুলে পাক স. যে কদম পাক উঠিয়েছেন এবং যেখানে কদম পাক রেখেছেন, সে নিশানার উপরই আমি আমার কদম রেখেছি। কিন্তু নবুওয়াতের কদম তো কেবল রসুলে পাক স. এর জন্যই খাস। কাজেই চেষ্টা করো, তাঁর সঙ্গে যেনো মিলিত হয়ে যেতে পারো। তাঁর অনুসরণের দরিয়ায় নিমজ্জিত হয়ে যাও। ওয়াফ্‌ফাক্বানাল্লহু ওয়া ইয়্যাকুম আলা যালিক।

রসুলেপাক স. আল্লাহ্‌তায়ালার হাবীব ছিলেন এবং তিনি মাহবুবিয়াতের মারকায (প্রেমাস্পদতার কেন্দ্র) ছিলেন। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, একদিন সাহাবা কেরাম রসুলেপাক স. এর আগমনের আপেক্ষায় বসে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি এলেন। সাহাবা কেরামের নিকটবর্তী হলেন। শুনতে পেলেন, সাহাবীগণ বলাবলি করছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর মাখলুকের মধ্য থেকে নবী ইব্রাহীমকে তাঁর খলীল বানিয়েছেন। অপরজন বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা নবী মুসার সঙ্গে কথা বলেছেন। তৃতীয়জন বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা নবী

ঈসাকে কালিমাতুল্লাহ্ এবং রূহুল্লাহ্র মর্যাদা দিয়েছেন। চতুর্থজন বললেন, আল্লাহ্তায়ালা নবী আদমকে সফিউল্লাহ্ বানিয়েছেন। রসুলেপাক স. তাঁদেরকে সালাম দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের কথোপকথন শুনলাম। তোমরা বলেছো, আল্লাহ্তায়ালা ইব্রাহীমকে খলীল, মুসাকে কালীম, ঈসাকে রূহুল্লাহ্ এবং আদমকে সফিউল্লাহ্ বানিয়েছেন। তোমরা জেনে নাও এবং হুঁশিয়ার হয়ে যাও যে, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে হাবিবুল্লাহ্ বানিয়েছেন এবং এতে আমার কোনো অহংকার নেই। কিয়ামতের দিন আমি লিওয়াউল হামদ (প্রশংসার পতাকা) বহনকারী হবো। এতে আমার কোনো আত্মম্ভরিতা নেই। আমি কিয়ামতের দিন প্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার শাফাআত প্রথমে কবুল করা হবে। এতে আমার কোনো দম্ভ নেই। কিয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করবো। তখন আমার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে। সেদিন আমিই প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবো। তখন আমার সঙ্গে থাকবে আমার উম্মতের ফকীর দরবেশগণ। আমিই পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের মধ্যে অধিক সম্মানিত হবো। এতে আমার কোনো দর্প নেই। রসুলেপাক স. এর কামালত ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনায় এই হাদিসটি পূর্ণাঙ্গ। ইতোপূর্বে রসুলেপাক স. এর উচ্চ স্থান এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য রসুলেপাক স. এর জন্য 'হাবীব' শব্দটির রহস্যোদ্ধার। সুতরাং ভালো করে জেনে নাও যে, কামালতের মাকামসমূহের মধ্যে উন্নততর মাকাম হচ্ছে মাকামে হুব্বী। হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন– 'কুংতু কানযান মাখফিয়্যান ফাআহ্বাব্তু আন আ'রুফা ফাখলাক্বতুল খলক্বা ওয়া তু'রাফতু ইলাইহিম ফী আরাফূনী ওয়া আরাফ্তু বিহিম' (আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম। অতঃপর আমি পরিচিত হতে চাইলাম। সুতরাং আমি মাখলুক সৃষ্টি করলাম এবং আমি তাদের কাছে পরিচিত হলাম। তারা আমাকে চিনলো আমিও তাদেরকে চিনলাম)। সুতরাং তাওয়াজ্জুহে হুববীই অর্থাৎ প্রেমের দৃষ্টিই হচ্ছে প্রথম সৃষ্টি, যা আল্লাহ্তায়ালা থেকে মাখলুক সৃষ্টির মাধ্যমে পরিণতি লাভ করেছে। বাকী সমস্ত মাখলুক সেই প্রথম সৃষ্টির শাখা এবং সমস্ত হাকীকতে 'হুব্ব' (প্রেম) এর ওয়াসেতায় (মাধ্যমে) প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সৃষ্টি যে হুব্ব তা যদি না হতো, তাহলে কোনো মাখলুকই পয়দা হতো না। হলেও আসমা ও সেফাতে এলাহীকে কেউ জানতো না। মাখলুকের জহুর (প্রকাশ) হয়েছে রূহে মোহাম্মদীর ওয়াসেতায়। সুতরাং রূহে মোহাম্মদী না হলে কেউ সৃষ্টি হতো না এবং আল্লাহ্তায়ালাকে কেউ জানতে পারতো না। সুতরাং 'হুব্ব' হচ্ছে ওজুদে মওজুদাত (সৃষ্টির অস্তিত্ব) এর জন্য প্রথম ওয়াসেতা। নিশ্চয়ই হাদিস শরীফে এসেছে, শবে মেরাজে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর স্বীয় হাবীবকে বলেছিলেন– 'লাও লা কা লামা খলাক্বতুল আফলাক' অর্থাৎ হে আমার হাবীব! আপনি না হলে আমি আসমানসমূহ সৃষ্টি করতাম না। সুতরাং জানা গেলো, রসুলেপাক স. এর গোপন ভাণ্ডার চেনার জন্য তাওয়াজ্জুহে হুব্বীর মূল মকসুদ হলেন। তারপর তিনি ব্যতীত

যতো কিছু আছে তার সবকিছুই তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। তিনিই হুব্বে এলাহীর মূল মকসুদ। তিনি ব্যতীত অন্য সব তার শাখাতুল্য। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে 'হাবীব' ইসিম (নাম) দ্বারা খাস করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কাউকেই হাবীব নামে আখ্যায়িত করেননি। তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে যে তাঁর অনুসরণ করবে, আল্লাহ্পাক তাঁকে মাহবুব বানাবেন। যেমন আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন– 'কুল ইন কুংতুম তুহিব্বূনাল্লাহা ফাত্তাবিউ'নী ইউহ্বিব্কুমুল্লাহূ' (বল, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন)(৩ঃ৩১)। এই বিধানানুসারে সমস্ত মখলুক তাঁর থেকে আলমে ওজুদের মধ্যে (অস্তিত্বের জগতে) আগমন করেছে। যেমন রসুলেপাক স. বলেছেন, 'আনা মিন নূরিল্লাহি ওয়াল মু'মিনূনা মিন নূরী' (আমি নূরে এলাহী থেকে সৃষ্ট, আর মুমিনগণ আমার নুর থেকে সৃষ্ট)। যাতে এলাহীর সঙ্গে নেসবত হওয়ার এই বৈশিষ্ট্য উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য খাস। অন্যান্য উম্মতের জন্য নয়। অতীত উম্মতের মধ্য থেকে যারা এই দাবী করেছে যে, আমরা আল্লাহ্র মাহবুব, আল্লাহ্তায়ালা তাদের এই দাবীকে অস্বীকার করেছেন এবং উম্মতে মোহাম্মদীর জন্যই মহব্বত প্রমাণ করেছেন। কেননা প্রত্যেক উম্মত তাদের আপন আপন নবীগণ থেকে সৃষ্ট (অর্থাৎ তাদের মাবদায়ে তাআইয়্যুন হচ্ছেন তাদের নবী) এবং তারা তাদের আপন আপন নবীর সঙ্গেই মিলিত হবে। রসুলেপাক স. ছাড়া যেহেতু আর কোনো হাবীব নেই, সুতরাং তাঁর উম্মত মহব্বতের সঙ্গে খাস– একথাই সাব্যস্ত হয়।

প্রকাশ থাকে যে, সাধারণতঃ 'হুব্ব' এর নয়টি স্তর আছে। তন্মধ্যে একটি স্তর খালেক এর মধ্যে। আর বাকী স্তরসমূহ মাখলুকের মধ্যে বিদ্যমান। প্রথম স্তর যা খালেক এর মধ্যে বিদ্যমান তার নাম হচ্ছে 'হুব্ব'। তবে এই 'হুব্ব' এর প্রকাশের জন্য হরকত (প্রতিক্রিয়া) হওয়া জরুরী নয়। এই হুব্ব যখন সৃষ্টি হবে, তখন তার মধ্যে পাওয়া যাবে এরাদা (অভিপ্রায়)। বস্তুতপক্ষে এরাদা হক তায়ালার জন্যই খাস। ১. মাখলুকের মধ্যে যে 'হুব্ব' হয়ে থাকে, তার প্রথম স্তর হচ্ছে 'মায়লান'। আর 'মায়লান' হচ্ছে কাম্য বস্তুর প্রতি মনের আকর্ষণ। ২. এই আকর্ষণ যখন বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে বলা হয় 'রগবত'। ৩. রগবতের মাত্রা অধিক হলে তাকে বলা হয় 'তলব' ৪. তলব এর মাত্রা অধিক হলে তাকে বলা হয় 'ওলা'। ৫. 'ওলা'র মধ্যে যখন কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং সে অবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন তাকে বলা হয় 'সাবা'। ৬. এ অবস্থা যখন সুদৃঢ় হয়, অন্তরের গভীরে নেমে যায় এবং কাম্য বস্তু লাভে শান্তি পায়, তখন তাকে বলে 'হাওয়া' ৭. হাওয়া যখন প্রবল আকার ধারণ করে এবং তা অন্তঃকরণে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন তাকে বলে 'শাগাফ'। ৮. এই শাগাফ যখন প্রেমিককে ফানা করে দেয় এবং সেই ফানা এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে, নিজের সত্তা থেকে হয়ে যায় পৃথক এবং ফানা থেকেও ফানা (ফানা উল ফানা) হয়ে যায়, তখন তাকে এ'যাম বলে। ৯. এই এ'যাম যখন সুদৃঢ় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বাহ্যিকতায় অবস্থান গ্রহণ

করে, প্রেমিক আপন সত্তার থেকেও ফানা হয়ে যায় এবং প্রেমাস্পদের তরফ থেকে এরূপ অবস্থা হয় যে, দু'জন এক সত্তায় পরিণত হয়ে যায়, তখন তাকে 'হুব্বে মুতলাক' বলা হয়। এর অপর নাম এশক। মাখলুকের জন্য ভালোবাসার ক্ষেত্রে এই হচ্ছে সর্বশেষ মাকাম। এই মাকামে প্রেমিক-প্রেমাস্পদে এবং প্রেমাস্পদ প্রেমিকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একে অপরের রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে যায়। কারণ আশেকের রূহ মাশুকের সুরতের মধ্যে স্থান করে নেয় এবং সে রূহানী সুরত আশেকের দিলের মধ্যে যুক্ত হয়ে যায়। তখন এ অবস্থায় একে অপর থেকে আর পৃথক হতে পারে না। উপরোক্ত 'হুব্ব' এর নয়টি স্তর প্রকৃতপক্ষে মাখলুকের জন্য খাস। আল্লাহ্তায়ালার শানে তা ব্যবহার করা যাবে না। তবে হাঁ, এ সমস্ত স্তরসমূহের সৃষ্টিকারী আল্লাহ্তায়ালা।

'হুব্ব' ও 'এরাদা' আল্লাহ্তায়ালার জন্য। তবে এই 'হুব্ব' এর আরেকটি স্তর আছে– যা হকতায়ালা এবং মাখলুকের মধ্যে প্রকাশ পায়। তাকে মরতবায়ে জামেআ (সমন্বিত স্তর) নাম দেওয়া হয়। একে দ্বিতীয় স্তরও বলা হয়। আসমায়ে এলাহীর মধ্যে একটি ইসিম আছে 'ওয়াদুদ' (প্রেমময়)। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান, তাকে প্রেমদান করেন। আর বান্দাও তাঁর সাথে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যেমন আল্লাহ্তায়ালা কালামে মজীদে বলেছেন, 'ফাসাওফা ইয়া'তিল্লাহু বিক্বাওমিইঁ ইউহিব্বুহুম ওয়াইউহিব্বুনাহু' (নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে)(৫ঃ৫৪)। এখানে উভয়ই ভালোবাসার এই স্তরে পরস্পরে শরীক। এ স্তরটি আলমে জহুরে (প্রকাশ্য জগতে) দুইপক্ষ থেকে হওয়ার কারণে এশকের স্তরসমূহের মধ্যে সর্বশেষ মাকাম। মাখলুকের জন্য এশকে এলাহীর স্তর থেকে অগ্রগামী কোনো কিছুই নেই। যেহেতু– 'নারুল্লাহিল মূক্বাদাতুল্লাতী তাত্ত্বলিউ' আ'লাল আফইদাহ্' (ইহা আল্লাহ্র প্রজ্বলিত হুতাশন, যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে)(১০৪ঃ৬-৭)। (আল্লাহ্র ভালোবাসার আগুন যা দেল পর্যন্ত খবর দিয়ে দেয়। সুতরাং বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও)।

রসুলে পাক স. এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার অবস্থা এবং তাঁর দুয়ারে হাজির হওয়ার বরকত প্রসঙ্গে আলোচনা।

জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্তায়ালা যখন তাঁর হাবীবকে ভালোবাসেন, কিয়ামত দিবসে তাঁর উম্মতের জন্য যখন তাঁকে শাফাআতকারী বানিয়েছেন, যা নৈকট্য, ইজ্জত ও মহব্বতের পরিচায়ক। সাধারণভাবে সকলের জন্য শাফাআত করার অধিকার দিয়েছেন। আমভাবে শাফাআত করার এরকম অধিকার অন্য কাউকে দান করেননি। এর রহস্য হচ্ছে, যেহেতু রসুলেপাক স. সমস্ত মাখলুকাতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সকলের কল্যাণকামী ছিলেন।

প্রত্যেক রক্ষক ও কল্যাণকামী তাঁর উম্মত ও অধীনস্থদের জবাবদিহিতায় থাকেন এবং তাঁর উপর তাদের যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা ওয়াজিব হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্তায়ালা রসুলেপাক স. এর উপর উম্মতের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং সেই কারণেই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে এই তৌফিক দান করেছেন। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে 'মাকামে মাহমুদ' নামক ওসিলা প্রদানের ওয়াদা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ওসীলার অর্থই হচ্ছে কাম্য বস্তুতে পৌঁছার মাধ্যম। আর তা বাস্তবায়িত হবে শাফাআতের মাধ্যমে। সেই ওসিলা হচ্ছে উক্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি জায়গা– যার সুরত আছে ফেরদৌসে আলায়, যা বেহেশতের মনজিলসমূহের উচ্চতম মনজিল। রসুলেপাক স. সেখানে অবস্থান করবেন। যাহের, বাতেন ও কামালাতের সাথে সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখবেন। যেমনিভাবে রসুলেপাক স. সমস্ত মাখলুকের জন্য সর্বপ্রথম ওজুদের মধ্যে আসার এবং প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যম, তেমনিভাবে চূড়ান্ত পর্যায়েও বেহেশতে অবস্থান করার জন্যও তিনি মাধ্যম। সুতরাং আমাদের অস্তিত্ব এবং ওই সকল অস্তিত্বশীলের জন্যই অনাদি অনন্ত, প্রথম ও শেষ সর্বাবস্থায় রসুলেপাক স. ছাড়া অপর কেউ মাধ্যম নেই।

'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম'। সুতরাং হে খাঁটি আল্লাহ্অন্বেষী ব্যক্তি! তোমার উপর অপরিহার্য এবং সমীচীন এই যে, তুমি সেই অতুলনীয় দরবারের আশ্রয়ের সাথে যুক্ত হয়ে যাও এবং তাঁর পবিত্র দরজায় অবস্থান গ্রহণ করো। যেনো দু'দিক থেকে সম্পর্ক হয়ে যায়। যখনই কোনো ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর সঙ্গে বেহেশতে সাথী হয়ে থাকার বাসনা প্রকাশ করেছেন, তখন তিনি তাকে জবাবে বলেছেন, তুমি আমাকে তোমার নিজের ব্যাপারে সাহায্য করো অধিক সেজদা করার মাধ্যমে। তাহলে তোমার মকসুদ হাসিল হবে এবং তোমার মকসুদটি পরিপূর্ণ মকসুদ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে। এজন্যই কামেল আউলিয়া কেরামের তরীকা ছিলো– তাঁরা রসুলেপাক স. এর দরবারে যুক্ত হয়ে যেতেন এবং তাঁর পবিত্র দরবারে বায়না করতেন। কামেলগণের তরীকা সব সময় এরকমই ছিলো। আল্লাহ্তায়ালা যাকে পূর্ণতা দান করতে ইচ্ছা করেন এবং উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিতে চান, তার জন্য এই নেয়ামত অর্জনের তৌফিক দান করেন। কামেল ওলিআল্লাহ্গণ যখন আল্লাহ্তায়ালার দরবারের মনজিলসমূহের কোনো এক মনজিলে হাজির হন, তখন তাঁরা সেখান থেকে দরবারে মোহাম্মদীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেন। আল্লাহ্তায়ালার দরবার থেকে রসুলেপাক স. এর দরবারে যে নূরের বর্ষণ হতে থাকে, সেই নূরের দিকে তাঁরা দ্রুতগতিতে ধাবিত হতে থাকেন। তখন তাঁরা দরবারে এলাহীর বাক্যকে রসুলেপাক স. এর দিকে ঘুরিয়ে দেন। তখন কামালাতে এলাহিয়ার মধ্য থেকে তাঁদের হাকীকত যা চায়, সে সকল

কিছু থেকে তাঁরা গাফেল হয়ে যান। আর রেসালতের দরবারের আদবের খাতিরে তাঁরা তাঁদের কামালিয়াতকে আড়াল করে নেন। আর সেই ওলীগণের উক্ত হালের বরকতের ভিত্তিতে এতো অধিক নেয়ামত অর্জিত হয়, যার ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব নয়। তখন তাঁরা উক্ত হালের ভিত্তিতে সেই সময়ে মোহাম্মদী শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমে এমন জিনিস দেখেন ও শোনেন, যা মোহাম্মদী কাবেলিয়াতের উপযোগী এবং তাঁকে মোহাম্মদী পরিচ্ছদ পরিধান করানো হয়– যা এই তরীকা ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়।

শায়েখ আবুল গয়ছ ইবনে জামীল বলেছেন– 'খুদনা বাহ্‌রাওঁ ওয়াক্বাফাল আম্বিয়াউ আলা সাহিলিহী' (আমি এমন এক সাগরে সাঁতার কেটেছি, যে সাগরের উপকূলে দণ্ডায়মান ছিলেন প্রেরিত পুরুষগণ)। তাঁর বাক্যের 'সাগর' শব্দের অর্থ ওই শরীয়ত, যা রসুলেপাক স. এর জন্য খাস। রসুলেপাক স. ছাড়া অন্যান্য নবীর শরীয়ত নয়। সুতরাং যাহের বাতেনে যার নেসবতে মোহামদী স. বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছে, আকৃতিগত ও আত্মিকতায় সে পরিপূর্ণ এত্তেবায়ে মোহাম্মদীর বদৌলতে হাকীকতে মোহাম্মদীর সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। সে ব্যক্তি তখন কাবেলিয়াতে মোহাম্মদীর দ্বারা হক সুবহানাহু তায়ালার কাছ থেকে কিছু জিনিস অর্জন করে নেয়। এ বিষয়ের তাৎপর্য যখন জানা হলো, তখন রসুলেপাক স. এর তাসাববুর (স্মৃতিচারণ)কে অপরিহার্য বানানো এবং তাঁর পবিত্র দরবারে পড়ে থাকাকে তোমার জন্য অপরিহার্য্য (ওয়াজিব) করে নেওয়া উচিত।

এখন তুমি যদি বলো, সম্পর্কের হাল এবং মহান দরবারের কর্মচারী তো আমরা পাই না– তাহলে আমরা কেমন করে তা অর্জন করবো। এর উত্তরে বলবো, রসুলেপাক স. এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন দুই প্রকারে হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার তাআল্লুকে সূরী (বাহ্যিক সম্পর্ক)। এই সম্পর্ক আবার দুই প্রকার। প্রথম প্রকার– পূর্ণ এত্তেবার উপর সুদৃঢ় থাকা। রসুলেপাক স. এর কথা, কাজ, কিতাব ও সুন্নতের আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালনে লেগে থাকা এবং ওই আকীদা পোষণ করা, চার ইমামগণ– ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল যে আকীদা পোষণ করেছেন। কেননা উলামা মুহাক্কেকীনের ঐকমত্য এই যে, এই চার ইমামই আহলে হক (সত্যাধিষ্ঠিত)। কিয়ামতের দিন ইনশাআল্লাহ্ এই দলই নাজাতপ্রাপ্ত হবে। এই বাহ্যিক অনুসরণের পূর্ণতা সাব্যস্ত হয়েছে এ বিষয়ের উপর যে, আমলের ক্ষেত্রে আযীমতের (দৃঢ়তার) প্রতি নির্ভর করা হয়। রুখসতের (সহজসাধ্যতার) প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না। কেননা আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবীকে আযীমতের উপর আমল করার হুকুম করেছেন। যেমন আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন– (হে রসুল স.!) আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেমন উলুল আযম রসুলগণ করেছেন'। উলুল আযম রসুল ছিলেন পাঁচজন, যা সুস্পষ্ট করা হয়েছে এই আয়াতে কারীমায়– 'শারাআ' লাকুম মিনাল্লাযীনা মা

ওয়াস্‌সা বিহী নূহাওঁ ওয়াল্লাযীনা আওহায়না ইলাইকা ওয়ামা ওয়াস্‌যা বিহী ইব্‌রহীমা ওয়া মূসা ওয়া ঈ'সা আন আক্বীমুদ দীনু ওয়ালা তাতাফার্‌রকূ ফিহী' (আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের জন্য দ্বীনের বিধান করেছেন যে বিষয়ে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন নূহকে। যার বিষয়ে আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি। এবং যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে– তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং এ বিষয়ে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হবে না)। সুতরাং উলুল আজম রসুল ছিলেন হজরত নূহ, হজরত ইব্রাহীম, হজরত মুসা, হজরত ঈসা এবং সাইয়্যেদে আলম মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পরিপূর্ণ এত্তেবাকারীর উচিত আযীমতের বিষয়সমূহের এত্তেবা করা। রুখসত ও সহজলভ্য আমলের দিকে ধাবিত না হওয়া। কেননা এটিই হচ্ছে ইসলামের মূল মাকাম।

আমি তোমাদের জন্য ওই জিনিস পছন্দ করি, যা আমি আমার নিজের জন্য পছন্দ করি। আর তা হচ্ছে কুরবত এবং সিদ্দীকিয়াতের মাকাম। এই মাকাম অর্জনের জন্য শর্ত হচ্ছে রসুলেপাক স. এর আযীমতের আমলের এত্তেবা করা এবং তা আমল করা। আর তোমরা আযীমতের উপর যথাযথ আমল করতে সক্ষম হবে না ওই পর্যন্ত, যে পর্যন্ত নফসের পরিচয়, তার দোষক্রটি এবং তার কারণ সম্পর্কে অবহিত হতে না পারবে। আর বিষয়টি অর্জন করা সম্ভব আহলুল্লাহ্‌র মধ্য থেকে কোনো শায়েখে কামেলের মাধ্যমে। তিনিই তোমাকে এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করতে পারেন। তিনি জানতে পারবেন তোমার আমল এবং হাল সম্পর্কে। বিভিন্ন হালের মধ্য থেকে কোন হালটি তোমার অনুকূলে হবে, তা তিনি জানতে পারবেন।

সাইয়্যেদে আলম রসুলে আকরম স. জগতবাসীকে হেদায়েত প্রদানের প্রত্যাশায় আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে পথনির্দেশনা পাবার আশায় বহু দিন পর্যন্ত হেরা গুহার ভিতর এবাদতে মশগুল ছিলেন। এর চূড়ান্ত পরিণতি যখন লাভ হলো, তখন তিনি স. গারে হেরায় এবাদত ও নির্জনতা অবলম্বন ছেড়ে দিলেন এবং রমজান মাসের শেষ দশদিন ব্যতীত সারা বৎসর সাহাবীগণের সঙ্গেই সম্পর্ক রক্ষা করে চললেন।

নিঃসন্দেহে একজন তালেব কোন জিনিসটি তার হালের উপযোগী তা জানতে ও বুঝতে পারে না। শায়েখ ও মোর্শেদের ওয়াসেতা এবং মাধ্যম ব্যাতীত সে তার নিজের পথপ্রদর্শন নিজে করতে পারে না। অথবা পথপ্রদর্শন হতে পারে জযবে এলাহীর মাধ্যমে, যা তার কাছে কাশফ হয়ে আসতে পারে।

হে জ্ঞানবান ব্যক্তি! এত্তেবায়ে মোহাম্মদীর তালেবের জন্য আমার কথা উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। সুতরাং তোমাদের উচিত এমন কোনো শায়েখের সন্ধান করা, যিনি তোমাকে মারেফতে এলাহীর সন্ধান দিতে পারবেন এবং তোমার নিজের হাল সম্পর্কে তোমাকে পথপ্রদর্শন করতে পারবেন। যখন তুমি এমন শায়েখের সন্ধান পেয়ে যাবে তখন তাঁর হুকুমের বরখেলাফ করবে না এবং কখনও তাঁর কাছ থেকে পৃথক হবে না, যদিও মুসীবতসমূহ তোমাকে টুকরা টুকরা করে ফেলে। তাঁর

অবাধ্যতা পরিহার করবে এবং তাঁর কাছে কখনও নিজের হাল গোপন করবে না। যদি বদ কিসমতের কারণে নিজের থেকে কোনো গোনাহ্ সংঘটিত হয়ে যায়, তবে তা শায়েখের কাছে নিবদেন করবে, যাতে তিনি তা দূর করার চেষ্টা করতে পারেন এবং তোমার অবস্থার চাহিদা অনুসারে তার চিকিৎসা করতে পারেন। তিনি বারেগাহে এলাহীতে দোয়া করবেন আল্লাহ্তায়ালা যেনো তোমাকে এই যিল্লতী থেকে মুক্তি দেন।

এমন কোনো শায়েখ লাভের সৌভাগ্য যদি তোমার না হয় এবং কোনো আল্লাহ্ওয়ালার সন্ধান না মিলে, তাহলে আল্লাহ্ওয়ালাদের কর্মপদ্ধতিকে অপরিহার্য করে নাও। আহলুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ওয়ালাদের কর্মপদ্ধতি মোট চারটি ঃ

১. কলবকে মুক্তকরণ। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কাম্য বস্তু থেকে দেলকে মুক্ত করে গায়রুল্লাহ্কে অন্তর থেকে উঠিয়ে দেওয়া।

২. আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করা– পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্কে ভালোবাসা, যা অন্য কোনো গরয, চিন্তা, দৃষ্টিপাত এবং বিনিময়কামনা থেকে পবিত্র হবে।

৩. নফসের বিরোধিতা করা– নফসের এমন খাহেশসমূহের বিরোধিতা করা, যা সে তার নিজের প্রতিপালনের জন্য তালাশ করে। নফসের বড় বিরোধিতা হচ্ছে গাইরুল্লাহ্কে পরিত্যাগ করা। গাইরুল্লাহ্কে পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় চিন্তা-ফিকির, আকীদা দুরুস্ত করা এবং এলেম অর্জনের মাধ্যমে।

৪. সার্বক্ষণিক জিকির– অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার জালাল ও জামালের প্রতি লক্ষ্য করে সব সময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র জিকির করা, চাই তা যবানী জিকির হোক, অথবা হোক কালবী জিকির। রূহী জিকির হোক অথবা হোক সেররী জিকির।

প্রথম প্রকারের দ্বিতীয় প্রকারঃ বাহ্যিক সম্পর্ক– রসুলেপাক স. এর অনুসরণ সুদৃঢ় মহব্বতের সাথে করতে হবে, যেনো রসুলেপাক স. এর মহব্বতের স্বাদ নিজের সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে অনুভব করা যায়। হজরত শায়েখ বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি রসুলেপাক স. এর মহব্বত অনুভব করি আমার দেল, আত্মা, শরীর, মন, স্বীয় মস্তক ও কেশরাজীতে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে কঠিন পিপাসায় ঠাণ্ডা পানির তৃপ্তি যেমন সমস্ত দেহে অনুভব করা যায়। রসুলেপাক স. এর মহব্বত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজে আইন। এ মর্মে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন, 'আন নাবিয়ু্য আওলা বিল মু'মিনীনা মিন আনফুসিহিম' (নবী মু'মিনদের নিকট তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর)(৩৩ঃ৬)। রসুলেপাক স. বলেছেন, 'লাইইউ'মিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বু ইলাইহি মিন নাফসিহী ওয়ামালিহী ওয়া ওয়ালাদিহী' (তোমাদের মধ্য হতে কেউ কখনও মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না আমি তার কাছে সর্বাধিক প্রিয় হবো তার নিজের জীবন, মাল ও সন্তান থেকে)। এখন তুমি যদি তোমার মধ্যে ওই রকম মহব্বত না পাও যা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাহলে জেনে রাখো যে তোমার ইমান নাকেস (অপূর্ণ)। তাহলে তুমি

এস্তেগফার করো এবং নিজের গোনাহ্র জন্য তওবা করো এবং রসুলেপাক স. এর স্মরণ বেশী বেশী মাত্রায় করতে থাকো। তাঁর প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের আদব সম্মান প্রদর্শন করো। তিনি যা নিষেধ করেছেন, সেগুলো বর্জন করে চলো। মনে মনে এই আশা পোষণ করো যে, আমি যদি এমন হতে পারি, তাহলে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে আমাকে হাশর করানো হবে। কেননা রসুলেপাক স. বলেছেন, যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গে।

এখন তুমি জানতে পেরেছো প্রথম প্রকারে যা কিছু বর্ণনা করেছি– রসুলেপাক স. এর সঙ্গে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে। আর এ সম্পর্ক হাসিল হবে না বাহ্যিকভাবে শরীয়তের উপর আমল করা, দৃঢ়তার সাথে তরীকতের সুলুক করা, রসুলেপাক স.কে পরিপূর্ণভাবে মহব্বত করা এবং যাহেরী ও বাতেনীভাবে তাঁকে তাজীম (সম্মান) করা ব্যতীত। রসুলেপাক স.কে তাজীম করার সাথে সাথে আসহাবে কেরাম ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতিও যথাযথ আদব সম্মান ও মহব্বত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে রসুলেপাক স. এর সঙ্গে মহব্বত ও আদব রাখাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি মহব্বত ও আদব। আল্লাহ্তায়ালা তৌফিক দানকারী ও পথ প্রদর্শনকারী।

দ্বিতীয় প্রকার– তাআল্লুকে মানবী। রসুলেপাক স. এর দরবারের সাথে আত্মিক সম্পর্ক। তাও দু'প্রকার– প্রথম প্রকার হচ্ছে, রসুলেপাক স. এর অতুলনীয় সুরত শেকেল মনের আয়নার মধ্যে হাজির রাখা। তুমি যদি এমন হয়ে থাকো যে, কোনো সময় স্বপ্নযোগে রসুলেপাক স. এর দর্শন লাভে ধন্য হয়েছো তবে তা যে সুরত তুমি স্বপ্নে দেখেছো, তা মনের মধ্যে হাজির রাখো। আর যদি কখনও তুমি স্বপ্নে তাঁর দর্শন লাভ না করে থাকো এবং তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত সুরত হুবহু মনের মধ্যে হাজির করতে না পারো, তবে তাঁর কথা খুব বেশী স্মরণ করো এবং তাঁর প্রতি বেশী বেশী করে দরুদ ও সালাম প্রেরণ করো। তাঁকে স্মরণ করার কালে এবং দরুদ ও সালাম প্রেরণকালে তোমার মানসিক অবস্থা এরকম বানিয়ে নাও যে রসুলেপাক স. তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তোমার কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছেন। আর তুমিও রসুলেপাক স.কে ইজ্জত, সম্মান, হায়া ও আদবের সাথে দেখতে পাচ্ছো। কেননা রসুলেপাক স. আল্লাহ্তায়ালার সেফাতে ভূষিত। আল্লাহ্তায়ালার একটি সেফাত হচ্ছে– হাদিসে কুদসীতে তিনি যেমন বলেছেন– 'আনা জালিসি মান জাকারানি' (আমি তার সঙ্গে আছি যে আমার জিকির করে)। এই সেফাতটি রসুলেপাক স. এর ভাগ্যেও অতিমাত্রায় সন্নিবেশিত হয়েছে। কেননা এশকে এলাহীর আরেফ হওয়া রসুলেপাক স. এর একটি বিখ্যাত সেফাত। যেহেতু তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বাধিক আরেফ বিল্লাহ্ ছিলেন।

উপরোক্ত সেফাতের দ্বারা তুমি যদি নিজেকে গঠন করতে না পেরে থাকো, তাহলে তুমি রসুলেপাক স. এর কবরে আনওয়ার কখনও যদি যিয়ারত করে

থাকো, রওজা মোবারক ও কুব্বা শরীফ (সুবজ গম্বুজ) দেখে থাকো, তাহলে স্মৃতিপটে সেই পবিত্র দরবারের চিত্র ধরে রাখো। যখনই তুমি রসুলেপাক স. এর উপর দরুদ সালাম পেশ করবে, তখন তুমি এমন বনে যাও যেনো তুমি রসুলেপাক স. এর রওজা শরীফের সামনে সসম্মানে দণ্ডায়মান। এমন কি তুমি জাহেরী ও বাতেনীভাবে রসুলেপাক স. এর রূহানিয়াত প্রত্যক্ষ করে চলেছো।

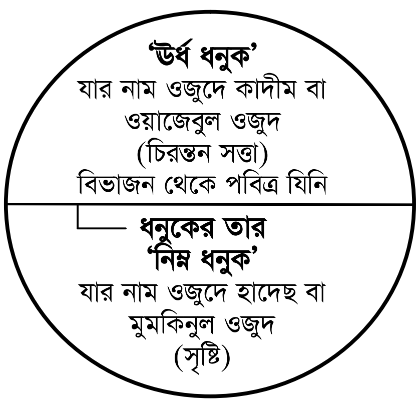
আর তুমি যদি এমন হয়ে থাকো যে, রসুলেপাক স. এর রওজা শরীফ কখনও দেখোনি এবং কবর শরীফের যিয়ারত কখনও করোনি, তাহলে সব সময় তাঁর উপর সালাত ও সালাম পেশ করো এবং মনে মনে খেয়াল করো যেনো রসুলেপাক স. শুনতে পাচ্ছেন। পরিপূর্ণ আদব-সম্মানের পথ গ্রহণ করো, যেনো তোমার দরুদ ও সালাম রসুলেপাক স. এর অবস্থার সাথে তাঁর দরবারে পেশ হয়ে যায়। হিম্মত ও হুযুরে কলবের বিরাট তাছির (প্রভাব) আছে। রসুলেপাক স.কে স্মরণ করার কালে এবং তাঁর উপর সালাত ও সালাম প্রেরণের মুহূর্তে অন্য কোনো কাজে মগ্ন হওয়াকে লজ্জাকর মনে করবে। তোমাদের সালাত ও সালাম রূহবিহীন দেহতুল্য। এরকম হওয়া উচিত নয়। বান্দা যা আমল করে তার ভিত্তি হলো হুযুরে কলব। এমন আমল হয় জিন্দা আমল। আমল যদি গাফলতের সাথে হয় এবং অন্যের সাথে মশগুল থাকা অবস্থায় হয়, তাহলে সে আমল হবে আত্মাবিহীন শরীর তুল্য। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রসুলেপাক স. বলেছেন– 'ইন্নামাল আ'মালু বিন্‌নিয়্যাত' (সকল আমলের দারমাদার ও ভিত্তি হলো নিয়ত ও কলবী এরাদা)। হজরত শায়েখ বলেছেন, আমার শায়েখ ইসমাঈল জারনী বলেছেন, বান্দা যখন প্রথমে নিয়ত ছাড়াই আমল শুরু করে দেয়, আর সে যদি আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা করে, তাহলে তার কর্তব্য হবে আমল শুরু করার পর নিয়ত করে নেওয়া। তাহলে তার আমলটি এমন হবে, যেনো দেহের মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেওয়া হলো। আর কেউ যদি আমল শুরু করার কালে বদ নিয়তে শুরু করে থাকে, আর আমল করার মধ্যে বদ নিয়ত পরিবর্তন করে নেকনিয়ত করে নেয়, তবে তাও ভালো সুরতেই তার জন্য উপকারী হবে। এর ফলে তার আমলটি জীবন্ত ও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, হজরত শায়েখ যথার্থই বলেছেন।

যখন তুমি জানতে পারলে তাআল্লুকে মানবী (আত্মিক সম্পর্ক) এর প্রথম প্রকারে আমি যা বর্ণনা করলাম যে, রসুলেপাক স. এর সুরত মোবারক এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত যা কিছু সে সব স্মৃতিতে আনতে হবে। সে সবকে আত্মিক ভয় ও ভক্তির সাথে, বুযুর্গী ও কামালতের সাথে ইজ্জত-সম্মান সহকারে সব সময় ধরে রাখতে হবে। তবেই মহান সৌভাগ্য ও নৈকট্যের পদমর্যাদা অর্জিত হবে। আল্লাহ্‌তায়ালা তৌফিক দানকারী।

তাআল্লুকে মানবী (আত্মিক সম্পর্ক) এর দ্বিতীয় প্রকার– রসুলেপাক স. যে সকল পরিপূর্ণ গুণাবলী দ্বারা ভূষিত হয়েছেন, যা জালাল ও কামালের সমন্বয়ে

হয়েছে এবং মহান আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে, যাতে এলাহীর নুর দ্বারা যাকে ধন্য করা হয়েছে, যা কামালে হাক্বী ও খলকী (আল্লাহ্র কামালিয়াত ও সৃষ্টির কামালিয়াত)কে বেষ্টন করেছে, যা সমস্ত ফযীলত ও মর্যাদাকে ওয়াজিব করেছে, তাকে বাহ্যিক ও আত্মিকভাবে হাকীকত, বিধানগত ও সত্তাগতভাবে জাহেরী ও বাতেনীভাবে ধারণার মধ্যে উপস্থিত করতে পারবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি না জানবে যে, রসুলেপাক স. সম্পূর্ণ আলমে বরযখে হাদেছ ও কাদীমের হাকীকতের ওজুদের মধ্যে বিদ্যমান এবং তিনি স. দু'দিক থেকেই প্রত্যেকের মধ্যে যাতি ও সেফাতী হাকীকত। কেননা তিনি যাতের নূর থেকে সৃষ্ট এবং তিনি আসমা, সেফাত, আফআল ও আছারের সমন্বয়কারী। এ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্তায়ালা রসুলেপাক স. সম্পর্কে বলেছেন 'ছুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা ক্বাবা ক্বাওসাইনে আওআদনা' (অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হলেন, আরও নিকটবর্তী হলেন। অতঃপর দু'ধনুকের দূরত্বে বা তার চেয়ে আরও নিকটে এসে গেলেন)(৫৩ঃ৮-৯)।

এখন আমি তোমাদের জন্য উক্ত আয়াতে কারীমার অর্থের হাকীকত বুঝার জন্য যা রসুলেপাক স. এর কামালাতের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত, তা উপস্থাপন করছি, যাতে করে স্মৃতির পটে তাঁর সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা মুদ্রিত হয় এবং এই নমুনাটি দেখার পর ওই আয়াতের তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যায়।



নকশাটি দেখে চিন্তা করো যে, ওজুদ (যার অস্তিত্ব আছে) একটি দায়েরা বা বৃত্ত সদৃশ। এ দায়েরা (বৃত্ত)কে এমন একটি রেখা দ্বারা দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যা ভেদ করেছে দায়েরার কেন্দ্রবিন্দুকে। দায়েরার উপরের অংশ যা একটি ধনুকসদৃশ তার নাম দেওয়া হয়েছে ওজুদে কাদীম (চিরন্তন সত্তা), ওয়াজেবুল

ওজুদ (অবশ্যম্ভাবী সত্তা) বা হক তায়ালা। সেই সত্তা বিভক্তি ও বিভাজন থেকে পবিত্র। অপর দায়েরা বা বৃত্তের নিম্নাংশ যার নাম দেওয়া হয়েছে ওজুদে হাদেছ (নতুন সত্তা), মুমকিনুল ওজুদ (সম্ভাব্য সত্তা) বা সৃষ্টি। দায়রা বা বৃত্তের উভয় অর্ধাংশ একটি ধনুক তুল্য। আর মধ্যের রেখাটি হচ্ছে ধনুকের তার। সুতরাং মধ্যরেখাটি হচ্ছে ধনুক এবং বৃত্তের তার সদৃশ। এই রেখাটি দ্বারাই বৃত্তের অর্ধাংশ ধনুকে পরিণত হয়েছে। আর এই রেখাটি যা তার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'কাবাকাওসাইন'। সুতরাং জেনে রাখো যে, মাকামে মোহাম্মদী কামালাতে এলাহীয়া (আল্লাহ্‌র পূর্ণতা) এবং কামালাতে খালকিয়ার (সৃষ্টির পূর্ণতার) সমন্বয়কারী। অর্থাৎ দুই ধরনের কামালিয়াতই তাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। রসুলেপাক স. আলমে বরযখের হাকীকত। একথার তাৎপর্য এই যে, শবে মেরাজে তাঁর মাকাম হয়েছিলো আরশে। আর আরশ হচ্ছে সমগ্র মাখলুকের শেষ সীমা। আরশের উপর আর কোনো মাখলুক নেই। সুতরাং সমস্ত মাখলুকাত রসুলেপাক স. এর নিম্নে। আর তাঁর রব হচ্ছেন কেবলমাত্র তাঁর উপরে এবং সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌তায়ালা ও মাখলুকের মধ্যে রসুলেপাক স. একটি বরযখ (মধ্যবর্তীতা)রূপে সাব্যস্ত হলেন। সুতরাং তিনি দুই দিকের দুই ধরনের সেফাত দ্বারাই ভূষিত হলেন বাহ্যিক, আত্মিক, বিধানগত এবং সত্তাগতভাবে। যা আমি বর্ণনা করলাম তা যদি জেনে এবং বুঝে থাকো, তাহলে কামালে মোহাম্মদীর বিষয়টি স্মৃতিবদ্ধ রাখা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ্। প্রকাশ থাকে যে, হাকীকতে মোহাম্মদীর জন্য এ জগতের মতো সকল জগতেই একটি যহুর বা আত্মপ্রকাশ আছে। সুতরাং আলমে আজসামে (দৈহিক জগতে) তাঁর আত্মপ্রকাশ যেভাবে ঘটেছে, আলমে আরওয়াহতে (রূহের জগতে) সেভাবে ঘটেনি। কেননা আলমে আজসাম (দৈহিক জগত) হচ্ছে সংকীর্ণ। অপ্রশস্ত। আলমে আরওয়াহ হচ্ছে প্রশস্ত। তাই তাঁর প্রকাশ আলমে আরওয়াহতে যেরকম, আলমে মানাতে (সূক্ষ্ম জগতে) সে রকম নয়। কেননা আলমে আরওয়াহ্'র চেয়ে আলমে মানা অধিকতর সূক্ষ্ম এবং প্রশস্ত। যমীনে তাঁর প্রকাশ যে রকম আসমানে সে রকম নয়। আসমানে যে রকম প্রকাশ, ইয়ামীনে আরশে (আরশের ডান দিকে) সে রকম নয়। ইয়ামীনে আরশে যে রকম আরশের উপর সে রকম নয়। কেননা সেখানে কোনো আইনা এবং কাইফা (কোথায় এবং কীভাবে) এর অবকাশ নেই। সুতরাং নিম্নতর মাকাম থেকে উর্ধ্বতর মাকামে অধিকতর পূর্ণ প্রকাশ হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক প্রকাশে মহল (স্থান) হিসাবে বিশেষ বুজুর্গী শান, শওকত এবং রহস্য নিহিত থাকে। এমন কি এমন মহল পর্যন্ত তাঁর প্রকাশের চূড়ান্ত হয়ে থাকে, যেখানে তাঁর আবির্ভাবের দিকে নজর করে দেখবে, কোনো নবী বা ওলীর পক্ষেও তা সম্ভব হয় না। রসুলেপাক স. এর এ কথার তাৎপর্য এরকমই– আমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যেখানে আমার রব ছাড়া আর কারও কোনো

অবকাশ নেই। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমার জন্য আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যেখানে কোনো নৈকট্যভাজন ফেরেশতা এবং কোনো নবী রসুলের অধিকার নেই।

হে ভ্রাতঃ! হিম্মতকে সমুন্নত রাখো। সর্বোচ্চ প্রকাশস্থলে হাকীকতে কুবরার সাহায্যে যেনো দর্শন লাভ করতে পারো। কেননা তিনি তিনিই। ভালো করে বুঝে নাও। হে ভ্রাতঃ! আমি তোমাকে বাহ্যিক ও আত্মিকভাবে সর্বদাই পর্যবেক্ষণের চোখ খোলা রাখতে ওসিয়ত করছি, যদিও তুমি নিজেই এর দায়ে দায়বদ্ধ। তাহলে দেখবে অচিরেই তোমার আত্মা তাঁর সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে এবং চাক্ষুষভাবে রসুলেপাক স. এর সৌন্দর্য তোমার দৃষ্টিগোচর হবে। তুমি তাঁর দরবারে হাজির হয়ে কথোপকথন করতে পারবে। তুমি আরয করবে। রসুলেপাক স. তার জবাব দিবেন। রসুলেপাক স. তোমাকে সম্বোধন করবেন। তুমি সাহাবায়ে কেরামের মতো মর্যাদা পাবে এবং তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যেতে পারবে ইনশাআল্লাহ্।

রসুলেপাক স. এর দরবারে হাজির হওয়া এবং তাঁর সূক্ষ্ম সুরত আধ্যাত্মিকতার আলোকে দর্শন করা যদিও এটি খেয়াল ও ফিকিরগত বিষয়, তথাপিও সম্মানিত দরবারে হাজির থাকার কারণে তাঁর দরবারের নৈকট্য লাভের কারণ হবে। তুমি কি শোনোনি, রসুলেপাক স. বলেছেন তোমাদের মধ্যে যে আমার উপর অধিক সালাত ও সালাম পেশ করবে, সে তোমাদের মধ্য থেকে আমার অধিক নিকটবর্তী হবে। তার কারণ হচ্ছে দরুদ পাঠকারীর অন্তরের সম্পর্ক রসুলেপাক স. এর জামালের সাথে গ্রথিত হয়ে যায়। সে সময় সে রসুলেপাক স. এর রূহানী সুরতের উপর তার দীল থেকে আশেক হয়ে যায়। ফলে সে অবশ্যই রসুলেপাক স. এর নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং তাঁর সঙ্গী হয়ে যায়। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে– 'যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গে'। এখানে আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে। রসুলেপাক স. এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, দোয়াকারী যখন তার মুসলমান ভাইয়ের জন্য দোয়া করে, তখন ফেরেশতারা তাকে বলে, তোমার জন্যও সে রকম হোক। ফেরেশতাদের দোয়া যে কবুল হয়, এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। সুতরাং দরুদ পাঠকারী মুসলমান নবী করীম স. এর উপর দরুদ প্রেরণ করে, আর আল্লাহ্তায়ালা তার উপর রহমত নাযিল করেন। দরুদ পাঠকারীর দরুদ এবং আল্লাহ্তায়ালার রহমত দু'টিই বান্দার উপর অবতীর্ণ হতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে– রসুলেপাক স. বলেছেন, যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ্তায়ালা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। এখান থেকে জানা যায় যে, দরুদ পাঠকারীর জন্য নৈকট্যের হাকীকত হাসিল হয় এবং রসুলেপাক স. এর সঙ্গে তার হাশর হবে। শুধু জিহ্বা দ্বারা দরুদ পাঠ করলেই যখন এরূপ ফলাফল পাওয়া যায়, তখন কলব, রুহ ও সের দ্বারা যদি

কেউ দরুদ পাঠ করে, তবে তার হাল কী হবে? অভিধানে 'সালাত' শব্দের অর্থ এসেছে নৈকট্য, একত্রিত হওয়া, বাস্তবায়ন ও মনোনিবেশ ইত্যাদি। জাহেরীভাবে দরুদ পড়ার প্রতিফল হচ্ছে বেহেশতের মধ্যে স্থানগত নৈকট্য লাভ। তাহলে বাতেনী আমল অর্থাৎ আত্মিক সম্পর্ক, মনোনিবেশন, মোরাকাবা (গভীর ধ্যানমগ্নতা), সার্বক্ষণিকভাবে সুরত ও আত্মার খেয়াল করা এ সবের প্রতিফল কী হতে পারে? নিশ্চয়ই এর দ্বারা মর্যাদাগত নৈকট্য লাভ হবে। আর সে মর্যাদাগত নৈকট্য হচ্ছে– 'ফী মাক্বআ'দি সিদক্বিন ই'নদা মালীকিন মুক্বতাদির' (পরম ক্ষমতাবান অধিপতির নিকট সত্যবাদিতার আসন) এটি ওই মাকাম, যেখানে আইনা এবং কাইফা (কোথায় ও কীভাবে) এর অবকাশ নেই। সুতরাং ভালো করে বুঝে নাও।

প্রকাশ থাকে যে, ওলীয়ে কামেলের নিকট যখন আল্লাহ্তায়ালার মারেফত অধিক হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় জিকিরকে উক্ত ওলীর অস্তিত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং ওলী তা থেকে কখনও গাফেল হন না। আর ওলীয়ে কামেলের মারেফত যখন রসুলুল্লাহ স. এর জন্য বৃদ্ধি পায়, তখন তার উপর হয়রানী ও পেরেশানী আসে। রসুলেপাক স.কে যখন স্মরণ করেন, তখন তাঁর নিদর্শন প্রকাশ পায়। কেননা ওলীর মারেফত আল্লাহ্র সঙ্গে তার কাবেলিয়াত অনুসারে হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্তায়ালার দরবারের সীমানায় যে মাকামই তিনি লাভ করেন, সেই মাকামেই স্থির হয়ে যান। আর সেই ওলীর মারেফত যদি রসুলেপাক স. এর বিষয়ে হয়, যা রসুলেপাক স. এর কাবেলিয়াত অনুসারে হয়ে থাকে। ফলে সে ওলীর তা বহন ও বরদাশত করার শক্তি থাকে না যে, তিনি শান্ত ও স্থির থাকবেন। তখন তাঁর উপর সেই মারেফতের নমুনা প্রকাশিত হয়ে যায়। ওলীর উপর যখন রসুলেপাক স. এর মারেফত বেশী হয়ে যায়, তখন তিনি অন্য ওলীর তুলনায় অধিকতর কামেল হয়ে যান। আল্লাহ্তায়ালার দরবারে অধিক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান এবং মারেফতে এলাহীর সাগরে শর্তবিহীনভাবে প্রবেশ করেন।

রসুলেপাক স. এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেই ওলী তাজাল্লিয়াতে এলাহীর মধ্য হতে কোনো তাজাল্লী দ্বারা রসুলেপাক স.কে দেখতে পারেন। তখন রসুলেপাক স. তাঁকে কামালিয়াতের জামাসমূহ থেকে একটি জামা দান করেন এবং তিনি তাঁকে সে জামা পরিধান করিয়ে দেন। সে জামা তাঁর কাছেই থাকে। এখন দর্শনকারী উক্ত ওলীর যদি এমন শক্তি এবং বরদাশত ক্ষমতা থাকে যে তা পরিধান করা তাঁর জন্য সম্ভব হয়, তখন সে সময়ই তিনি পরিধান করেন। আর তা না হলে তিনি তা হেফাজত করে রেখে দেন। দুনিয়াতে তা পরিধান করার যোগ্যতা ও শক্তি যখন পান, তখন তিনি তা পরিধান করেন। অন্যথায় আখেরাতে পরিধান করবেন। সুতরাং যিনিই এ জামা লাভ করবেন এবং তিনি তা দুনিয়া বা আখেরাতে পরিধান করবেন, তখন তাঁর রূহানী শক্তি

রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে দানকৃত হবে। অতঃপর সে ওলী উক্ত ওলীর তাজাল্লীসমূহ থেকে কোনো তাজাল্লী দ্বারা দেখতে পাবেন, যার হাতে সে জামা রয়েছে– তখন তিনি তাঁকে সেই জামা পরিধান করিয়ে দিবেন। দ্বিতীয় দর্শনকারীকে সে জামা রসুলেপাক স. এর পক্ষ থেকে দান করে দেন। পরে জামাদানকারী ওলীর জন্য মাকামে মোহাম্মদী স. থেকে আরও অধিকতর কামেল জামা দান করা হয় প্রথমোক্ত জামার পরিবর্তে। দ্বিতীয় ওলী যখন তাঁকে সে অবস্থায়ই দেখেন, তখন উক্ত জামা আবার তাঁকে দান করা হয় এবং নবী করীম স. এর দরবার থেকে আরও উত্তম জামা তাঁর জন্য সরবরাহ করা হয়। এভাবে মোহাম্মদ স. এর দরবার থেকে অসংখ্য জামা বণ্টন করা হতে থাকে। রসুলেপাক স. এর এই সুন্নত রোজে আযল থেকেই জারী আছে, যখন আল্লাহ্তায়ালা আম্বিয়া আ. থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি সে দিন তাঁরা নবুওয়াতের মাকাম এ কারণেই পেয়েছিলেন। আর আওলিয়া কেরামের হাতসমূহ মাকামে নবুওয়াত পর্যন্ত পৌঁছেছে এ কারণেই। এ কারণেই আওলিয়া কেরাম রসুলেপাক স. এর দর্শন লাভ করতে পারবেন না ওই দর্শনের পর, যা ভিন্ন স্থানে হয়েছিলো। এ কারণেই আম্বিয়া কেরাম সৌভাগ্যের ওই মর্যাদা লাভ করতে পেরেছেন, যা অন্যের জন্য সম্ভব হয়নি। কেননা তাঁরা হচ্ছেন প্রথম মহান জন যাঁরা রসুলেপাক স.কে পরিপূর্ণ পরিচ্ছদাবৃত অবস্থায় দেখেছিলেন, যা ছিলো রসুলেপাক স. এর মহান শান। রসুলেপাক স. এর সম্মানিত স্বভাব এবং মর্যাদাবান তরীকা সকল দর্শনকারীদের জন্য একই রকম। রসুলেপাক স. এর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য অনন্তকাল পর্যন্ত ওই একই রকম দেখতে থাকবেন এ জগতের আউলিয়া কেরাম। সল্লাল্লাহু তাআ'লা আ'লা খইরি খালক্বিহী মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন ওয়া বারেক ওয়া সাল্লিম।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া, যিনি শায়েখ মোহাক্কেক শাহ মোহাম্মদ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র অমর গ্রন্থ 'মাদারেজুন নবুওয়াত' এর অনুবাদ সম্পন্ন করার তৌফিক দান করেছেন। তার উর্দু তরজমা সমাপ্ত হয়েছে ৩০শে জুন ১৯৬৭, মোতাবেক ২১ রবিউল আওয়াল ১৩৮৭ হিজরী, শুক্রবার।

বাংলা তরজমা সমাপ্ত হয়েছে ২০শে জুলাই ২০০৭, মোতাবেক ৪ঠা রজব ১৪২৮ হিজরী, শুক্রবার। ওয়া লাহুল হামদ।

সমাপ্ত

মাদারেজুন নবুওয়াত

ISBN 984-70240-0020-0